আকীদাতুত্ব ত্বহাবী

আরবি-বাংলা

মূল

ইমাম আবূ জা'ফর আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সালামা আত্বত্বহাবী

[মৃত্যু ৩২১ হিজরি]

অনুবাদক

মাওলানা মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন বিন আব্দুস সালাম মল্লিক

ফাযেলে দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী, চট্টগ্রাম

মুদাররিস, জামিয়া ইসলামিয়া বায়তুননূর, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা

সম্পাদনায়

মাওলানা মোহাম্মদ আবুল কালাম মাসূম

ফাযেলে দারুল উলূম দেওবন্দ, ভারত

ইসলামিয়া কুতুবখানা

৩০/৩২ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

عَقِيْدَةُ الطَّحَاوِيّ

আকীদাতুত্ব ত্বহাবী [আরবি-বাংলা]

মূল	:	ইমাম আবূ জা'ফর আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সালামা আত্বত্বহাবী
অনুবাদক	:	মাওলানা মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন বিন আব্দুস সালাম মল্লিক
সম্পাদনায়	:	মাওলানা মোহাম্মদ আবুল কালাম মাসূম
প্রকাশক	:	আলহাজ মাওলানা মোহাম্মদ মোস্তফা ইসলামিয়া কুতুবখানা, ঢাকা [প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]
প্রকাশকাল	:	২০ আগষ্ট, ২০১৩ ইং
শব্দ বিন্যাস	:	ইসলামিয়া কম্পিউটার হোম ২৮/এ, প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০
মুদ্রণে	:	ইসলামিয়া অফসেট প্রিন্টিং প্রেস প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০

হাদিয়া : ২৭০.০০ টাকা মাত্র

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা

ভূমিকা

আকিদা পরিচিতি :

*** عَقِيْدَةٌ-এর আভিধানিক অর্থ :**

اَلْعَقِيْدَةُ শব্দটি মাসদার। এর বহুবচন اَلْعَقَائِدُ শব্দটি عَقْدٌ মূলধাতু হতে সংগৃহীত। এর মূল অর্থ বন্ধন করা, গিরা দেওয়া, চুক্তি করা, জমাট হওয়া, নিষ্ঠা, একাগ্রতা, শক্ত হওয়া ইত্যাদি। প্রখ্যাত ভাষাবিদ ইবনে ফারিস এর অর্থ বর্ণনা করেন, শব্দটি (ع - ق - د) থেকে সংগৃহীত। অর্থ হলো− দৃঢ় করা, দৃঢ়ভাবে নির্ভর করা। শব্দটি যত অর্থে ব্যবহৃত হয়, তা এ অর্থ থেকে গৃহীত। অতএব, عَقِيْدَةٌ শব্দের বর্তমান প্রচলিত অর্থ হবে, স্বভাব, রীতি, নীতি বা চরিত্র।

*** عَقِيْدَةٌ-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা :**

عَقِيْدَةٌ শব্দের সংজ্ঞা ওলামায়ে কেরাম বিভিন্নভাবে প্রদান করেছেন। নিচে কয়েকটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য সংজ্ঞা প্রদত্ত হলো−

১. আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত عَقِيْدَةٌ -এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন− اَلْعَقَائِدُ هِيَ الْخِصَالُ الَّتِيْ اَخَذَ النَّاسُ وَيُقِيْمُ عَلَيْهَا অর্থাৎ আকিদা মানুষের এমন কতগুলো অভ্যাসকে বলা হয়, যা তারা মনে প্রাণে গ্রহণ করে এবং তার উপর জান প্রাণ দিতে অটল থাকে।

২. অষ্টম শতকের প্রখ্যাত অভিধানবেত্তা ইবনে মুহাম্মদ আল ফাইউমী (র.) বলেন−
اَلْعَقِيْدَةُ هِيَ مَا يَدِيْنُ الْاِنْسَانُ بِهٖ অর্থাৎ আকিদা বলা হয় ঐ অভ্যাস বা বিশ্বাসকে যা মানুষ ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করে।

৩. মু'জামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার (র.) বলেন− اَلْعَقِيْدَةُ اَلْحُكْمُ الَّذِىْ لَا يَقْبَلُ الشَّكَّ فِيْهِ لِمُعْتَقِدِهٖ অর্থাৎ আকিদা ঐ বিধান বা নির্দেশকে বলা হয়, যা সন্দেহের অবকাশ ব্যতীত মানুষ গ্রহণ করে।

৪. কতিপয় আলেম এ ব্যাপারে তাদের মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন− আকিদা বলা হয় মানুষের এমন জন্মগত বিধি-বিধানকে যার উপর তারা মৃত্যু পর্যন্ত দৃঢ়ভাবে অটুট থাকে।

৫. ইসলামিয়া গ্রন্থকার বলেন− اَلْعَقَائِدُ هُوَ اِعْتِقَادُ الْقَلْبِ اِعْتِقَادًا جَازِمًا بِاللّٰهِ وَبِرَسُوْلِهٖ وَمَا نُقِلَ عَنْهُمَا مِنْ اَوْصَافِهِمَا وَهَدْيِهِمَا بِالدَّلَائِلِ الثَّابِتَةِ.

আকিদার আলোচ্য বিষয় :

- আকিদার আলোচ্য বিষয় হলো, আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদ, গুণাবলি ও তাঁর সম্পর্কিত অন্যান্য আকিদা নিয়ে আলোচনা করা।
- রাসূল ﷺ সম্পর্কে সঠিক আকিদা নিয়ে আলোচনা করা।

আকিদার উদ্দেশ্য :

- আকিদার উদ্দেশ্য একটিই, তা হলো ইসলামি শরিয়তের মৌলিক বিধি-বিধানগুলোর ক্ষেত্রে ভুল ভ্রান্তি হতে মুক্ত থাকা এবং উভয় জাহানের সফলতা অর্জন করা।
- কেউ বলেন, উভয় জাহানের সফলতা অর্জনের লক্ষ্যে ইসলামের সকল বিধানগুলোর ক্ষেত্রে ভুল ভ্রান্তি থেকে মুক্ত থাকা।

আকিদার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ :

হযরত রাসূল ﷺ ও তাঁর সাহাবাদের যুগে আকিদা বিষয়ক পরিভাষা প্রচলিত ছিল। আর তা হলো ঈমান। আল কুরআন ও হাদীস শরীফে এই শব্দটিই আকিদা বিষয়ক পরিভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। অবশ্য হিজরি দ্বিতীয় শতক হতে ধর্ম বিশ্বাস বুঝাতে আরো কিছু পরিভাষা এ বিষয়ে পরিচিতি লাভ করে।

ইসলামে আকিদা বিষয়ক নিদর্শনাবলির ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরাম (রা.) রাসূল ﷺ ও আল কুরআনে যা বলা হয়েছে তা তারা নির্দ্বিধায় তথা বিনা বাক্যে মেনে নিয়েছেন ও বিশ্বাস করেছেন। এ ব্যাপারে তারা কোনো প্রকার যুক্তি তর্কে লিপ্ত হননি। যখন ইসলাম পারস্য, ইরাক, মিসর, আফ্রিকা ও অন্যান্য দেশে ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করে, তখন এ সকল রাষ্ট্রের মানুষ নিজেদের পূর্ববর্তী ধর্ম ও তৎকালীন সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদের প্রভাবে ইসলামের [আকিদা] তথা ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিতর্কের সূত্রপাত করে। তাদের বিতর্কিত বিষয়ে ইসলামি ধর্ম বিশ্বাসের বিভিন্ন দিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে তাবেঈন, তাবেতাবেঈনগণ সচেষ্ট হন। তাঁরা ধর্ম বিশ্বাসের অমৌলিক বিষয়াদি আলোচনার জন্য "ঈমান" শব্দ ছাড়াও অনেক পরিভাষা ব্যবহার করেন। এ সকল পরিভাষার মধ্যে অন্যতম হলো اَلْعَقِيْدَةُ ও اَلشَّرِيْعَةُ - اَلسُّنَّةُ - اَلْفِقْهُ الْاَكْبَرُ - عِلْمُ التَّوْحِيْدِ ইত্যাদি। এ সবগুলোর মধ্যে اَلْعَقِيْدَةُ পরিভাষাটির অধিক প্রচলন ঘটে। যার ফলে এটি অধিক পরিচিত হয়ে পড়ে।

হিজরি চতুর্থ শতাব্দীর পূর্বে এর কোনো প্রচলন ছিল না। এমনকি হিজরি চতুর্থ শতাব্দী পর্যন্ত সংকলিত কোনো অভিধান গ্রন্থেও এর ব্যবহার পাওয়া যায় না। হিজরি চতুর্থ শতাব্দী হতে এর প্রচলন ঘটে। এর পরবর্তী যুগে এটিই একমাত্র ঈমান বিষয়ক পরিভাষা হয়ে পড়ে।

পূর্ব যুগে عَقِيْدَةٌ শব্দটি ধর্ম বিষয়ক বুঝাতে ব্যবহৃত হলেও হযরত রাসূল ﷺ -এর যুগে এবং প্রাচীন আরবি ভাষায় -এর ব্যবহার পাওয়া যায় না। اَلْعَقِيْدَةُ ও اَلْاِعْتِقَادُ শব্দ কুরআন ও হাদীসে ব্যবহৃত হয়নি। রাসূল ﷺ ও তাঁর পূর্বে শব্দ দুটি বিশ্বাস অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। অবশ্য জমাট হওয়া বা দৃঢ় হওয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রসিদ্ধ ভাষাবিদ ইসমাঈল হাম্মাদ জাওহারী বলেন–

اِعْتَقَدَ ضَيْعَةً وَمَالًا اَىْ اِقْتَنَاهَا وَاعْتَقَدَ الشَّيْئُ صَلُبَ وَاشْتَدَّ - وَاعْتَقَدَ كَذَا بِقَلْبِهِ وَلَيْسَ لَهُ مَعْقُوْدٌ اَىْ عَقْدُ رَاْيٍ অর্থাৎ সম্পত্তি বা সম্পদ ই'তেকাদ করেছে। অর্থাৎ তা অর্জন করেছে বা সঞ্চয় করেছে। কোনো কিছু ই'তেকাদ হয়েছে, অর্থ হলো, তা শক্ত এবং কঠিন মজবুত বা জমাটবদ্ধ হয়েছে। অন্তর দিয়ে অমুক জিনিস ই'তেকাদ করেছে। আর তার কোনো মা'কূদ নেই। অর্থাৎ তার মতামতের স্থিরতা বা দৃঢ়তা নেই।"

হাতে গোণা দু'একটি হাদীসে اِعْتِقَادٌ শব্দটি ব্যবহার হয়েছে ঠিকই, কিন্তু বিশ্বাস অর্থে নয়; বরং সম্পদ- পতাকা ইত্যাদি দৃঢ়ভাবে ধারণ করা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন একটি হাদীসে হযরত বারা ইবনে আযিব (রা.) বলেন, لَقِيْتُ عَمِّىْ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَقَدْ اِعْتَقَدَ رَايَةً অর্থাৎ আমি আমার চাচার সাথে সাক্ষাৎ করলাম, এমতাবস্থায় তিনি একটি পতাকা দৃঢ়ভাবে ধারণ করেছিলেন।

হিজরি দ্বিতীয় শতাব্দীর কোনো কোনো ইমাম ও আলেমের কথায় اِعْتِقَادٌ ও عَقِيْدَةٌ শব্দটি দৃঢ় ধর্ম বিশ্বাস অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন হযরত আবূ হানীফা (র.) ফিকহুল আকবারে اِعْتِقَادٌ শব্দকে 'ধর্ম বিশ্বাস' অর্থে ব্যবহার করেছেন।

অবশ্য চতুর্থ ও পঞ্চম শতকের লিখিত কোনো অভিধান গ্রন্থে عَقِيْدَةٌ শব্দ ব্যবহৃত হয়নি। যদিও عَقْد – عُقْدَةٌ – عَقِيْدَةٌ ও عَقِيْد শব্দ পাওয়া যায়। ৮ম শতকের পরে এই عَقِيْدَةٌ শব্দের ব্যাখ্যা বিভিন্নজন বিভিন্নভাবে করেছেন।

ইসলামি আকিদা বিষয়ক অন্যান্য পরিভাষা :

হযরত রাসূল ﷺ ও সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর যুগে আকিদা বিষয়ক অন্য কোনো পরিভাষা [اِيْمَانٌ শব্দ ছাড়া] ব্যবহৃত না হলেও হিজরি দ্বিতীয় শতাব্দীতে কিছু পরিভাষার উৎপত্তি হয়। নিম্নে তা সবিস্তারে প্রদত্ত হলো।

১. عِلْمُ التَّوْحِيْد : হযরত ইমাম আবূ হানীফা (র.) عِلْمُ الْعَقِيْدَةِ কে عِلْمُ التَّوْحِيْد নামে ব্যবহার করেছেন। তাওহীদই আকিদার মূল ভিত্তি। তিনি এ হিসেবে একে عِلْمُ التَّوْحِيْد নামে অভিহিত করেছেন। –[ফিকহে আকবার]।

২. اَلسُّنَّةُ : হিজরি তৃতীয় শতকে ইসলামি আকিদা ও এ বিষয়ক মূলনীতি বুঝাতে উক্ত শব্দটির ব্যাপক পরিচিতি ঘটে। সুন্নত বলা হয় রাসূল ﷺ -এর জীবনাদর্শ ও তাঁর সাহাবাদের কর্ম আদর্শকে। যেহেতু হিজরি তৃতীয় শতাব্দীর দিকে নতুন মুসলিমগণ ইসলাম গ্রহণ করে নিজস্ব মত ও তর্ক দিয়ে সাহাবাদের সুন্নত থেকে বের হতে থাকলো। তাই সে যুগের ইমামগণ 'আস সুন্নাহ' নামক আকিদা বিষয়ক অনেক গ্রন্থ লেখেন এবং 'আস সুন্নাহ' শব্দকে আকিদা বিষয়ক পরিভাষা হিসেবে ব্যবহার করেন।

৩. اُصُوْلُ الدِّيْنِ اَوِ الدِّيَانَةِ : কোনো কোনো আলেম হিজরি চতুর্থ শতকের পর উক্ত পরিভাষাটি আকিদা বুঝাতে ব্যবহার করেন। তাদের মধ্যে আল্লামা আবুল হাসান আলী ইবনে ইসমাঈল আশ শায়ারী (র.) উল্লেখযোগ্য। তিনি اَلْاِبَانَةُ عَنْ اُصُوْلِ الدِّيَانَةِ নামক একটি গ্রন্থও লিখেন।

৪. اَلشَّرِيْعَةُ : হিজরি তৃতীয় শতাব্দীতে উক্ত পরিভাষাটি আকিদা বিষয়ক পরিভাষা হিসেবে ব্যাপক প্রচার লাভ করে। ইমাম আবূ বকর মুহাম্মদ ইবনে হুসাইন আল আজুরী (র.) আকিদা বিষয়ক আশ শরীয়াহ নামক গ্রন্থও লিখেন।

৫. عِلْمُ الْكَلَامِ : ইসলামি আকিদা বিষয়ক আলোচনা বা গবেষণাকে অনেক সময় এ পরিভাষায় আখ্যা দেওয়া হতো। ধর্ম বিষয়ক দর্শন ও যুক্তি বিদ্যাকেই ইলমুল কালাম হিসেবে বুঝানো হয়।

আহমদ আমীন (র.) বলেন, ইলমুল কালামটা মূলতঃ মু'তাজিলা সম্প্রদায়ের সৃষ্ট। আব্বাসীয় খেলাফত যুগে সম্ভবত আল মামূনের শাসনকালে এর উৎপত্তি ও বিকাশ লাভ করে। এর পূর্বে এ বিষয়ক পরিভাষা اَلدِّيْنُ ও اَلْفِقْهُ ছিল। আল্লামা শিবলী নু'মানী (র.) বলেন, আব্বাসীয় যুগে খলিফা মাহদীর যুগ পর্যন্ত এটা ইলমুল কালাম নামে অভিহিত ছিল না। কিন্তু যখন মামূনুর রশীদের যুগে মু'তাজিলা সম্প্রদায় দর্শন শাস্ত্রে দক্ষতা লাভ করে এবং দার্শনিক মনোবৃত্তি নিয়ে এই শাস্ত্রের গ্রন্থাদি রচনা শুরু করে তখন তারা এর নাম ইলমুল কালাম রাখেন।

* হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর যুগে সাহাবায়ে কেরাম (রা.) ধর্ম বিশ্বাস বুঝাতে একটি পরিভাষাই ব্যবহার করতেন। আর তা হলো اَلْاِيْمَانُ যেহেতু এটি ধর্ম বিশ্বাস বিষয়ক প্রথম পরিভাষা তাই এর সংজ্ঞা আমাদের জেনে নেওয়া উচিত। তাই নিম্নে এর বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হলো।

الايمان -এর পরিচিতি :

* **اَلْاِيْمَانُ শব্দের আভিধানিক অর্থ :** اَلْاِيْمَانُ শব্দটি اَمْنٌ ধাতু হতে নির্গত। এর অর্থ–

১. اَلتَّصْدِيْقُ অর্থাৎ আন্তরিক বিশ্বাস।
২. اَلْاِنْقِيَادُ অর্থাৎ আনুগত্য করা।
৩. اَلْوُثُوْقُ অর্থাৎ নির্ভর করা।
৪. اَلْخُضُوْعُ অর্থাৎ অবনত হওয়া।
৫. اَلْاِطْمِيْنَانُ অর্থাৎ প্রশান্তি লাভ করা।
৬. اَلْاِذْعَانُ অর্থাৎ স্বীকৃতি দেওয়া।
৭. আল্লামা তাফতাযানী (র.) বলেন, اَلْاِيْمَانُ-এর আভিধানিক অর্থ হলো সংবাদ দাতার সংবাদকে মনে প্রাণে বিশ্বাস করা এবং তা গ্রহণ ও সত্যায়ন করা।
৮. ফায়েদুত তুল্লাব গ্রন্থকার (র.) বলেন, اَلْاِيْمَانُ-এর আভিধানিক অর্থ হলো– اَلْاِعْتِمَادُ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস রাখা।

* **اَلْاِيْمَانُ -এর পারিবাষিক সংজ্ঞা :**

১. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) বলেন– اَلْاِيْمَانُ هُوَ الْعَمَلُ بِالْمَامُوْرَاتِ وَالْاِجْتِنَابُ عَنْ جَمِيْعِ الْمَنْهِيَّاتِ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ﷺ কর্তৃক সকল আদিষ্ট বিষয়াবলির উপর আমল ও সকল নিষিদ্ধ বিষয়াবলি পরিহার করাকে ঈমান বলা হয়।
২. ইমাম গাযালী (র.) বলেন– اَلْاِيْمَانُ هُوَ تَصْدِيْقُ النَّبِيِّ ﷺ بِجَمِيْعِ مَا جَاءَ بِهٖ অর্থাৎ ঈমান বলা হয় হযরত রাসূল ﷺ যা কিছু নিয়ে এসেছেন সব কিছুর প্রতি আস্থা স্থাপন করাকে।
৩. ঈমান বলা হয়, মহানবী ﷺ যা কিছু নিয়ে আগমন করেছেন তাতে পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা এবং তা আমাদের নিকট মুতাওয়াতির রূপে পৌঁছার জ্ঞান রাখা সংক্ষিপ্তের স্থানে সংক্ষিপ্ত এবং বিস্তারিত স্থানে বিস্তারিত।
৪. জমহুর ওলামাদের মতে, اَلْاِيْمَانُ هُوَ التَّصْدِيْقُ بِمَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالْاِقْرَارُ بِهٖ অর্থাৎ আল্লাহর নিকট থেকে রাসূল ﷺ কর্তৃক আনীত সকল বিষয়াবলির সত্যায়ন করা ও তা মৌখিক স্বীকার করাকে ঈমান বলা হয়।
৫. আল্লামা কাজি বায়যাবী (র.) বলেন–

اَلْاِيْمَانُ هُوَ تَصْدِيْقُ بِمَا عُلِمَ مَجِيْءُ النَّبِيِّ ﷺ بِهٖ اِجْمَالًا وَتَفْصِيْلًا.

৬. আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশমিরী (র.) বলেন–

اَلْاِيْمَانُ هُوَ تَصْدِيْقُ النَّبِيِّ ﷺ بِمَا جَاءَ بِهٖ بِاعْتِمَادٍ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ.

৭. রায়েদুত তুল্লাব গ্রন্থকার (র.) বলেন– اَلْاِيْمَانُ هُوَ الْاِعْتِمَادُ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ

বিশুদ্ধ আকিদা ও ঈমানের গুরুত্ব :

সঠিক বিশ্বাসই মানুষের সকল সফলতার চাবিকাঠি ও সৌভাগ্যের ভিত্তি। বিশ্বাসই মানুষের পরিচালিকা শক্তি। সঠিক বিশ্বাস তথা ঈমান মানুষকে সফলতার শীর্ষে তুলে দেয় এবং তার জীবনকে করে অনাবিল শান্তিময় ও আনন্দময়। আর ঈমান ও কর্মের নাম ইসলাম। বিশুদ্ধ ঈমান ইসলামের মূল ভিত্তি। মানুষ আল্লাহ তা'আলার যত ইবাদত ও গুণকীর্তন করে সব কবুল হওয়ার জন্য প্রথম শর্ত হলো, বিশুদ্ধ ঈমান। তাতে কোনো প্রকার কুফর বা শিরক থাকতে পারবে না। একথা মহান আল্লাহ তা'আলা কুরআনের বহু স্থানে বলেছেন।

যেমন এক স্থানে বলেন– وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ وَسَعٰى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشْكُوْرًا অর্থাৎ আর যে ব্যক্তি পারলৌকিক জীবনে কল্যাণ চায় ও সে জন্য চেষ্টা করে এমতাবস্থায় সে মু'মিন। তাহলে তার চেষ্টা তথা কর্ম কবুল করা হবে।

অন্যত্র মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُوْنَ فِيْهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ অর্থাৎ যে সকল মু'মিন পুরুষ বা নারী সৎকর্ম সম্পাদন করবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর সেখানে তারা অফুরন্ত নিয়ামত ও রিজিক ভোগ করবে। –[সূরা নিসা]

অনুরূপভাবে ইহলৌকিক জীবনে আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত, বরকত ও কল্যাণ লাভের জন্যও বিশুদ্ধ ঈমান শর্ত। যেমন ইরশাদ হচ্ছে– مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ অর্থাৎ পুরুষ কিংবা নারীদের মধ্য থেকে যারা সৎকর্ম সম্পাদন করবে, এমতাবস্থায় যে সে মু'মিন তাহলে অবশ্যই তাকে ইহকালে পবিত্র জীবন দিয়ে জীবিত রাখবো এবং পরকালে তাদেরকে সর্বোত্তম প্রতিদান প্রদান করব। যেরূপ দুনিয়াতে বরকত লাভের জন্য ঈমান শর্ত অনুরূপ যদি ঈমান না থাকে তাহলে তার শাস্তি হলো ধ্বংস ও ক্ষতি। যেমন ইরশাদ হচ্ছে– وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ وَلٰكِنْ كَذَّبُوْا فَاَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ অর্থাৎ যদি জনপদসমূহের অধিবাসীরা ঈমান আনতো ও আল্লাহকে ভয় করতো তাহলে অবশ্যই আমি তাদের জন্য আসমান ও জমিনের বরকত এবং কল্যাণসমূহের দ্বার উন্মুক্ত করে দিতাম। কিন্তু তারা মিথ্যারোপ করলো, যার ফলে তাদের কৃত বর্ণনানুযায়ী তাদেরকে পাকড়াও করলাম। –[সূরা আ'রাফ]

আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য এবং বন্ধুত্ব লাভের জন্যও ঈমান শর্ত। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন– اَلَاۤ اِنَّ اَوْلِيَاۤءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا অর্থাৎ জেনে রাখ! নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলার বন্ধুদের কোনো ভয় নেই আর তারা চিন্তা গ্রস্তও হবে না। আর তারা তো ঐ সব লোক যারা ঈমান এনেছে এবং তাকওয়া তথা আল্লাহভীতি অবলম্বন করেছে। –[সূরা ইউনুস]

বিশুদ্ধ ঈমান বিনষ্টকারী সম্পর্কে জ্ঞান লাভের গুরুত্ব :

মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই মানবীয় বিবেক বুদ্ধি ও যুক্তির মাধ্যমে মহান সত্তা আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব অনুভব ও প্রমাণ করতে পারে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার প্রতি বিশ্বাসের স্বরূপ ও বিস্তারিত বিষয়াদি অনুভব করতে পারে না। এজন্য ঐশী বাণীর জ্ঞানের উপর তার নির্ভরশীল হতে হয়। এ কারণে কুরআন হাদীসের আলোকে ইসলাম ঈমানের স্বরূপ, ভিত্তি ও আরকান ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে অবগত হওয়া ছাড়া বিশুদ্ধ ঈমান অর্জন করা অসম্ভব।

যেরূপভাবে ঈমান অর্জন করা জরুরি, সেরূপভাবে তা সংরক্ষণ করাও জরুরি। রাসূল ﷺ-এর পূর্বেকার যুগের অনেক নবীর উম্মত তাঁদের সত্যবাণীর মাধ্যমে ঈমান অর্জন করেছে। কিন্তু তাঁরা ঈমান সংরক্ষণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। তাঁরা ঈমান বিধ্বংসী বিষয়াবলি চিহ্নিত করতে না পারার কারণে নিজেদের ঈমান সংরক্ষণ করতে পারেনি।

উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'আলা ইহুদি, নাসারা ও আরব কাফেরদের কথা উল্লেখ করেছেন। তারা সকলেই নিজেদেরকে খাঁটি ও নির্ভেজাল মু'মিন হিসেবে বিশ্বাস করতো এবং রাসূল ﷺ-এর আনীত ধর্মকে তারা মনে করতো তাদের ঈমান ও পূর্ব পুরুষদের রেখে যাওয়া ধর্মের বিনষ্টকারী। যার ফলে তারা ইসলামকে গ্রহণ করেনি। কিন্তু তারা এ বিষয়টি বুঝতে পারেনি যে, তাদের ঈমানকে কুফর ও শিরক গ্রাস করে বিনষ্ট করে দিয়েছে। অথচ তারা আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করত এবং অনেক সৎকার্য সম্পাদন করত। কিন্তু তারা একথা জানতো না বা জানলেও বিশ্বাস করতো না যে, আল্লাহ তা'আলা তো কুফর শিরক মিশ্রিত ইবাদত কবুল করেন না। এ কারণেই মহান আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন- وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهٗ অর্থাৎ যে কেউ ঈমান প্রত্যাখ্যান করবে, তার সৎকর্মসমূহ নিষ্ফল হয়ে যাবে। [আলে ইমরান]

অন্যত্র মহানবী ﷺ-কে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ তা'আলা বলেন- وَلَئِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ অর্থাৎ [শিরকের ভয়াবহতা সম্পর্কে সতর্ক করতে গিয়ে বলেন], যদি আপনি শিরক করেন, তবে অবশ্যই আপনার আমল বিফল হয়ে যাবে। আর আপনি হবেন ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।

সুতরাং ঈমান বিধ্বংসী বিষয়ের স্বরূপ, এগুলোর কারণ এবং পূর্ববর্তী নবীগণের উম্মতদের বিভ্রান্তির কারণ ও তার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে পূর্ণ অবগত হওয়া অতীব জরুরি।

ভ্রান্ত আকিদা সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের গুরুত্ব :

হযরত রাসূলে কারীম ﷺ যে সকল কর্ম করেননি সে সকল কর্ম সম্পাদন করাকে ইবাদত, বুজুর্গী মনে করার অর্থ এ দাঁড়ায় যে, নিশ্চয় তাঁর সুন্নত অপূর্ণ। অনুরূপ আকিদার ক্ষেত্রে তিনি যা বলেননি তাকে ইসলামি আকিদা হিসেবে গণ্য করাও তাঁর সুন্নতকে অবজ্ঞা ও অপূর্ণ মনে করার নামান্তর। এমনটি করা পাপ বৈ কিছু নয়। কর্মের ক্ষেত্রে পাপ না থাকলেও আকিদার ক্ষেত্রে এরূপ সুন্নত বিরোধিতার কারণে সে পাপী বলেই গণ্য হবে।

এ ধরনের ব্যক্তির আকিদা বিভ্রান্তিকর হওয়ার কারণে সে জাহান্নামী হবে। কারণ হযরত রাসূল ﷺ বলেছেন-

إِنَّ بَنِىْ إِسْرَائِيْلَ تَفَرَّقَتْ عَلٰى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِىْ عَلٰى ثَلَاثٍ وَّسَبْعِيْنَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِى النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً قَالُوْا وَمَنْ هِىَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِىْ.

অর্থাৎ নিশ্চয় বনী ইসরাঈলগণ ৭২ দলে বিভক্ত হয়েছিল। আর আমার উম্মত [আকিদাগতভাবে] ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। এদের একটি দল ব্যতীত সকলেই জাহান্নামে যাবে। সাহাবায়ে কেরাম (রা.) প্রশ্ন করলেন, সে দলটি কারা? হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! উত্তরে তিনি বললেন, আমি এবং আমার সাহাবীগণ যে রীতিনীতির উপর রয়েছি।

উপরিউক্ত হাদীস থেকে কয়েকটি বিষয় বুঝা যায়।

১. হাদীসে বর্ণিত ৭৩ দলের মধ্যে কেবলমাত্র একদল জান্নাতী হবে। আর অবশিষ্ট ৭২ দল জাহান্নামী। অবশ্য তারা কাফের নয়; বরং আকিদার ক্ষেত্রে ত্রুটি থাকার কারণে পাপী হয়েছে। যার ফলে পাপের শাস্তি ভোগ করে জান্নাতে যাবে। হ্যাঁ, যদি তার ত্রুটিযুক্ত আকিদা কুফরি হয়, তবে তা ভিন্ন কথা।
২. ইসলামি শরিয়ত ও আকিদার ক্ষেত্রে সকল সাহাবীই সত্যের মাপকাঠি।
৩. আকিদার ক্ষেত্রে রাসূল ﷺ ও সাহাবায়ে কেরাম (রা.) কি আকিদা পোষণ করেছেন তা জানা সকল মুসলমানের অত্যাবশ্যক। ইসলামি শরিয়ার সর্বক্ষেত্রে হুবহু তাদের অনুসরণ করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য জরুরি।

সুতরাং সকল মুসলমানের জন্য সঠিক আকিদা ও বিভ্রান্তিকর আকিদা সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞানার্জন করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

গ্রন্থকার ইমাম তাহাবী (র.) :

নাম ও বংশ : তাঁর প্রকৃত নাম আহমদ, উপনাম আবূ জাফর। পিতার নাম মুহাম্মদ। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো– আবূ জাফর আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সালামা ইবনে মাসলামাহ ইবনে আব্দুল মালেক ইবনে সালামা ইবনে সুলাইমান ইবনে হারবুল আযদী আল হাজারী আল মিসরী আত ত্বহাবী (র.)।

ইয়ামেনের একটি বিখ্যাত গোত্রের নাম আযদ। এরই একটি শাখার নাম হাজার। 'ত্বহা' নামক এলাকায় তিনি বাস করতেন। বর্ণিত সব দিকেই সম্বন্ধ করে তাঁকে কখনো আযদী, কখনো হাজরী আবার কখনো ত্বহাবী বলা হয়। তবে তিনি ত্বহাবী নামেই সমধিক পরিচিত।

জন্ম : ইমাম তাহাবী (র.) ১১ই রবিউল আউয়াল মাসে জন্মগ্রহণ করেন। অবশ্য তাঁর জন্ম সন নিয়ে বিভিন্ন মত পরিলক্ষিত হয়।

১. ইবনে আসাকির (র.) ইবনে ইউনুস (র.) থেকে বর্ণনা করে বলেন, ইমাম ত্বহাবী (র.) ২৩৯ হিজরি সনে জন্মগ্রহণ করেন। আবদুল কাদের কুরাশী, ইবনে নুকতা, ইয়াকূত ইমাবী, আল্লামা ইবনে জাওযী, আল্লামা সুয়ূতী, হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী, আল্লামা হাফেজ ইবনে কাসীর, ইবনুত তাগরী, শাহ আবদুল আজিজ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ ও মিসরীয় ব্যক্তিবর্গের মতেও ইমাম ত্বহাবী (র.)-এর জন্ম ২৩৯ হিজরি সনে হয়েছে।
   [জাওয়াহেরে মুযীআ, মু'জামুল বুলদান, লিসানুল মীজান, হুসনুল মুহাযারা, আল বুলদান ও আন নুজূমুয যাহেরা ইত্যাদি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য]

২. কারো মতে তিনি ২২৯ সনে জন্মগ্রহণ করেন।
৩. কেউ বলেন, তিনি ২৩৭ হিজরি সনে জন্মগ্রহণ করেন।
৪. কতক ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলেন, তিনি ২২৭ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন।
৫. কতিপয় ইতিহাসবেত্তার মতে ইমাম ত্বহাবী (র.) ২৩৮ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন।

তবে প্রথম মতটিই অধিকতর বিশুদ্ধ।

যাই হোক তিনি উপরিউক্ত যে কোনো এক সনে ১১ই রবিউল আউয়াল রবিবার মিসরের মফস্বল নগরের তাহতুত গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

শৈশবকাল : খোদাভীরু আলেম পরিবারে ইমাম ত্বহাবী (র.) জন্মগ্রহণ করায় তাঁর শৈশবকাল শুরু হয় ধর্মীয় পরিবেশে। তাঁর শৈবকাল অতিবাহিত হয়েছে মা বাবার সুশাসন ও সুদৃষ্টির মধ্য দিয়ে। পাড়ার অন্যান্য ছেলেদের মতো তাঁর শৈশব কাটেনি। তিনি সকলের নিকটই অত্যন্ত নম্র, ভদ্র ও মেধাবী হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

শিক্ষা জীবন : ইমাম ত্বহাবী (র.) ছিলেন তীক্ষ্ণ মেধা ও অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী। স্বীয় পিতার নিকট প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করার পর তিনি জগদ্বিখ্যাত মুহাদ্দিস, যুগ শ্রেষ্ঠ ফকীহ, ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর একনিষ্ঠ শীর্ষ ইমাম ইসমাঈল মুযানী (র.)-এর নিকট মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা লাভ করেন। তাঁর মামা শাফেয়ী মাজহাবের অনুসারী ছিলেন বিধায় তিনিও ছোটকাল থেকে শাফেয়ী মাজহাব অনুযায়ী গড়ে উঠেন। তিনি আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া ইবনে আমরুসের নিকট কুরআন মাজীদ মুখস্থ করেন। ইমাম আহমদ ইবনে আবূ ইমরান, জা'ফর ইবনে আবূ ইমরান, কাজি আবদুল হামীদ ইবনে জা'ফর, কাজি বকর ইবনে কুতাইবা ও আবূ আজীম প্রমুখ ওলামাদের নিকট তাফসীর হাদীস, ফিকহ ও আকাইদ, যুক্তিবিদ্যা ও ইতিহাস বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেন।

ইমাম ত্বহাবী (র.)-এর হাদীস শাস্ত্রের উল্লেখযোগ্য শিক্ষকবৃন্দ : তিনি যে সকল শিক্ষক মহোদয় থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন, তাদেরকে চারটি ভাগে বিভক্ত করা যায়।

১. যে সকল উস্তাদ থেকে "মা'য়ানীল আছার" ও "মুশকিলুল আছার" গ্রন্থে হাদীস বর্ণনা করেছেন।
২. যে সকল উস্তাদ থেকে "মায়ানিল আছার" গ্রন্থে হাদীস বর্ণনা করেছেন।
৩. যে সকল উস্তাদ থেকে "মুশকিলুল আছার" গ্রন্থে হাদীস বর্ণনা করেছেন।
৪. যে সকল উস্তাদ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন বলে হাদীস বিশারদ ও ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছে।

নিম্নে সে সকল স্তরের উস্তাদগণের নাম প্রদত্ত হলো।

প্রথম স্তর :

১. ইবরাহীম ইবনে আবূ দাঊদ [মৃ. ২৭২ হিজরি] আল বাবালুসী (র.)।
২. আহমদ ইবনে শুআইব আবূ আব্দুল্লাহ আন নাসায়ী [২১৫-৩০৩ হি.]
৩. আহমদ ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে ওহাব মিসরী (র.) [মৃ. ২৬৪ হি.]
৪. আহমদ ইবনে আব্দুল মু'মিন আল খুরাসানী আল মিরওয়াযী [মৃ. ২৬৭ হি.]
৫. আহমদ ইবনে আবূ ইমরান (র.) [মৃ. ২৮০ হি.]
৬. ইসহাক ইবনে ইবরাহীম ইবনে ইউনুস আল বাগদাদী [মৃ. ৩০৪ হি.]
৭. বাহার ইবনে নাসর ইবনে সাবিক আল খাওলানী [মৃ. ১৮০ হি.]
৮. বাকর ইবনে কুতাইবা আল বাকবাবী আল মিসরী [মৃ. ২৮২ হি.]

৯. হুসাইন ইবনে নাসর ইবনে মা'আরিফ আল বাগদাদী [২৬১ হি.]
১০. রাবী ইবনে সুলাইমান আল জাযী আবূ মুহাম্ম বিসরী [মৃ. ২৫৬/৮৭০]
১১. রাবী ইবনে সুলাইমান আল মুয়াযযিন আবূ মুহাম্মদ আল মিসরী [১৭৪/৭৯০]
১২. রাওহা ইবনে ফারজ আল কাত্তান আবূ যিনাব আল মিসরী [১৮৬/৮০২]
১৩. আবদুর রহমান ইবনে আমর ইবনে আবদুল্লাহ আদ দামেশকী [২৮২/৮৯৪]
১৪. আবদুল আজিজ ইবনে মু'আবিয়া ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে খালেদ আল উমুয়ী আল আত্তাবী আল বিসরী [২৮৪/৮৯৭ হি.]
১৫. আবদুল গনী ইবনে আবদুল আকীল আল লাখমী আবূ জাফর মিসরী [১৬৪/৭৮০]
১৬. আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ান আর রাকী আল আহওয়াযী [২৫৬/৮৬৯]
১৭. আলী ইবনে আবদুর রহমান ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুগীরা আল কূফী [২৭২/৮৮৬]
১৮. আলী ইবনে আবদুল আজিজ আল বাগদাদী [মৃ. ২৮৬/৮৯৯]
১৯. সুলাইমান ইবনে মু'আবিয়া ইবনে সুলাইমা আল কায়সানী [১৮৬/৮০২]
২০. আলী ইবনে মা'বাদ ইবনে নূহ আল বাদাদী (র.) প্রমুখগণ। [২৫৯/৮৭৩]

দ্বিতীয় স্তর :

১. মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে জাররাহ আল জুযাজানী (র.) আবূ আবদুর রহীম (র.) [২৪৫/৮৫৯]
২. মুহাম্মদ ইবনে হাসসান আন নাহবী (র.) [২৭২/৮৮৫]
৩. মুহাম্মদ ইবনে মারযূক (র.) [২৪৮/৮৬২]
৪. ওয়াহবান ইবনে ওসমান আল ওয়াসীত আল বাগদাদী (র.) [২৩৯/৮৫৩]
৫. মূসা ইবনে মুবারক (র.)
৬. হাশিম ইবনে মুহাম্মদ ইয়াযীদ আল আনসারী আবুদ-দারদা (র.) প্রমুখগণ।

তৃতীয় স্তর :

১. আহমদ ইবনে ইসহাক ইবনে বাহলুল আত তানূখী (র.) আবূ জাফর [২৩২/৮৪৫]
২. আহমদ ইবনে হাম্মাদ আত তুজায়বী আবূ জাফর মিসরী (র.) [২৫৬]
৩. আহমদ ইবনে সুলায়মান ইবনে আবদুল মালেক আবুল হুসাইন আর রুহাবী (র.) [২৬১/৮৭৫]
৪. আহমদ ইবনে সিনান ইবনে আসাদ আবূ জাফর আল ওয়াসীত আল কাত্তান (র.) [২৫৬/৮৬৯]
৫. আহমদ ইবনে ওসমান হাকীম আল আওদী আবূ আবদুল্লাহ (র.) [২৬১/৮৭৪]
৬. ইবরাহীম ইবনে হাসান ইবনে হায়সাম আল খাস'আমী আবূ ইসহাক আল মাসাসী আল মিকসামী (র.)।
৭. ইসমাঈল ইবনে হামদুয়াহ আল বিকান্দী আবূ সাঈদ আল বুখারী [২৭৩/৮৮৬]
৮. হাসান ইবনে বাকর ইবনে আবদুর রহমান আবূ আলী আল মারওয়াযী।
৯. হাসান ইবনে গুলায়ব ইবনে সাঈদ আল আজাদী [২৯০/৯০২]
১০. আবদুল্লাহ ইবনে আবূ দাউদ সুলাইমান ইবনে আশ'আস আস সাজশতানী আবূ বাকে (র.) [২৩০/৮৪৪] প্রমুখগণ।

চতুর্থ স্তর :

১. ইবরাহীম ইবনে মূসা ইবনে জালীল আল ওমুরী আবুল ইসহাক আন্দুলূসী (র.) [৩০০/৯১২]
২. আলী ইবনে হুসাইন ইবনে হারব ইবনে ঈসা আল কাজি আবূ উবায়দ ইবনে হারবুয়াহ (র.) [২৮৬/৮৯৯]
৩. হারূন ইবনে সাঈদ আল আয়লী আস সাবদী আবূ জাফর আত তামীম [২৫৩/৮৬৭]
৪. আলী ইবনে আবদুল আজিজ আল হাফিজ আবুল হাসান আল বাগবী (র.) [২৮৬/৮৯৯]
৫. ইয়াহইয়া ইবনে আইয়ূব ইবনে বাদী আল খাওলানী আল আল্লাফ (র.) [২৮৯/৯০১]

শিক্ষা সফর :

ইমাম ত্বহাবী (র.) তৎকালীন সর্বাপেক্ষা বড় আলেম এবং প্রখ্যাত হাদীস বিশারদগণের নিকট জ্ঞানার্জন করার পরও উচ্চতর জ্ঞানান্বেষণের উদ্দেশ্যে সিরিয়া, জেরুজালেম, গাজা এবং আসকালানসহ বিভিন্ন শহরে সফর করেন। এছাড়াও তিনি ইয়ামান, বসরা, হেজাজ, কূফা ও খুরাসান দেশ জ্ঞানান্বেষণের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করেন।

কর্মজীবন :

ইমাম ত্বহাবী (র.) সুদীর্ঘকাল জ্ঞানান্বেষণের পর শিক্ষকতা পেশায় আত্মনিয়োগ করেন। পূর্ণ মন মানসিকতা তাতে ঢেলে দেন। ফলে তিনি সকলের নিকট একজন সফল শিক্ষক হিসেবে পরিচিত হন। তাঁর দরসে অনেক দূর থেকে জ্ঞান পিপাসু ছাত্ররা এসে ভিড় জমাতেন। এ শিক্ষকতার পাশাপাশি তিনি লেখা লেখিতে মনোনিবেশ করেন। যার ফলে তাঁর কর্মময় জীবনের পরিধি অনেক বিস্তৃত হয়ে পড়ে।

ইমাম ত্বহাবী (র.) সম্পর্কে মনীষীদের অভিমত :

ইমাম ত্বহাবী (র.) সমকালীন ও তাঁর পরবর্তী সময়ের বিশিষ্ট মনীষীদের দৃষ্টিতে ছিলেন এক অনন্য মানুষ। তাঁরা সর্বদা তাঁকে শ্রদ্ধা ও সম্মান নিবেদন করতেন। নিম্নে কয়েকজন মনীষীর মতামত তুলে ধরা হলো।

* আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র.) বলেন, ইমাম ত্বহাবী (র.) নির্ভরযোগ্যতা, আমানতদারী, দিয়ানতদারী এবং হাদীস ও হাদীস এর সনদের ত্রুটি ও নাসেখ মানসূখ [তথা কোনটার হুকুম রহিত ও কোনটার হুকুম বলবৎ রয়েছে] এসম্পর্কে বিশেষ দক্ষতার অধিকারী ছিলেন। এ ব্যাপারে উম্মতের ঐকমত্য রয়েছে। তাঁরপর এ স্থান কেউ পূর্ণ করতে পারেনি।
* ইবনে আবদুল বার মালিকী (র.) বলেন, ইমাম ত্বহাবী (র.) হানাফী মাজহাবধারী হওয়া সত্ত্বেও সকল মাজহাবের ফিকহ সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞানী ছিলেন।
* আল্লামা আবদুল মাহাসিন (র.) বলেন, ইমাম ত্বহাবী (র.) ফিকহ, হাদীস, ইখতেলাফে ওলামা, ফিকহী আহকাম এবং ভাষা ও ব্যাকরণে যুগের অদ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি হানাফী মাসলাকের একজন মর্যাদাসম্পন্ন ফকীহ ছিলেন।
* ইবনে ইউনুস (র.) বলেন, ইমাম ত্বহাবী (র.) নির্ভরশীল, আস্থাবান, বুঝমান ফকীহ ছিলেন। তাঁরপর তাঁর মতো দ্বিতীয়জন আর আসেনি।
* আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী (র.) বলেন, ইমাম ত্বহাবী (র.) ছিলেন হানাফী মাজহাব সম্পর্কে সবচেয়ে বড় জ্ঞানী, এমনকি তিনি সকল মাজহাব সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞানী ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন মুজতাহিদ। তিনি শরহুল মায়ানীল আছারে ইমাম শাফেয়ী (র.)

থেকে এক ওয়াসেতায় এবং ইমাম মালেক (র.) থেকে দুই ওয়াসেতায় ইমাম আজম (র.) থেকে তিন ওয়াসেতায় এবং ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র.) থেকে এক ওয়াসেতায় হাদীস বর্ণনা করেছেন।

* আল্লামা মুহাম্মদ কাউছার (র.) বলেন, ইমাম ত্বহাবী (র.) ফিকহের মুজতাহিদদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি রেওয়ায়েত ও দেরায়েত উভয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট স্বরচিত অত্যন্ত উপকারী অনেক অনবদ্য গ্রন্থ রেখে গেছেন।

মাজহাব পরিবর্তন :

যখন ইমাম ত্বহাবী বিশ বছর বয়সে পদার্পণ করেন তখন তিনি হানাফী মাজহাব গ্রহণ করেন। এর পূর্বে তিনি শাফেয়ী মাজহাব-এর অনুসারী ছিলেন। তাঁর এই পরিবর্তনের কারণ সম্পর্কে ওলামাদের অনেক মতামত রয়েছে। আবার বানোয়াট ও অসারতাও রয়েছে। নিম্নে তাঁর মাজহাব পরিবর্তনের সর্বাধিক বিশুদ্ধতম কারণ তুলে ধরা হলো।

ইমাম ত্বহাবী (র.)-এর আপন মামা ইমাম মুযানী (র.)-এর নিকট শাফেয়ী মাজহাবের শিক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁর মামা ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর একজন বিশিষ্ট ও মেধাবী ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও নিজ ভগ্নি পুত্রের জ্ঞানের পিপাসা নিবারণ করতে অক্ষম হয়ে পড়েন। যার কারণে ফিকহের ময়দানে ইমাম ত্বহাবী (র.) যতই সামনে অগ্রসর হচ্ছিলেন। ততই তিনি দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছিলেন। কারণ উসূল ও মূলনীতির পটভূমি খুটিনাটি বিষয়ের সমাধানে তিনি দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগতেন। তাঁর মামার পক্ষে তাঁর অনুসন্ধিৎসা নিবৃত করা সম্ভব হতোনা। এ অবস্থায় ইমাম ত্বহাবী খোঁজ নিয়ে জানতে পারলেন যে, তাঁর মামা মতবিরোধপূর্ণ মাসআলার সমাধান দেওয়ার জন্য হানাফী মাজহাবের কিতাবাদি অধ্যয়ন করেন এবং সে আলোকে সমস্যার সমাধান দেন। এ অবস্থা দেখে তিনি নিজেও হানাফী মাজহাবের গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করতে শুরু করেন। আর এ ব্যাপারে তিনি নিজেই বলেন, আমি মামাকে সর্বদা হানাফী মাজহাবের গ্রন্থাবলি অধ্যয়ন করতে দেখে আমি নিজেও তাতে লেগে পড়ি এবং আমি তুলনামূলকভাবে প্রত্যক্ষ করি যে, হানাফী মাজহাবের দলিল আদিল্লা শাফেয়ী মাজহাবের প্রমাণাদি হতে অধিক শক্তিশালী ও অকাট্য। যার ফলে তা আমার হৃদয়ে রেখাপাত করে। আমার মামা যখন আমার এ অবস্থা সম্পর্কে অবগত হন, তখন তিনি আমার প্রতি রাগ হয়ে বললেন, وَاللّٰهِ لَا يَجِيْءُ مِنْكَ شَيْءٌ আল্লাহর শপথ, তোমার দ্বারা কিছু হবে না। অতঃপর তিনি মামার সঙ্গ ত্যাগ করে হানাফী মাজহাবের বিশিষ্ট আলেম, কাজি আহমদ ইবনে আবূ ইমরান বাগদাদীর নিকট ফিকহে হানাফীর জ্ঞানার্জন শুরু করেন। পরিশেষে হানাফী মাজহাবের প্রতি পূর্ণ আকৃষ্ট হয়ে শাফেয়ী মাজহাব ত্যাগ করে হানাফী মাজহাব গ্রহণ করেন। -[আল-হাভী]

এতদ সম্পর্কে ইমাম মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আশ শুরূতী (র.) বলেন, আমি ইমাম ত্বহাবী (র.) কে তাঁর মাজহাব পরিবর্তনের কারণ জিজ্ঞাসা করলাম। প্রতি উত্তরে তিনি বললেন, আমার মামা আবূ ইবরাহীম ইসমাঈল ইবনে ইয়াহইয়া আল মুযানীকে হানাফী মাজহাবে গ্রন্থাবলি অধ্যয়ন করতে দেখেছি এবং তিনি তা থেকে অনেক ফায়দা হাসিল করতেন। যার ফলে আমার অন্তরেও হানাফী মাজহাবের গ্রন্থাদি অধ্যয়নের আগ্রহ সৃষ্টি হলো এবং আমিও অধ্যয়ন করতে লাগলাম। আর এই অধ্যয়নই আমার অন্তরে গভীর প্রভাব সৃষ্টি করলো। যার ফলে আমি হানাফী মাজহাব গ্রহণ করি।

তাঁর মর্যাদা :

ইমাম ত্বহাবী (র.) কে মুসলিম সমাজে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। তাঁর জীবন এতটাই বিস্তৃত ছিল যে, তাঁর জীবনীর উপর অনেকেই ডক্টরেট ডিগ্রী পর্যন্ত অর্জন করেছে। তৃতীয় শতকের খ্যাতনামা মনীষীদের অন্যতম হলেন তিনি। ইলমে হাদীস ও ইলমে ফিকহ উভয় ক্ষেত্রেই তাঁর ছিল অসামান্য জ্ঞান। হাদীস মুখস্থ করার সাথে সাথে ফিকহ ও ইজতিহাদেও তাঁর অবস্থান ছিল অনেক উপরে। তাকে অনেক উঁচু পর্যায়ের মুজতাহিদগণের মধ্যে গণ্য করা হয়। তিনি একজন মুজতাহিদ মুনতাসিব ছিলেন। তিনি হানাফী মাজহাবের শুধু মুকাল্লিদই ছিলেন না; বরং অনেক মাসআলার ক্ষেত্রে স্বয়ং আবূ হানীফা (র.)-এর ভিন্ন মতও পোষণ করেছেন। এ কারণে আল্লামা আবদুল হাই লক্ষ্ণবী (র.) বলেছেন, ইমাম ত্বহাবী (র.) ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর স্তরের ইমাম। তাঁর মর্যাদা তাদের থেকে কোনো অংশেই কম নয়।

শিষ্যবৃন্দ :

ইসলামি জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ইমাম ত্বহাবী (র.)-এর অসাধারণ যোগ্যতা থাকার কারণে পৃথিবীর প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে ইলম পিপাসু ছাত্ররা তাঁর কাছে ছুটে আসতো। আর এই ছাত্রদের কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যা ছিল না। তাঁর উল্লেখযোগ্য কিছু সংখ্যক ছাত্রের নাম তুলে ধরা হলো।

১. আহমদ ইবনে ইবরাহীম ইবনে হাম্মাদ আবূ উসমান (র.) [৩২৯/৯৪০]
২. হুমায়দ ইবনে সাওয়াবাহ আবুল কাসেম আল জুযামী আল আন্দুলূসী (র.)
৩. আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মনসূর আল আনসারী আবূ বাকর দামিগানী আল কাজী (র.)
৪. ইসমাঈল ইবনে আহমদ ইবনে মুহাম্মদ আবদুল আজিজ আবূ সাঈদ আল জুরজানী আল খাল্লাল আল ওয়াররা (র.) [৩৭৩]
৫. হুসাইন ইবনে আহমদ ইবনে আবূ আবদুল্লাহ আল হাফিজ আশ শামাখী [৩৭৩/৯৮২]
৬. সুলাইমান ইবনে আহমদ ইবনে আইয়ূব আত তাবরানী আবুল কাসেম। [২৬০/৮৭৩]
৭. হুসাইন ইবনে ইবরাহীম ইবনে জাবের আবূ আলী আল ফারায়েযী ইবনে আল রামরাম (র.) [৩৬৮/৯৭৮]
৮. মাসলামা ইবনে কাসিম ইবনে ইবরাহীম আবুল কাসেম আল কুরতুবী [৩৫৩/৯৬৮]
৯. মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম ইবনে আলী আল মুকরী আবূ বকর আল হাফিজ। [২৮১/৮৯৪]
১০. মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ ইবনে জুবায়ের আবূ সুলাইমান আল হাফিজ আর রাবেয়ী। [৩৭৯/৯৮৯]
১১. মুহাম্মদ ইবনে মুযাফফার ইবনে মূসা ইবনে হুসাইন আল বাগদাদী (র.) [৩৭৯/৯৮৪]

রচিত গ্রন্থাবলি :

ইসলামি জ্ঞান বিজ্ঞানে ইমাম ত্বহাবী (র.)-এর অবদান অনস্বীকার্য। শিক্ষা খাতে রয়েছে ইলমে দীন শিক্ষা দেওয়ার মাধ্যমে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। অনুরূপ রচনা গ্রন্থনার ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান রয়েছে। যা কখনো অস্বীকার করা যাবে না। ফিকহ, আকাইদ, ইতিহাস, জীবনী গ্রন্থ, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে রচিত গ্রন্থসমূহ তাকে স্মরণীয় করে রেখেছে। তাঁর অনবদ্য গ্রন্থ রচনার সংখ্যা অনেক। নিম্নে তাঁর কিছু বিষয়ভিত্তিক গ্রন্থের তালিকা দেওয়া হলো।

আকাইদ শাস্ত্র :

১. بَيَانُ عَقِيْدَةِ اَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ.

এটি হলো আলোচ্য গ্রন্থের নাম। যাকে আমরা আকিদাতুত ত্বহাবী নামে চিনি।

২. كِتَابٌ فِى النِّحَالِ وَاَحْكَامِهَا وَاَجْنَاسِهَا وَمَا وُعِدَ فِيْهَا مِنْ خَيْرٍ.

তাফসীর শাস্ত্র :

তাফসীর শাস্ত্রেও তিনি অনবদ্য গ্রন্থ রচনা করে স্মরণীয় হয়ে আছেন। তাঁর লিখিত ২টি তাফসীর গ্রন্থ হলো- ১. আহকামুল কুরআন ও ২. তাফসীরুল কুরআন।

ফিকহ্ শাস্ত্র :

যে সব গ্রন্থ রচনা করে তিনি ফিকহ্ শাস্ত্রকে সার্থক করেছেন তা নিম্নরূপ-

১. আল মুখতাসারুল কাবীর। ২. ইখতিলাফুল ওলামা। ৩. আশ শুরুতুল আওসাত। ৪. শরহুল জামিঈল কাবীর। ৫. আন নাওয়াদিরুল ফিকহিয়্যাহ্। ৬. জুযউন ফী কিসমিল ফাই ওয়াল গানাইম। ৭. জুযউন ফির রাবিয়্যাহ্। ৮. আল ওয়াসায়া ওয়াল ফারাইজ। ৯. আল মুখতাসারুস সাগীর। ১০. আশ শুরুতুল কাবীর। ১১. আশ শুরুতুস সাগীর। ১২. শরহুল জামিউস সাগীর। ১৩. জুযউন ফী আরদি মাক্কাহ। ১৪. কিতাবুল আশরিবাহ। ১৫. জুযআনে ফী ইখতিলাফির রেওয়ায়েত আলা মাজাহিবিল কূফিয়্যীন। ১৬. আল মুহাজির ওয়াস সিজিল্লাহ। ১৭. আল কিতাবুল ফিল ফুরূ'।

ইতিহাস শাস্ত্র :

ইমাম ত্বহাবী (র.) কর্তৃক রচিত ইতিহাস শাস্ত্রের বিরল গ্রন্থসমূহ- ১. আত তারীখুল কাবীর। ২. আন নাওয়াদির ওয়াল হেকায়াহ। ৩. আখবারু আবূ হানীফা ওয়া আসহাবিহী। ৪. আর রাদ্দু আলা আবী উবায়দ ফীমা আখতাআ ফীহি ফী কিতাবিল আনসার।

ইন্তেকাল :

এই ধর্মভীরু আলেমে দীন, স্বনামধন্য ভাষা বিজ্ঞানী, জ্ঞান তাপস, হানাফী মাজহাবের স্বনামধন্য মুজতাহিদ-মুজাদ্দিদ ইমাম ত্বহাবী (র.) ৩২১ হিজরি সনের জিলকদ মাসের চাঁদনী রাতে আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্যে চলে যান। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। তাঁকে কারাকা নামক কবরস্থানে দাফন করা হয়।

আকিদা বিষয়ক গ্রন্থাবলি :

আকিদাগত বিভক্তি ও দলাদলি যখন মুসলিম উম্মাহর মধ্যে দেখা দিলো, তখন আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের ইমামগণ ইসলামের মূল ধারাকে ঠিক রাখার জন্য কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে ঈমানের বিশুদ্ধ মূলনীতি তথা ইসলামি আকিদার বিভিন্ন দিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেন এবং হিজরির দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতক থেকে অনেক বই পুস্তক এ ব্যাপারে রচনা করেছেন। নিম্নে কিছু সংখ্যক বই লেখকের নামসহ তুলে ধরা হলো।

	গ্রন্থ	লেখক	মৃত্যু
১	আল ফিকহুল আকবার	ইমাম আবূ হানীফা (র.)	১৫০ হিজরি
২	আস সুন্নাহ	ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)	২৪১ হিজরি
৩	আল ঈমান	মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া আল আদনী	২৪৩ হিজরি

	গ্রন্থ	লেখক	মৃত্যু
৪	আস সুন্নাহ	আবূ বকর আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হানি আল আসবাম (র.)	২৭৩ হিজরি
৫	আস সুন্নাহ	হাম্বল ইবনে ইসহাক হাম্বল আশ শায়বানী (র.)	২৭৩ হিজরি
৬	আস সুন্নাহ	আবূ দাঊদ সুলাইমান ইবনে আশআস (র.)	২৭৫ হিজরি
৭	আস সুন্নাহ	আবূ বকর ইবনে আমর ইবনে আবী আমীম আদ দাহহাক আশ শায়বানী (র.)	২৮৭ হিজরি
৮	আস সুন্নাহ	আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)	২৯০ হিজরি
৯	আস সুন্নাহ	মুহাম্মদ ইবনে নাসর আল মারওয়াযী (র.)	২৯৪ হিজরি
১০	ছাবীহুস সুন্নাহ	আবূ জাফর মুহাম্মদ ইবনে জারীর আত তাবারী (র.)	৩১০ হিজরি
১১	আর রিসালাহ, আল কাইরোয়া নিয়্যাহ	আবূ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবনে আবী যায়দ আল কায়রোয়া মালিক আস সাগীর (র.)	৩৮৬ হিজরি
১২	আস সুন্নাহ	ইবনে শাহীন আবূ হাফস ওমর ইবনে আহমাদ ইবনে উসমান আল বাগদাদী (র.)	৩৮৫ হিজরি
১৩	আশ শরীআহ	মুহাম্মদ ইবনে হুসাইন আল আজুরী (র.)	৩৬০ হিজরি
১৪	আস সুন্নাহ	আবূ শায়খ আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে জাফর ইবনে হাইয়ান আল ইসফাহানী (র.)	৩৬৯ হিজরি
১৫	আস সুন্নাহ	সুলাইমান ইবনে আহমদ তাবরানী (র.)	৩৬০ হিজরি
১৬	আস সুন্নাহ	আল আসসাল (র.)	৩৪৯ হিজরি
১৭	আল ইবানাতু আন উশূলিদ দিয়ানাহ	আল আশআরী (র.)	৩২৪ হিজরি
১৮	আকিদাতু আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামা'আতি	আবূ জাফর ত্বহাবী (র.)	৩২১ হিজরি
১৯	আস সুন্নাহ	আবূ বকর খাল্লাল আহমদ ইবনে মুহাম্মদ (র.)	৩১১ হিজরি
২০	আস সুন্নাহ	আবূ বকর আহমদ ইবনে মুহাম্মদ আল খাল্লাল (র.)	৩১১ হিজরি
২১	আল ঈমান	ইবনে মানদাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (র.)	৩৯৫ হিজরি
২২	ই'তিকাদু আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ	আবুল কাসেম লালকাঈ হিবাতুল্লাহ ইবনে হাসান (র.)	৪১৮ হিজরি
২৩	আকিদাতুর সালাফি আহলিল হাদীস	আবূ উসমান ইসমাঈল ইবনে আবদুর রহমান আস সাবূনী (র.)	৪৪৯ হিজরি
২৪	আল ই'তিকাদ	বায়হাকী (র.)	৪৫৮ হিজরি
২৫	আল ইকতিসাদ ফিল ই'তিকাদ	আবূ হামিদ গাজালী (র.)	৫০৫ হিজরি
২৬	আল আকাইদ আন সাসাফিয়্যাহ	ওমর ইবনে মুহাম্মদ আন নাসাফী (র.)	৫৩৭ হিজরি
২৭	শারহুল আকাইদ	সা'দুদ্দীন তাফতাযানী (র.)	৭৯১ হিজরি
২৮	শারহুল আকিদাহ আত তাহাবিয়্যাহ	ইবনে আবীল ইজ হানাফী (র.)	৭৯২ হিজরি
২৯	কিতাবুত তাওহীদ	আবদুর রহমান ইবনে আহমদ ইবনে রাজাব হাম্বলী (র.)	৭৯৫ হিজরি

এছাড়াও যুগে যুগে আকিদা বিষয়ক আরো অনেক গ্রন্থ রচনা করা হয়েছে। যে যুগেই বাতিল মতবাদ গজিয়েছে সে যুগেই সমকালীন ওলামায়ে কেরাম তাদের জবাবে অনেক আকিদা বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেছেন।

قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْفَقِيْهُ عَلَمُ الْاَنَامِ حُجَّةُ الْإِسْلَامِ أَبُوْ جَعْفَرٍ الْوَرَّاقُ الطَّحَاوِيُّ الْمِصْرِيُّ.

অনুবাদ : শায়েখ, ইমাম, ফকীহ, সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব, হুজ্জাতুল ইসলাম, আবূ জাফর আল ওয়াররাক আত ত্বহাবী আল মিসরী (র.) বলেন, কিতাবে উল্লিখিত এ অংশটুকু স্বয়ং ইমাম ত্বহাবী (র.) লিখেননি। কেননা আত্মপ্রসংসা করা বিশিষ্ট মনীষীগণের অভ্যাস নয়। এ কারণে তিনি লিখেননি; বরং তার কোনো এক ছাত্র বা ভক্ত লিখেছে বলে ধারণা করা হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ قَالَ الشَّيْخُ : اَلشَّيْخُ শব্দের অর্থ বৃদ্ধ। বহুবচন شُيُوْخٌ ; নিজ উস্তাদের প্রতি সম্বন্ধ করে শায়েখ বলা হয়। আলেম ব্যক্তি, গোত্রপতি এবং প্রত্যেক ঐ ব্যক্তির প্রতি শায়েখ শব্দ সম্বোধিত হয় যিনি জনসাধারণের দৃষ্টিতে জ্ঞানী, মর্যাদাবান ও সফলতার দিক থেকে বড় হন।

قَوْلُهٗ الْوَرَّاقُ : কাগজ প্রস্তুতকারী, কাগজ বিক্রেতা, ব্যারিস্টার, কাতেব ইত্যাদি। এটি একটি ইঙ্গিত বাচক শব্দ। এটি ত্বহাবী (র.) সম্পর্কে বলা হয় কারণ তিনি হানাফী মাযহাবের (وَرَّاقْ) ব্যারিস্টার ছিলেন।

قَوْلُهٗ حُجَّةُ الْإِسْلَامِ : এটি একটি গুণবাচক নাম। একটি সম্মানসূচক উপাধি। যেহেতু ইমাম ত্বহাবী (র.) শরিয়তের গবেষক, বিশ্লেষক। এজন্য তাকে হুজ্জাতুল ইসলাম বলা হয়। যা তাঁর উপাধী ছিল।

اَلطَّحَاوِيُّ : তা মিসরের পাহাড়ী অঞ্চলীয় একটি গ্রাম বা লোকালয়। সেখানে তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন। তাই তাকে ত্বহাবী বলা হয় এবং মিসরের অধিবাসী হওয়ায় তাকে মিসরীও বলা হয়।

বি. দ্র. ইমাম ত্বহাবী (র.)-এর জীবনী ভূমিকায় বিস্তারিত রয়েছে।

প্রথম পাঠ

هٰذَا ذِكْرُ بَيَانِ عَقِيْدَةِ اَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ

অনুবাদ : ইহা [এই কিতাবটি] আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আকিদা সম্পর্কে লিখিত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ ذِكْرُ بَيَانِ عَقِيْدَةِ : এখানে عَقِيْدَةٌ শব্দটি عَقَائِدُ-এর একবচন। এর শাব্দিক অর্থ হলো, ইয়াকীন, বিশ্বাস, নিষ্ঠা, একাগ্রতা ইত্যাদি। পরিভাষায় আকিদা বলা হয়, এমন ইলমকে যার মধ্যে আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদ এবং তাঁর গুণাবলি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পূর্বে হয়েছে।

কিতাবের নামকরণ :

এই কিতাবের নাম بَيَانُ السُّنَّةِ যা আকিদাতুত ত্বহাবী নামে সমধিক পরিচিত। কতক আলেম বলেন, এই কিতাবের নাম- بَيَانُ اَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَالْفُقَهَاءِ الْمِلَّةِ

قَوْلُهٗ اَهْلُ السُّنَّةِ : গ্রন্থকার ইমাম ত্বহাবী (র.) বলেন, এ কিতাবটি লিখা হয়েছে আকিদা সম্পর্কে, যে আকিদা পোষণ করেছেন আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত। নিম্নে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাত সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত-এর পরিচিতি :

*** আভিধানিক অর্থ :**

اَهْلُ السُّنَّةِ এটি একটি যৌগিক শব্দ। তার মধ্যে একটি اَهْلُ অপরটি اَلسُّنَّةُ। اَهْلُ শব্দটির অর্থ হলো মালিক, অনুসারীবৃন্দ, আত্মীয়-স্বজন, বাসিন্দা, অধিবাসী, পরিবার ইত্যাদি। যেমন-আল্লাহ তা'আলা বলেন- يَاَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ

আর اَلسُّنَّةُ শব্দের অর্থ হলো, রীতিনীতি, আদর্শ, অভ্যাস। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন- سُنَّةَ اللّٰهِ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ

*** পারিভাষিক সংজ্ঞা :**

১. প্রখ্যাত ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র.) বলেন- اَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ الْقَوْمُ الصَّادِقُوْنَ هُمُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوا الْقُرْاٰنَ وَسُنَّةَ الرَّسُوْلِ وَسُنَّةَ صَحَابَتِهٖ اَجْمَعِيْنَ অর্থাৎ আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত বলা হয় এমন সত্যপন্থি দলকে যারা জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে কুরআন, রাসূলের সুন্নত ও সকল সাহাবীদের রীতিনীতি অনুসরণ করে চলে।

২. প্রখ্যাত দার্শনিক ইবনে উইয়ান (র.) বলেন- اَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ هُمُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا سُنَّةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كُلَّ حِيْنٍ وَمَكَانٍ অর্থাৎ আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত বলা হয় এমন এক দলকে যারা প্রতিটি ক্ষেত্রে রাসূল ﷺ-এর সুন্নতকে অনুসরণ করে।

৩. কতক আলেম বলেন, আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত বলা হয় মুসলমানদের ঐ দলকে যারা রাসূল ﷺ ও তাঁর সাহাবায়ে কেরাম (রা.) হতে বিশুদ্ধভাবে বর্ণিত পন্থায় ইস্তেকামাত তথা অটল থাকে।

৪. কতিপয় আলেমের মতে, সর্বদা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত দলই আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত।

আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ :

মহানবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ একটি ভবিষ্যত বাণীতে বলেছিলেন যে, আমার উম্মতের মধ্যেও বনি ইসরাঈলের ন্যায় বিভক্তি আসবে। বনি ইসরাঈল ৭২ দলে বিভক্ত ছিল। আর আমার উম্মত হবে ৭৩টি দলে বিভক্ত। তন্মধ্যে একটি দলই মাত্র নাজাত প্রাপ্ত হবে। এই দলটির পরিচয় দিতে গিয়ে রাসূল ﷺ বলেন, তারা ঐ সব লোক যারা আকিদার ক্ষেত্রে আমি ও আমার সাহাবাদের রীতি ও নীতির অনুসরণ করবে। হযরত রাসূল ﷺ-এর মুখনিসৃত বাণী তাঁর মৃত্যুর পরই বাস্তবে রূপ নিল। খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগের শেষ দিক হতেই রাজনৈতিক গোলযোগকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন দলের বিভক্তি শুরু হয়। তারা নিজ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য এবং নিজেদের চিন্তাধারাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য ইসলামি মৌলিক আকিদার মধ্যে তাদের কিছু মনগড়া মতবাদ প্রবেশ করায়। যার কারণে তারা রাসূল ﷺ ও তাঁর সাহাবাদের রীতি থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে।

তাদের অগ্রবর্তীরা হলো খারেজী, রাফেজী, কাদরিয়া, শিয়া, মুরজিয়া ও জাবরিয়া প্রভৃতি দল। ইসলামের সঠিক আকিদাকে ধামাচাপা দিয়ে তারা নিজেদের ভ্রান্ত চিন্তা ধারাকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রচারণা ও যুক্তি প্রদর্শন শুরু করে দেয়।

ইসলামের এই ক্রান্তিকালে একদল হক পন্থি আলেমে দীন রাসূল ﷺ ও তাঁর সাহাবীদের মতানুযায়ী কুরআন ও হাদীসের আলোকে ইসলামের সঠিক আকিদাগুলো সংরক্ষণ ও প্রচারণার কাজ আরম্ভ করে। পাশাপাশি ভ্রান্তদের যুক্তি ও দাবি কুরআন হাদীসের আলোকে খণ্ডন করেন। এ মনীষীদের মধ্যে চার মাজহাবে ইমাম, ইমাম ত্বহাবী, ইমাম শা'বী, ইমাম গাযালী ও ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র.)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মুসলিম সমাজের অধিকাংশই তাদের সমর্থন করেন। বর্তমানেও গুটি কয়েক মুসলমান ব্যতীত সকলেই তাদের মতের অনুসারী। আর এরাই হলেন আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত। যদিও ভ্রান্তরা তাদের মতাদর্শ ও যুক্তি তর্কের মাধ্যমে প্রচারণা করে এবং এটাকে সত্য বলে দাবি করে।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সরল ও সঠিক পথ তো একটিই। কারণ এক বিন্দু হতে অপর বিন্দু পর্যন্ত সরল রেখা একটিই হয়। পক্ষান্তরে বক্র রেখা অনেকগুলো হতে পারে।

অনুরূপ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পথ একটিই। যেমন– আল্লাহ তা'আলা বলেন– إِنَّ هٰذَا صِرَاطِيْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهٖ.
এটাই হচ্ছে আমার দেওয়া সরল পথ। তোমরা এই সরল পথের অনুসরণ কর। এতদভিন্ন অন্য সকল [ভ্রান্ত] পথের অনুসরণ পরিহার কর। তা না হলে তোমাদেরকে আল্লাহ সঠিক পথ হতে বিচ্ছিন্ন করে দিবেন। –[সূরা আন'আম]

আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আকিদা :

অত্র কিতাবে যতগুলো আকিদা উল্লেখ করা হবে সবগুলোই আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আকিদা। কিন্তু ভ্রান্ত দলগুলোর উত্থান ও তাদের বাতিল মতবাদ প্রচারণা প্রেক্ষিতে সঠিক আকিদা প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে নিম্নোক্ত আকিদাগুলো তাঁরা কুরআন ও হাদীসের আলোকে পেশ করে থাকেন।

১. **আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদ :** তাওহীদ সম্পর্কে আহলে সুন্নাহ অত্যন্ত সচেতন মেধা ও দৃষ্টিভঙ্গি প্রদানকারী একটি জামাত। তারা আল্লাহ তা'আলার একত্বতার বিপরীতে কোনো উক্তি করতে অসম্মত। পক্ষান্তরে ভ্রান্তরা পরোক্ষভাবে আল্লাহর সাথে শরিক স্থাপন করে।

২. হযরত মুহাম্মদ ﷺ শেষ নবী। কেননা তিনি বলেছেন তাঁর পরে কোনো নবী নেই।

৩. কুরআন আল্লাহর কালাম। তা সৃষ্ট নয়; বরং আল্লাহর সিফাত বা গুণ।

৪. মোজার উপর মাসেহ করা বৈধ। কারণ রাসূল ﷺ-এর অনুমতি দিয়েছেন।

৫. শাফায়াত সত্য। হাশরের মাঠে রাসূল ﷺ আল্লাহর হুকুমে তাঁর প্রিয় উম্মতের জন্য শাফায়াত করবেন।

৬. হাউজে কাওছার সত্য। কেননা আল্লাহ বলেছেন- إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ

৭. পরকালে জান্নাতীগণ জান্নাতে যাওয়ার পর এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে যাওয়ার পর আল্লাহ তা'আলা জান্নাতীদের সাথে দেখা দিবেন।

৮. কবরের আজাব মুনকার নাকীকের সওয়াল-জওয়াব সত্য।

৯. পুনরুত্থান, প্রতিফল দান, আমলনামা প্রকাশ ও মীযান-পুলসিরাত সত্য।

১০. আল্লাহ তা'আলা সীমা বা পরিধির ঊর্ধ্বে।

১১. খোলাফায়ে রাশেদীনের সকলেই সত্য ও ন্যায় পথের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

১২. আরশ কুরসী সত্য : কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন- وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ

১৩. তাকদীর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে। অন্য কারো থেকে নয়।

১৪. জান্নাত ও জাহান্নাম বর্তমানে বিদ্যমান। এটি কুরআন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। কিন্তু ভ্রান্তরা তা মানতে প্রস্তুত নয়।

১৫. রাসূল ﷺ-এর সাহাবীদের প্রতি ভালোবাসা রাখা ঈমান ও দীন। তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা কুফরি ও নিফাকের লক্ষণ।

১৬. বান্দা হলো কর্ম সম্পাদনকারী। আর আল্লাহ তা'আলা হলেন, মূলকর্মের স্রষ্টা।

১৭. কবীরা গুনাহকারীরা কাফের নয় এবং ঈমান হতে খারিজ বা বহিষ্কার তথা বেঈমান হয়ে যায় না।

১৮. ধর্মীয় বিষয় অস্বীকার ছাড়া কারো বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরা যাবে না, জিহাদ করা যাবে না।

আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের গুণাবলি :

হুজ্জাতুল ইসলাম আল্লামা কারী তাঈয়েব সাহেব (র.) বলেন, আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের গুণাবলি সম্পর্কে হযরত ইবনে ওমর (রা.) একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি হলো-

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ تَفَرَّقَتْ عَلٰى اثْنَتَىْ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً وَسَتَفْتَرِقُ اُمَّتِىْ عَلٰى ثَلٰثٍ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِى النَّارِ اِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً ـ قَالُوْا مَنْ هِىَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ـ قَالَ مَا اَنَا عَلَيْهِ وَاَصْحَابِىْ.

অর্থাৎ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেন, হযরত রাসূল ﷺ বলেছেন, বনী ইসরাঈল ৭২ দলে বিভক্ত ছিল। আর নিশ্চয় আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। এদের প্রত্যেকেই জাহান্নামী হবে। শুধুমাত্র একটি দল ব্যতীত। সাহাবায়ে কেরাম (রা.) জানার জন্য আবেদন করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! সে দলটি কোন দল? প্রতি উত্তরে তিনি বললেন যে, আমি এবং আমার সাহাবায়ে কেরাম (রা.) যে মত ও পথের উপর অটল থাকব। [তিরমিযী]

* অপর একটি হাদীসে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের গুণাবলি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, যাদের মাঝে নিম্নে বর্ণিত ১০টি গুণাবলি পাওয়া যাবে তাদেরকে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের মধ্যে গণ্য করা হবে।

নিম্নে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের গুণাবলি উল্লেখ করা হলো–

১. শায়খাইন হযরত আবূ বকর ও ওমর (রা.) কে সকল সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করা।
২. রাসূল ﷺ-এর উভয় জামাতা হযরত ওসমান ও আলী (রা.) কে সম্মান প্রদর্শন করা।
৩. উভয় কেবলা তথা বাইতুল্লাহ ও বাইতুল মুকাদ্দাসকে শ্রদ্ধা করা।
৪. পরহেজগার ও ফাসেক উভয় ব্যক্তির জানাজার ইহতেমাম করা।
৫. পরহেজগার ও ফাসেক উভয় ইমামের পেছনে নামাজ পড়া।
৬. ইমাম ও রাষ্ট্রনায়ক জালেম হোক বা ন্যায়পরায়ণ হোক তাদের বিরুদ্ধাচরণ না করা।
৭. পায়ের মোজার উপর মাসেহ বৈধ মনে করা।
৮. ভালো মন্দ তাকদীরের উপর বিশ্বাস রাখা।
৯. কোনো মুসলমানকে জান্নাতী বা জাহান্নামী হওয়ার সাক্ষ্য না দেওয়া। তবে নবীগণ ও আশারায়ে মুবাশশারা সাহাবাগণের ব্যাপারে ভিন্ন কথা।
১০. উভয় ফরজ তথা নামাজ ও জাকাত আদায় করা।

উল্লেখ্য যে, উপরিউক্ত বিষয়গুলো আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের বড় নিদর্শন। কিন্তু এছাড়া আরো বহু নিদর্শনাবলি রয়েছে। যেমন– আল্লাহর সাক্ষাৎলাভ, কবর জগতের আজাব ও শাস্তির উপর বিশ্বাস রাখাও আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের নিদর্শনাবলির অন্তর্ভুক্ত।

* হযরত সাহেবে মিদরাক (র.) إِنَّ هٰذَا صِرَاطِىْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهِ সম্পর্কে একটি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَطَّ خَطًّا مُسْتَقِيْمًا فَقَالَ هٰذَا طَرِيْقُ الرُّشْدِ وَالْهِدَايَةِ فَاتَّبِعُوْهُ. অর্থাৎ হযরত রাসূলে কারীম ﷺ একবার একটি সরল রেখা আঁকলেন। অতঃপর বললেন, এটি হলো সঠিক ও হেদায়েতের পথ। সুতরাং এর অনুসরণ করো। অতঃপর তাঁর চারদিকে আরো ৬টি রেখা একে বললেন, এগুলো হলো শয়তানের পথ। অতএব তোমরা এগুলো পরিহার করো।

ভ্রান্ত দল ও তাদের বৈশিষ্ট্যাবলি :

যে সকল দল আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের বিরোধিতা করে তারা সবাই বাতিল বলে গণ্য হবে। কারণ তারা শরিয়তের মূলনীতি বাদ দিয়ে নিজেদের মনগড়া মূলনীতি শরিয়তের ভিতরে অনুপ্রবেশ করায়।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা গেছে তারা কুরআন সুন্নাহ পরিপূর্ণভাবে পরিহার করে নিজেদের চিন্তা, চেতনা আর যুক্তিকেই শরিয়তের মাপকাঠি বানিয়ে নিয়েছে। নিম্নে তাদের কিছু চিত্র তুলে ধরা হলো।

* বাতিল বা গুমরাহি দলগুলোকে মূলত ছয়ভাগে ভাগ করা যায়।

১. রওয়াফিজ, ২. খাওয়ারিজ, ৩. জাবরিয়্যাহ, ৪. কাদরিয়্যাহ, ৫. জাহমিয়্যাহ ও ৬. মুরজিয়্যাহ। অতঃপর এর প্রত্যেকটিই আবার ১২টি উপদলে বিভক্ত হয়েছে।

রাওয়াফিজদের ভ্রান্ত আকিদা :

১. তারা আল্লাহ তা'আলার রহমত হতে নিরাশ হয়ে যায়।
২. একমাত্র হযরত আলী (রা.) ব্যতীত রাসূলে কারীম ﷺ-এর সকল সাহাবীগণকে বিশেষ করে হযরত আবূ বকর, ওমর ও তালহা (রা.) এবং হযরত জুবায়ের (রা.) কে গালমন্দ ও সমালোচনা করে থাকে।
৩. হযরত ফাতেমা (রা.) কে হযরত আয়েশা (রা.)-এর উপর প্রাধান্য দিয়ে থাকে।
৪. একই শব্দে তিন তালাক পতিত হওয়াকে অস্বীকার করে।
৫. নামাজের জন্য আজান ও ইকামত দেওয়া সুন্নত। এটাকে অস্বীকার করে এবং জামাত অস্বীকার করে।
৬. পায়ের মোজার উপর মাসেহ করাকে বৈধ মনে করে না।
৭. তারাবির নামাজকে অস্বীকার করে।
৮. নামাজে দাঁড়ানো অবস্থায় ডান হাত বাম হাতের উপর রাখাকে স্বীকার করে না।
৯. মাগরিবের নামাজ জলদি পড়াকে অস্বীকার করে।
১০. রোজার ইফতার করাকে অস্বীকার করে।

উপরিউক্ত বিষয়গুলোতে মতপার্থক্য থাকার কারণে তারা আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের অন্তর্ভুক্ত নয়।

রাওয়াফিজদের উপদলগুলো নিম্নরূপ :

১. উলূবিয়্যাহ, ২. আদিয়্যাহ, ৩. শীইয়্যাহ, ৪. ইসহাকিয়্যাহ, ৫. জায়দিয়্যাহ, ৬. আব্বাসিয়্যাহ, ৭. ইমামিয়্যাহ, ৮. তানাসুখিয়্যাহ, ৯. নাদিয়্যাহ, ১০. লাগিয়্যাহ, ১১. ওয়াজিয়্যাহ এবং ১২. ওয়াবিছাহ।

খাওয়ারিজদের ভ্রান্ত আকিদা :

১. খাওয়ারিজদের আকিদা হলো পাপের কারণে আহলে কিবলা মুসলমান কে কাফের বলা।
২. জলেম ও অত্যাচারী রাষ্ট্রনায়কের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোকে বৈধ মনে করে।
৩. তারা হযরত আলী (রা.) কে অভিশাপ দেয়।
৪. কাওয়ারিজগণ আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতকে ও নামাজের জামাতকে অস্বীকার করে।

খাওয়ারিজদের উপদলগুলো :

১. আজাদিয়্যাহ, ২. আবূ হানাফিয়্যাহ, ৩. তাগলিবিয়্যাহ, ৪. হারিদিয়্যাহ, ৫. খালকিয়্যাহ, ৬. কাওজিয়্যাহ, ৭. মু'তাজিলা, ৮. মায়মূনিয়্যাহ, ৯. কানজিয়্যা, ১০. মুহকামিয়্যাহ, ১১. আখনাসিয়্যাহ এবং ১২. শারাফিয়্যাহ।

জাবরিয়্যাদের ভ্রান্ত আকিদা :

১. তারা বলে মানুষ পাথর ও শক্ত মাটির ন্যায় অনড় ও অটল। কোনো কাজের ক্ষেত্রেই বান্দার কোনো ক্ষমতা নেই। অতএব বান্দাকে তার কৃত কর্মের প্রতিদান হিসেবে শাস্তি বা শান্তি কোনোটিই দেওয়া যাবে না।

২. তারা আল্লাহর ব্যাপারে একটি অলীক ধারণা পোষণ করে আর তাহলো– আল্লাহর নিকট ধন সম্পদ খুবই প্রিয়।

৩. বান্দার কর্ম সম্পাদিত হওয়ার পূর্বেই আল্লাহর তাওফীক সংঘটিত হয়।

৪. তারা রাসূলে কারীম ﷺ-এর স্বশরীরে মি'রাজকে অস্বীকার করে।

৫. রূহের জগতে আল্লাহ তা'আলা যে অঙ্গীকার নিয়েছেন তা অস্বীকার করে।

৬. জানাজার নামাজ ওয়াজিব হওয়াকে অস্বীকার করে।

জাবরিয়্যাদের উপদলগুলো :

১. মুযতারিয়্যাহ, ২. আফয়ালিয়্যাহ, ৩. মায়িয়্যাহ, ৪. মা'যিবিয়্যাহ, ৫. মাজাযিয়্যাহ, ৬. মুতমানিয়্যাহ, ৭. কাছলিয়্যাহ, ৮. সাবেকিয়্যাহ, ৯. হাবীবিয়্যাহ, ১০. খাওফিয়্যাহ, ১১. ফিকরিয়্যাহ এবং ১২. হাবসীসিয়্যাহ।

কাদরিয়্যাদের ভ্রান্ত আকিদা :

১. কাদরিয়্যাদের বিশ্বাস হলো মানুষ মূলত নিজ ক্ষমতা দ্বারাই কর্ম সম্পাদন করে থাকে। এতে আল্লাহ তা'আলার হস্তক্ষেপ বলতে কোনো কিছুই নেই।

২. কোনো কাজ আল্লাহ তা'আলার নিকট কুফর কিন্তু বান্দার নিকট তা ঈমান বটে, এটার সম্ভাবনা রয়েছে।

৩. বান্দার কর্ম সম্পাদিত হওয়ার পূর্বেই আল্লাহ তা'আলার তাওফীক হয়।

৪. এরাও রাসূল ﷺ-এর স্বশরীরে মি'রাজ অস্বীকার করে।

৫. রূহের জগতে আল্লাহ ত'আলা যে বান্দাদের থেকে অঙ্গীকার নিয়েছেন, তা অস্বীকার করে।

৬. জানাজার নামাজ ওয়াজিব হওয়াকে অস্বীকার করে।

কাদরিয়্যাদের উপদলগুলো :

১. আহমদিয়্যাহ, ২. শানবিয়্যাহ, ৩. কাসানিয়্যাহ, ৪. শাইতানিয়্যাহ, ৫. শারীকিয়্যাহ, ৬. ওয়াহীমিয়্যাহ, ৭. রুওয়াইদিয়্যাহ, ৮. নাকিশিয়্যাহ, ৯. তাবরিয়্যাহ, ১০. ফাসেতিয়্যাহ, ১১. নেজামিয়্যাহ এবং ১২. মানযিলিয়্যাহ।

জাহমিয়্যাদের ভ্রান্ত আকিদা :

১. জাহামিয়্যাদের ধারণা মতে ঈমান শুধুমাত্র অন্তরের সাথে সম্পৃক্ত, মুখের সাথে নয়। চাই মৌখিক কথা যে কোনো ভাবেই হোক না কেন।

২. তারা মৃত্যুর ফেরেশতা অস্বীকার করে বলে প্রাণীর প্রাণ কবজ করা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্পর্ক, কোনো ফেরেশতার সাথে নয়।

৩. তারা আলমে বরজখ তথা কবর জগতকে অস্বীকার করে।
৪. মুনকার নাকির-এর সওয়াল জওয়াবকে অস্বীকার করে।
৫. এবং হাউজে কাউছারকেও অস্বীকার করে। তারা বলে এসব মানুষের কল্পনা মাত্র।

জাহমিয়্যাদের উপদলগুলো :

১. মাখলূকিয়্যাহ, ২. গায়রিয়্যাহ, ৩. ওয়াকিফিয়্যাহ, ৪. খাইরিয়্যাহ, ৫. জানাদিকিয়্যাহ, ৬. লাফযিয়্যাহ, ৭. রাবিইয়্যাহ, ৮. মুতারাকিবিয়্যাহ, ৯. ওয়ারিদিয়্যাহ, ১০. ফানিয়্যাহ, ১১. হারকিয়্যাহ এবং ১২. মুয়াত্তালিয়্যাহ।

মুরজিয়্যাদের ভ্রান্ত আকিদা :

১. তারা বলে হযরত আদম (আ.) কে আল্লাহ স্বীয় আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন।
২. আরশে আজীম আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত স্থান।
৩. শুধু ঈমানই নাজাত তথা মুক্তির জন্য যথেষ্ট।
   অতএব আল্লাহ তা'আলার ইবাদত ও বন্দেগির মধ্যে কোনো ফায়েদা নেই এবং নাফরমানির মধ্যে কোনো অপকার নেই।
৪. নারীরা হলো ফুল বাগিচার ফুলের ন্যায়। যেই চাইবে তাদেরকে ভোগ করবে। এতে কোনো প্রকার বিবাহের প্রয়োজন নেই।

মুরজিয়্যাদের উপদলগুলো :

১. তারিকিয়্যাহ, ২. শানিয়্যাহ, ৩. রাবিয়্যাহ, ৪. শাকিয়্যাহ, ৫. বাহামিয়্যাহ, ৬. আমালিয়্যাহ, ৭. মানকূহিয়্যাহ, ৮. শাতসানিয়্যাহ, ৯. আছরিয়্যাহ, ১০. বিদঈয়্যাহ, ১১. হাশবিয়্যাহ এবং ১২. মশাব্বিহা।

আল-মাওয়াকিফ গ্রন্থ প্রণেতা বলেন যে, ভ্রান্ত দল আটটি :

১. মু'তাজিলা, ২. জাবরিয়্যাহ, ৩. মারজিয়্যাহ, ৪. শিয়া, ৫. খাওয়ারিজ, ৬. মুশাব্বিহাহ, ৭. বুখারিয়্যাহ এবং ৮. না-যিয়্যাহ।

আবার মু'তাজিলা ও খাওয়ারিজ প্রত্যেকটির ২০টি করে উপদল রয়েছে এবং শিয়াদেরও ২০টি উপদল রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, শিয়াদের উপদল ২২টি এবং মুরজিয়্যাদের ৫টি শাখা রয়েছে।

আর মশাব্বিহাহ ও না-যিয়্যাহর কোনো শাখা নেই।

উল্লেখ্য যে, উপরিউক্ত ভ্রান্ত দলগুলো বর্তমান সমাজে খুবই বিরল। এদের পরিচয় শুধু বই পুস্তকেই পাওয়া যায়। বাস্তবে এর কোনো অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই ছাত্রদের জন্য এর পিছনে সময় ব্যয় করার প্রয়োজন বোধ করি না। তথাপি তালিবে ইলমদের প্রতি অনুরোধ রইলো যে, যাতে তারা কিতাবটি থেকে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের পরিচয় লাভ করবে এবং সে অনুযায়ী বর্তমান সমাজে আহলে হক ও ভ্রান্ত দলগুলো চিহ্নিত করবে।

عَلٰى مَذْهَبِ فُقَهَاءِ الْمِلَّةِ اَبِىْ حَنِيْفَةَ النُّعْمَانِ بْنِ ثَابِتٍ الْكُوْفِيِّ وَاَبِىْ يُوْسُفَ يَعْقُوْبَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ الْاَنْصَارِيِّ وَاَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الشَّيْبَانِيِّ رِضْوَانُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْنَ وَمَا يَعْتَقِدُوْنَ مِنْ اُصُوْلِ الدِّيْنِ وَيَدِيْنُوْنَ بِهٖ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

অনুবাদ : (যা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে) ফুকাহায়ে মিল্লাত হযরত ইমাম আবূ হানীফা নো'মান ইবনে ছাবেত আল কূফী, আবূ ইউসুফ ইয়াকূব ইবনে ইবরাহীম আল আনসারী এবং আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে হাসান আশ শায়বানী –আল্লাহ তা'আলা তাঁদের সকলের উপর সন্তুষ্ট হোন– প্রমুখ ইমামদের মাজহাব অনুসারে এবং দীন ধর্মের যেসব মূলনীতিতে তাঁরা বিশ্বাসী ছিলেন ও আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি কল্পে যে সকল মূলনীতি তাঁরা অবনত শিরে মেনে চলতেন সে অনুসারে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ عَلٰى مَذْهَبِ : এখানে হযরত ইমাম ত্বহাবী (র.) তাঁর পুস্তিকাটি ইমামত্রয় অর্থাৎ ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসুফ ও ইমাম মোহাম্মদ (র.)-এর মাজহাব অনুযায়ী লিখার কথা ব্যক্ত করেছেন। অন্য কোনো মাজহাব অনুযায়ী নয়।

* **মাজহাব :** ইসলামি শরিয়তের মূল উৎস কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াস অর্থাৎ এ দলিল চতুষ্টয়ের ভিত্তিতে ইমাম ও মুজতাহিদগণ ইসলামি শরিয়তের ভিন্ন ভিন্ন যে ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন, সেই ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যাকেই মাজহাব বা মাসলাক বলে।

قَوْلُهٗ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) : ইমাম আবূ হানীফা (র.) হানাফী মাসলাকের আবিষ্কারক। আর ইমাম আবূ ইউসূফ ও মুহাম্মদ (র.) ছিলেন তাঁর ছাত্রদের মধ্য হতে অন্যতম দুজন ছাত্র। নিম্নে তাদের পৃথক পৃথক সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রদত্ত হলো।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) :

নাম : নো'মান, উপনাম আবূ হানীফা। পিতার নাম ছাবেত। তিনি তাবেয়ী ছিলেন। তাঁরা পারস্যের নাগরিক ছিল। তাঁর পিতা ছাবেত (র.) ছোট বেলায় হযরত আলী (রা.)-এর দরবারে যান এবং হযরত আলী (রা.) তাঁর বংশধরের জন্য বরকতের দোয়া করেন।

জন্ম : তিনি বিশুদ্ধতম মতানুযায়ী ৮০ হিজরি মোতাবেক ৭০৩ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাবেয়ী ছিলেন। কেননা তিনি সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হারিছ (র.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন। হযরত ইবনে হাজর আসকালানী (র.) বলেন, তিনি হযরত আনাস (রা.)-কে দেখেছেন। দুররুল মুখতার-এর বর্ণনানুযায়ী তিনি ২০ জন সাহাবীকে দেখেছেন। তিনি ৯৩ হিজরিতে হজ পালন করেছেন।

আকমাল গ্রন্থের বর্ণনানুযায়ী তিনি ২৩ জন সাহাবীকে দেখেছেন। আর তাঁর গ্রাম কূফাতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) আগমন করেছেন।

বাল্যকাল : তিনি ছোট বেলা থেকেই তীক্ষ্ণ মেধার অধিকারী ছিলেন। কিন্তু প্রথম জীবনে নিজেকে ব্যবসায় নিয়োজিত করেন। পরে জনৈক আলেমের সুপরামর্শে ইলম শিক্ষার প্রতি মনোনিবেশ করেন।

শিক্ষা জীবন : সতের বছর বয়সে জ্ঞানার্জন শুরু করেন এবং অল্প সময়েই ইলমে কালাম সম্পর্কে পূর্ণ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। অতঃপর কুরআন ও হাদীসের জ্ঞানার্জনে মনোনিবেশ করেন এবং অল্প দিনেই হাদীস, তাফসীর, নাসিখ ও মানসূখ এর জ্ঞান পরিপূর্ণভাবেই অর্জনে সক্ষম হন।

গুণাবলি : তিনি ছিলেন যুগ শ্রেষ্ঠ আলেম, আবেদ, অতিশয় বুদ্ধিমান। একাধারে ৩০ বছর রোজা রেখেছেন। ৪০ বৎসর রাতে ঘুমাননি। প্রতি রমজানে ৬১ খতম কুরআন তেলাওয়াত করতেন।

হজের এক মৌসুমে তিনি দু'রাকাত নামাজের প্রথম রাকাতে এক পা উঠিয়ে কুরআনের প্রথম অর্ধাংশ এবং দ্বিতীয় রাকাতে অপর পা উঠিয়ে বাকি অর্ধাংশ তেলাওয়াত করেছেন। যেখানে ইন্তেকাল করেছেন সেখানে ১০০০ বার কুরআন খতম করেছেন। তিনি ৯৯ বার আল্লাহ তা'আলাকে স্বপ্নে দেখেছেন।

ইমাম আজম সম্পর্কে মনীষীদের মতামত :

* ইবনে মোবারক বলেন, যদি আল্লাহ তা'আলা আমাকে ইমাম আবূ হানীফা ও সুফিয়ান সাওরী (র.) দ্বারা সাহায্য না করতেন তাহলে আমি অন্যান্য সাধারণ লোকদের ন্যায়ই থাকতাম।
* ইমাম মালেক (র.) বলেন, যদি কোনো কারণে ইমাম আবূ হানীফা এই পাথরের স্তম্বকে স্বর্ণে পরিণত করতে চান, তাহলে তিনি যুক্তির নিরিখে তা স্বর্ণে পরিণত করতে সক্ষম।
* ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, মানুষ ফিকহের ক্ষেত্রে আবূ হানীফা (র.)-এর পরিবারভুক্ত। আবূ হানীফা হলেন এই পরিবারের কর্তা আর অন্যান্যরা তাঁর পরিবারের সদস্য।
* হযরত ইবনে মঈন বলেন, আবূ হানীফা হাদীসে সেকাহ স্তরের ব্যক্তিত্বের পদ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন।

ফিকহ শাস্ত্রে তাঁর অবদান :

মুসলিম বিশ্বের অনন্য ব্যক্তিত্ব ইমাম আজম (র.) ফিকহ শাস্ত্রের উদ্ভাবক। তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি সর্বপ্রথম কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াসের ভিত্তিতে ইলমে ফিকহকে একটি শাস্ত্র হিসেবে রূপ দেন। তাঁর ৪০ জন সুযোগ্য ছাত্রের সমন্বয়ে একটি ফিকহ বোর্ড গঠন করেন। এ বোর্ডের মাধ্যমে দীর্ঘ ২২ বছর পর্যন্ত অক্লান্ত চেষ্টা সাধনা আর পরিশ্রমের পর ফিকহ শাস্ত্রের পূর্ণাঙ্গরূপ দান করেন। একটি মাসআলা বোর্ডে পেশ করে মতামত চাইতেন এভাবে তিনি ৯৩ হাজার মাসআলা "কুতুবে হানাফীয়াতে" লিপিবদ্ধ করেন।

হাদীস শাস্ত্রে তাঁর অবদান :

হাদীস শাস্ত্রে তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান হলো, মুসনাদে ইমাম আবূ হানীফা (র.)। এই কিতাবে বর্ণিত হাদীস সংখ্যা মতান্তরে ৫০০, ৬০০, ৭০০, ১১০০।

তাঁর শিক্ষকবৃন্দ : হযরত ইমাম আজম (র.)-এর সম্মানিত শিক্ষক চার হাজারেরও বেশি। তাদের অন্যতম হলেন, আতা ইবনে আবূ রাবাহ, আসেম ইবনে আবূ নুজুদ, আলকামা ইবনে মারছিদ প্রমুখ।

তাঁর ছাত্রবৃন্দ : ইমাম আজম (র.)-এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে ধন্য হয়েছে অসংখ্য ছাত্র। তাদের মধ্যে যারা স্বীয় চেষ্টা সাধনায় সমগ্র বিশ্বে খ্যাতির শীর্ষে আরোহণ করেছেন তারা হলেন- আবূ ইউসূফ, মুহাম্মদ ও জুফার (র.) প্রমুখ।

রচনাবলি : ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর লিখিত গ্রন্থ হলো- মুসনাদে আবূ হানীফা, আল ফিকহুল আকবর, ওয়াসিয়্যাতু আবী হানীফা। অনেকে বলে, তিনি কোনো কিতাব লেখেননি।

ইন্তেকাল : তিনি হিজরি ১৫০ মোতাবেক ৭৬৭ খ্রিস্টাব্দে ইন্তেকাল করেন।

ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) :

নাম ও জন্ম : তাঁর নাম ইয়াকূব। উপনাম আবূ ইউসুফ। পিতার নাম ইবরাহীম। তাঁর বংশের ক্রমধারা- ইয়াকূব ইবনে ইবরাহীম ইবনে হাবীব ইবনে সাঈদ ইবনে বুহাইর ইবনে মু'য়াবিয়া। তিনি ৯৩ হিজরি সনে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পরদাদা সাঈদ ইবনে বুহাইর একজন সাহাবী ছিলেন। যিনি রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন এবং রাসূল ﷺ তাঁর বীরত্বে খুশি হয়ে মাথায় হাত রেখে দোয়া করেন। হযরত আবূ ইউসূফ (র.) ইমাম মালেক (র.) থেকে দুই বছরের বড় ছিলেন।

শিক্ষা জীবন : তিনি অল্প বয়সেই ইলমে কুরআন, ইলমে হাদীস ও ইলমে কালাম অর্জন করেন। হযরত আবূ ইউসূফ (র.) বলেন, আমি আবূ হানীফা (র.)-এর সাহচর্যে ২৩ বছর ছিলাম এবং তাঁর সাথে ফজরে নামাজ আদায় করতাম।

কর্ম জীবন : শিক্ষা জীবন শেষ করার সাথে সাথে তিনি তখনকার সময়ের قَاضِىُ الْقُضَاةِ বা Chief Justice তথা প্রধান বিচারপতির পদ অলংকৃত করেন। তিনি অত্যধিক শিক্ষানুরাগী ছিলেন। তাই বিচার কার্য সমাপ্ত করার সঙ্গে সঙ্গেই অপেক্ষমান জ্ঞান অনুসন্ধিৎসু ছাত্রদেরকে পাঠদানে আত্মনিয়োগ করতেন। এভাবেই তিনি আমৃত্যু বিচারকার্য সম্পাদনের সাথে জ্ঞানের সেবা করে গেলেন।

তাঁর গুণাবলি : তিনি খুব খোদাভীরু ছিলেন। হেলাল বিন ইয়াহইয়া (র.) তাঁর সম্পর্কে বলেন, তিনি ছিলেন হাফেজে তাফসীর এবং হাফেজে ফিকহ। তিনি বড় কারী হওয়া সত্ত্বেও প্রতিদিন ২০০ রাকাত নফল নামাজ পড়তেন।

মনীষীদের অভিমত :

* তিনি ইসলামি জগতের সর্ব প্রথম ব্যক্তিত্ব যিনি প্রধান বিচারপতি উপাধীতে ভূষিত হয়েছেন। তাঁর সম্পর্কে ঐতিহাসিক ইবনে আবদুল বার বলেন, আমি আবূ ইউসূফ (র.) থেকে যোগ্যমান কোনো কাজি দেখি না, যার বিচারকার্য পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তরে সর্বত্র সমানভাবে প্রসিদ্ধি ও সমাদৃত হয়েছে।
* একবার তিনি অসুস্থ হওয়ার কারণে আবূ হানীফা (র.) তাকে দেখতে গেলেন। আবূ হানীফা (র.) তাঁকে দেখে বিষন্নতা অনুভব করলেন। অতঃপর আবূ হানীফা (র.) কে বিষন্নতার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন। যদি এই যুবক মারা যায় তাহলে বড় একটা জগৎ ধ্বংস হয়ে যাবে।
* ইবরাহীম ইবনে জারাহ (র.) বলেন, আমি ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মুমূর্ষ অবস্থায় তাঁর সেবা শুশ্রূষা করার জন্য উপস্থিত হই। এমতাবস্থায় আমি দেখলাম তার দরবারে

ইলমের আলোচনা চলছে। ইতোমধ্যে তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। জ্ঞান ফিরে আসার পর তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে ইবরাহীম! হজের মৌসুমে পাথর নিক্ষেপ করা আরোহী অবস্থায় উত্তম নাকি পদব্রজে উত্তম? .... এ থেকে বুঝা যায় তিনি জ্ঞান চর্চার প্রতি কত বেশি আগ্রহী ছিলেন।

* ইবনে মঈন (র.) বলেন, ইমাম আবূ ইউসূফ ছিলেন সাহেবে ফিক্হ ও হাদীস।

তাঁর উস্তাদবৃন্দ : ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) যে সকল উস্তাদবৃন্দের কাছ থেকে জ্ঞানার্জনে ধন্য হয়েছেন তাদের অন্যতম কয়েকজন হলেন নিম্নরূপ–

১. আবূ ইউসুফ (র.) নিজেই বলেন, আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয় বস্তু হলো, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর জ্ঞান চর্চার মজলিস। কেননা তাঁর চেয়ে উন্নততর কোনো ফকীহ্ আমি দেখিনি। আমি ২৩ বছরকাল তার দরবারে থেকে শরিয়তের জ্ঞান অর্জন করি। এমনকি আমার পিতার মৃত্যুর পর তার জানাজায় শরিক হওয়া ছেড়ে দিয়েছি কিন্তু তাঁর পাঠদানে অংশগ্রহণ করাকে ছাড়িনি।

এছাড়া আরো অন্যান্যদের কাছ থেকে উপকৃত হয়েছি। যথা– ২. আব্বান ইবনে আবী আইয়াশ ৩. আবূ ইসহাক আশ শায়বানী, ৪. ইবনে জুরাইজ আবদুল মালেক, ৫. হেজাজ ইবনে আরতাত, ৬. হুসাইন ইবনে দীনার, ৭. আ'মাশ, ৮. আবদুর রহমান ইবনে ছাবেত, ৯. আতা ইবনে সায়েব, ১০. আতা ইবনে আজলাল, ১১. আমর ইবনে দীনার, ১২. আমর ইবনে নাফে', ১৩. কায়েস ইবনে রবী', ১৪. লাইছ ইবনে সাঈদ, ১৫. মালেক ইবনে আনাস, ১৬. মুজাহিদ ইবনে সাঈদ, ১৭. মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক, ১৮. মিসয়ার ইবনে কুদাম, ১৯. ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আনসারী প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ।

তাঁর ছাত্রবৃন্দ : তাঁর ছাত্রদের অন্যতম হলেন ইমাম মুহাম্মদ, ইমাম আহমদ, ইমাম শাফেয়ী ও ইবনে মঈন প্রমুখগণ।

রচনাবলি : তিনি যে সকল গ্রন্থ রচনা করে সমগ্র বিশ্ববাসীকে ঋণী করেছেন তার অন্যতম হলো, আল ইমলা, আল আমানী, আদাবুল কাজি ওয়াল মানাসিক, কিতাবুল আছার, কিতাবুল খাওয়ারিজ ও কিতাবুজ জাকাত। এছাড়া আরো অনেক গ্রন্থ তিনি রচনা করেছেন।

ইন্তেকাল : তিনি ১৮২ হিজরি সনে ইন্তেকাল করেন। তাঁকে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর পাশে দাফন করা হয়।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) :

নাম : তাঁর নাম মুহাম্মদ, উপনাম আবূ আবদুল্লাহ, পিতার নাম আল হাসান। তিনি ১৩২ হিজরি সনে খোরাসানের উপদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। অতঃপর তাঁর পিতা হাসান সেখান থেকে কূফায় চলে আসেন। আর এখানেই তাঁর লেখাপড়া জীবনের সূচনা হয়।

জ্ঞানার্জন : ইমাম মুহাম্মদ (র.) চৌদ্দ বছর বয়সে বিদ্যার্জন শুরু করেন এবং ফিকহ, তাফসীর, হাদীস ও ইলমে কালাম সম্পর্কে গভীর পাণ্ডিত্ব অর্জন করেন। আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট চার বছর থাকেন। অতঃপর ইমাম আজম (র.) পরলোক গমন করলে তিনি আবূ ইউসূফ (র.)-এর নিকট আসেন। আর জ্ঞানের পূর্ণতা লাভে ধন্য হন।

এছাড়া ইমাম মিছয়ার, আওজায়ী, সুফিয়ান সাওরী এবং ইমাম মালেক (র.) থেকে উপকৃত হন। ইমাম মালেক (র.) থেকে তিন বছর জ্ঞানার্জন করেন। তিনি বলেন, আমি পিতা হতে

ওয়ারিশ সূত্রে ৩০ হাজার দিনার ও দেরহাম পেয়েছি। এর অর্ধেক ব্যয় করেছি ভাষা ও শে'র এর জ্ঞানার্জন এবং বাকি অর্ধেক খরচ করেছি হাদীস ও ফিকহ-এর জ্ঞানার্জনে। তিনি আজীবন রচনা ও লেখনির জন্য অর্থ ব্যয় করেছেন।

তাঁর গুণাবলি : ইমাম মুহাম্মদ-এর গুণাবলি হতে কিছু হলো, তিনি রাতকে তিনভাগে ভাগ করতেন। প্রথমভাগে দরস প্রদান করতেন। দ্বিতীয় ভাগে নামাজ পড়তেন এবং তৃতীয়ভাগে ঘুমাতেন।

* ইবনে আবী ইমরান (র.) বলেন, মুহাম্মদ (র.) পূর্ণ দিনই কুরআন পাঠ করতেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল আপনি কেন ঘুমান না? জবাবে বলেছিলেন, সমস্ত মুসলমান আমাদের আশায় ঘুমায়, তাই আমরা কিভাবে ঘুমাতে পারি?

কর্ম জীবন : ইমাম মুহাম্মদ (র.) বিশ বৎসর বয়সে দরস, পাঠদান তথা শিক্ষকতা শুরু করেন। তিনি যখন কুফা নগরীতে "মুয়াত্তা" পড়াতেন তখন এত অধিক পরিমাণ লোক আগমন করতো যে, কুফা নগরীর রাস্তায় যানজট সৃষ্টি হয়ে যেতো। তিনি শরিয়তের সঠিক, সহজ ও সার্থক সমাধান উদ্ভাবনের গবেষণায় নিমগ্ন থাকতেন।

মনীষীদের মতামত :

* ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা দুই ব্যক্তির দ্বারা আমাকে সাহায্য করেছেন। একজন হলো সুফিয়ান অপরজন হলেন ইমাম মুহাম্মদ (র.)।
* তিনি আরো বলেন, আমি মুহাম্মদ (র.) থেকে অধিক স্পষ্ট ভাষী, বাকপটু ও জ্ঞানী আর কাউকে দেখিনি। তিনি যখন কুরআন পাঠ করতেন তখন মনে হতো যেন আসমান হতে কুরআন নাজিল হচ্ছে।
* হযরত আবূ উবাইদ (র.) থেকে জমীরী (র.) বর্ণনা করেন যে, ইমাম মুহাম্মদ (র.) হলেন আরবি, নাহু ও অংক শাস্ত্রের ইমাম। আর কুরআন সম্পর্কে তিনি সবচেয়ে ছিলেন বেশি জ্ঞানী।

তাঁর উস্তাদবৃন্দ : তাঁর উস্তাদদের মধ্যে অন্যতম হলেন ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম আবূ ইউসূফ, ইমাম মালেক, ইমাম আওযায়ী, ইমাম মিছয়ার, ইমাম যুফার ও সুফিয়ান সাওরী (র.) প্রমুখ।

তাঁর ছাত্রবৃন্দ : ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর ছাত্র অগণিত। তাদের অন্যতম হলেন ইমাম শাফেয়ী, আবূ হাফস আল কাবীল, আসাদ ইবনুল ফাররাত, আবূ সুলাইমান মূসা প্রমুখ।

তাঁর রচনাবলি : ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর অনেক রচিত কিতাব রয়েছে। এর থেকে অন্যতম হলো, সিয়ারে কাবীর, সিয়ারে সাগীর, জামে কাবীর, জামে সাগীর, যিয়াদাত ও কাসানিয়াত। এছাড়াও আরো অনেক কিতাব রয়েছে। মূলত তিনিই হানাফী মাজহাবের সম্প্রসারক।

ইন্তেকাল : তিনি ১৮৯ হিজরি সনে ইন্তেকাল করেন এবং তাঁকে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর পাশেই সমাধিস্থ করা হয়।

দ্বিতীয় পাঠ

আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদের আকিদা

وَنَقُوْلُ فِي تَوْحِيْدِ اللهِ مُعْتَقِدِيْنَ بِتَوْفِيْقِ اللهِ - اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى وَاحِدٌ.

অনুবাদ : আল্লাহ্ তা'আলার তাওফীকের প্রতি একান্ত বিশ্বাস রেখে তাঁর তাওহীদের আলোচনা সম্পর্কে বলছি। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা এক ও অদ্বিতীয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ فِيْ تَوْحِيْدِ اللّٰهِ : গ্রন্থকার ইমাম ত্বহাবী (র.) فِيْ تَوْحِيْدِ اللّٰهِ বাক্য দ্বারা কিতাব শুরু করেছেন। এখানে একটি প্রশ্ন হতে পারে। তা হলো গ্রন্থকার (র.) তাওহীদের তথা একত্ববাদের আলোচনার সাথে কিতাব আরম্ভ করার কারণ কি? এর জবাব কয়েকভাবে দেওয়া যায়।

প্রথম জবাব : ইসলামের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ রুকন হলো তাওহীদ এবং দীন ও আকিদার স্তম্ভসমূহের মধ্যে প্রধান স্তম্ভ হলো তাওহীদ। তাছাড়া বান্দার উপর সর্বপ্রথম যে কাজটি ফরজ, তা হলো একত্ববাদ মেনে নেওয়া এবং সর্বকালের নবী রাসূলগণের এমনকি সর্বকালের সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রথম দাওয়াত ছিল তাওহীদ বা একত্ববাদ। এ হিসেবে আকিদা সম্পর্কিত কিতাব তাওহীদ-এর বয়ান দ্বারা শুরু করাটাই বাঞ্ছনীয়। তাই গ্রন্থকার (র.) তেমনটিই করেছেন। এর দলিল হিসেবে বলা যায়, আল্লাহ্ পাক প্রথমত নিজেকে তাঁর মর্যাদাবান সত্তার একত্বের সাক্ষী সাব্যস্ত করেন। দ্বিতীয় সাক্ষী হিসেবে ফেরেশতাদেরকে এবং তৃতীয় সাক্ষী আলেমদেরকে বানিয়েছেন। এ মর্মে স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা বলেন−

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ.

এবং সূরা আলে ইমরানে বলেন−

شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَاُولُو الْعِلْمِ قَآئِمًا بِالْقِسْطِ (الاية).

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা সাক্ষী দিচ্ছেন যে, তিনি একক ও অদ্বিতীয়। তিনি ছাড়া কোনো প্রভু নেই এবং ফেরেশতা ও ন্যায়পরায়ণ জ্ঞানী আলেমগণও সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। তিনিই মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। −[সূরা আলে ইমরান]

দ্বিতীয় জবাব : তাছাড়া আল্লাহ্ পাকের সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ ও একত্ববাদের কালিমা দ্বারা প্রেরিত হয়েছেন। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন− فَاعْلَمْ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْۢبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ অর্থাৎ হে রাসূল! আপনি জেনে নিন, আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই। আর আপনি নিজ কর্ম ও মু'মিন মু'মিনাতের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। −[সূরা মুহাম্মদ]

তাই তাওহীদের বয়ানের সাথে শুরু করাটাই স্বাভাবিক।

তৃতীয় জবাব : তাওহীদের কালিমা এমন একটি বাক্য যা শত বছরের ঐ পাপী বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকেও পর্যন্ত মা'সূম তথা পাপহীন করে ইসলামের ছায়াতলে প্রবেশ করিয়ে দেয়, যে তার গোটা জীবনকে ইসলামের শিকড় কেটে দেওয়ার জন্য উৎসর্গ করেছিল। অতএব এ তাওহীদের কালিমার বর্ণনার সাথে রচনার সূচনা হওয়াটা স্বাভাবিক বৈ কিছু নয়।

চতুর্থ জবাব : আল্লাহ তা'আলা যত নবী রাসূলদেরকে উম্মতের নিকট পাঠিয়েছেন। তাদের সকলকে এক তাওহীদের উপর অটল থাকার এবং মানব জাতিকে আল্লাহর একত্ববাদের প্রতি আহ্বান করারই আদেশ করেছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন- وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِيْ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ অর্থাৎ আর আমি আপনার পূর্বে এমন কোনো নবী রাসূল প্রেরণ করিনি যাঁর নিকট এই মর্মে বার্তা প্রেরণ করিনি যে, আমি ছাড়া [তোমাদের] কোনো উপাস্য নেই। অতএব আমার উপাসনা কর।

অতএব বুঝা গেল তাওহীদ হলো সকল নবী রাসূল (আ.) গণের দীন এবং সর্বযুগের সিদ্দীক ও সালেহীনগণের পথ। এ কারণে গ্রন্থকার (র.) তাওহীদের আলোচনা সর্বপ্রথম করলেন।

তাওহীদ এমন প্রাথমিক জিনিস যার দ্বারা মানুষ ইসলামি অনুশাসনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। আর এই তাওহীদ নিয়েই শেষ বিদায় তথা পরকালে পাড়ি জমায়। নবী করীম ﷺ বলেন, مَنْ كَانَ اٰخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ অর্থাৎ যার শেষ বাক্য لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ হবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর মানুষের উপর সর্বপ্রথম ওয়াজিব হলো, একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন করা এবং সর্বশেষ তার উপর অটল থাকা। জানা থাকা দরকার যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো تَوْحِيْدُ الْاُلُوْهِيَّتْ আল্লাহর একত্ববাদ।

তাওহীদের প্রকারভেদ : تَوْحِيْد সাধারণত তিন ভাগে বিভক্ত। যথা- ১. تَوْحِيْدٌ فِى الرَّبُوْبِيَّةِ অর্থাৎ আল্লাহ এক এবং প্রত্যেকটি বস্তুর স্রষ্টা, ২. تَوْحِيْدٌ فِى الصِّفَاتِ ৩. تَوْحِيْدٌ فِى الذَّاتْ বা تَوْحِيْدُ الْاُلُوْهِيَّتْ অর্থাৎ আল্লাহ তা'লা এককভাবে এর উপযুক্ত, তারই ইবাদত করা যায়। তার কোনো শরিক নেই।

অতএব, দেখা যায় ইসলামের সবকিছুই تَوْحِيْد তথা একত্ববাদের উপর নির্ভরশীল। তাই গ্রন্থকার (র.) تَوْحِيْد দ্বারা গ্রন্থ রচনা শুরু করেছেন।

قَوْلُهُ بِتَوْفِيْقِ اللّٰهِ : গ্রন্থকার (র.) আল্লাহ তা'আলার তাওফীকের স্মরণাপন্ন হয়েছেন। এ আয়াতের প্রতি লক্ষ্য করে وَمَا تَوْفِيْقِيْ إِلَّا بِاللّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيْبُ

قَوْلُهُ إِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى وَاحِدٌ : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সকল আসমানি কিতাবে নিজের একত্বতার আলোচনা করেছেন। বিশেষ করে কুরআনুল কারীমের অসংখ্য আয়াতে এর আলোচনা করেছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন- هُوَ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ অর্থাৎ তিনিই আল্লাহ যিনি একক পরাক্রমশালী পরাক্রান্ত।

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে- قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ অর্থাৎ হে নবী! আপনি বলে দিন। তিনিই এক আল্লাহ। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে- وَإِلٰهُنَا وَإِلٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُوْنَ অর্থাৎ আমাদের প্রভু ও তোমাদের প্রভু এক-একক। আর আমরা তারই আনুগত্যশীল।

আল্লাহ ভিন্ন অন্য কোনো উপাস্য বা মাবুদ যদি থাকতো তাহলে তার পরিণতি কি হতো? তার অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে মহান আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- لَوْ كَانَ فِيْهِمَا اٰلِهَةٌ إِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا আর ফাসাদ বা অনর্থের ধরন বা প্রকৃতি বর্ণনা দিতে গিয়ে আল্লাহ আরো বলেন- وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلٰهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلٰهٍ بِمَا خَلَقَ الخ

* উপরিউক্ত সব আয়াতই আল্লাহ তা'আলার একত্বতার প্রমাণ বহন করে এবং উপরিউক্ত দলিল আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব সাব্যস্ত করে। অপর আয়াতে তিনি ব্যতীত অন্য সব উপাস্যের অস্তিত্বের শূন্যতা সাব্যস্ত করে বলেন- لَوْ كَانَ اٰلِهَةٌ إِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا অর্থাৎ যদি আসমান ও জমিনে আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোনো প্রভু থাকতো, তাহলে অবশ্যই তাদের উভয়েই ধ্বংস হয়ে যেত। সুতরাং আয়াত দ্বারা বুঝা গেল আল্লাহ এক-একক।

আল্লাহ তা'আলা অসাদৃশ্যমান সক্ষম

لَا شَرِيْكَ لَهُ لَا شَيْءَ مِثْلُهُ وَلَا شَيْئَ يُعْجِزُهُ وَلَا إِلٰهَ غَيْرُهُ.

অনুবাদ : আল্লাহ্ তা'আলার কোনো অংশীদার নেই। তাঁর সাদৃশ্য কোনো কিছুই নেই এবং কোনো কিছু তাকে অক্ষম করতে পারে না আর তিনি ছাড়া কোনো স্রষ্টা নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ : পূর্বেকার নবীদের উপর নাজিলকৃত আসমানি কিতাবে যেমন আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদের কথা বলা হয়েছে। অনুরূপ তার অংশীদার কেউ না হওয়ার কথাও বলা হয়েছে। বিশেষ করে কুরআনুল কারীমের অগণিত জায়গায় আল্লাহ তা'আলার অংশীদার না হওয়ার কথা অসংখ্য যুক্তি প্রমাণ দ্বারা পেশ করা হয়েছে। যেমন– আল্লাহ্ তা'আলা বলেন– قُلْ إِنَّ صَلَاتِىْ وَ نُسُكِىْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ. لَا شَرِيْكَ لَهُ وَ بِذٰلِكَ أُمِرْتُ (الاية). অর্থাৎ হে নবী আপনি বলুন আমার নামাজ, আমার কুরবানি, আমার জীবন-মরণ সব কিছু বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহরই জন্য। তাঁর কোনো অংশীদার নেই। আমি তার আদিষ্ট হয়েছি। অপর জায়গায় ইউসূফ (আ.) সম্পর্কীত আয়াতে বলেন– مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ অর্থাৎ [ইউসূফ (আ.)] আমাদের জন্য সমীচীন নয় যে, আমরা কোনো বস্তুকে আল্লাহ তা'আলার সাথে শরিক করবো। অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে– اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذٰلِكَ مِنْ شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ.
অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা এমন সত্তা যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, রিজিক দিয়েছেন। অতঃপর তোমাদেরকে মৃত্যু দিবেন, আবার জীবন দিবেন। তোমাদের শরিকদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি? যে এসব কাজ থেকে কোনো একটি করতে সক্ষম? তারা আল্লাহর সাথে যাদেরকে শরিক করে আল্লাহ তা হতে পবিত্র ও মহান। অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা নবী করীম ﷺ-কে নির্দেশ দিয়ে বলেন– وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ. অর্থাৎ আপনি বলুন! সমস্ত প্রসংশা কেবলই তাঁর যার না কোনো সন্তান জন্ম গ্রহণ করেছেন এবং না তাঁর রাজত্বে কোনো শরিক আছে। তিনি না কোনো দুর্দশাগ্রস্থ হয়েছেন যার কারণে তাঁর কোনো সাহায্যকারীর দরকার।

উপরোল্লিখিত সকল দলিল দ্বারা বুঝা যায় যে, আল্লাহর কোনো শরিক নেই। অতএব সকল মু'মিনকে শিরক থেকে বিরত থাকা ফরজ। কেননা তা অমার্জনীয় অপরাধ।

قَوْلُهُ لَا شَيْءَ مِثْلُهُ : আল্লাহ তা'আলার জাত বা সত্তা অতুলনীয় এবং তাঁর জাত ও গুণাবলির সাথে সৃষ্টির কোনো কিছুর তুলনা চলে না। যেহেতু তাঁর সত্তা অতুলনীয় তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন– لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ অর্থাৎ কোনো বস্তুই তাঁর সাদৃশ্যশীল নয়। –[সূরা শু'আরা] আল্লাহর জাত বা সত্তার দিক দিয়ে এবং তার গুণাবলি ও শানের দিক দিয়ে সব কিছুই তাঁর সাথে অতুলনীয়। অতএব তাঁর সাথে কোনো কিছুকে সাদৃশ্যশীল মনে করা ঈমানের পরিপন্থি বা কুফরি।

قَوْلُهُ لَا شَيْئَ يُعْجِزُهُ : অর্থাৎ কোনো বস্তুই আল্লাহ তা'আলার কোনো গুণকে অক্ষম করতে পারে না। এর কারণ হলো দুইটি।

১. কর্তা নিজ দুর্বলতার কারণে তার ইচ্ছানুযায়ী কর্ম সম্পাদন করতে অক্ষম।

২. অথবা কর্তা এ কাজ সম্পর্কে পূর্ণ অজ্ঞ কিংবা জ্ঞান অপরিপক্কতার কারণে নিজ ইচ্ছানুযায়ী কার্য সম্পাদন করতে অক্ষম হয়। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা নিঃসন্দেহে উপরিউক্ত দুটি বিষয় হতে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র। অর্থাৎ ক্ষমতা ও শক্তির এমন কোনো স্তর নেই যা আল্লাহ তা'আলার মাঝে অবর্তমান। কোনো কিছু তাঁকে অক্ষম করতে পারে না। নিম্নের আয়াতটি এর বহিঃপ্রকাশ। اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيْنِ অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা রিজিকদাতা ও অসীম ক্ষমতার অধিকারী। –[সূরা যারিয়াত]

উক্ত আয়াতে প্রথমত তিনি নিজেকে অসীম ক্ষমতার অধিকারী প্রমাণ করেন এবং পরে বলেন وَاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْئٍ عِلْمًا নিশ্চয় প্রত্যেক বস্তুই আল্লাহ তা'আলার জ্ঞান কর্তৃক পরিবেষ্টিত। আয়াতটি আল্লাহ তা'আলা অক্ষম ও অপারগ হওয়ার দ্বিতীয় কারণ হতে মুক্ত হওয়ার প্রমাণ বহন করে।

অতএব, উপরিউক্ত বক্তব্য দ্বারা বুঝা যায়, আল্লাহ তা'আলা সর্ববিষয়ে সর্বোচ্চ ক্ষমতার মালিক। তাঁর সম্পর্কে অপারগতা এবং অক্ষমতার কল্পনাই করা যায় না। তিনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। এতে কারো কোনো বাঁধা দেওয়ার ক্ষমতা নেই। এরই প্রতি ইঙ্গিত হচ্ছে– فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ অর্থাৎ তিনি যা ইচ্ছা তাই করেন। –[সূরা বুরূজ]

এ সম্পর্কে আরো স্পষ্ট করে বলেন– وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْئٍ فِى السَّمٰوٰتِ وَلَا فِى الْاَرْضِ اِنَّهُ كَانَ عَلِيْمًا قَدِيْرًا অর্থাৎ নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে কোনো বস্তুই নেই, যা আল্লাহ তা'আলাকে অক্ষম করতে পারবে। নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞানী ও সর্ব শক্তিমান। –[সূরা ফাতির]

সুতরাং বুঝা গেল আল্লাহ তা'আলার কাছে বিঘ্নতা সৃষ্টিকারী প্রতিবন্ধক বলতে কোনো কিছুই নেই; বরং এর প্রতি ঈমান রাখা কুফরি।

আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নাই :

قَوْلُهُ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُهُ : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কোনো উপাস্য বা ইবাদতের উপযুক্ত নেই। দলিল হিসেবে বলা যায়, আল্লাহ তা'আলা ভূ-পৃষ্ঠে যতো নবী রাসূল পাঠিয়েছেন। সকলের একই বাণী ছিলো যে, আল্লাহ তা'আলা ছাড়া উপাসনার উপযুক্ত আর কেউ নেই। যেমন– হযরত নূহ (আ.)-এর বাণী কুরআনে উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা বলেন– وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَالَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهُ অর্থাৎ আমি নূহ (আ.)-কে তাঁর জাতির নিকট এ মর্মে প্রেরণ করেছি যে, তোমরা আল্লাহ তা'আলার ইবাদত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো দ্বিতীয় উপাস্য নেই। –[সূরা আ'রাফ : ৫৯]

উপরিউক্ত আয়াতে প্রথমত হযরত নূহ (আ.)-এর রিসালাত, দ্বিতীয়ত আল্লাহ তা'আলা ইবাদত করা ও তৃতীয়ত তিনি ব্যতীত অন্য কোনো প্রভু না থাকার কথা বলা হয়েছে এবং তিনি ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত না করার জন্যও বলা হয়েছে।

অনুরূপ আ'দ সম্প্রদায়ের নিকট তাদের ভাই হযরত হূদ (আ.) কে প্রেরণ করা হয়েছে একই মর্মে। যেমন– وَاِلٰى عَادٍ اَخَاهُمْ هُوْدًا قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَالَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرُهُ অর্থাৎ আমি আ'দ জাতির নিকট তাদের ভাই হূদকে প্রেরণ করেছি এই বার্তা দিয়ে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোনো প্রভু নেই। –[সূরা আ'রাফ : ৬৫]

এই আয়াতেও অনুরূপ বিষয় বর্তমান।

আবার ছামূদ বংশের নিকট তাদের ভাই সালেহ (আ.)-কে উপরিউক্ত বিষয়ে পাঠানো হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে- وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ অর্থাৎ ছামূদ জাতির নিকট তাদের ভাই সালেহ (আ.) কে প্রেরণ করেছি। এই সংবাদ দিয়ে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো মাবুদ নেই। -[আ'রাফ : ৭৩] ঠিক একই বিষয় নিয়ে হযরত শুআইব (আ.) প্রেরিত হয়েছে। যেমন- وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ.

অর্থাৎ মাদয়ান শহরে তাদের ভাই হযরত শুআইব (আ.)-কে প্রেরণ করেছি, এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো মাবুদ নেই। -[সূরা আ'রাফ : ৮৫] আর لَا إِلَهَ غَيْرُهُ এমন একটি শব্দ যার প্রতি সকল নবী রাসূল ﷺ মানুষকে আহ্বান করেছে। হ্যাঁ বোধক এবং না বোধক শব্দের দ্বারা একত্ববাদের আলোচনাকে এজন্যই সীমাবদ্ধ করেছেন যে, শুধু হ্যাঁ বোধক এর আলোচনা দ্বারা অন্যান্য হ্যাঁ বোধক বস্তুকে রহিত করা হয় না। এজন্যই আল্লাহ বলেন- وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ

অতঃপর তিনি বলেন- لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

মোটকথা হযরত আদম (আ.) থেকে মুহাম্মদ ﷺ পর্যন্ত প্রত্যেক নবী রাসূলেই আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদ তথা তাওহীদের দাওয়াত দিয়ে এসেছেন। কারণ এটি সব বিশ্বাস ও কর্মের প্রাণ তাই যখনই কোনো জাতি আল্লাহ তা'আলার সত্ত্বা, তাঁর গুণাবলি এবং দীনে হককে বাদ দিয়ে করে ত্রিত্ববাদ কিংবা অন্য কোনো বিশ্বাসে নিমজ্জিত হয়ে আল্লাহর সাথে শিরক করা শুরু করেছে, তাকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করা শুরু করে দিয়েছে, তখনই আল্লাহ তা'আলা নবী রাসূলের মাধ্যমে একত্ববাদের দাওয়াত দিতে আরম্ভ করে দিতেন এবং তিনি ছাড়া অন্য কারো ইবাদত না করা, অন্য কাউকে উপাস্যরূপে মেনে না নেওয়ার কঠোর আদেশ দান করেন। যেমন- وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ অর্থাৎ আমি প্রত্যেক গোত্রে রাসূল প্রেরণ কর্ছি। এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহ তা'আলার ইবাদত কর এবং তোমরা তাগুত তথা প্রতিমা পূজা বর্জন করো।

উপরিউক্ত বর্ণনা দ্বারা একথা প্রমাণ হলো যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। তিনি এক একক। অতএব, এর বিপরীত কোনো আকিদার বিশ্বাসি হওয়া কুফরির শামিল। যার পরিণাম চির জাহান্নাম।

আল্লাহ তা'আলাকে এক-একক জানার হুকুম :

১. আল্লাহ তা'আলাকে এক-একক জানা সকলের উপর ফরজ।
২. যারা আল্লাহর একত্ববাদের প্রতি দাওয়াত পায়নি তারা নিজেরাই চিন্তা গবেষণা করে আল্লাহকে একক জানা ফরজ। যেমনটি করেছিলেন হযরত ইবরাহীম (আ.)। কেননা তিনি মূর্তি পূজারীর সন্তান হওয়া সত্ত্বেও তাদের অজ্ঞতা মেনে নেননি; বরং তিনি পূর্ণরূপে নিজ রবের অনুসন্ধান করলেন। অবশেষে তাঁকে পেলেন। দলিল- وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ অর্থাৎ আমি মানব ও জিন জাতিকে সৃষ্টি করেছি আমার ইবাদতের জন্য। فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَقَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ. অর্থাৎ অতঃপর যখন সূর্য উদিত হলো। তখন ইবরাহীম (আ.) বলল, এটাই আমার রব এবং এটাই সর্ব বৃহৎ। অতঃপর যখন তা ডুবে গেল তখন তিনি বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! নিশ্চয় আমি মুশরিকদের থেকে পবিত্র।

আল্লাহ অনাদি, অনন্ত, বিনাশমুক্ত ও ধ্বংসমুক্ত

قَدِيْمٌ بِلَا اِبْتِدَاءٍ دَائِمٌ بِلَا اِنْتِهَاءٍ لَا يَفْنِيْ وَلَا يَبِيْدُ.

অনুবাদ : আল্লাহ তা'আলা অনাদি যাঁর [প্রারম্ভের, আরম্ভের, সূচনার, প্রথমত্বের] কোনো শুরু নেই। তিনি অনন্ত যাঁর কোনো অন্ত, ইতি, বা শেষ নেই। তিনি ধ্বংস হবেন না। তিনি বিনাশও হবেন না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আল্লাহ তা'আলা অনাদি ও অনন্ত :

قَوْلُهُ قَدِيْمٌ الخ : আল্লাহ তা'আলার সত্তা সব সময় ছিল এবং সব সময় থাকবে। যার কোনো শুরুও নেই শেষও নেই। কারণ তাঁর পূর্বে কেউ ছিল না। তিনিই সর্ব প্রথম এবং তাঁর শেষেও কেউ নেই তিনিই সর্ব অনন্ত। মহান আল্লাহ তাঁর অনাদি ও অনন্তের বর্ণনা দিতে গিয়ে সূরায়ে হাদীদের তিন নং আয়াতে বলেন– هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ তিনিই প্রথম তিনি শেষ, তিনিই প্রকাশ্য তিনিই অদৃশ্য। তিনিই সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়। যা হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْاَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَاَنْتَ الْاٰخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ অর্থাৎ হে আল্লাহ! আপনি সর্বপ্রথম, আপনার পূর্বে কেউ ছিল না এবং আপনিই সর্বশেষ আপনার পরে কেউ নেই। –[মুসলিম]

আয়াতে বর্ণিত শব্দ اَلْاَوَّلُ - اَلْاٰخِرُ - اَلظَّاهِرُ ও اَلْبَاطِنُ সম্পর্কে তাফসীরকারকগণ বিভিন্ন মত পেশ করেছেন। তাঁরা যে সমস্ত মত প্রকাশ করেছে। তার কোনোটির মধ্যেই বৈপরীত্বের অবকাশ নেই। কেননা তারা যে সকল মত ব্যক্ত করেছেন তার সবগুলোরই সম্ভাবনা রয়েছে উপরিউক্ত শব্দগুলোর অর্থ হিসেবে।

ইমাম ত্বহাবী (র.) বলেন قَدِيْمٌ بِلَا اِبْتِدَاءٍ دَائِمٌ بِلَا اِنْتِهَاءٍ মূলত আসমায়ে হুসনা। اَلْاَوَّلُ এবং اَلْاٰخِرُ শব্দ দ্বারা এর পরিচ্ছন্ন অর্থ প্রকাশ করা হলো। কেননা اَوَّلِيَّتْ সাধারণত ওই বস্তুকে বলা হয় যার اِبْتِدَاءٌ প্রারম্ভত্বের বা সূচনার কোনো সীমা নেই। যাকে اَزَلْ বলা হয়। আর কালাম শাস্ত্রবীদদের পরিভাষায় একেই قَدِيْمٌ বলা হয়।

আর اُخْرُوِيَّتْ শব্দ দ্বারা সাধারণত উদ্দেশ্য নেওয়া হয় যার কোনো اِنْتِهَاءٌ বা শেষত্বের পরিসীমা নেই। যাকে اَبَدٌ বলা হয়। পরিভাষায় এর জন্য دَائِمٌ শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

اَلْاَوَّلُ শব্দের অর্থ– অস্তিত্বের দিক থেকে সকল সৃষ্টি জগতের অগ্রে ও আদিতে। তিনি ব্যতীত সব কিছুই সৃজিত। তিনি স্রষ্টা। তাই তিনিই আদি।

اَلْاٰخِرُ শব্দের অর্থ সর্বশেষ। অর্থ সকল সৃজিত বস্তুই বিনাশ হবে। কিন্তু তিনি বিনাশ হবেন না। এরই কথা বলা হয়েছে নিম্নের আয়াতটিতে كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهُ অর্থাৎ সব জিনিসই ধ্বংসশীল একমাত্র আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত। –[সূরা কাছাছ]

তিনি এমন এক সত্তা যে সত্তার অস্তিত্বের কোনো শেষ নেই। অন্য সকল ব্যক্তি, বস্তু ও সত্তার অস্তিত্বই নির্দিষ্ট সময়ান্তে শেষ হবে কিন্তু তার সত্তা শেষ শব্দের অনুভব শক্তির ঊর্ধ্বে।

প্রশ্ন : গ্রন্থকার (র.) قَدِيْمٌ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। কিন্তু কুরআনে তা ব্যবহার হয়নি। অবশ্য اَلْاَوَّلُ শব্দটি قَدِيْمٌ-এর অর্থ প্রদান করেছে। এর কয়েকটি জবাব দেওয়া যেতে পারে।

১. اَلْاَوَّلُ শব্দটিতে যে সৌন্দর্য্য নিহিত রয়েছে قَدِيْمٌ শব্দে তা অবর্তমান। আর কুরআন হলো সাহিত্যের ঊর্ধ্ব জগতে যাতে সুন্দর অর্থবহ শব্দই স্থান পাওয়ার যোগ্য। তাই اَلْاَوَّلُ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। قَدِيْمٌ ব্যবহৃত হয়নি।
২. اَلْاَوَّلُ শব্দটিতেই قَدِيْمٌ-এর অর্থ রয়েছে। কিন্তু اَلْاَوَّلُ-এর অর্থ قَدِيْمٌ শব্দে নেই। তাই اَلْاَوَّلُ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।
৩. স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা যে শব্দ ব্যবহার করেছেন তাই শিরোধার্য।
৪. اَلْاَوَّلُ শব্দটি قَدِيْمٌ-এর অর্থ বুঝানোর সাথে এটাও বুঝায় যে, সবকিছু আশ্রয়স্থল একমাত্র আল্লাহ্ই।

আল্লাহর বিনাশ ও ধ্বংস নেই :

قَوْلُهُ وَلَا يَفْنٰى الخ : আল্লাহ তা'আলার সব সৃষ্টিই ক্ষয় হয় এবং ক্ষয় হতে হতে এক পর্যায়ে তা ধ্বংস হয়ে যায়। অতএব সবকিছুই ধ্বংসশীল। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার কোনো ক্ষয় নেই এবং ধ্বংস হবেন না এবং তিনি ধ্বংসশীলও নন। যা তিনি পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করেছেন- كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهٗ অর্থাৎ সব কিছুই ধ্বংসশীল একমাত্র আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত। -[সূরা কাছাছ]

অপর এক আয়াতে তিনি বলেন- كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَّيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠের সব কিছুই ধ্বংসশীল শুধু আপনার মহামান্বিত ও মহানুভব পালনকর্তার সত্তাই স্থিতিশীল বা ধ্বংসহীন। -[সূরা আর রহমান]

উপরিউক্ত প্রমাণাদি দ্বারা একথা সাব্যস্ত হয় যে, আল্লাহর সত্তা কখনো ধ্বংস হবে না। তিনি ছাড়া সব কিছুরই ধ্বংস অনিবার্য। একেকটি একেক কারণের দ্বারা ধ্বংস হবে। কোনোটি আগে ও কোনোটি পরে। একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই ধ্বংসহীন। তিনি অস্তিত্বশীল। অতএব অস্তিত্বের গুণ তাঁর থেকে পৃথক হওয়া অসম্ভব। এটাই প্রকৃত মু'মিনের বিশ্বাস। এর বিপরীত বিশ্বাস রাখা কখনই বৈধ হবে না।

আল্লাহ তা'আলা অনন্ত, অনাদি, বিনাশহীন ও ধ্বংসহীন-এর হুকুম :

উপরিউক্ত বিষয়ে ঈমান আনয়ন করা বা বিশ্বাস রাখা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ। এর বিপরীত আস্থা পোষণ বা বিশ্বাস রাখা কুফরির শামিল।

দলিল :

১. هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ -[সূরা হাদীদ]
২. كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهٗ -[সূরা কাছাছ]
৩. كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَّيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ -[সূরা আর রাহমান]

বান্দা কাজের কর্তা নয়

আল্লাহ তা'আলা কল্পনার উর্ধ্বে :

وَلَا يَكُوْنُ إِلَّا مَا يُرِيْدُ، لَا تَبْلُغُهُ الْأَوْهَامُ وَلَا تُدْرِكُهُ الْأَنْعَامُ.

অনুবাদ : আল্লাহ তা'আলা যা ইচ্ছা করেন তাই হয়। মানবীয় কল্পনা তাঁর নাগাল পায়না। মানবীয় জ্ঞানও তাঁর কাছে যেতে পারে না বা তাঁকে অনুভব করতে পারে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَا يَكُوْنُ الخ : আল্লাহর ইচ্ছার বাইরে কোনো কিছু সংঘটিত হয় না। যা কিছুই সংঘটিত হয় সব আল্লাহর ইচ্ছাই হয়। অতএব মানুষের কোনো কাজ যদি আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছানুযায়ী হয় তবেই তা সংঘটিত হবে। অন্যথায় তা হবে না, যদিও মানুষ হাজার চেষ্টা চালায়। যেমন : আল্লাহর বাণী- وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِيْ إِنْ أَرَدْتُّ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللّٰهُ يُرِيْدُ أَنْ يُّغْوِيَكُمْ অর্থাৎ আর আমার উপদেশ তোমাদেরকে চাইলেও তা ফলপ্রসু হবে না যদি আল্লাহ তা'আলা তোমাদের পথভ্রষ্ট করতে চান। -[সূরা হুদ]

অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- قُلْ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَعْصِمُكُمْ مِّنَ اللّٰهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوْٓءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُوْنَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا অর্থাৎ আপনি বলুন, আল্লাহর হাত থেকে তোমাদেরকে কে নিরাপত্তা দান করবে। যদি তিনি তোমাদের অমঙ্গল কিংবা মঙ্গল চান? আর তারা আল্লাহ ব্যতীত কাউকে নিজেদের জন্য অভিভাবক হিসেবে পাবে না এবং সাহায্যকারী হিসেবেও পাবে না। -[সূরা আহযাব]

উপরিউক্ত আয়াতদ্বয় দ্বারা বুঝা যায় আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ছাড়া কোনো কাজই সংঘটিত হয় না। সব তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ীই হয়ে থাকে। এটাই মু'মিনের আকিদা।

এটা মু'তাজিলা সম্প্রদায়ের বিপরীত অভিমত। তাদের ভ্রষ্ট ধারণা হলো যে, আল্লাহ তা'আলা সকল মানুষ থেকে ঈমানের ইচ্ছা করেন আর কাফের কুফরের ইচ্ছা করেন। অতঃপর আল্লাহর ইচ্ছা পূরণ হয়নি কিন্তু কাফেরের ইচ্ছা পূর্ণ হয়ে গেল।

تَعَالَى اللّٰهُ عَنْ ذَالِكَ عُلُوًّا كَبِيْرًا মু'তাজিলাদের এই কথা কুরআন, হাদীস ও শুভ বুদ্ধির বিপরীত।

আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত বলেন, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বস্তুর ইচ্ছা করেন। যদিও তা কুফর এবং পাপের হোক না কেন। কিন্তু এই ইচ্ছাটা تَكْوِيْنِىْ، تَقْدِيْرِىْ তথা আল্লাহ কর্তৃক সৃষ্টির অস্তিত্ব দান সম্পর্কিত হয়। শরয়ি দিক থেকে অনুমোদিত কার্য হিসেবে নয়। আল্লাহর নিকট কুফর এবং পাপকার্য অপছন্দনীয় আর এর প্রতি তিনি নির্দেশ দেননি; বরং একে তিনি অপছন্দ করেন। এটাই সকল সালাফদের মাজহাব যে, مَا شَاءَ اللّٰهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ ; আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের মুহাক্কিক আলেমদের মতে, কুরআন পাকে উল্লিখিত إِرَادَةْ দুই প্রকার। যথা- ১. إِرَادَةْ تَكْوِيْنِيَّهْ এবং ২. إِرَادَةْ شَرْعِيَّهْ

১. إِرَادَةٌ تَكْوِيْنِيَّةٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ঐ সকল ইচ্ছা যা দ্বারা সাধারণ ভাবে সকল সৃষ্ট বস্তুকে ইচ্ছা করা হয়। চাই তা স্রষ্টার পছন্দনীয় হোক বা অপছন্দনীয়। যেমন আল্লাহর বাণী- فَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهٗ يَشْرَحْ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ وَمَنْ يُّرِدْ اَنْ يُّضِلَّهٗ

২. আর إِرَادَةٌ شَرْعِيَّةٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যার প্রতি মহান স্রষ্টার সন্তুষ্টি এবং পছন্দ রয়েছে। আর যা আল্লাহর নিকট প্রিয়। কালামে পাকে তার প্রমাণ রয়েছে। যেমন- يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সাথে সহজতা অবলম্বন করেছেন এবং কাঠিন্নতা পরিহার করেছেন। তিনি আরো বলেন- يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ.

এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপন হয় যে, যদি আল্লাহ তা'আলাই সমস্ত কাজ সৃষ্টি করে থাকেন। তাহলে তা মন্দ কাজ (যেমন- কুফরি) আল্লাহ তা'আলাই মানুষের মাধ্যমে সৃষ্টি করে থাকেন। তবে মানুষের অপরাধ কি? এর জবাবে আমরা বলবো।

সমস্ত কাজই আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করে থাকেন। এমনকি মন্দ কাজ, হেদায়েত আল্লাহ তা'আলাই সৃষ্টি করেন। কিন্তু ভালো মন্দ গ্রহণের ইচ্ছা নামক বিষয়টি আল্লাহ তা'আলা বান্দার হাতে দিয়ে দেন। ইচ্ছা হলে মঙ্গলজনক কাজ গ্রহণ করবে এবং ইচ্ছা হলে মন্দকাজ। সবই তার উপর বর্তাবে। অতএব এখানে প্রশ্নের নিরসন হয়ে যায়।

قَوْلُهٗ لَا تَبْلُغُهُ الْاَوْهَامُ : এখানে اَوْهَامٌ শব্দটি وَهْمٌ-এর বহুবচন। এর অর্থ হলো ধারণা, কল্পনা, চিন্তা। অর্থাৎ মানুষের চিন্তা, কল্পনা আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছে না এবং কখনো পৌঁছতেও পারবে না। কারণ মানুষের চিন্তাও কল্পনা সবই সীমিত। এগুলো দৃশ্যমান বস্তু দর্শন ছাড়া আর কিছুই করতে পারে না। উর্ধ্ব জগতের নূরানী ও সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম বিষয় পর্যন্ত পৌঁছে না। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা- وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِهٖ عِلْمًا

এ ব্যাপারে শেখ সাদী (র.) যথার্থই লিখেছেন- ای برتر از خیال وقیاس وگمان وزهم دز هرفر کفة انر شنیو یم وخوانرایم

যা হাদীসে কুদছিতে এভাবে বলা হয়েছে, اَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِيْنَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا اُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلٰى قَلْبِ بَشَرٍ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি আমার নেক বান্দার জন্য এমন নিয়ামত তৈরি করেছি। যা কোনো চক্ষু কোনো দিন দেখেনি। কোনো কান তা কখনো শুনেনি এবং কোনো অন্তরে তা কল্পনাও হয়নি। -[বুখারী]

উপরিউক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, যখন মানুষের দৃষ্টি, চিন্তা, ধারণা, অনুমান ও কল্পনা নূরানী দেহ তথা জান্নাতের অফুরন্ত নিয়ামত পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি। তখন যে সত্তা দেহাবয়ব থেকে পূত পবিত্র তাঁর পর্যন্ত মানুষের কল্পনা কিভাবে পৌঁছতে পারে? এবং যিনি এই কল্পনাতীত বেহেশতী নিয়ামত তৈরি করেছেন তাঁর পর্যন্ত কিভাবে মানবীয় কল্পনা পৌঁছবে? সুল্লাম গ্রন্থ প্রণেতা (র.) যথার্থই বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার কল্পনা মানবীয় কল্পনার উর্ধ্বে। না চক্ষু তাকে অনুমান করতে পারে এবং না জ্ঞান ও কল্পনা তাকে উপলব্ধি করতে পারে।

قَوْلُهٗ لَا تُدْرِكُهُ الْاَفْهَامُ : تُدْرِكُ শব্দটি اَلْاِدْرَاكُ হতে নির্গত। অর্থ হলো- পাওয়া, বেষ্টন করা, বুঝা। اَلْاَفْهَامُ শব্দটি فَهْمٌ-এর বহুবচন। অর্থ হলো- বুঝা, বোধ শক্তি, উপলব্ধি, বুদ্ধি।

অর্থাৎ সৃষ্টি জীবের জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক আল্লাহ তা'আলার সত্তাকে পরিবেষ্টন করতে পারেনি। পারবেও না। এর কারণ অনেক হতে পারে। নিম্নে তার হেতু বর্ণিত হলো–

১. মানবীয় জ্ঞান, বুদ্ধি, অনুভূতি ও চিন্তাশক্তি সবই সীমিত এবং মানুষের জ্ঞানার্জনের মাধ্যমগুলোও সীমিত। অতএব সীমিত মাধ্যম দ্বারা সীমিত জ্ঞানই অর্জন হয়ে থাকে। অথচ আল্লাহ তা'আলার সত্তা অসীমিত। আর একথা সর্বজন স্বীকৃত যে, অসীমিত আল্লাহ তা'আলার সত্তা সীমিত মানুষের জ্ঞান দ্বারা বুঝা, অনুধাবন করা অসম্ভব এবং এর মৌলতত্ত্বে যাওয়াও অসম্ভব।

সুতরাং ফলাফল বের হয় যে, মানুষের জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিবেক দ্বারা আল্লাহ তা'আলার সত্তাকে বুঝা, অনুধাবন করা ও আয়ত্ব করা যায়নি, যাবেও না। এ সম্পর্কেই আল্লাহ তা'আলা বলেন– يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِهٖ عِلْمًا অর্থাৎ তিনি সামনের পিছনের সব কিছু সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে সম্যক পরিজ্ঞাত। আর তারা তাঁকে জ্ঞান দ্বারা আয়ত্ব করতে পারবে না। –[সূরা ত্বাহা]

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে– لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ। অর্থাৎ দৃষ্টিসমূহ তাঁর নাগাল পায় না। অথচ তিনি দৃষ্টিসমূহের নাগাল পান। তিনি অত্যন্ত সুক্ষ্মদর্শী, সুবিজ্ঞ। –[সূরা আন'আম]

উপরিউক্ত প্রমাণ দ্বারা বুঝা যায় যে, মানুষ, জিন, ফেরেশতা ও সকল জীবের দৃষ্টি এক হয়েও আল্লাহ তা'আলার সত্তাকে বেষ্টন করতে পারবে না। পক্ষান্তরে আল্লাহ তা'আলার জন্য সব কিছুকে পরেবেষ্টন করা একেবারে সহজ। যার প্রমাণ নিম্নের আয়াতে পরিলক্ষিত– وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيْطًا অর্থাৎ সকল বস্তুই আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক পরিবেষ্টিত। –[সূরা নিসা]
وَاللّٰهُ مِنْ وَّرَائِهِمْ مُّحِيْطٌ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাদের পেছন হতে বেষ্টনকারী। –[সূরা বুরূজ]

উপরিউক্ত প্রমাণ হতে দুটি জিনিস বের হয়–

১. জগতের কারো দৃষ্টি বরং সবার দৃষ্টি একত্র হয়ে আল্লাহকে পরিবেষ্টন করতে পারবে না। যেমন– হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন এ পর্যন্ত পৃথিবীতে যত জিন, মানুষ, ফেরেশতা, শয়তান ও জীব জন্ম লাভ করেছে এবং করবে, সকলে যদি এক সারিতে দাঁড়িয়ে আল্লাহর দিকে দৃষ্টি দেয়। তারপরও আল্লাহর সত্তাকে পরিবেষ্টন করা অসম্ভব। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এসবকে পরিবেষ্টন করা অসম্ভবের কিছু নয়।

   এ গুণটি শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য। নতুবা তিনি সৃষ্টি জীবকে এমন দৃষ্টি শক্তি দান করেছেন যে, তারা পৃথিবীর বুকে বসে বিশাল বিশাল গ্রহ-নক্ষত্র দেখতে সক্ষম। যা পৃথিবী হতে বহুগুণে বড়।

২. তাঁর দৃষ্টি সমগ্র সৃষ্টি জগতকে পরিবেষ্টনকারী। এ জগতের ক্ষুদ্রতম বস্তুও তাঁর জ্ঞানের বাইরে নয়। তাঁকে ছাড়া আর কারো গুণ অর্জিত হয়নি হবেও না। কারণ এটি তাঁর বিশেষ গুণ।

* বান্দা কর্মের কর্তা নয়, আল্লাহ কল্পনার ঊর্ধ্বে, এর হুকুম : এক্ষেত্রে পরিপূর্ণ ঈমান রাখা মু'মিনের দায়িত্ব ও ফরজ। এতে কোনো সন্দেহ করা কুফরির নামান্তর।

আল্লাহ তা'আলা অসাদৃশ্য, চিরস্থায়ী, চিরঞ্জীব ও স্রষ্টা

وَلَا يُشْبِهُهُ الْاَنَامُ حَيٌّ لَا يَمُوْتُ قَيُّوْمٌ لَا يَنَامُ . خَالِقٌ بِلَا حَاجَةٍ.

অনুবাদ : সৃষ্টিজীব তাঁর সাথে সাদৃশ্য রাখে না। আল্লাহ তা'আলা চিরঞ্জীব, কখনো তাঁর মৃত্যু হবে না। তিনি চিরস্থায়ী ধারক [সমগ্র বিশ্বের অন্য সকল বস্তুকে স্থায়িত্ব দানকারী] তিনি কখনো ঘুমান না। তিনি তাঁর নিজ প্রয়োজন ব্যতীত সৃষ্টিকারী।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَا يُشْبِهُهُ الخ : আল্লাহর সাথে কোনো সৃষ্টির সাদৃশ্য নেই। আর তা হতেও পারে না। যদিও সৃষ্টির গুণাবলির মধ্যে জ্ঞান, দর্শন, শ্রবণ, ক্ষমতা, অস্তিত্ব এবং স্মৃতি শক্তি বিদ্যমান রয়েছে। তথাপি আল্লাহর জ্ঞান, শ্রবণ, ক্ষমতা, অস্তিত্ব, স্মৃতি শক্তি এবং ইলম মাখলুকের তথা সৃষ্টির মতো নয়। কেননা আল্লাহ তা'আলার গুণাবলি সর্বকাল, সর্বাবস্থায় চিরন্তন, চিরস্থায়ী, অনন্ত ও অনাদি। কোনো দিন তা বিনষ্ট হবে না, ধ্বংস হবে না, ক্ষয় হবে না, এমনকি কমবেও না। চিরকাল তাঁর জন্য এসব গুণাবলি নির্ধারিত এবং তা অসীম ও অসীমিত। এ সব গুণাবলি সৃষ্টিকে বেষ্টন করে নিয়েছে। কখনো এই বেষ্টন অবিরাজমান হবে না। পক্ষান্তরে সৃষ্টির গুণাবলি অনাদি, চিরস্থায়ী নয়। কিছুদিন পরেই তা বিনষ্ট হয়ে যায়, ধ্বংস হয়ে যায়, ক্ষয় হয়ে যায়। আর সৃষ্টির এসব গুণাবলি সর্বত্র বিরাজমান নয়; বরং তা সীমিত ও সসীম। আর অসীমিত ও অসীমের সাথে সীমিত ও সসীমের তুলনা করা চলে না। এমনকি তুলনার কল্পনাও চলে না।

وَلَا يُشْبِهُهُ الْاَنْعَامُ বলে فِرْقَةٌ مُشَبِّهَةٌ দের অভিমত রদ করা হয়েছে। তারা আল্লাহ তা'আলাকে মাখলুক তথা সৃষ্ট জীবের সাথে তুলনা করে। অথচ আল্লাহ বলেন, কোনো বস্তুই তাঁর সাথে সাদৃশ্য রাখে না এবং তিনি [আল্লাহ] প্রতিটি কথা শ্রবণ করেন প্রতিটি বস্তুর দ্রষ্টা।

আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত এর নিকট نَفْيُ تَشَبُّهٌ দ্বারা نَفْيُ صِفَاتٌ উদ্দেশ্য নয়। যেমন সিফাত অস্বীকারকারী সম্প্রদায় জাহমিয়াহ, মু'তাজিলা এবং রাফেজী আল্লাহর সিফাতকেই অস্বীকার করে বসে।

হযরত ইমাম আবূ হানীফা (র.) যথার্থই বলেছেন- وَلَا يَشْبَهُ شَيْئًا مِنْ خَلْقِهٖ وَلَا يُشْبِهُهٗ شَيْءٌ مِنْ خَلْقِهٖ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذٰلِكَ صِفَاتُهٗ كُلُّهَا خِلَافُ صِفَاتِ الْمَخْلُوْقِيْنَ يَعْلَمُ لَا كَعِلْمِنَا وَيَقْدِرُ لَا كَقُدْرَتِنَا وَيَرٰى لَا كَرُؤْيَتِنَا অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাঁর কোনো সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্যশীল নন এবং কোনো সৃষ্টিও তাঁর সাথে সাদৃশ্য রাখে না। অতঃপর তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলার সমস্ত গুণাবলি সৃষ্টির গুণাবলির সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি জানেন। তবে তা আমাদের জানার মতো নয় এবং তিনি শক্তিশালী। কিন্তু আমাদের শক্তির ন্যায় নয়। তিনি দেখেন, আমাদের দেখার মতো নয়। [আল ফিকহুল আকবার] হযরত নুয়াঈম ইবনে হাম্মাদ বলেন, যে আল্লাহকে তাঁর কোনো সৃষ্টির সাথে তুলনা দেয় সে কুফরি করে। আর যে তাঁর কোনো সিফাতকে অস্বীকার করে যে সিফাত স্বয়ং আল্লাহই নিজের ব্যাপারে বর্ণনা করেছেন তাহলে সেও কুফরি করে। ইমাম ইসহাক ইবনে রাহওয়াই (র.)

বলেন, যে আল্লাহর কোনো সিফাত বর্ণনা করল। অতঃপর এই সিফাতকে কোনো সৃষ্টির সিফাতের সাথে তুলনা করল তাহলে সে কুফরি করল।

মোটকথা অস্তিত্ব, শক্তি, শোনা ও দেখা ইত্যাদি গুণাবলি যদিও সৃষ্টি জীবের মধ্যে বিদ্যমান কিন্তু আল্লাহর এসব গুণাবলি সৃষ্টির গুণাবলির মতো সাময়িক, সসীম ও সীমিত নয়।

আল্লাহ তা'আলা নিজেই বলেন- لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ অর্থাৎ কোনো বস্তুই তাঁর মতো নয়। -[সূরা শুরা] অন্য আয়াতে বলেন- وَلِلّٰهِ الْمَثَلُ الْاَعْلٰى وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার জন্যই সর্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। আর তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

উপরিউক্ত প্রমাণ দ্বারা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হলো যে, আল্লাহ তা'আলা দৃষ্টান্তের ঊর্ধ্বে। এ হিসেবে মুশাব্বিহ সম্প্রদায়-এর আকিদা, বিশ্বাস ও মতবাদ ভ্রান্ত বলে আখ্যায়িত হয়। অতএব মুশাব্বিহদের ইসলামে কোনো স্থান নেই।

قَوْلُهُ حَيٌّ لَا يَمُوْتُ : সৃষ্ট জীবের মধ্যে যেমনিভাবে গুণাবলি রয়েছে। অনুরূপভাবে তার ধ্বংসও রয়েছে। যেমন- সৃষ্ট জীব ক্ষণিকের জন্য বেঁচে থাকে। আবার চিরকালের জন্য মৃত্যুবরণও করে। কারণ তারা আল্লাহর সৃজিত বস্তুমাত্র। কিন্তু আল্লাহ পাক যেহেতু সৃষ্টজীবের সমস্ত গুণাবলি হতে একেবারেই পবিত্র। সেহেতু তিনি চিরঞ্জীব। তাঁর মৃত্যু নেই। তিনি কখনো মৃত্যুবরণ করবেন না। তিনি নিজেই বলেন- اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ অর্থাৎ আল্লাহ তিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। তিনি চিরঞ্জীব ধারক। -[সূরা আলে ইমরান]

অপর আয়াতে নবী করীম ﷺ কে সম্বোধন করে মহান আল্লাহ বলেন- وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِيْ لَا يَمُوْتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهٖ অর্থাৎ হে নবী! আপনি ভরসা করুন চিরঞ্জীব সত্তার উপর যিনি মৃত্যুবরণ করবেন না এবং তাঁর তাসবীহ পাঠ করুন প্রশংসা বা স্তুতিজ্ঞাপনের মাধ্যমে। -[সূরা ফুরকান]

গ্রন্থকার ইমাম ত্বহাবী (র.) উপরে উল্লিখিত উদাহরণের মাধ্যমে স্রষ্টা এবং সৃষ্টজীবের মধ্যে تَشَبُّهٌ তথা সাদৃশ্যকে নাকচ করে দিয়েছেন। সামনে যতগুলো صِفَاتٌ বর্ণনা করা হবে তার সবই আল্লাহ তা'আলার সাথেই নির্দিষ্ট। সৃষ্টজীব এর সাথে সম্পৃক্ত না। যেন স্রষ্টা এবং সৃষ্টির মধ্যে স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন পার্থক্য সূচিত হয়ে যায়।

উপরিউক্ত আয়াতে আল্লাহ পাকের একক অস্তিত্ব তাওহীদ ও গুণাবলির এক অনুপম বর্ণনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। যা আল্লাহ তা'আলার গুণবাচক নামের অন্তর্ভুক্ত। যা ব্যবহার করে তিনি বুঝিয়েছেন যে, তিনি সর্বদা জীবিত থাকবেন। মৃত্যু তাকে কখনো স্পর্শ করবে না। অবশ্য বাকি সব সৃষ্টিজীব মৃত্যুবরণ করবে।

قَوْلُهُ قَيُّوْمٌ لَا يَنَامُ : অর্থাৎ আল্লাহ পাক সমস্ত জিনিসের ধারক। যাকে কখনো ঘুম বা তন্দ্রা স্পর্শ করে না। قَيُّوْمٌ শব্দটি আল্লাহ তা'আলার একটি গুণবাচক নাম। কেননা হযরত আলী (রা.) বলেন, বদরের ময়দানে যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে আমি ইচ্ছা করলাম নবী করীম ﷺ -এর সাথে দেখা করবো। দেখবো যে, তিনি কি করছেন? আমি কাছে গিয়ে দেখি তিনি সেজদায় পড়ে يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ জপতেছেন। এতে বুঝা যায় قَيُّوْمٌ শব্দটি আল্লাহ তা'আলার গুণবাচক নাম। ইসমে আজম।

আল্লাহ তা'আলা হলেন ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলের ধারক। এমনকি "প্রকৃতি"ও তাঁর নিয়ন্ত্রণের বাইরে নয়। এসব নিয়ন্ত্রণের জন্য তাঁকে কারো সাহায্যের প্রয়োজন হয় না। সুতরাং قَيُّوْمٌ শব্দটি তাঁর নাম হওয়াটাই যথার্থ। এ কারণে সৃষ্ট জীবের কাউকে قَيُّوْمٌ বলা কুফরি। কারণ

সে নিজেই অপরের তথা আল্লাহ তা'আলার নিয়ন্ত্রণে থেকে যায়। তাহলে সে قَيُّوْمٌ হয় কি ভাবে? যেহেতু আল্লাহ তা'আলা বিশ্ব চরাচরের ধারক। তিনিই সব নিয়ন্ত্রণে রাখেন। সেহেতু মানুষের মনে ধারণা জাগতে পারে আল্লাহ তা'আলা সব নিয়ন্ত্রণে রাখার ফলে কোনো সময়ই কি ক্লান্তি আসে না? যার ফলে তাঁকে নিদ্রা আচ্ছন্ন করে। যেমনটি হয়ে থাকে মানুষের বেলায়। এর জবাবে আল্লাহ তা'আলা বলেন- اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই। তিনি জীবিত, ধারক, তাঁকে তন্দ্রা ও নিদ্রা স্পর্শ করে না। -[সূরা আলে-ইমরান]

নবী ﷺ বলেছেন, নিদ্রা মৃত্যুর ভাইয়ের তুল্য। অথচ আল্লাহ তা'আলা হলেন চিরঞ্জীব। যার কোনো মৃত্যু নেই। সুতরাং তাঁর নিদ্রা না থাকাটাই স্বাভাবিক। কারণ নিদ্রা হলো মৃত্যুর সমগোষ্ঠী। এজন্যই আল্লাহ তা'আলা لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ বলে আপন সত্তাকে তন্দ্রা নামক দোষ থেকেও পবিত্র ঘোষণা করেছেন।

قَوْلُهٗ خَالِقٌ بِلَا حَاجَةٍ : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সমস্ত সৃষ্টির স্রষ্টা। এতে তাঁর কোনো প্রকার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, ভূ-পৃষ্ঠে মানুষ হরেক রকম জিনিস তৈরি করে। এতে তার প্রয়োজন থাকে। কিন্তু আল্লাহর ক্ষেত্রে বিপরীত।

* خَلْقٌ শব্দের অর্থ হলো অস্তিত্ব দান করা, সৃজন করা যা একমাত্র আল্লাহরই গুণ। এতে অন্য কোনো বস্তুর শরিক নেই বা শরিক থাকার প্রয়োজন নেই। কারণ মানুষ কোনো কিছু তৈরি করলে অন্য কিছুর মুখাপেক্ষী হয়। যেমন ঘর বানালে কাঠ, টিন ইত্যাদির মুখাপেক্ষী হয়। আলমারি বানালে লোহা বা স্টীলের মুখাপেক্ষী হয়। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা কোনো কিছু সৃজন করতে চাইলে কোনো কিছুরই মুখাপেক্ষী হন না। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন- فَاِذَا قَضٰٓى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ এবং اِنَّمَآ اَمْرُهٗٓ اِذَآ اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ অর্থ- যখন তিনি কোনো বস্তুর ইচ্ছা করেন তখন শুধু বলেন, হয়ে যাও। তখন তা হয়ে যায়। -[সূরা ইয়াসীন]

এখানে একটি প্রশ্ন হতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলা কোনো কিছু সৃষ্টি করার জন্য كُنْ শব্দ বলে থাকেন। অতএব তিনি কোনো বস্তু সৃজনের জন্য كُنْ শব্দের মুখাপেক্ষী। এই প্রশ্নের জবাবে আমরা বলবো, আল্লাহ তা'আলা كُنْ শব্দ বলে শুধু সৃজনের ইচ্ছা বা উদ্দেশ্য প্রকাশ করেন। আর কোনো বস্তুর ইচ্ছা করলেই তার মুখাপেক্ষী হওয়া সাব্যস্ত হয় না। অতএব আল্লাহ তা'আলা كُنْ বলে ইচ্ছা প্রকাশের কারণে তার প্রতি মুখাপেক্ষী হন একথা বলা সঠিক হয় না। (مَعَاذَ اللّٰهِ)। অতএব এখানে আর প্রশ্ন থাকে না।

উপরিউক্ত বর্ণনা দ্বারা প্রমাণ হয় যে, আল্লাহ তা'আলা বিশ্বচরাচরের সৃষ্টিকারী। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন- خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের আকৃতি দান করেছেন। অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন- اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সমস্ত বস্তুর সৃষ্টিকারী। -[সূরা যুমার]

সুতরাং সকল বস্তুর সৃষ্টিকর্তা একমাত্র আল্লাহই অন্য কেউ নয়। কেননা সৃষ্টি করা একটি সত্তাগত বৈশিষ্ট্য। আর সৃষ্টি বলা হয় অস্তিত্ব দান করাকে যা একমাত্র সম্ভব ঐ সত্তার জন্য যার রয়েছে, সত্তাগত অস্তিত্ব দানের বৈশিষ্ট্য। অথচ সৃষ্টজীবের সত্তাগত অস্তিত্ব দানের বৈশিষ্ট্য নেই। সুতরাং সৃষ্টজীব অনস্তিত্ব বস্তুর অস্তিত্ব কোত্থেকে দিবে?

* অস্তিত্বহীন বস্তুকে অস্তিত্বে আনার ক্ষমতা যে কেবলই মাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্যই সংরক্ষিত। এই দাবিকে অটুট রাখার জন্য চ্যালেঞ্জ করে আল্লাহ তা'আলা বলেন- هٰذَا خَلْقُ اللّٰهِ فَاَرُوْنِىْ مَاذَا خَلَقَ الَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ অর্থাৎ এগুলো আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি। সুতরাং [তোমরা যদি অন্য কাউকে তাঁর শরিক মনে করো] তাহলে আমাকে দেখাও তিনি ছাড়া [তোমরা যাদেরকে মাবুদ মনে করো] তারা কি কি সৃষ্টি করেছে? -[সূরা লোকমান]
* অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন- اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَّنْ يَّفْعَلُ مِنْ ذٰلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ سُبْحَانَهٗ অর্থাৎ আল্লাহ যিনি তোমাদেরকে সৃজন করেছেন। অতঃপর তোমাদেরকে রিজিক দান করেছেন। অতঃপর মৃত্যু দিয়েছেন। অতঃপর জীবন দান করেছেন। তোমাদের শরিকরা এগুলোর কোনো একটি করতে পারবে কি? -[সূরা রূম]
* অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা নবী করীম ﷺ কে প্রথম ওহী পেশ করে বলেন- اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ - خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ অর্থাৎ আপনি নিজ প্রভুর নামে পাঠ করুন, যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত হতে। -[সূরা আলাক]

এই আয়াতে মানুষকে সম্পূর্ণ অনস্তিত্ব হতে অস্তিত্ব দানের কথা বলা হয়েছে।

* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন- اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যিনি তোমাদেরকে মাটি হতে, অতঃপর শুক্রবিন্দু হতে সৃজন করেছেন। -[সূরা ফাতির]

এই আয়াতেও সম্পূর্ণ অনস্তিত্ব হতে মানুষকে অস্তিত্ব দানের কথা বলা হয়েছে।

* অপর আয়াতে বলেন- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ অর্থাৎ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন। -[সূরা ফাতির]
* নবী ﷺ কে সম্বোধন করে আল্লাহ তা'আলা বলেন- وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ অর্থাৎ হে নবী! আপনি যদি তাদেরকে [কাফেরদেরকে] জিজ্ঞাসা করেন। আসমান ও জমিন কে সৃষ্টি করেছেন? এবং সূর্য ও চন্দ্রকে কে চালান? তাহলে অবশ্যই তারা বলবে আল্লাহ। -[সূরা আনকাবূত]

  উপরিউক্ত আয়াত দ্বারা বুঝা যায়, আল্লাহ তা'আলাই একমাত্র স্রষ্টার গুণে গুণান্বিত সত্তা। অন্য কেউ নয়। আর এটাও বুঝা যায়, মক্কার রুঢ়পন্থি মুশরিকরা পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলাকে একমাত্র স্রষ্টা হিসেবে জানতো এবং মানতো। তাহলে তো একজন প্রকৃত মুসলমান আল্লাহকে স্রষ্টা হিসেবে না মানার প্রশ্নই উঠে না।
* কথিত আছে যে, হযরত ইমাম আবূ হানীফা (র.) এক নাস্তিকের প্রতিবাদ করার জন্য তর্কানুষ্ঠানের আয়োজন করেন। কারণ নাস্তিক বলেছিল, আল্লাহ তথা স্রষ্টা বলতে কেউ নেই। পৃথিবী এবং পৃথিবীর অন্যান্য বস্তুসমূহ এমনিতেই সৃষ্টি হয়েছে। আবার স্বয়ংক্রিয় ভাবেই ধ্বংস হয়ে যাবে। ইমাম আজম (র.) তর্কানুষ্ঠানের নির্ধারিত সময়ে সেখানে উপস্থিত হলেন না; বরং কিছুক্ষণ বিলম্ব করে অনুষ্ঠানে উপস্থিত হলেন। নাস্তিক বলল, আপনি নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হলেন না কেন? প্রতি উত্তরে তিনি বলেন, নদীর তীরে এসে নৌকা না পাওয়ায় অপেক্ষা করতে লাগলাম। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর দেখলাম পানি দিয়ে একটি গাছ ভেসে আসছে। অতঃপর তা নিজেই চিরে নৌকা হলো এবং আমাকে নদী পার করে দিল। তাই আমার নির্ধারিত সময়ে আসতে বিলম্ব হলো। নাস্তিক

রেগে গিয়ে বলল, এটা কি করে সম্ভব যে, গাছ নিজে নিজেই কাঠ হয়ে নৌকা হলো। অতঃপর মাঝি ছাড়াই আবার আপনাকে নদী পাড় করে দিল। আপনি প্রকৃতপক্ষে পাগল হননি তো? সাথে সাথেই আবূ হানীফা (র.) বলে উঠলেন, যদি পানি দিয়ে গাছ ভেসে এসে নিজে নিজে কাঠ হয়ে নৌকা হওয়া এবং আমাকে মাঝি ছাড়া পাড় করে দেওয়া অসম্ভব হয়। তাহলে বলুন, কিভাবে পৃথিবী কেউ সৃষ্টি করা ব্যতীত এমনি হয়েছে। আবার তা এমনিই ধ্বংস হয়ে যাবে? নিশ্চয়ই পৃথিবীর একজন সৃষ্টিকর্তা রয়েছে। আর তিনি হলেন, আল্লাহ। অবশ্যই তিনি আসমান, জমিন সৃষ্টি করেছেন।

একটি প্রশ্ন ও তার জবাব :

প্রশ্ন : হতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ অর্থাৎ মানব ও জিন জাতিকে সৃষ্টি করেছি একমাত্র আমার ইবাদতের জন্য। –[সূরা জারিয়াত]

এতে বুঝা যায়, আল্লাহ তা'আলার মানব ও জিন জাতির ইবাদত পাওয়াও প্রয়োজন এবং তিনি ইবাদতের প্রতি মুখাপেক্ষী। অতএব ইমাম ত্বহাবী (র.)-এর উক্তি خَالِقٌ بِلَا حَاجَةٍ যথার্থ হয়নি।

জবাব : আল্লাহ তা'আলা সৃজিত কোনো বস্তুর প্রতিই মুহতাজ বা মুখাপেক্ষী নন, মানব ও জিন জাতির ইবাদত ইত্যাদিরও মুখাপেক্ষী তিনি নন। কিন্তু তিনি উপরিউক্ত আয়াতে "মানব ও জিন জাতিকে আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি" কথাটি কয়েকটি কারণে বলতে পারেন।

১. মানব ও জিন জাতির কল্যাণার্থে বলেছেন। ইবাদাতের মুখাপেক্ষী হয়ে নন।
২. মানব ও জিন জাতিকে সতর্ক করণার্থে। যাতে করে তারা পাপাচারে লিপ্ত হয়ে জাহান্নামি না হয়।
৩. মানব ও জিন জাতিকে ইবাদতের প্রতি আগ্রহ বাড়ানোর জন্য বলেছেন। যাতে তারা পাপাচার বর্জন করে ইবাদতের প্রতি ঝুকে।
৪. আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রাচুর্যের অভাব না থাকা সত্ত্বেও বলেছেন– وَاَقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا অর্থাৎ তোমরা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও। –[সূরা আলে ইমরান]

অথচ বান্দা সম্পূর্ণভাবে মুখাপেক্ষী। আর তিনি হলেন অমুখাপেক্ষী। তা সত্ত্বেও তিনি যেমন বান্দাদের কল্যাণার্থে এবং আমলের প্রতি উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেওয়ার জন্য কথাটি বলেছেন, অনুরূপ তিনি মানব ও জিন জাতির মঙ্গল কামনায় একথা বলেছেন।

দলিল :

* কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন– يَاَيُّهَا النَّاسُ اَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ اِلَى اللّٰهِ وَاللّٰهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ অর্থাৎ হে মানুষ সকল! তোমরা সবাই আল্লাহর প্রতি মুখাপেক্ষী। আর তিনি হলেন অমুখাপেক্ষী ও প্রসংশিত।
* অপর আয়াতে বলেন– مَا اُرِيْدُ مِنْهُمْ مِنْ رِّزْقٍ وَمَا اُرِيْدُ اَنْ يُّطْعِمُوْنِ অর্থাৎ আমি তাদের থেকে কোনো রিজিক চাই না এবং তাদের থেকে আপ্যায়নও চাই না। اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা রিজিকদাতা, শক্তিশালী ও অসীম ক্ষমতাধর। –[সূরা জারিয়াত]

মোটকথা তিনি বান্দা থেকে রিজিক ও আপ্যায়ন কিছুই চান না; বরং তিনি বান্দাকে রিজিক দান করেন। অতএব গ্রন্থকার (র.)-এর উক্তি خَالِقٌ بِلَا حَاجَةٍ যথার্থই হয়েছে।

* আল্লাহ তা'আলা চিরঞ্জীব, ধারক ও স্রষ্টা, এর হুকুম হলো তাঁকে এগুলো উপযুক্ত সত্তা মেনে নেওয়া ও বিশ্বাস করা ফরজ। বিপরীত ক্ষেত্রে কুফরি বলে গণ্য হবে।

আল্লাহ তা'আলা রিজিকদাতা, মৃত্যুদাতা ও পুণরুত্থানকারী

رَازِقٌ بِلَا مُؤْنَةٍ مُمِيتٌ بِلَا مَخَافَةٍ بَاعِثٌ بِلَا مَشَقَّةٍ.

অনুবাদ : আল্লাহ তা'আলা অক্লান্ত রিজিকদাতা। তিনি নির্ভীক মৃত্যুদানকারী। বিনা কষ্টে পুনরুত্থানকারী।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ رَازِقٌ بِلَا مُؤْنَةٍ : অর্থাৎ তিনি বিনা পরিশ্রমে রিজিকদাতা। আল্লাহ আমাদের উপর দয়া, অনুগ্রহপূর্বক রিজিক দেওয়ার মতো বিশাল দায়িত্ব নিয়েছেন। এতে তাঁর কোনো কষ্ট-ক্লেশ ও পরিশ্রমই হয় না। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন- وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا অর্থাৎ ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণকারী সকল প্রাণীর রিজিকের দায়িত্ব একমাত্র আল্লাহ তা'আলার উপর ন্যস্ত। -[সূরা হূদ]

একথা বুঝে নেওয়া দরকার যে, আল্লাহর উপর রিজিকের ন্যায় এই বিশাল দায়িত্ব কেউ চাপিয়ে দেয়নি এবং তা দেওয়ার অধিকারও রাখে না; বরং আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টজীবের উপর দয়া ও মায়া করে এই গুরু দায়িত্ব নিয়েছেন। যদি তিনি চান তবে সকলকেই রিজিক না দিয়ে মৃত্যুর কোলে নিপতিত করতে পারেন। এতে কারো কিছুই করার অধিকার নেই। অবশ্য এই কথা সত্য যে, তিনি সৃষ্টজীবের রিজিক দেওয়ার ওয়াদার ব্যতিক্রম কখনো করবেন না।

কেননা তিনি বলেন- إِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيْنِ অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা রিজিকদাতা। অধিক ক্ষমতাশালী শক্তিধর। -[সূরা জারিয়াত]

উপরিউক্ত আয়াতে তিনি ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيْنِ দ্বারা একথা বুঝিয়েছেন যে, সমস্ত প্রাণীকে রিজিক দেওয়া তাঁর জন্য একেবারেই সহজ সাধ্য ব্যাপার। এতে কোনো ধরনের কষ্ট হওয়ার কিছুই নেই বা রিজিক বণ্টনে কোনো প্রকার ত্রুটি হবে এমনটিও নয়।

কারণ কষ্ট দুর্বলতার কারণে অনুভব হয়ে থাকে। অথচ আল্লাহ তো দুর্বল নন; বরং তিনি অসীম ক্ষমতার অধিকারী ও শক্তিধর মহা সত্তা।

মহান আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেন- قُلْ أَغَيْرَ اللّٰهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ অর্থাৎ হে নবী! আপনি বলুন, আমি ঐ আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সাহায্যকারী স্থির করবো কি? যিনি আসমান জমিনের সৃষ্টিকর্তা এবং যিনি সকলকে আহার দান করেন। তাঁকে কেউ আহার দান করে না। -[সূরা আন'আম]

উপরিউক্ত আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টজীবের জন্য রিজিক দিতে পরিপূর্ণ সক্ষম। এতে তাঁর কোনো কষ্ট হয় না এবং কষ্টের প্রহর গুণতেও হয় না। কারণ তিনি হলেন শক্তিশালী এবং তাঁর মধ্যে কোনো দুর্বলতা নেই। আর যার মধ্যে দুর্বলতা নেই। তার মধ্যে ক্লান্তিও নেই এবং রিজিক বণ্টনে কোনো ত্রুটিও নেই।

قَوْلُهُ مُمِيتٌ بِلَا مَخَافَةٍ : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কোনো প্রাণীর মৃত্যু ঘটাতে কাউকে ভয় করেন না। আর সবকিছুই তাঁর হাতে। তিনিই সব কিছুর মালিক এবং তিনিই সর্বশক্তিমান

আল্লাহ, তিনিই সমগ্র বিশ্বের সবকিছুর একমাত্র স্রষ্টা। যেমন তিনি কুরআনে পাকে এ সম্পর্কে বলেন– لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ وَهُوَعَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ অর্থাৎ নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের রাজত্ব তাঁরই জন্য। তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান। তিনিই সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। –[সূরা হাদীদ]

হযরত সালেহ (আ.)-এর সম্প্রদায় যখন উষ্ট্রিকে হত্যা করলো, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের প্রতি গোস্বা হয়ে তাদেরকে ধ্বংস করলেন। এতে তিনি কাউকে ভয় করেন না বা কারো থেকে কোনো ধরনের সংশয় বোধ করেন না।

* যেমন তিনি বলেন– فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا অর্থাৎ [ছালেহ (আ.)-এর সম্প্রদায়ের পাপাচারের কারণে] তাদের প্রভু তাদেরকে আজাবে নিপতিত করলেন। ফলে তারা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লো। আর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে শাস্তি দানে ভয় করেননি। –[সূরা শামস]
* অপর আয়াতে আদ ও ছামূদ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করার উল্লেখ করে বলেন– وَاَمَّا ثَمُوْدُ فَاُهْلِكُوْا بِالطَّاغِيَةِ অর্থাৎ আর ছামূদ সম্প্রদায়কে বিকট চিৎকারের মাধ্যমে ধ্বংস করা হয়েছিল। –[সূরা হাক্কা]
* অপর আয়াতে বলেন– وَاَمَّا عَادٌ فَاُهْلِكُوْا بِرِيْحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ অর্থাৎ আর আ'দ সম্প্রদায় তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিল প্রচণ্ড ঝাঞ্ঝা বায়ুর মাধ্যমে। [ফলে সকলেই মৃত্যু প্রাপ্ত হলো]। –[সূরা হাক্কা]

মৃত্যু অস্তিত্বশীল না অস্তিত্বহীন বস্তু : মৃত্যু অস্তিত্বশীল বস্তু না অস্তিত্বহীন এ সম্পর্কে মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। ফালাসিফা Philosopher তথা দার্শনিক এবং তাদের মতানুসারীদের মতে, মৃত্যু অনস্তিত্বশীল বস্তু হওয়ার প্রবক্তা। আর আহলে হক অস্তিত্বশীল হওয়ার মতাদর্শী। এদের মতের সপক্ষে দলিল হলো خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا। যদি মৃত্যু অনস্তিত্বশীল বস্তু হতো তাহলে তাকে সৃষ্ট বস্তু বলা হতো না।

উপরিউক্ত সবকয়টি আয়াতই আল্লাহ তা'আলা নির্ভীক মৃত্যুদাতা হওয়ার উপর প্রমাণ বহন করে। মোটকথা তিনি সব কিছুর উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান ও সক্ষম হওয়াটা একথা প্রমাণ করে যে, সব প্রাণীর জীবন দান করতে ও মৃত্যু ঘটাতে তাঁর মধ্যে কোনো প্রকার ভয় ভীতির ছাপ থাকে না। কেননা ভয় ভীতি সৃষ্টি হয় কোনো কিছুর উপর পূর্ণ মালিকানা, কর্তৃত্ব কিংবা ক্ষমতা না থাকার কারণে। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা সব কিছুর উপর পূর্ণ মালিকানা, কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা রাখেন। যখন যা ইচ্ছা তাই করেন। অতএব তিনি কোনো ব্যাপারে কাউকে ভয় করার কোনো কারণ নেই।

অবশ্য একথা চির সত্য যে, আল্লাহ্ ব্যতীত আর কেউ সৃষ্টজীবের মৃত্যু বা জীবন দানের ক্ষমতা রাখে না। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলেন– لَا يَمْلِكُوْنَ مَوْتًا وَّلَا حَيٰوةً وَّلَا نُشُوْرًا অর্থাৎ ভূ-পৃষ্ঠের কেউ জীবন দান, মৃত্যু ঘটানো ও পুনরুত্থানের মালিক নয় এবং তা হতেও পারে না। –[সূরা ফুরকান]

আর তা একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর হাতেই তার একচ্ছত্র মালিকানা রয়েছে। যেমন নির্ভিক সত্তা ইরশাদ করেন– اَلَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ অর্থাৎ যিনি [আল্লাহ] মৃত্যু এবং জীবনকে সৃষ্টি করেছেন। –[সূরা মূলক]

অতএব তিনিই একমাত্র মৃত্যু ও জীবন দানকারী এবং তাঁর হাতে তৎসম্পর্কীত ক্ষমতা বিদ্যমান এবং তিনি তা কার্যকর করে থাকেন। যেমন- এতদসম্পর্কে অকুতভয় জীবন ও মৃত্যুদাতা ইরশাদ করেন- إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ অর্থাৎ নিশ্চয় আমিই জীবন দান করি এবং মৃত্যু ঘটাই। আর সকলকে আমার দিকেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে। -[সূরা কাফ]

উপরিউক্ত আয়াত দ্বারা এ কথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো যে, আল্লাহই একমাত্র জীবন ও মৃত্যুর মালিক আর তিনিই তা ঘটান। অতএব তিনি হায়াত সংকীর্ণ করতে কাকে ভয় করবেন? এবং মৃত্যু দানে তার ভয় কিসের? সুতরাং মু'মিনদের বিশ্বাস এমনই হওয়া চাই।

قَوْلُهُ بَاعِثٌ بِلَا مَشَقَّةٍ : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা অক্লান্তে পুনরুত্থানকারী। পুনরুত্থান اَلْبَعْثُ বলা হয়, মৃত্যুর পর মহা প্রলয়ের দিনের জীবনকে। অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা সকল প্রাণীর মৃত্যুর পর পুনরায় সকলকেপুনরুত্থান করবেন। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন- وَاَنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيْهَا وَاَنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ مَنْ فِى الْقُبُوْرِ অর্থাৎ আর নিশ্চয় কিয়ামত অত্যাসন্ন। এতে কোনো সন্দেহ নেই এবং নিশ্চয় সমাহিত সকলকে পুনরুজ্জীবিত করবেন। -[সূরা হজ]

অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা যারা পুনরুত্থান অস্বীকার করেন তাদের কথা রদ করে বলেন- وَقَالُوْاۤ اِنْ هِىَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوْثِيْنَ وَلَوْ تَرٰۤى اِذْ وُقِفُوْا عَلٰى رَبِّهِمْ قَالَ اَلَيْسَ هٰذَا بِالْحَقِّ قَالُوْا بَلٰى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ. অর্থাৎ তারা বলে, আমাদের এ পার্থিব জীবনই একমাত্র জীবন এবং আমরা পুনরুত্থিত হবো না। আর যদি আপনি দেখতে পেতেন ঐ অবস্থা যখন তাদেরকে তাদের প্রভূর সামনে দাঁড় করানো হবে এবং তিনি বলবেন এটা বাস্তব সত্য নয় কি? তারা বলবে নিশ্চয় সত্য। কসম আমাদের রবের। তিনি বলবেন, এখন তোমরা তোমাদের কুফরির কারণে শাস্তির স্বাদ আস্বাদন কর। -[আন'আম]

উল্লিখিত প্রমাণাদি দ্বারা বুঝা যায়, আল্লাহ তা'আলা পুনরুত্থানে পূর্ণ সক্ষম। এমনকি তিনি যে প্রাণী যে অবস্থা যে সুরত বা আকৃতি নিয়ে মৃত্যুবরণ করবে হুবহু সে অবস্থা ও আকৃতি দিয়েই পুনরুত্থান করাবেন। যার প্রমাণ হযরত রাসূল ﷺ -এর হাদীস থেকে পাওয়া যায়। এতে আল্লাহ তা'আলার কোনো প্রকার কষ্ট ক্লেশ হবে না; বরং তাঁর নিকট এ কাজটি একেবারেই সহজ। যেমন তিনি বলেন- زَعَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْاۤ اَنْ لَّنْ يُّبْعَثُوْا قُلْ بَلٰى وَرَبِّىْ لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ - وَذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ অর্থাৎ কাফেররা ধারণা করে যে, তারা কখনো পুনরুজ্জীবিত হবে না। হে নবী! আপনি বলে দিন, তারা অবশ্যই পুনরুজ্জীবিত হবে। আমার রবের শপথ! অবশ্যই তোমরা পুনরুজ্জীবিত হবে। অতঃপর তোমরা তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবিহিত হবে। আর এটা করা মহান আল্লাহর নিকট অতি সহজ। -[সূরা হাদীদ]

* অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন- وَهُوَ الَّذِىْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ অর্থাৎ তিনি এমন এক সত্তা যিনি সঠিক নিরূপণে প্রথমবার অস্তিত্ব দান করেছেন। অতঃপর দ্বিতীয়বার তাকে সৃষ্টি করবেন। আর এটা তাঁর জন্য অতি সহজ। -[সূরা রূম]

অর্থাৎ তাঁর নিকট পুনরুত্থান করা ও আমল সম্পর্কে অবিহিত করাতে কোনো প্রকার কষ্টই হবে না।

* অপর আয়াতে বলেন- مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ إِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ অর্থাৎ তোমাদের সৃষ্টি ও পুনরুত্থান তো একটি সৃষ্টি ও পুনরুত্থানের মতো। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা। -[সূরা লুকমান]

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা পুনরুত্থানে পূর্ণ সক্ষম কষ্ট ক্লেশ ব্যতিরেকেই। কেননা তিনি সব কিছু থেকেই অমুখাপেক্ষী এবং সর্বময় ক্ষমতাধর। যা তাঁর মূল সত্তাগত ভাবেই তাঁর মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। অতএব তাঁর জন্য পুনরুজ্জীবন দান করা অতি সহজ বৈ কিছু নয়।

যেমন তিনি বলেন- ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّهُ يُحْيِ الْمَوْتٰى وَاَنَّهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ অর্থাৎ এসব এ কারণে যে, আল্লাহই সত্য। আর তিনিই প্রাণহীনকে প্রাণ দান করেন এবং তিনি সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান। -[সূরা হজ] যখন আল্লাহর অসীম শক্তির কারণে দুর্বলতা ও অক্ষমতা নেতিবাচক হলো, তখন পুনরুত্থানে ক্লান্ত-ক্লেশ নেতিবাচক হয়ে যায়।

তাছাড়া اَلْبَعْثُ তথা পুনরুত্থান এর অর্থ হলো- اَلْاِعَادَةُ পুনর্গঠন করা বা পুনরাবৃত্তি করা। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন- كَمَا بَدَأْنَا اَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيْدُهُ অর্থাৎ যে ভাবে আমি প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম সেভাবেই পুনরুত্থান করবো। -[সূরা আম্বিয়া]

আর اَلْاِعَادَةُ পুনর্গঠন اَلْبَعْثُ পুনরুত্থান বা অনস্তিত্বকে অস্তিত্ব দান করা থেকে অধিক সহজ, কিয়াস ও অভ্যাসগত ভাবে। অতএব যে সত্তা কষ্ট ও ক্লান্তি ছাড়া অনস্তিত্ব বস্তুকে অস্তিত্ব দিতে পারেন তবে সেই সত্তা অবশ্যই অবর্তমান অস্তিত্ব বস্তু পুনর্গঠন করতে কষ্ট ক্লেশ ছাড়াই সক্ষম। এ কারণেই তিনি বলেন- وَهُوَ الَّذِيْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ الخ আল্লাহ তা'আলা ক্লান্তি ব্যতীতই পুনরুত্থানে সক্ষম হওয়ার বাস্তব প্রমাণ হলো, হযরত ইবরাহীম (আ.) আল্লাহকে পুনরুত্থান সম্পর্কে প্রশ্ন করেন- رَبِّ اَرِنِيْ كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتٰى قَالَ اَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلٰى وَلٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِيْ. অর্থাৎ হে আমার প্রভু! আমাকে দেখাও তুমি কিভাবে মৃতকে জীবিত কর? আল্লাহ তা'আলা বললেন, তুমি কি বিশ্বাস করো না? ইবরাহীম (আ.) বললেন, অবশ্যই আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু অন্তরের প্রশান্তির জন্য। আল্লাহ তা'আলা বললেন, তাহলে চারটি পাখি নিয়ে বশীভূত কর। অতঃপর সেগুলোর এক এক অংশ বিভিন্ন পর্বতে রাখো। তারপর তাদেরকে ডাকো। দেখবে তারা তোমার কাছে দৌড়ে চলে আসছে। জেনে রাখো! আল্লাহ তা'আলা পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়। -[সূরা বাকারা]

* উপরিউক্ত প্রমাণ দ্বারা বুঝা যায় আল্লাহ তা'আলা পুনরুত্থানে ক্লান্তিহীন হওয়ায় সক্ষম। এটাই মু'মিনের একান্ত বিশ্বাস হওয়া চাই। অন্যথায় কুফরির শামিল।

আল্লাহ তা'আলা সর্বকালে সর্বাবস্থায় সর্বগুণে গুণান্বিত

مَازَالَ بِصِفَاتِهِ قَدِيْمًا قَبْلَ خَلْقِهِ لَمْ يَزْدَدْ بِكَوْنِهِمْ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ قَبْلَهُمْ مِنْ صِفَاتِهِ وَكَمَا كَانَ بِصِفَاتِهِ اَزَلِيًّا كَذَالِكَ لَا يَزَالُ عَلَيْهَا اَبَدِيًّا.

অনুবাদ : আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির পূর্ব থেকেই স্বীয় গুণাবলি নিয়ে শাশ্বত সত্তা তথা قَدِيْم হিসেবে বিদ্যমান রয়েছেন। সৃষ্টি কারণে এমন কোনো গুণ বেড়ে যায়নি, যা মাখলূক সৃষ্টি করার পূর্বে ছিল না। তিনি নিজ গুণাবলি নিয়ে যেমন অনাদি ছিলেন, তেমন তিনি নিজ গুণাবলিসহ অনন্ত, চিরন্তন ও চিরঞ্জীব থাকবেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ مَا زَالَ بِصِفَاتِهِ : অর্থাৎ মাখলুক সৃজিত হওয়ার পর আল্লাহ তা'আলার যে সমস্ত গুণাবলি প্রকাশ পেয়েছে। মাখলুক সৃষ্টি হওয়ার পূর্বে অনাদিকাল থেকেই তিনি সে সব গুণে গুণান্বিত ছিলেন এবং মাখলুক ধ্বংস হয়ে গেলেও তাঁর সে সব গুণাবলি বৃদ্ধি পাবে না এবং হ্রাসও পাবে না। তিনি অনাদিকাল থেকে সে সব গুণে বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত ছিলেন এবং অনন্তকাল থাকবেন।

আল্লাহ তা'আলার গুণাবলি দুই প্রকার। যথা– ১. صِفَاتُ ذَاتْ তথা সত্তাগত গুণাবলি, ২. صِفَاتُ فِعْل তথা কর্মগত গুণাবলি صِفَاتُ ذَاتْ যেমন– হায়াত, কুদরত, ইলম, কালাম, শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও ইচ্ছাশক্তি ইত্যাদি। এগুলো সকলের ঐকমত্যে صِفَاتُ فِعْل، قَدِيْم যেমন– সৃষ্টি করা, রিজিক দেওয়া, জীবনদান এবং মৃত্যুদান ইত্যাদি। এগুলো সিফাতে ফে'ল। মাতুরিদিয়া সম্প্রদায়ের নিকট صِفَاتُ فِعْل টিও قَدِيْم এবং আশারিয়াদের নিকট হাদেস। মু'তাজিলার নিকট صِفَاتُ فِعْل হ্যাঁ বাচক ও না বাচক উভয়টার মধ্যে সংযুক্ত। যেমন– خَلَقَ اللّٰهُ لِفُلَانٍ وَلَدًا وَلَمْ يَخْلُقِ اللّٰهُ لِفُلَانٍ وَلَدًا

সিফাত কি عَيْنِ ذَاتْ না غَيْرُ ذَاتْ :

ফালাসিফা তথা দার্শনিকদের নিকট আল্লাহ তা'আলার গুণ হলো صِفَاتُ ذَاتْ আর মু'তাজিলাদের নিকট غَيْرُ ذَاتْ আর কাররামিয়াদের নিকট صِفَاتُ بَارِئِ تَعَالٰى গুলো حَادِثْ ; তবে নিঃসন্দেহে সৃষ্ট জীবের সিফাত সকলের কাছেই ذَاتَ خَالِقْ এর বিপরীত। আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের নিকট আল্লাহ তা'আলার সিফাত عَيْنِ ذَاتْ ও না غَيْرُ ذَاتْ না। কেননা عَيْنِ ذَاتْ মানার দ্বারা قَدِيْم হওয়া আবশ্যক হয় আর غَيْرُ ذَاتْ মানার দ্বারা حَادِثْ হওয়া আবশ্যক হয়। আর এই দুই অবস্থার উভয়টাই বাতেল।

* কেননা আল্লাহ তো ঐ সত্তাকে বলা হয়, যার মধ্যে সিফাতে কামালিয়া তথা পরিপূর্ণ গুণাবলি বা আসমায়ে হুসনার সমাগম ঘটেছে। যেমন– আল্লাহ তা'আলা বলেন– هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ. অর্থাৎ তিনিই আল্লাহ যিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। তিনিই অধিপতি পবিত্র। শান্তিদাতা, নিরাপত্তা দাতা, রক্ষাকারী, পরাক্রমশালী, প্রবল প্রতাপান্বিত। অতীব মহামান্বিত। তারা যে শরিক করে তা হতে তিনি পবিত্র ও মহান।

তিনিই আল্লাহ, সৃষ্টিকর্তা, উদ্ভাবনকারী, রূপদাতা। তাঁর জন্য রয়েছে আসমায়ে হুসনা তথা সুন্দর সুন্দর নাম। [হাশর] সুতরাং যখনই আল্লাহ নাম উচ্চারিত হবে, তখনই আল্লাহর সত্তা ও তাঁর সমস্ত সিফাতে কামালিয়া উদ্দেশ্য হবে। এ কারণেই কুরআনুল কারীম ও হাদীসের পরিভাষায় 'আল্লাহ' শব্দ দ্বারা তাঁর পবিত্র সত্তা ও তাঁর সমস্ত সিফাতে কামালিয়াই বুঝানো

উদ্দেশ্য হয়। সিফাতে কামালিয়া বাদ দিয়ে শুধু সত্তা কিংবা সত্তা বাদ দিয়ে শুধু সিফাতে কামালিয়া উদ্দেশ্য হয় না। [কারণ এমনটি করা কোনোক্রমেই বৈধ নয়]

উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, আল্লাহ তা'আলার সমস্ত সিফাত ও আসমায়ে হুসনা তাঁর জন্য অনাদি ও সত্তাগত। নব আবিষ্কৃত বা নবাগত নয়। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার সিফাতে কামালিয়া তাঁর সত্তা থেকে ক্ষণিকের জন্য পৃথক হতে পারে না। আর তা সম্ভবও নয়; বরং সর্বাবস্থায়ই তাঁর সত্তার সাথে মিলিত ও সংযুক্ত থাকা আবশ্যক। আবার একথাও প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহর সত্তা যেমন অনাদি তাঁর সিফাতে কামালিয়াও তেমন অনাদি। তাঁর সত্তা যেমন চিরন্তন, সিফাতে কামালিয়াও তেমন চিরন্তন। অতএব প্রকৃত মু'মিনরা এমনই আকিদা রাখে। এর বিপরীত কুফরির নামান্তর।

قَوْلُهُ لَمْ يَزْدَدْ بِكَوْنِهِمْ الخ : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সৃষ্ট জীবের সৃজনের পর তাদের খাবার দাবার, বাসস্থান, বস্ত্র, দুঃখ-কষ্ট, শান্তি, জীবন মরণ ইত্যাদির ব্যবস্থা করার কারণে তাঁর সত্তার কোনো গুণ বেড়ে যায়নি কিংবা কমেও যায় নি এবং তিনি মাখলুককে ধ্বংস করার কারণে কিংবা কিয়ামত সংঘটিত করার ফলে তাঁর কোনো গুণ বাড়েনি বাড়বেও না কিংবা হ্রাস পায়নি, পাবেও না; বরং তাঁর সত্তার সমস্ত সিফাত অনাদি ও অনন্ত। অতীতে যে গুণ ছিল, চিরকাল সে গুণ নিয়েই থাকবেন।

* কেননা তিনি বলেন- اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيْلٌ لَهُ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ অর্থাৎ আল্লাহই সব কিছুর স্রষ্টা এবং তিনিই সব কিছুর তত্ত্বাবধানকারী। আসমান ও জমিনের কুঞ্জি তাঁরই অধিকারে রয়েছে। -[সূরা যুমার]

  অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিজগত সৃজন করার আগেও স্রষ্টা ছিলেন এবং পরেও স্রষ্টার গুণে গুণান্বিত। প্রশ্ন হতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির পূর্বে ও পরে কিভাবে স্রষ্টার গুণে গুণান্বিত ছিলেন?

* জবাবে বলব যে, তিনি সৃষ্টি জগৎ সৃজন করার পূর্বে নিজ শক্তি, ইচ্ছানুযায়ী সৃষ্টি করতে সক্ষম ছিলেন। যার ফলে তিনি স্রষ্টা।

* তিনি যখন জগৎ সৃষ্টি করেছেন, তখন তিনি নিজ ইচ্ছানুযায়ী সৃষ্টি করেছেন, যার ফলে তিনি তখনও স্রষ্টা।

* আর তিনি সৃষ্টি জগৎ সৃজন করার পর স্রষ্টা এ কারণে যে, সৃষ্টি করাটা তাঁর সত্তাগত সিফাতে কামালিয়ার একটি গুণ। যা কখনো তাঁর সত্তা হতে পৃথক হওয়া একেবারেই অসম্ভব। অতএব তিনি সৃষ্টিজগৎ সৃজন করার পরও স্রষ্টা। এভাবেই তাঁর সমস্ত সিফাতে কামালিয়া সমস্ত বস্তুর সাথে ফিট তথা খাপ খাবে, চাই উক্ত বস্তু অস্তিত্বে থাকুক বা না থাকুক। অবশ্য তাঁর সিফাতে কামালিয়া অনস্তিত্ব বস্তুর সাথে ফিট খাবে এভাবে যে, তিনি উক্ত অনস্তিত্ব বস্তুর অস্তিত্ব দানে, জীবন দানে ও মৃত্যু ঘটাতে পূর্ণ সক্ষম।

আর অস্তিত্বশীল সৃষ্টির সাথে ফিট খাবে এই ভাবে যে, তিনি যাকে ইচ্ছা মৃত্যু দিবেন। যাকে ইচ্ছা জীবন দান করবেন, যাকে ইচ্ছা লালন পালন করবেন এবং যাকে ইচ্ছা ধ্বংস করবেন।

একটি প্রশ্ন হয় যে, পূর্বে বলা হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিজগতের পূর্বে নিজ সিফাতে কামালিয়ার গুণে গুণান্বিত ছিলেন। এর অর্থ কি?

জবাবে আমরা বলবো যে, সৃষ্টিজগৎ সৃজনের পূর্বে আল্লাহ তা'আলা নিজ সিফাতে কামালিয়া যেমন رَبّ প্রতিপালক, خَالِق সৃষ্টিকর্তা, رَزَّاق রিজিকদাতা, غَفَّار ক্ষমাকারী, رَحِيْم দয়াবান ইত্যাদি গুণে গুণান্বিত হওয়ার অর্থ হলো, তিনি এসব গুণের ক্ষমতা সর্বদা রাখেন এবং তখনও ছিল। এতে তাঁর কোনো গুণে কমতি ছিল না।

মোটকথা তিনি মাখলুক সৃজনের পূর্বে যে গুণে গুণান্বিত ছিলেন। মাখলুক সৃজনের পরও ঐ সব গুণ তাদের সামনে প্রকাশিত ও প্রমাণিত হয়।

অতএব তিনি অনাদিকাল নিজ গুণাবলি নিয়ে বিদ্যমান ছিলেন এবং অনন্তকাল তা নিয়ে থাকবেন। মু'মিনের আকিদা এমনই হওয়া উচিত।

আল্লাহ তা'আলা অনাদি ও অনন্তকাল স্রষ্টা

لَيْسَ مُنْذُ خَلَقَ الْخَلْقَ اِسْتَفَادَ اِسْمَ الْخَالِقِ وَلَا بِاِحْدَاثِهِ الْبَرِيَّةَ اِسْتَفَادَ اِسْمَ الْبَارِي لَهُ مَعْنَى الرُّبُوْبِيَّةِ وَلَا مَرْبُوْبَ وَمَعْنَى الْخَالِقِيَّةِ وَلَا مَخْلُوْقَ ـ وَكَمَا اَنَّهُ مُحْيِ الْمَوْتٰى بَعْدَ مَا اَحْيٰ اِسْتَحَقَّ هٰذَا الْاِسْمَ قَبْلَ اِحْيَائِهِمْ كَذَالِكَ اِسْتَحَقَّ اِسْمَ الْخَالِقِ قَبْلَ اِنْشَائِهِمْ ذَالِكَ بِاَنَّهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ـ وَكُلُّ شَيْءٍ اِلَيْهِ فَقِيْرٌ ـ وَكُلُّ اَمْرٍ عَلَيْهِ يَسِيْرٌ لَا يَحْتَاجُ اِلٰى شَيْءٍ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ـ

অনুবাদ : মাখলুক সৃজন করার পর হতে তিনি নিজ গুণবাচক নাম خَالِق তথা স্রষ্টা অর্জন করেননি। এবং এ বিশ্ব জাহান সৃষ্টি করার ফলে নিজ গুণবাচক নাম بَارِئ তথা নব আবিষ্কার পাননি। প্রতিপাল্য ও মাখলুক ছাড়া তাঁর মধ্যে প্রতিপালন এবং স্রষ্টার গুণ বর্তমান রয়েছে। আর তিনি মৃতকে জীবন দান করার কারণে যেমন জীবন দানকারী গুণে গুণান্বিত ঠিক তেমনি কোনো মৃতকে জীবন দান করার পূর্বেও তিনি এ নামে তথা জীবন দানকারী গুণে গুণান্বিত ছিলেন। অনুরূপভাবে তিনি মাখলুক সৃষ্টি করার পূর্বেও خَالِق তথা স্রষ্টা গুণের অধিকারী ছিলেন। [অর্থাৎ মাখলুক সৃষ্টির পূর্বে অনাদিকাল থেকে তাঁর গুণাবলি সাব্যস্ত থাকাটা এ হিসেবে] কেননা তিনি সব কিছুর উপর সক্ষম। আর সকল জিনিস তাঁর মুখোপেক্ষী এবং প্রতিটি কাজ তাঁর জন্য সহজ। তিনি কোনো কিছুর প্রতি মুখাপেক্ষী নন। তাঁর সমকক্ষ কোনো কিছুই নেই। তিনিই সর্বশ্রোতা সর্বোবহিত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ لَيْسَ مُنْذُ خَلَقَ الْخَلْقَ الخ : অর্থাৎ পবিত্র কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'আলা নিজ গুণবাচক নামসমূহ উল্লেখ করেছেন। মাখলুক সৃষ্টির পূর্ব হতেই তিনি এ সকল গুণের অধিকারী ছিলেন। কারণ পবিত্র কুরআনে সকল গুণবাচক নাম "আল্লাহ" শব্দের সাথে সাধারণ অতীতকালের শব্দের মাধ্যমে সংযোজিত হয়েছে। যেমন তিনি বলেন–

* وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞ।
* فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলাই সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞ। –[সূরা নিসা]
* وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيْطًا অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক সকল বস্তু পরিবেষ্টিত।
* وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَلِيْمًا অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ সহনশীল। –[সূরা নিসা]
* وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল দয়ালু। –[সূরা নিসা]
* وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সর্বশ্রোতা সর্বোবহিত। –[সূরা নিসা]
* وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى ذٰلِكَ قَدِيْرًا অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা এ সবের উপর শক্তিমান। –[সূরা নিসা]
* وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সকল বস্তুর পরিমাপক। –[সূরা নিসা]
* وَكَانَ اللّٰهُ غَنِيًّا حَمِيْدًا অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা অমুখাপেক্ষী প্রশংসিত। –[সূরা নিসা]

এ ধরনের আরো অনেক গুণবাচক নাম আল্লাহ্ তা'আলা উল্লেখ করে ঐদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, এ সকল গুণ অনাদিকাল হতে আল্লাহর সত্তার সাথে মাখলুক সৃষ্টির পূর্বহতে সংযুক্ত ছিল। স্রষ্টার এসব গুণ বাস্তবে প্রকাশিত হওয়ার জন্য মাখলুক সৃষ্টির উপর নির্ভরশীল নয়।

যদি আল্লাহ্ তা'আলার এসব গুণবাচক নাম, সিফাতে কামালিয়া ও কর্মসমূহ তথা সৃষ্টি জগৎ সৃজনের সাথে সম্পৃক্ত হতো অর্থাৎ মাখলুকের সাথে আল্লাহ্র কর্মের সম্পর্ক হওয়ার কারণে যদি এ সকল গুণবাচক নাম অর্জিত হতো, তাহলে পবিত্র কুরআনে এ সকল গুণবাচক নাম সৃষ্টি জগৎ সৃজনের পূর্বে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে সম্পৃক্ত হতো না।

অনুরূপভাবে এ সকল গুণবাচক নাম অনাদি, অনন্ত, ওয়াজিবুল ওয়াজুদ এবং সমস্ত সিফাতে কামালিয়ার সমষ্টিগত নাম আল্লাহ্ শব্দের সাথে মাজী মুতলাক তথা সাধারণ অতীতের শব্দের সাথে উল্লেখ করা হতো না। অতএব কুরআনের এই অতীতকালীন শব্দ ব্যবহার থেকে বুঝা যায় যে, ওয়াজিবুল উজুদ আল্লাহ্ তা'আলার এসব সিফাতে কামালিয়া আদিকাল থেকে ছিল এবং অনন্তকাল থাকবে। এগুলো তাঁর কোনো কর্ম সংঘটনের উপর নির্ভরশীল নয়। বরং কর্ম সম্পাদনের পূর্বে যেমন ছিল পরেও তেমনি আছে এবং থাকবে।

আবার দেখা যায়, কুরআনের অনেক গুণবাচক নাম রয়েছে যেগুলো আল্লাহ্ শব্দের সাথে কোনো কালের সহিত সংযুক্ত না হয়ে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন- هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰى অর্থাৎ তিনি আল্লাহ যিনি সৃষ্টিকর্তা, নব আবিষ্কারক, রূপদাতা। তাঁর জন্য রয়েছে আসমায়ে হুসনা তথা সুন্দর সুন্দর নাম। -[সূরা হাশর]

উপরিউক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার সিফাতি নামগুলো কোনো "কালের" সাথে সীমাবদ্ধ না হয়ে একথা বুঝায় যে, তিনি মাখলুক সৃষ্টির পূর্ব হতে অনাদিকাল সৃষ্টিকর্তা, রূপদানকারী ও নব উদ্ভাবক ছিলেন এবং মাখলুক সৃষ্টির পরেও অনন্তকাল তিনি এসব গুণে গুণান্বিত থাকবেন। অন্যথায় আল্লাহ্ তা'আলার গুণবাচক নামগুলো তাঁর সত্তার উপর প্রয়োগ হতো কোনো কালের সাথে সীমাবদ্ধ করার মাধ্যমে। সুতরাং এ কথা প্রমাণিত হলো যে, আল্লাহ্ তা'আলা সিফাতে কামালিয়া নিয়ে আদিকাল থেকে গুণান্বিত ছিলেন এবং অনন্তকাল থাকবেন।

যেমন কোনো ব্যক্তির লিখার যোগ্যতা রয়েছে, তখন তাকে লেখক বলে সম্বোধন করা হয়। আর যখন কোনো কিছু না লিখে তখনো তাকে পূর্বের লেখনির কারণে লেখক বলে সম্বোধন করা হয়। উক্ত ব্যক্তিকে লিখক বলে সম্বোধন করা হয় তার লেখার যোগ্যতা থাকার কারণে। তার লিখা নামক ক্রিয়ার কারণে নয়। চাই সে বর্তমানে লিখুক বা না লিখুক।

قَوْلُهُ ذَالِكَ بِأَنَّهُ عَلٰى كُلِّ الخ : অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা সর্ব কাজে সক্ষম। -[সূরা বাকারা] পূর্বে এর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তা দেখে নাও।

قَوْلُهُ وَكُلُّ شَيْءٍ اِلَيْهِ فَقِيْرٌ الخ : অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা সব কিছুর উপর ক্ষমতাশীল। তিনি ক্ষমতার জন্য কোনো কিছুর প্রতি মুখাপেক্ষী নন। কিন্তু সব মাখলুক নিজ অস্তিত্ব লাভ ও ঠিক থাকার জন্য তাঁর মুখোপেক্ষী।

যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন- اَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ اِلَى اللّٰهِ অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর প্রতি মুখাপেক্ষী। -[সূরা মুহাম্মদ]

আর সব কিছু অস্তিত্ব দান ও ঠিক রাখা তাঁর জন্য একেবারেই সহজ ব্যাপার।

যেমন তিনি বলেন وَذَالِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ অর্থাৎ এসব আল্লাহর নিকট সহজ। -[সূরা মায়েদা] এবং তাঁর মত কেউ এ রকম দৃষ্টান্ত দিতে অক্ষম। তাই উপরিউক্ত কথাগুলো মেনে নেওয়া মু'মিনের উপর ফরজ।

তৃতীয় পাঠ

আল্লাহই স্রষ্টা এবং ভাগ্য নির্ধারক

خَلَقَ الْخَلْقَ بِعِلْمِهٖ وَقَدَّرَ لَهُمْ اَقْدَارًا وَضَرَبَ لَهُمْ اٰجَالًا .

অনুবাদ : আল্লাহ তা'আলা নিজ জ্ঞানে মাখলুক সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের জন্য সীমা তথা ভাগ্য নির্ধারণ করেছেন আর তিনিই তাদের সময় [বয়স] নির্ধারণ করে দিয়েছেন ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ خَلَقَ الْخَلْقَ بِعِلْمِهٖ : আল্লাহ তা'আলা আসমান জমিন এবং তার মাঝে যা কিছু রয়েছে সব কিছু স্বীয় জ্ঞানে সৃষ্টি করেছেন। কোনো কিছু তার জ্ঞানের বাইরে নয়। خَلَقَ শব্দটি فِعْل مَاضِىْ অর্থ- اَوْجَدَ তথা আবিষ্কার বা উদ্ভাবন, اَنْشَاَ তথা সৃষ্টি করা ইত্যাদি। اَلْخَلْقَ শব্দটি مَصْدَرٌ এখানে مَخْلُوْقٌ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। بِعِلْمِهٖ শব্দটি حَالٌ হওয়ায় مَنْصُوْبٌ مَحَلًّا হয়েছে। تَقْدِيْر عِبَارَتٌ হবে নিম্নরূপ- خَلَقَهُمْ عَالِمًا بِهِمْ অর্থাৎ মাখলুক সৃষ্টি করেছেন এমতাবস্থায় যে, এ ব্যাপারে তিনি জ্ঞান রাখতেন। যেমন তিনি ইরশাদ করেন- اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ অর্থাৎ তিনি কি জানেনা? যিনি সৃষ্টি করেছেন, আর তিনিই সূক্ষ্ম জ্ঞানী সম্যক জ্ঞাত। -[সূরা মুলক]

উক্ত আয়াতে বুঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা যা কিছু সৃষ্টি করেছেন, কোনো কিছুই তার জ্ঞানের বাইরে নয়। সুস্থ বিবেকও একথার সমর্থন করে যে, আল্লাহ তা'আলা মাখলুক সৃষ্টি করে যে পরিমাণ জ্ঞান, মর্যাদা ও যোগ্যতা দিয়েছেন, সবই তাঁর পক্ষ হতে। কেননা তিনিই সব কিছু উদ্ভাবন করেছেন এবং প্রত্যেক মাখলুকের উপযোগী ও প্রয়োজনীয় সব জ্ঞান-বুদ্ধি তিনিই দিয়েছেন।

যেমন তিনি ইরশাদ করেন- رَبُّنَا الَّذِىْٓ اَعْطٰى كُلَّ شَىْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى অর্থাৎ আমাদের প্রভু তিনি, যিনি প্রতিটি বস্তুকে যথাযোগ্য আকৃতি দিয়ে সৃজন করেছেন। অতঃপর পথ প্রদর্শন করেছেন। -[সূরা ত্বোহা]

একথা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ যে, আল্লাহ তা'আলা সিফাতে কামালিয়া এবং মাখলুককে যোগ্য আকৃতি দান করে সৃষ্টিকারী হতে অক্ষম; বরং একথার পরিপূর্ণ বিশ্বাস রাখতে হবে যে, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা এতদসংশ্লিষ্ট বিষয়ে সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময় সত্তা। উপরিউক্ত গুণাবলির উপযুক্ত হকদার অন্য কেউ এর হকদার বা উপযুক্ত নয়। অতএব স্রষ্টা তাঁর মাখলুক সৃজন করার পূর্ব হতেই তার সব কিছু সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত হওয়া অত্যাবশ্যক। যদি তিনি এ সম্পর্কে না-ই জানেন এবং এ সম্পর্কে অবহিত না হন, তাহলে কোন জিনিস গচ্ছিত রাখলেন যা জানতেন না? অথচ তাঁর জ্ঞানের বাইরে কোনো কিছুই নেই।

قَوْلُهٗ وَقَدَّرَ لَهُمْ الخ : অর্থাৎ তিনি মাখলুকের ভাগ্য নির্ধারণ করে রেখেছেন। ভাগ্য নির্ধারণের উপর বিশ্বাস রাখা ঈমানের ৬ষ্ঠ রোকন। যাকে আমরা تَقْدِيْر বলে জানি।

اَلتَّقْدِيْرُ -এর সংজ্ঞা :

اَلتَّقْدِيْرُ : অর্থ হলো– নির্ধারণ করা, ভাগ্য লিপিবদ্ধ করা।

পরিভাষায় বলা হয়, এই বিশ্বের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি সৃষ্টির জন্য যে, সুশৃঙ্খল নিয়ম বা কার্যপ্রণালী বা ব্যবস্থা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তাকে তাকদীর বা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে বান্দার জন্য লিপিবদ্ধ করণ বা নির্ধারণ বলা হয়।

আমরা বিশ্বাস করি যে, এই বিশ্বের ভালো, মন্দ, আনন্দ ও বেদনার যা কিছু ঘটে তা সবই আল্লাহ তা'আলার জ্ঞান ও ইচ্ছানুসারে ঘটে থাকে। তাঁর ইচ্ছা ও জ্ঞানের বাইরে কিছুই ঘটে না। সব কিছু আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত "পরিমাপ" বা قَدْر এর মধ্যে সৃষ্টি করেছেন।

যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন– اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ অর্থাৎ আমি প্রতিটি জিনিস সৃষ্টি করেছি নির্ধারিত পরিমাপে। –[সূরা কামার]

অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন– وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيْرًا অর্থাৎ তিনি প্রতিটি বস্তু সৃজন করেছেন। অতঃপর তাকে পরিমিতভাবে প্রতিস্থাপন করেছে। –[সূরা ফুরকান]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন– اَللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ اُنْثٰى وَمَا تَغِيْضُ الْاَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ অর্থাৎ প্রত্যেক নারী সে তার গর্ভে যা ধারণ করে এবং জরায়ুতে যা কমে ও বাড়ে আল্লাহ তা'আলা সে সম্পর্কে সম্যক অবগত এবং তাঁর বিধানে প্রত্যেক বস্তুরই এক নির্দিষ্ট পরিমাণ আছে। –[সূরা রা'দ]

আল্লাহ তা'আলা বলেন– وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ اِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ অর্থাৎ আমার নিকট রয়েছে প্রত্যেক জিনিসের ভাণ্ডার আমি তা পরিজ্ঞাত পরিমাণেই সরবরাহ করে থাকি। –[সূরা হিজর]

আয়াতে কারীমায় বলা হয়েছে– وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ قَدَرًا مَّقْدُوْرًا অর্থাৎ আল্লাহর বিধান সুপ্রতিষ্ঠিত।

সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ বলেন– قَدَّرَ اللّٰهُ مَقَادِيْرَ الْخَلْقِ قَبْلَ اَنْ يَّخْلُقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِخَمْسِيْنَ اَلْفٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সৃষ্ট জীবের ভাগ্যলিপি আসমান জমিন সৃষ্টি করার পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে নির্ধারণ করে রেখেছেন। যখন তাঁর [আল্লাহর সিংহাসন] পানির উপর স্থাপিত ছিল। যা কিছু ঘটবে সবই তিনি জানেন। তাঁর জ্ঞানের কোনো পরিবর্তন পরিবর্ধন নেই।

মোটকথা প্রত্যেকটি বস্তুর পরিমাণ, সময়, কাল, হ্রাস-বৃদ্ধি বিশ্ব অস্তিত্ব লাভের পূর্বেই লিখে দেওয়া হয়েছে। এখন বিশ্বে যা কিছু ঘটে বা না ঘটে, সবই আদিকালীন তাকদীর অনুযায়ী অনুযায়ী হচ্ছে। এই তাকদীরের উপর ঈমান রাখা ফরজ, অপরিহার্য কর্তব্য। নিম্নে তাকদীরের বিষগুলো উল্লেখ করা হলো–

তাকদীরের বিষয়াবলি :

তাকদীরের বিষয়াবলি ৫টি–

১. **আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস :** আল্লাহ তা'আলা আদি, অনন্ত, অসীম, সর্বজ্ঞানী একথার বিশ্বাস রাখা। কেননা আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ, সর্বজ্ঞানী। তাঁর জ্ঞানের কোনো তুলনা চলেনা। সৃষ্টির আগে থেকেই বিশ্বচরাচরে কোথায় কি হবে, কি ঘটবে সবই তিনি জানেন। তার জ্ঞানের কোনো পরিবর্তন পরিবর্ধন নেই।

২. **আল্লাহর লিখনে বিশ্বাস :** ইসলামি বিশ্বাসের অংশ হলো, আল্লাহ তাঁর অনাদি, অনন্ত, অসীম ও সর্বব্যাপী জ্ঞান কিতাবে মুবীন তথা লাওহে মাহফূজে লিখে রেখেছেন। লিখনের ধরন মাখলুক জানেনা। আল্লাহ তা'আলা এর বর্ণনা কুরআনে দিয়েছেন- وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمٰتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ. (اَلْآيَةُ) অর্থাৎ "অদৃশ্যের চাবি তাঁরই হাতে রয়েছে। তিনি ছাড়া অন্য কেউ তা জানেনা। জলে স্থলে যা কিছু রয়েছে তা তিনিই অবগত। তাঁর অজ্ঞাতসারে একটা পাতাও পড়ে না। মৃত্তিকার অন্ধকারে এমন শস্য কণাও অঙ্কুরিত হয় না অথবা রসযুক্ত কিংবা শুষ্ক এমন কোনো বস্তু নেই যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই। -[সূরা আন'আম]

অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন- وَمَا تَكُوْنُ فِيْ شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوْ مِنْهُ مِنْ قُرْاٰنٍ وَلَا تَعْمَلُوْنَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوْدًا ...... إِلَّا فِيْ كِتَابٍ مُّبِيْنٍ. অর্থাৎ তুমি যে কোনো কর্মে রত হও এবং তুমি তৎসম্পর্কে কুরআন হতে যা কিছুই আবৃত্তি কর। আর তোমরা যে কোনো কাজ কর। আমি তোমাদের সবকিছুর পরিদর্শক। যখন তোমরা তাতে প্রবৃত্ত হও। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অণু পরিমাণও তোমার প্রতিপালকের অগোচরে নয় এবং তা অপেক্ষা ক্ষুদ্রতম অথবা বৃহত্তর কিছুই নেই যা সুস্পষ্ট কিতাবে পূর্ব থেকেই নির্ধারিত বা লিপিবদ্ধ নেই। -[সূরা ইউনুস : ৬১]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন- وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ .... كُلٌّ فِيْ كِتَابٍ مُّبِيْنٍ অর্থাৎ ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণকারী সকলের জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহরই উপর। তিনি তাদের স্থায়ী ও অস্থায়ী অবস্থা সম্বন্ধে সম্যক অবহিত, যা সু-স্পষ্ট কিতাবে রয়েছে। -[সূরা হূদ]

আল্লাহ জাল্লা শানুহু আরো বলেন- اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ - اِنَّ ذٰلِكَ فِيْ كِتَابٍ অর্থাৎ আপনি অবহিত নন কি? নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা আসমান জমিনের সব খবর রাখেন। এর সবই কিতাবে বিদ্যমান।

অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন- يَمْحُو اللّٰهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ اُمُّ الْكِتَابِ। অর্থাৎ তিনি যা ইচ্ছা মুছে ফেলেন এবং যা ইচ্ছা রেখে দেন। আর তাঁর কাছে আছে মূল গ্রন্থ। -[সূরা রা'দ]

৩. **আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় বিশ্বাস :** এ পৃথিবীর বুকে যা কিছু সংঘটিত হয়, সবই তাঁর ইচ্ছা ও জ্ঞানেই সংঘটিত ও বাস্তবায়িত হয়। তাঁর ইচ্ছা ও জ্ঞানের বাহিরে কোনো কিছুই সংঘটিত হওয়ার শক্তি ও সামর্থ্য রাখে না।

আর এ সম্পর্কেই মহান আল্লাহর বাণী অনুরণীত হয়। তিনি বলেন- وَمَا تَشَاءُوْنَ اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ .... يُدْخِلُ مَنْ يَّشَاءُ فِيْ رَحْمَتِهِ (اَلْآيَةُ) অর্থাৎ তোমরা কোনো ইচ্ছা করতে পারবে না। যদি আল্লাহ ইচ্ছা না করেন। তিনি যাকে ইচ্ছা নিজ অনুগ্রহে প্রবেশ করান। -[সূরা ইনসান/ দাহর]

অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন- اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ .... وَمَا تَشَاءُوْنَ اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ অর্থাৎ এতো শুধু বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ। .... জগতসমূহের রব আল্লাহ ইচ্ছা না করলে তোমরা কোনো বিষয় সম্পর্কে ইচ্ছা করবে না। -[সূরা তাকবীর]

৪. **আল্লাহর সৃষ্টিতে বিশ্বাস :** বিশ্বচরাচরের সব কিছু আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন। তিনি ছাড়া সবই সৃষ্টি কেবলমাত্র তিনিই [আল্লাহ] স্রষ্টা। মানুষের কর্মও তিনি সৃষ্টি করেছেন। যেমন তিনি বলেন- ذَالِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ ...... خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوْهُ অর্থাৎ এই আল্লাহই তোমাদের প্রতিপালক। তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো ইলাহ নেই। তিনিই সব কিছুর [দর্শনীয় বা দর্শনহীন, অনুভবযোগ্য বা অনুভবহীন, আবিষ্কৃত ও অনাবিষ্কৃত সকল বস্তু] প্রতিপালক স্রষ্টা। সুতরাং তাঁর ইবাদত কর। -[সূরা আন'আম]
অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন- وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ অর্থাৎ আর আল্লাহই তোমাদের এবং তোমাদের কর্ম সৃষ্টি করেছেন। -[সূরা শু'আরা]

৫. **মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা ও কর্মফলে বিশ্বাস :** মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা ও তার ইচ্ছার কর্মফলে বিশ্বাসের উপরই ইসলামের অন্যান্য বিধি বিধানের ভিত্তি। মানুষ তার স্বাধীন ইচ্ছায় যে কর্ম সম্পাদন করে, তার আনুপাতিক হারে সে পুরস্কার-শাস্তির উপযুক্ত। অবশ্য বান্দার কর্ম আল্লাহর জ্ঞান ও ইচ্ছানুযায়ীই হয়ে থাকে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন- إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ ...... إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيْلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُوْرًا. অর্থাৎ আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি শুক্র হতে ..... আমি মানুষকে পথ নির্দেশ দিয়েছি। হয় সে কৃতজ্ঞ হবে অন্যথায় অকৃতজ্ঞ। -[সূরা দাহর/ইনসান]
অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন- أَلَمْ نَجْعَلْ لَّهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَّشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ অর্থাৎ আমরা কি তার জন্য সৃষ্টি করিনি দু'টি চক্ষু, জিহ্বা ও দু'ওষ্ঠ? আমি কি দেখাইনি তাকে দু'টি পথ? -[সূরা বালাদ]
অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন- قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا অর্থাৎ সেই সফলতা অর্জন করেছে যে নিজেকে পবিত্র করবে এবং সেই ব্যর্থ হবে যে নিজেকে কলুষিত করবে। -[সূরা শামস]

মোটকথা উপরে উল্লিখিত তাকদীরের ৫টি আরকানের উপর অবশ্যই বিশ্বাস রাখতে হবে। কেননা হযরত আবূ হানীফা (র.) বলেন, তাকদীরে বিশ্বাস রাখার অর্থ হলো, আল্লাহর জ্ঞান ও ন্যায়পরায়ণতা উভয় বিশেষণে সমানভাবে বিশ্বাস রাখা। তাকদীরে বিশ্বাস না করলে আল্লাহর জ্ঞান ও ক্ষমতায় অবিশ্বাস করা হয়। আর মানুষের স্বাধীন ইচ্ছায় অবিশ্বাসী হলে আল্লাহর ন্যায়পরায়ণতা ও করুণায় অবিশ্বাস করা হয়। এটাই হলো আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আকিদা।

তাকদীরের গুরুত্ব :

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বর্ণনা করেন যে, হযরত রাসূল ﷺ বলেছেন, প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে কতেক মাজুসী তথা অগ্নিপূজক থাকে আমার উম্মতের মাজুসী তারা, যারা তাকদীর মানে না। -[আহমদ, আবূ দাউদ, তাবারানী]

কত বড় ধমকি যে তাকদীর অমান্যকারীকে অগ্নিপূজক বলেছেন। আমরা খুব গভীরভাবে লক্ষ্য করেছি যে, তাকদীরের উপর সবেচেয় দৃঢ় প্রত্যয় ছিলেন নবী করীম ﷺ তাই তিনি সবচেয়ে বেশি দৃঢ় প্রত্যয়ী কর্মবীর ছিলেন। ঠিক তেমনি অকুতোভয় দৃঢ় প্রত্যয়ী কর্মবীর ছিলেন তাঁর সাহাবীগণ, তাকদীরে বিশ্বাস তাদের সকল সংশয়, ভয় ও দুশ্চিন্তা দূর করে বিশ্ব জয়ে প্রেরণা জুগিয়েছে। তাই তাকদীরে বিশ্বাস একান্ত জরুরি।

তাকদীরের হুকুম :

তাকদীর ইসলামের একটি অকাট্য ধর্ম বিশ্বাস। যে একে সরাসরি অস্বীকার করে সে কাফের বলে গণ্য হবে। কিন্তু যদি দ্ব্যর্থতার আশ্রয় নিয়ে তা অস্বীকার করে তাহলে সে ফাসিক। এমন স্বভাবের ব্যক্তির পিছনে নামাজের ইকতেদা না জায়েজ।

قَوْلُهٗ ضَرَبَ لَهُمْ اٰجَالًا : এখানে اٰجَالٌ শব্দটি اَجَلٌ-এর বহুবচন। অর্থ বয়স, মৃত্যু, আয়ু, কাল। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টি জগতের প্রতিটি ব্যক্তি বা বস্তুর জন্য একটি সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন। উক্ত নির্ধারিত সময় পর্যন্ত তাঁর সকল সৃষ্টি বিদ্যমান থাকবে। তাদের কোনো ধ্বংস হবে না। কিন্তু যখনই প্রতিটি সৃষ্টির নির্ধারিত সময় শেষ হয়ে যাবে, তখনই প্রত্যেকটি সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে যাবে এতে সামান্যতম ব্যত্যয় বা বিকল্প ঘটবে না। এ সময় কেউ তাকে সময় বাড়িয়ে দেওয়ার সক্ষম সত্তার অস্তিত্ব পাবে না এবং সেও চোখের পলক পরিমাণ সময় আগ-পিছ হবে না। কেননা আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেকের আয়ুষ্কাল লাওহে মাহফুজে নির্ধারণ করে রেখেছেন।

কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- مَا خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَجَلٍ مُّسَمًّى অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সব কিছু যথোপযোগ্য করে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সৃষ্টি করেছেন। -[সূরা কামার]

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে- لِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ اِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ অর্থাৎ প্রত্যেক জাতির জন্যই একটি নির্ধারিত সময় রয়েছে। অতঃপর যখন তাদের নির্দিষ্ট সময় এসে যাবে তখন সে এক মুহূর্ত পিছু হটতে পারবে না এবং এক মুহূর্ত আগেও বাড়তে পারবে না। -[সূরা ইউনুস]

অপর আয়াতে বলেন- لِكُلِّ اَجَلٍ كِتَابٌ অর্থাৎ প্রত্যেকটি অঙ্গীকার নির্ধারিত সময়ে লিপিবদ্ধ রয়েছে। -[সূরা রা'দ]

মোদ্দাকথা আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি জগৎ সৃজন করার সূচনা লগ্নে তার ভাগ্য তথা কর্ম, ভালো, মন্দ এবং জীবন মরণ ইত্যাদি লাওহে মাহফূজে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। যখনই তার ঐ নির্ধারিত সময় উপস্থিত হবে, তখন আল্লাহ তা'আলাই তা সংঘটন করবেন। এতে তার কোনো বেগ, কষ্ট, ক্লান্তি, ক্লেশ পেতে বা বাধা প্রাপ্ত হতে হবে না।

আল্লাহর নিকট কোনো বস্তুই গোপন নয়

لَمْ يَخْفَ عَلَيْهِ شَيْءٌ قَبْلَ اَنْ خَلَقَهُمْ وَعَلِمَ مَا هُمْ عَامِلُوْنَ قَبْلَ اَنْ يَخْلُقَهُمْ.

অনুবাদ : মাখলুক সৃজন করার পূর্বে কোনো বস্তু আল্লাহ তা'আলার নিকট গোপন বা অস্পষ্ট ছিল না এবং তাদেরকে সৃষ্টি করার পূর্বে তিনি জানতেন সৃষ্টির পর কে কি করবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ لَمْ يَخْفَ الخ : গ্রন্থকার ইমাম ত্বহাবী (র.)-এর উক্ত বক্তব্যের দ্বারা রাওয়াফেজ এবং কাদরিয়াদের মতবাদের প্রতিবাদ করা হয়েছে। তারা বলে আল্লাহ কোনো বস্তু সৃষ্টির পূর্বে ঐ বস্তু সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল। আহলে সুন্নতের অভিমত হলো, যা সংঘটিত হয়েছে এবং যা হয় নাই উভয় বিষয়েই আল্লাহ ইলম রাখেন। অনুরূপভাবে আল্লাহর ঐ জ্ঞানও রয়েছে যে, যদি ভবিষ্যতে অমুক কাজটি হয়ে যায় তাহলে কি অবস্থা হবে। আল্লাহ বলেন– اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ উক্ত আয়াত দ্বারা বুঝা যায় আল্লাহ আগে পরের জ্ঞানে জ্ঞানী। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা এমন এক জ্ঞানী সত্তা যার নিকট সৃষ্টজগৎ সৃজনের পর যেমন সর্ব বিষয় তাঁর নিকট স্পষ্ট ঠিক অনুরূপ মাখলুক সৃষ্টির পূর্বেও তিনি সর্ব বিষয়ে জ্ঞানী। কোনো কিছুই তাঁর নিকট গোপন নয় বা অস্পষ্টও নয় এবং কখনো তা হবেও না।

যেমন– আল্লাহ তা'আলা বলেন– اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفٰى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَاءِ وَيَعْلَمُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার নিকট জমিন ও আসমানের কোনো কিছুই অস্পষ্ট বা গোপন নয়। আর তিনি আসমান ও জমিনের মধ্যস্থিত সব কিছু সম্পর্কে জানেন। –[সূরা আলে-ইমরান]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– قُلْ اِنْ تُخْفُوْا مَا فِيْ صُدُوْرِكُمْ وَمَا تُبْدُوْهُ يَعْلَمُ اللّٰهُ وَيَعْلَمُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ. অর্থাৎ হে নবী! আপনি বলে দিন, যদি তোমরা মনের কথা গোপন করে রাখো অথবা প্রকাশ করো, আল্লাহ তা'আলা তার সবই জানেন এবং আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে তাও তিনি জানেন। –[আলে ইমরান]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন– وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ অর্থাৎ তোমাদের গোপনীয় ও প্রকাশ্য সকল কর্ম সম্পর্কে স্রষ্টা সম্যক সুপরিজ্ঞাত।

অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন– وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا تَكْتُمُوْنَ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সবই জানেন, যা তোমরা গোপনে করো আর প্রকাশ্যে কর। –[সূরা নূর]

অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন– اَلَمْ يَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যে তাদের গোপন রহস্য ও পরামর্শ জানেন এটা কি তারা জানে? আর আল্লাহ তা'আলা জানেন অদৃশ্যের সংবাদ তথা গায়েবের কথা। –[সূরা তাওবা]

উপরিউক্ত আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণ হয় যে, আসমান ও জমিনের কোনো কিছুই তাঁর নিকট অস্পষ্ট বা গোপন থাকে না বা থাকবেও না। কারণ বিশ্বচরাচরের সব জিনিস তাঁর কর্তৃত্বে

চলে। কিন্তু যদি কোনো বস্তু বা জীব তাঁর নিকট গোপন থাকে তাহলে তাঁর কর্তৃত্ব অচল বা অনর্থক হয়ে যায়। অথচ আল্লাহ তা'আলা এমন বিষয় হতে সম্পূর্ণ পবিত্র এবং উর্ধ্বে।

قَوْلُهُ وَعَلِمَ مَا هُمْ الخ : অর্থাৎ পৃথিবীতে আল্লাহ তা'আলা যত মাখলুক সৃষ্টি করেছেন এসব মাখলুক ভালো মন্দ যা কিছু করছে, বা করবে, ঐ সমস্ত কর্ম সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা পূর্ব হতেই জানতেন। কেননা আল্লাহ তা'আলা নিজেই বলেন- وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলাই তোমাদেরকে এবং তোমরা যে কর্ম সম্পাদন কর এর সব কিছুই সৃষ্টি করেছেন। -[সূরা ছাফফাত]

দ্বিতীয়ত আল্লাহই সমস্ত বস্তুর স্রষ্টা নিজ জ্ঞান অনুসারে। যেমন তিনি বলেন, اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ অর্থাৎ তিনি কি অবগত নন, যা তিনি সৃষ্টি করেছেন। -[সূরা মূলক]

তাছাড়া আল্লাহ তা'আলা হলেন মাখলুক হতে প্রকাশিত সকল কর্মের জমাকারী বা একত্রকারী তাহলে এটা কিভাবে সম্ভব হতে পারে যে, গচ্ছিত বস্তু সম্পর্কে জমাদানকারী অনবগত বা অনবহিত। সুতরাং একথা যথার্থই যে, আল্লাহ তা'আলা মাখলুক সৃষ্টির পূর্ব হতে জ্ঞাত যে, সে পৃথিবীতে ভালো মন্দ কোনো কাজ করবে। এতে কোনো প্রকার সন্দেহ করা তো দূরের কথা সন্দেহের অবকাশ পর্যন্ত নেই।

উপরিউক্ত বিষয়টির উপর সকল মু'মিন ঈমান রাখা ফরজ। অন্যথা ঈমানে ঘাটতি দেখা দিবে।

উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা স্বাভাবিক কারণেই একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় আর তা হলো, বান্দার সকল কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ যদি পূর্ব হতেই অবগত থাকেন এবং তা তিনি নিজেই বান্দা দ্বারা সম্পূর্ণ করিয়ে থাকেন, তাহলে বান্দার তো কোনো দোষ হবার কথা নয়, তথাপি বান্দার দোষ কেন?

উত্তর : আল্লাহ তা'আলা যদিও তা পূর্ব হতে জানেন এবং তা তাঁর আদেশেই সম্পাদিত হয়ে থাকে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা বান্দার হাতে ভালো মন্দের স্বাধীনতা বা ইচ্ছাধিকার দিয়েছেন। তার ইচ্ছা হলে ভালো কাজ করতে পারে এবং ইচ্ছা হলে মন্দও করতে পারে। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন- إِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِأَنْفُسِهِمْ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কোনো জাতির অবস্থা পরিবর্তন ততক্ষণ পর্যন্ত করেন না যতক্ষণ না সে নিজের অবস্থার পরিবর্তন করে। -[সূরা রা'দ]

আল্লাহ তা'আলা সৎ কাজের আদেশদাতা এবং অসৎ কাজের নিষেধকারী

وَاَمَرَهُمْ بِطَاعَتِهٖ وَنَهَاهُمْ عَنْ مَعْصِيَتِهٖ وَكُلُّ شَيْءٍ يَجْرِىْ بِقُدْرَتِهٖ وَمَشِيَّتِهٖ تُنْفَذُ لَا مَشِيَّةَ لِلْعِبَادِ مَا شَاءَ لَهُمْ فَمَا شَاءَ لَهُمْ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ.

অনুবাদ : আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে (মাখলুকদেরকে) তাঁর ইবাদতের নির্দেশ প্রদান করেছেন এবং পাপাচার হতে নিষেধ করেছেন। প্রত্যেক জিনিসই তাঁর ইচ্ছা ও ক্ষমতা বলে পরিচালিত হয় এবং সব কর্মই কার্যকর হয় স্রষ্টার ইচ্ছায়। বান্দার ইচ্ছায় কিছুই কার্যকর হয় না। অতএব তিনি মাখলুকের জন্য যা চাইবেন তা-ই হবে আর যা না চাইবেন তা কখনোই হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَاَمَرَهُمْ بِطَاعَتِهٖ : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সমগ্র সৃষ্টি জগতের মধ্যে একমাত্র জিন ও ইনসান ব্যতীত আর কাউকে ইবাদাতের জন্য সৃষ্টি করেননি। কিন্তু মানব ও জিন জাতিকেই একমাত্র ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। মানুষ কোনো কিছু সৃষ্টি করলে একাধিক উদ্দেশ্য রাখা অসম্ভবের কিছু না। যেমন একজন একখণ্ড জমি ক্রয় করল। এখন সে ইচ্ছা করলে তাতে ঘরবাড়ি তৈরি করতে পারে, চাষাবাদ করে ফসল উৎপাদন করতে পারে এবং এতে শিল্প কারখানাও তৈরি করতে পারে। কিন্তু বিশ্বস্রষ্টার মানব ও জিন তৈরিতে এমন কোনো উদ্দেশ্য নেই; বরং শুধুমাত্র ইবাদতের উদ্দেশ্যে তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। যেমন– তিনি বলেন– وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ অর্থাৎ আমি মানব ও জিন জাতিকে সৃষ্টি করেছি কেবলইমাত্র আমার ইবাদতের জন্য। –[সূরা জারিয়াত]

আর মানুষকে কিভাবে ইবাদত বন্দেগি করতে হবে তার রীতি বাতলিয়ে দিয়ে তাদেরকে তাঁর আনুগত্য প্রকাশের আদেশ দিয়েছেন এবং অবাধ্যতা ও অসৎ কাজ হতে বিরত থাকার জন্য নির্দেশ প্রদান করেছেন। কেননা তাঁর আনুগত্য প্রকাশ করা ও সৎ কাজ করা এবং অসৎ কর্ম হতে বিরত থাকাই হলো প্রকৃত ইবাদত।

যেমন পালনীয় ও বর্জনীয় কর্মের পরিচয় প্রদানে আল্লাহ তা'আলা বলেন– اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَاءِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْىِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ. অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা আদেশ করেন ন্যায় বিচারের, সদাচরণের এবং আত্মীয় স্বজনকে দান করার এবং তিনি নিষেধ করেন অসৎ, অসঙ্গত কাজ ও অবাধ্যতা করতে। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দান করেন তোমরা যেন শিক্ষা গ্রহণ কর। –[সূরা নাহল]

উপরিউক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কয়েকটি বিষয়ের আদেশ দিয়েছেন আর কতক কর্ম থেকে বিরত থাকতে বলেছেন। যা বাস্তবেই কোনো মুসলমানদের মধ্যে বিদ্যমান থাকলে সে প্রকৃত মু'মিন বলে গণ্য হবে।

অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত রাসূল ﷺ কে আদেশ দিয়ে বলেন- قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللّٰهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهٖ অর্থাৎ হে নবী! আপনি বলুন, নিশ্চয় আমি আদেশ প্রাপ্ত হয়েছি আল্লাহর ইবাদত করা ও তাঁর সাথে কাউকে শরিক না করার। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা নবীকে ইবাদত করা ও তাঁর সাথে শিরক না করার আদেশ দিয়ে সকল মানুষকেই তাঁর ইবাদতের আদেশ দিয়েছেন।

মোটকথা আল্লাহ্ তা'আলা উপরিউক্ত তিনটি জিনিসের আদেশ করেন। যেমন- ১. ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা, ২. সৃষ্টির প্রতি অনুগ্রহ করা ও ৩. আত্মীয়-স্বজনকে দান অনুগ্রহ করা।

আর তিনটি জিনিসের নিষেধ করেছেন- ১. অশ্লীলতা, ২. ন্যাক্কারজনক কাজ ও ৩. জুলুম করা।

উপরিউক্ত বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য করলে বুঝা যায়, এসবগুলোর সমষ্টিই হলো মানুষের জীবনের সাফল্যের চাবিকাঠি। যা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাদেরকে একমাত্র আনুগত্যেরই আদেশ দিয়ে থাকেন।

قَوْلُهٗ كُلُّ شَيْءٍ يَجْرِيْ الخ : অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা সর্বশক্তিমান, পরাক্রমশালী সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তাই বিশ্বচরাচরে সব কিছুই তাঁর হুকুম ও ক্ষমতায় চলে বা পরিচালিত হচ্ছে এবং হবে। এক্ষেত্রে কোনো সৃষ্ট জীবের কোনো ধরনের ক্ষমতা বা হস্তক্ষেপ নেই।

কেননা স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলাই বলেন- وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهٖ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ - وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যিনি তোমাদের জন্য নৌকাসমূহকে বশীভূত করে দিয়েছেন। যাতে তাঁর নির্দেশে তা সমুদ্রে চলে এবং যিনি তোমাদের উপকারার্থে নদ-নদীকে নিয়োজিত করেছেন। যিনি চন্দ্র সূর্যকে তোমাদের জন্য নিয়োজিত করেছেন যারা একই নিয়মে অনবরত চলছে। যিনি তোমাদের উপকারার্থে রাত দিনকে নিয়োজিত করেছেন। -[সূরা ইবরাহীম]

এরই সমার্থকরূপে অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন- وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَّجْرِيْ لِأَجَلٍ مُّسَمًّى অর্থাৎ তিনি কার্যরত রেখেছেন সূর্য ও চন্দ্রকে। প্রত্যেকটি নির্ধারিত সময় পর্যন্ত চলে। -[সূরা ফাতির]

অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন- فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيْحَ تَجْرِيْ بِأَمْرِهٖ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ অর্থাৎ আমি বায়ুকে তাঁর অধীনস্থ করে দিলাম, যা তাঁর নির্দেশে মৃদু গতিতে চলতো এবং তিনি যেথায় ইচ্ছা সেথায় চলে যেতেন।

অপর আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন- وَالشَّمْسُ تَجْرِيْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ অর্থাৎ আর সূর্য নিজ গন্তব্যের দিকে চলে। আর এটা মহাপরাক্রমশালী সর্বজ্ঞের নিয়ন্ত্রণ। -[সূরা ইয়াসীন]

অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন- تَجْرِيْ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهٖ অর্থাৎ নৌকা তাঁর নির্দেশেই সমুদ্রে চলে। -[সূরা হজ]

আয়াতে কারীমায় আরো বলা হয়েছে- وَلَهٗ مَنْ فِي السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهٗ قَانِتُوْنَ অর্থাৎ আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সবই তাঁর অনুগত। অর্থাৎ সবই তাঁর পরিচালিত।

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন- وَقَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُوْنَ. অর্থাৎ ইহুদিরা বলে, আল্লাহ তা'আলা সন্তান গ্রহণ করেছেন। অথচ মহান স্রষ্টা সম্পূর্ণরূপে তা হতে পবিত্র; বরং আসমান জমিনে যা কিছু রয়েছে প্রত্যেকেই তাঁর অনুগত। -[সূরা বাকারা]

মোদ্দাকথা পৃথিবীর বুকে যত সৃষ্টি রয়েছে সবই তাঁর পরিচালনার আওতায় পরিবেষ্টিত। কোনো বস্তুই তাঁর পরিচালনার বাইরে নেই।

قَوْلُهُ مَشِيَّتُهُ تَنْفُذُ الخ : অর্থাৎ সব কিছুই আল্লাহর ইচ্ছায় বাস্তবায়ন হয়। তাঁর ইচ্ছার বাইরে কোনো কিছুই সংঘটিত হয় না, হতে পারে না এবং বান্দার ইচ্ছানুযায়ী কোনো কিছু সংঘটিত বা বাস্তবায়িত হয় না। অবশ্য যখন বান্দার ইচ্ছা আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী হয়ে যায় তখনই কাজটি সংঘটিত হয় অর্থাৎ অস্তিত্ব লাভ করে।

সুতরাং আল্লাহ তা'আলা বান্দার জন্য যা কিছু ইচ্ছা করবেন তাই বাস্তবায়িত হবে এবং যা ইচ্ছা করবেন না তা কখনো বাস্তবায়িত হবে না। যদিও তারা হাজারো ইচ্ছা করে।

কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন- وَمَا تَشَاءُوْنَ اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا অর্থাৎ তোমাদের কোনো ইচ্ছাই পূরণ হবে না আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ছাড়া। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সম্যক জ্ঞাত প্রজ্ঞাময়। -[সূরা দাহর]

হুবহু একই কথা বলা হয়েছে সূরা তাকবীরে। যেমন- وَمَا تَشَاءُوْنَ اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ অর্থাৎ তোমরা ইচ্ছা করবে না আল্লাহর ইচ্ছা করা ব্যতীত। -[সূরা তাকবীর]

এ সম্পর্কে শাহ আবদুল আজিজ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) হযরত ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর একটি উক্তি উত্থাপন করে বলেন- فَمَا شِئْتَ كَانَ وَاِنْ لَمْ اَشَأْ - وَمَا شِئْتُ اِنْ لَمْ تَشَأْ لَمْ تَكُنْ অর্থাৎ তুমি যা ইচ্ছা কর তাই হয়ে যায়, যদিও আমি তা ইচ্ছা করি না। আর আমি যা ইচ্ছা করি তা হয় না যদি তুমি তার ইচ্ছা না কর।

মোটকথা আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার বাইরে কোনো কিছু হয় না, সবই তাঁর ইচ্ছানুযায়ী হয়।

আল্লাহই হেদায়েত, আশ্রয় ও নিরাপত্তা প্রদানকারী

يَهْدِي مَنْ يَّشَاءُ وَيَعْصِمُ وَيُعَافِي فَضْلًا وَيُضِلُّ مَنْ يَّشَاءُ وَيَخْذُلُ وَيَبْتَلِي عَدْلًا وَكُلُّهُمْ يَتَقَلَّبُوْنَ فِي مَشِيَّتِهِ بَيْنَ فَضْلِهِ وَعَدْلِهِ.

অনুবাদ : আল্লাহ তা'আলা নিজ অনুগ্রহে ও দয়া পূর্বক যাকে ইচ্ছা হেদায়েত, আশ্রয় ও নিরাপত্তা দান করেন এবং নিজ ন্যায়বিচার পূর্বক যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট, অপমানিত লাঞ্ছিত ও বিপদগ্রস্থ বা রোগাক্রান্ত করেন এবং পরীক্ষা করেন। সবাই তাঁর ইচ্ছার অধীনে তাঁর অনুগ্রহ ও ন্যায়বিচারে মাঝে আবর্তিত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ يَهْدِي مَنْ يَّشَاءُ الخ : هِدَايَة শব্দের অর্থ হলো- রাস্তা দেখানো, সঠিক পথ নির্দেশনা দেওয়া, অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়া, পথ দেখিয়ে দেওয়া যার দ্বারা গন্তব্যে পৌঁছে যেতে পারে।

পরিভাষায় هِدَايَة বলা হয় এমন পথ নির্দেশকে, যার কারণে সঠিক গন্তব্য তথা আল্লাহ তা'আলার রেজামন্দি তথা সন্তুষ্টি অর্জন পর্যন্ত পৌঁছা যায়। উক্ত ইবারতের দ্বারা গ্রন্থকার ইমাম ত্বহাবী (র.) মু'তাজিলা সম্প্রদায়ের প্রতিবাদ করেন। কেননা তাদের বিশ্বাস হলো, هِدَايَة مِنَ اللّٰهِ অর্থাৎ বান্দা যখন অসৎ বা পাপ কর্ম করে তখন আল্লাহ তা'আলা শুধু পাপের হুকুম দেন। মূলত মু'তাজিলাদের ভ্রান্তি হলো বান্দার পাপ বান্দাই তৈরি করে। অর্থাৎ পাপ কর্মের স্রষ্টা বান্দা নিজেই। কিন্তু আহলে সুন্নাহর অভিমত হলো বান্দা কর্মের কর্তা স্রষ্টা স্বয়ং আল্লাহই। তাই তিনি যাকে ইচ্ছা হেদায়েত দান করেন। অথবা পথভ্রষ্ট করেন إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِي مَنْ يَّشَاءُ

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সঠিক পথ নির্দেশ করেন। তিনি ব্যতীত অন্য কেউ সঠিক পথ নির্দেশ করতে সক্ষম না। আল্লাহ তা'আলা যাকে যাকে ইচ্ছা নিজ দয়া-অনুগ্রহ দান করেন। এতে কারো কোনো কর্তৃত্ব বা হস্তক্ষেপ নেই।

কেননা তিনি কুরআনে ইরশাদ করেন- وَمَنْ يَّشَاءْ يَجْعَلْهُ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা সঠিক পথে পরিচালিত করেন। -[সূরা আন'আম]

আল্লাহ তা'আলা যাকে হেদায়েত দান করেন, তাকে পৃথিবীর কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারবে না। যেমন তিনি বলেন- وَمَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُّضِلٍّ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِعَزِيْزٍ ذِي انْتِقَامٍ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যাকে হেদায়েত দান করেন, তাকে কেউ বিপথগামী করতে পারবে না। আল্লাহ তা'আলা মহাপরাক্রমশালী প্রতিশোধ গ্রহণকারী নয় কি?

অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন- مَنْ يَّهْدِي اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ অর্থাৎ যাকে আল্লাহ তা'আলা পথ দেখান সেই পথ প্রাপ্ত হয়। -[সূরা আন'আম]

মহানবী ﷺ কে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ তা'আলা বলেন- قُلْ إِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَنْ يَّشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ অর্থাৎ হে নবী (আপনার উম্মতকে) বলে দিন, আল্লাহ যাকে চান তাকে গোমরাহ করেন ও নিজের দিকে তাকে পথ নির্দেশ করেন যে তাঁর অভিমুখী হয়। -[সূরা রা'দ]

আল্লাহ পাক যার হেদায়েত কামনা করেন তার বক্ষকে ইসলামের জন্য খুলে দেন। যেমন তিনি বলেন- فَمَنْ يُرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যাকে সঠিক পথ নির্দেশ করতে চান তার সিনা তথা বক্ষকে ইসলামের জন্য খুলে দেন। -[সূরা আন'আম]

একই প্রসঙ্গে হযরত মূসা (আ.) সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন- اِنْ هِيَ اِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِيْ مَنْ تَشَاءُ অর্থাৎ [হযরত মূসা (আ.) আল্লাহর নিকট অনুনয়ের সাথে বলেন] তা শুধু তোমার পরীক্ষা। এ দ্বারা যাকে ইচ্ছা তুমি বিপথগামী কর এবং যাকে ইচ্ছা পথের দিশা দাও। -[সূরা আ'রাফ]

অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ هَدَانَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا اَنْ هَدَانَا اللّٰهُ. অর্থাৎ সমস্ত প্রশংসা ঐ সত্তার জন্য যিনি আমাদেরকে পথ দেখিয়েছেন। আর আমরা পথ প্রাপ্ত হতাম না যদি আল্লাহ আমাদেরকে পথ না দেখাতেন। -[সূরা আ'রাফ]

আল্লাহ তা'আলাই একমাত্র সঠিক পথ প্রদর্শক, যার কারণে তিনি বান্দাদেরকে তাঁর নিকট সঠিক পথ নির্দেশনার জন্য দোয়া করতে বলেছেন। যেমন তিনি বলেন- اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ [অর্থাৎ হে আল্লাহ] তুমি আমাদেরকে সরল সঠিক পথের নির্দেশ করো। -[সূরা ফাতেহা]

উপরিউক্ত আয়াতসমূহ দ্বারা একথা সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে, তিনিই একমাত্র সঠিক পথ প্রদর্শক। তিনি যাকে চান তাকে হেদায়েত দেন এবং যাকে চান না তাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন না। এতে কারো হস্তক্ষেপ করার অধিকার নেই। আর কোনো বান্দার প্রতি যখন আল্লাহ সঠিক পথ নির্দেশ করেন তখন তার প্রতি আল্লাহর পক্ষ হতে অনুগ্রহ করা হয়।

قَوْلُهُ فَضْلاً : এর অর্থ অনুগ্রহ, দয়া। অর্থাৎ আল্লাহর এমন দানকে فَضْل বলে, বান্দা বাস্তবে যার অধিকারী ছিল না। কেননা আল্লাহ তা'আলার হেদায়েত, নিরাপত্তা ও সুস্থতার অধিকারী কেউই নয়। কিন্তু যদি তিনি কাউকে তা দান করেন, তবে তা অনুগ্রহ বা দয়া বলেই বিবেচিত হবে।

قَوْلُهُ وَيُضِلُّ مَنْ يَّشَاءُ : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা তাকে পথভ্রষ্ট করেন, অপমানিত করেন। তিনি যাকে বিপদগামী ও অপমানিত করেন, কেউ তাকে পথের দিশা দিতে পারবে না এবং এর কারণে তাঁকে কিছু করার অধিকারও কেউ রাখে না।

কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন- تُضِلُّ مَنْ تَشَاءُ অর্থাৎ তুমি যাকে ইচ্ছা তাকে বিপদগামী কর। -[সূরা আ'রাফ]

অপর আয়াতে বলেন- مَنْ يَّشَاءِ اللّٰهُ يُضْلِلْهُ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যাকে চান তাকে পথভ্রষ্ট করেন। -[সূরা আন'আম]

অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন- وَمَنْ يُّرِدْ اَنْ يُّضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَاَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ অর্থাৎ তিনি যাকে বিপথগামী করতে চান, তার বক্ষকে অতিশয় সংকীর্ণ করে দেন। যেন সে সবেগে আকাশে আরোহণ করছে। -[সূরা আনআম]

অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন- وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যাকে বিপথগামী করেন তার কোনো পথ প্রদর্শক নেই। -[সূরা রা'দ]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন- وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا অর্থাৎ যাকে আল্লাহ বিপথগামী করেন (হে নবী!) আপনি তার জন্য কোনো পথ প্রদর্শক বা অভিভাবক পাবেন না। -[সূরা কাহফ]

এতদসম্পর্কে আরো ইরশাদ হলো– وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ অর্থাৎ যাকে ইচ্ছা তুমি সম্মান দান কর এবং যাকে ইচ্ছা তুমি অপমান-লাঞ্ছিত কর। আর সকল ধরনের কল্যাণ তোমারই হাতে। –[সূরা বাকারা]

উপরিউক্ত আয়াতসমূহ দ্বারা বুঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা যে কাউকে বিপদগামী করেন এতে কারো কোনো হস্তক্ষেপের অধিকার নেই। অবশ্য একথা সত্য যে, আল্লাহ তা'আলা কাউকে কষ্ট দেওয়ার উদ্দেশ্যে বিনা কারণে বিপদগামী, রোগাক্রান্ত ও অপমানিত করেন না। আর তা عَدْل তথা ন্যায় ইনসাফের কারণেই করে থাকেন। কারণ عَدْل শব্দের অর্থ হলো সমান সমান করা। কম বেশ না করা।

এ অর্থের দিক বিবেচনা করে বলা যায় যে, সল্পতা ও আধিক্যের মাঝামাঝি সমতাকে আদল বলে।

তাফসীরকারকগণ এর ব্যাখ্যায় বলেন, আদল হলো অন্যের পাওনা পুরোপুরি দেওয়া এবং নিজের অধিকার পুরোপুরি নেওয়া। এতে কোনো বেশ কম না করা। আর আল্লাহ তা'আলা যে বিপদগামী করেন তা আদল তথা ন্যায়ভাবেই দিয়ে থাকেন। কেননা তিনি বলেন– وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ অর্থাৎ তোমাদের উপর যে বিপদ আরোপিত হয় তা তোমাদের কর্মের ফল এবং তিনি তোমাদের অনেক মাফ করে দেন। –[সূরা শুরা]

উপরিউক্ত আয়াতে وَأَصَابَكُمْ ...... أَيْدِيكُمْ দ্বারা আল্লাহ তা'আলার আদল তথা ন্যায়পরায়ণতার প্রতি ইঙ্গিতবহ হয়েছে।

অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন– وَمَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ অর্থাৎ আপনার যে কল্যাণ হয়, তা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে হয় এবং আপনার যে অকল্যাণ হয় তা আপনার নিজের কারণেই হয়। –[সূরা নিসা]

উপরিউক্ত আয়াতদ্বয় এ কথার প্রতি স্পষ্ট ইঙ্গিত করে যে, মানুষ যে নিয়ামত লাভ করে প্রকৃতপক্ষে তার হকদার তারা নয়; বরং তা আল্লাহ তা'আলার একান্ত অনুগ্রহ ও দয়া ছাড়া কিছু নয়। মানুষ যতই তার ইবাদত বন্দেগি করে, কোনো ক্রমেই তার হকদার তারা নয়। আর মানুষের উপর যে বিপদাপদ আবর্তিত হয়, তা তাদের পাপাচারের কারণেই হয়ে থাকে।

এক্ষেত্রে আপদ আবর্তিত ব্যক্তি যদি অমুসলিম হয়, তবে তা ঐ আজাবের নমুনা স্বরূপ প্রদান করা হবে যা মৃত্যুর পর তার জন্য নির্ধারিত হয়েছে। অবশ্য পরকালের আজাব এর চেয়ে ভয়াবহ ও কঠিন হবে এতে কোনো সন্দেহ নেই।

আর যদি উক্ত ব্যক্তি মু'মিন হয়ে থাকে তবে এ বিপদ তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে পরিগণিত হবে। যা পরকালে তার জন্য মুক্তির কারণ হবে। কারণ হযরত রাসূল ﷺ বলেছেন, এমন কোনো বিপদ নেই যা মু'মিনের উপর আপতিত হয়েছে অথচ এটা তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত নয়। এমনকি যে কাঁটাটি তার পায়ে বিঁধে তাও।

অতএব উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা একথা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, উল্লিখিত আয়াত مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ দ্বারা আল্লাহর দয়া আর অনুগ্রহ বুঝায় এবং আয়াতাংশ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ দ্বারা আল্লাহ তা'আলার আদলের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, ন্যায়ানুগতার কথা বলা হয়েছে।

আল্লাহর সিদ্ধান্ত

لَا رَادَّ لِقَضَائِهٖ وَلَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهٖ وَلَا غَالِبَ لِاَمْرِهٖ.

অনুবাদ : আল্লাহ তা'আলার সিদ্ধান্তকে কেউ পরিবর্তন করতে পারে না এবং তাঁর হুকুমকে কেউ প্রলম্বিত করতে পারে না। আর তাঁর কাজের উপর কেউ প্রভাব বিস্তারকারীও নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ لَا رَادَّ لِقَضَاءِهٖ : ضِدّ বিপরীত ও উল্টো জিনিসকে বলা হয়। তার মিছাল বা দৃষ্টান্ত থাক বা না থাক। আর نِدّ ঐ বস্তুকে বলা হয় যার দৃষ্টান্ত থাকে। আল্লাহ তা'আলার এমন কোনো مُخَالِفْ নেই যার দৃষ্টান্ত হবে না। আর এমন কোনো مُقَابِلْ নাই যা তাঁর মিছাল হবে। যেমন وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ

ضِدّ এবং نِدّ দ্বারা মু'তাজিলাদের অভিমতকে প্রতিহত করা হয়েছে। কেননা তারা বান্দার কর্মের স্রষ্টা বলে আল্লাহর সাথে শরিক করে। মাখলূক কোনো ফায়সালা বা সিদ্ধান্ত নিলে তা কখনো পরিবর্তন বা পরিবর্ধন হতে দেখা যায়, তার ক্ষমতা ও প্রভাব স্বল্পতার কারণে বা অন্য কোনো কারণে। কিন্তু যেহেতু আল্লাহ তা'আলা পরাক্রমশালী, ক্ষমতাবান তাই তিনি কোনো মাখলুকের অনুকূলে বা প্রতিকূলে সিদ্ধান্ত বা ফয়সালা দিলে তা পরিবর্তন পরিবর্ধন বা রদ করার কোনো শক্তি নেই। বরং তাঁর সিদ্ধান্তই অনড়-অটল। কারণ তাঁর এই ফায়সালা যথার্থই, ভুল হতে পারে না।

যেমন তিনি কুরআনে ইরশাদ করেন- وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗٓ اِلَّا هُوَ ـ وَاِنْ يُّرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهٖ يُصِيْبُ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَهُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ অর্থাৎ যদি আল্লাহ তা'আলা আপনার উপর কোনো অনিষ্ট পৌঁছান তাহলে তা দূর করার কেউ নেই। একমাত্র তিনি ছাড়া। আর যদি তিনি আপনাকে কল্যাণ দান করেন তাহলে তার এই অনুগ্রহ ফিরাবার কেউ নেই। তিনি নিজ বান্দাদের যাকে ইচ্ছা তাকে অনুগ্রহ দান করেন। বস্তুত তিনিই ক্ষমাশীল দয়ালু। -[সূরা ইউনুস]

প্রসঙ্গক্রমে আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেন- وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗٓ اِلَّا هُوَ وَاِنْ يَّمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ـ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ. অর্থাৎ আল্লাহ যদি আপনাকে কোনো কষ্ট দেন, তবে তিনি ব্যতীত আর কেউ তার মোচনকারী নেই। আর যদি তিনি আপনার মঙ্গল করেন, তাতে তিনি সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান। তিনি নিজ বান্দাদের উপর পরাক্রমশালী। তিনি হেকমতওয়ালা সর্বজ্ঞাতা। -[সূরা আনআম]

অপর আয়াতে বলা হয়েছে- مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهٗ مِنْ بَعْدِهٖ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা মানুষের জন্য যে অনুগ্রহ বা রহমত উন্মুক্ত করে দেন তা প্রতিহত করার কেউ নেই।

আর তিনি যা বারন করেন তা প্রেরণকারী কেউ নেই একমাত্র তিনি ছাড়া। আর তিনিই পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়। -[সূরা ফাতির]

অন্য আয়াতে বলেন- قُلْ اَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَنِىَ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ اَوْ اَرَادَنِىْ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ অর্থাৎ আপনি বলুন, তোমরা ভেবে দেখেছ কি? যদি আল্লাহ্ তা'আলা কোনো অনিষ্ট করতে চান তবে তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের উপাসনা কর তারা সে অনিষ্ট দূর করতে পারবে কি? অথবা তিনি যদি আমার প্রতি রহমত করতে চান তবে তারা কি সে রহমত প্রতিরোধ করতে পারবে? -[সূরা যুমার]

অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন- وَاِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ سُوْءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُوْنِهِ مِنْ وَّالٍ অর্থাৎ আর যখন আল্লাহ্ তা'আলা কোনো জাতির অমঙ্গল চান, তখন তা রদ করার নয়। -[সূরা রা'দ]

উপরিউক্ত আয়াতসমূহ দ্বারা একথা প্রমাণ হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলাই কোনো কাজের সিদ্ধান্ত দেন এবং তিনি যে কাউকে বিপদাপদ দেন। তিনিই রহমত বর্ষণ করেন। সুতরাং তিনি কাউকে অনিষ্ট পৌঁছালে তা কেউ রদ করতে পারবে না এবং তিনি কাউকে রহমত তথা মঙ্গল দান করলে কেউ তার প্রতিবাদ করতে পারবে না। মোটকথা আল্লাহ্ তা'আলা যে ফায়সালা দিবেন তাই কার্যকর হতে অবশ্যই বাধ্য।

قَوْلُهُ وَلَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ الخ : অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যা কিছু করতে চাইবেন এবং যে সময় করতে চাইবেন ঠিক হুবহু সেই কাজই কার্যকর হবে এবং উক্ত কাজ সেই নির্ধারিত সময়েই সংঘটিত হবে। এক পলকের জন্যও উক্ত কাজ এদিক সেদিক করা হবে না এবং উক্ত কাজও বিন্দুমাত্র পরিবর্তন পরিবর্ধন করা হবে না।

কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলেন- وَاللّٰهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা নির্দেশ দেন, তার নির্দেশকে পশ্চাতে নিক্ষেপকারী কেউ নেই। -[সূরা ইউসুফ]

قَوْلُهُ : وَلَا غَالِبَ لِاَمْرِهِ : অর্থাৎ পৃথিবীর ধারা অনুযায়ী একজন অপর জনের উপর প্রভাব বিস্তার করে যে কোনো কাজের ক্ষেত্রে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা এতই শক্তিশালী আর প্রবল যে, তিনি যে কাজ সম্পাদনের ইচ্ছা করেন সে কাজ হতে কেউ তাঁকে হঠাতে বাঁধা দিতে পারে না। যেহেতু সকল মাখলুক তাঁর শক্তি-সামর্থ্য ও প্রভাবের নিকট একেবারেই তুচ্ছ, তাই তাঁর কাজে কেউ প্রভাব বিস্তার বা ক্ষমতা প্রয়োগের কল্পনাই করা যায় না।

যেমন কুরআনে তিনি বলেন- وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلٰى اَمْرِهِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় কর্মে বা নির্দেশে প্রভাব বিস্তারকারী। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা জানেনা। -[সূরা ইউসুফ]

যখন আল্লাহ্ তা'আলা কোনো কিছুর ইচ্ছা করেন, তখন দুনিয়ার বাহ্যিক সকল বস্তু তাঁর ইচ্ছানুযায়ী সংঘটিত হয়ে যায়। কেননা এক হাদীসে নবী করীম ﷺ বলেন, যখন আল্লাহ্ তা'আলা কোনো কাজের ইচ্ছা করেন, তখন দুনিয়ার সকল উপকরণ তার জন্য প্রস্তুত করে দেন। কিন্তু মানুষ তা বুঝে না। তারা বাহ্যিক উপকরণ সমূহকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকে।

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, আল্লাহকে সমূহ সিফাতের অধিকারী মনে করা ঈমানের একটি অংশ। মু'মিনের বিশ্বাস এমনটিই হওয়া চাই। এর বিপরীত বিশ্বাসে ঈমানের ত্রুটি অবশ্যম্ভাবী।

আল্লাহ তা'আলা সমকক্ষ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার উর্ধ্বে

وَهُوَ مُتَعَالٍ عَنِ الْاَضْدَادِ وَالْاَنْدَادِ اٰمَنَّا بِذٰلِكَ كُلِّهٖ وَاَيْقَنَّا اَنَّ كُلًّا مِنْ عِنْدِهٖ.

অনুবাদ : আল্লাহ তা'আলা সকল প্রতিদ্বন্দ্বী ও সকল সমকক্ষের উর্ধ্বে। উপরিউক্ত আলোচিত সকল বিষয়ের উপর আমরা ঈমান আনলাম এবং এই কথার উপর বিশ্বাস রাখলাম যে, এসব আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে আগত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَهُوَ مُتَعَالٍ الخ : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যেহেতু সকল সৃষ্টির স্রষ্টা, সকল শক্তি ও ক্ষমতার উৎস। তাই তাঁর সৃষ্টি কখনো তাঁর সমকক্ষ বা প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়া সম্ভব নয়। কেননা পৃথিবীর ধারা অনুযায়ী যে কোনো প্রজা ও রাজার মধ্যেই এটা প্রকাশ পায় যে, রাজা যে কোনো আদেশ করতে পারে, কিন্তু প্রজা তা পারে না। রাজা ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়ে দণ্ডবিধি কার্যকর করতে পারে। কিন্তু প্রজা সে ক্ষেত্রে অক্ষম। এভাবে সকল কাজের ক্ষেত্রেই রাজা ও প্রজার মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি হয়ে যায়। সুতরাং যে সত্তা সকল রাজার স্রষ্টা। যিনি সর্ব শক্তিমান, সকল সৃষ্টজীব যাঁর মুখাপেক্ষী, সেই সত্তার সাথে মাখলুকের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা কিভাবে কল্পনা করা যায়? সেই সত্তার প্রতিপক্ষ মাখলুক কিভাবে হতে পারে? এর কল্পনারই প্রশ্ন উঠে না। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার প্রতিদ্বন্দ্বী কেউ হতে পারে না। প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়ার সম্ভাবনাও রাখে না। বরং তিনি এসব হতে অনেক উর্ধ্বে। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন– قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ অর্থাৎ হে নবী! আপনি বলুন, তিনিই আল্লাহ এক ও একক। –[সূরা ইখলাস]

আল্লাহ আরো বলেন– وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ অর্থাৎ তাঁর কোনো সমকক্ষ নেই।

অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন– فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَّاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ অর্থাৎ তোমরা জেনেশুনে আল্লাহর সাথে কাউকে সমকক্ষ বানিয়ো না। –[সূরা বাকারা]

অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন– سُبْحَانَهٗ وَتَعَالٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাদের শিরক হতে পবিত্র ও উর্ধ্বে। –[সূরা যুমার]

অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ অর্থাৎ তোমাদের প্রভু একক ও অদ্বিতীয়। –[সূরা বাকারা]

অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন– سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ অর্থাৎ আপনার প্রভু তারা যা বলে, [মুশরিকরা যে শিরক করে] তা হতে পূত পবিত্র। –[সূরা ছাফফাত]

অতএব উপরিউক্ত আয়াতসমূহ দ্বারা আল্লাহ তা'আলার কোনো সমকক্ষ ও প্রতিদ্বন্দ্বী নেই একথা প্রমাণিত হয়।

قَوْلُهٗ اٰمَنَّا بِذٰلِكَ : অর্থাৎ আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের সকল মু'মিনগণ বলেন যে, আল্লাহ তা'আলার সত্তা ও সিফাতে কামালিয়া প্রমাণিত করার ক্ষেত্রে যে সব আলোচনা করা হয়েছে এবং আল্লাহ তা'আলার সিফাত ও তাঁর সত্তাকে সকল দুর্বলতা থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে যে আলোচনা হয়েছে-এ সবের প্রতি আমরা সকলে ঈমান আনয়ন করলাম। কারণ এগুলো কুরআন সুন্নাহ অনুযায়ী আলোচিত হয়েছে।

বি. দ্র. : ঈমান সম্পর্কে ভূমিকায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। প্রয়োজনবোধে তা দেখে নেওয়া যেতে পারে।

চতুর্থ পাঠ

নবী মুহাম্মদ ﷺ সম্পর্কে আকিদা

وَاِنَّ مُحَمَّدًا ﷺ عَبْدُهُ الْمُصْطَفٰى وَنَبِيُّهُ الْمُجْتَبٰى وَرَسُوْلُهُ الْمُرْتَضٰى.

অনুবাদ : (আর) নিশ্চয় হযরত মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহ তা'আলার নির্বাচিত বান্দা ও মনোনীত নবী এবং পছন্দনীয় রাসূল ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَاِنَّ مُحَمَّدًا الخ : গ্রন্থকার (র.) এতক্ষণ আল্লাহ তা'আলার ব্যাপারে আকিদার আলোচনা করেছেন । সৃষ্টি জগতে আল্লাহর পর মুহাম্মদ ﷺ হলেন সম্মানিত । তাই গ্রন্থকার (র.) দ্বিতীয়ত মুহাম্মদ ﷺ-এর ব্যাপারে কি আকিদা হওয়া চাই তা নিয়ে আলোচনা শুরু করেছেন ।

মুহাম্মদ ﷺ –এর পরিচয় :

১. নাম : হযরত রাসূল ﷺ -এর প্রকৃত নাম সম্পর্কে দু'টি বর্ণনা পাওয়া যায় । যথা–

ক. মহানবী ﷺ -এর সম্মানিত মাতা গর্ভাবস্থায় স্বপ্নে দেখেন তাকে বলা হচ্ছে, হে আমেনা, তোমার গর্ভে উম্মতের সরদার রয়েছে । সে জন্ম হলে তাঁর নাম রাখবে "মুহাম্মদ" ।

খ. ইবনে সা'দ থেকে বর্ণিত একটি রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, মহানবী ﷺ -এর মাতা আমেনাকে স্বপ্নে দেখানো হলো অর্থাৎ বলা হলো যে তাঁর নাম রাখবে 'আহমদ' । অতএব বুঝা গেল হযরত ﷺ-এর মূল নাম দু'টি । যথা– ১. **"মুহাম্মদ"** যেমন আল্লাহর বাণী– وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে– وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاٰمَنُوْا بِمَا نُزِّلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ অন্য আয়াতে বলা হয়েছে مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ ২. **আহমদ,** যেমন আল্লাহর বাণী– وَمُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَّاْتِيْ مِنْ بَعْدِى اسْمُهٗ اَحْمَدُ

এছাড়াও রাসূল ﷺ-এর নাম যে মুহাম্মদ এ ব্যাপারে তাত্ত্বিক আলোচনা হলো :

হযরত রাসূল ﷺ জন্মের সপ্তম দিন তাঁর দাদা আবদুল মুত্তালিব মুহাম্মদ ﷺ -এর আকিকা করেন এবং লোকদেরকে ভোজের দাওয়াত করেন । ভোজপর্ব শেষ করার পর লোকেরা বলল, হে আবদুল মুত্তালিব, তুমি তোমার যে সন্তানের জন্য আমাদেরকে খাওয়ালে, সেই সন্তানের কি নাম রেখেছ? আবদুল মুত্তালিব জবাবে বললেন, আমি তাঁর নাম রেখেছি মুহাম্মদ । লোকেরা পুনরায় জিজ্ঞেস করল, তুমি এর ব্যতিক্রমধর্মী নাম রাখলে কেন? প্রত্যুত্তরে আবদুল মুত্তালিব বললেন, আমি চাই যে, আসমানের অধিপতি এবং পৃথিবীতে তাঁর সকল সৃষ্টি এই মুহাম্মদের প্রশংসা করুক । –[সীরাতে সারওয়ারে আলম]

হযরত রাসূল ﷺ-এর নাম সম্পর্কে বেশ কতেক মুহাক্কিক আলেম বলেন যে, রাসূল ﷺ -এর নাম তাঁর মাতার স্বপ্নের আলোকে রাখা হলো "আহমদ" এবং আবদুল মুত্তালিব তাঁর নাম রাখলেন "মুহাম্মদ" ।

আবার কতেক আলেম বলেন, রাসূল ﷺ -এর নাম مُحَمَّدٌ ও أَحْمَدُ ব্যতীত আল্লাহ তা'আলা আরো কিছু নাম কুরআনে উল্লেখ করেছেন। যেমন- طٰهٰ - يٰسٓ - حٰمٓ ইত্যাদি। তবে রাসূল ﷺ-এর উপনাম হিসেবেই পবিত্র কুরআনে এই নামসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে।

২. **জন্ম তারিখ :** হযরত নবী করীম ﷺ-এর নির্দিষ্ট জন্ম তারিখ নিয়ে অনেক মতভেদ রয়েছে। ইবনে শায়বা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) ও হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (র.)-এর উক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে, রাসূল ﷺ ১২ই রবিউল আউয়াল তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। [সীরাতে সারওয়ারে আলম] ঐতিহাসিক ইবনে ইসহাক এই মতকেই অধিক প্রাধান্য দিয়েছেন।

* তাছাড়া এই তারিখই সমগ্র বিশ্বের গুণী ও জ্ঞানীজনদের নিকট সর্বাধিক প্রসিদ্ধ।

* কেউ কেউ বলেন, মহানবী ﷺ ১৩ই রবিউল আউয়াল তারিখে জন্মগ্রহণ করেছেন।

* আবার অনেকে বলেন ১১ই রবিউল আউয়াল তারিখে জন্মগ্রহণ করেন।

* কারো মতে ১৫ই রবিউল আউয়াল তারিখে জন্মগ্রহণ করেন।

* মুহাম্মদ পাশা ফালাকী (র.) বলেন, মহানবী ﷺ ১২ই রবিউল আউয়াল মোতাবেক ২০শে এপ্রিল ৫৭১ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

* কারো মতে ২৩ শে এপ্রিল ৫৭১ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

* জমহুর মুহাদ্দিসীন ও ঐতিহাসিকদের মতে, عَامُ الْفِيْلِ তথা হস্তীবাহিনীর ঘটনার বছরই রাসূল ﷺ-এর জন্ম। أَصْحَابُ الْفِيْلِ-এর ঘটনার ৫০ দিন মতান্তরে ৪০ দিন পর ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে রবিউল আউয়াল মাসে মহানবী ﷺ জন্মগ্রহণ করেন।

* কায়েস ইবনে মাখরামা বর্ণনা করেন, আমি ও রাসূলুল্লাহ ﷺ আবরাহার হামলার বছর জন্মগ্রহণ করেছি। অবশ্য এ ব্যাপারে সকলেই ঐকমত্য রয়েছে যে, রাসূল ﷺ সোমবার দিন সুবেহ সাদিকের সময় জন্মগ্রহণ করেন।

৩. **বংশ পরিচয় :** ঐতিহাসিকদের সর্বসম্মত মত এই যে, রাসূল ﷺ-এর পরিবার হযরত ইবরাহীম খলিল (আ.)-এর বংশের সেই শাখার সাথে সম্পৃক্ত যা তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র হযরত ইসমাঈল (আ.) থেকে চলে এসেছে। আর এই বংশের পরম্পরই বনি ইসরাঈলী নামে পরিচিত।

৪. **হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর সন্তানগণ :** বাইবেলের বর্ণনানুযায়ী ইসমাঈল (আ.)-এর ১২ জন পুত্রসন্তান ছিল। কুলুজিশাস্ত্রে যা সংরক্ষিত, নির্ভরযোগ্য এবং যাতে কোনো প্রকার মতপার্থক্য নেই। তা হলো এই যে, আদনান ছিল হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র নাবেশতের সন্তানগণের একজন। আর রাসূল ﷺ -এর বংশধারা এই আদনান পর্যন্ত পৌঁছেছে। এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু আদনানের উপর কোনো পুরুষের সাথে রাসূল ﷺ-এর বংশ পরম্পরা সম্পৃক্ত-এর কোনো বিশুদ্ধ প্রমাণ নেই।

হযরত ইবনে মাসউদ ও ইবনে আব্বাসের মতানুযায়ী যারা আদনানের উপর বংশপরম্পরা বর্ণনা করে তারা মিথ্যা বলে। হযরত ওমর (রা.) বলেন, আদনান পর্যন্ত বংশ বর্ণনা করা উচিত।

৫. **রাসূল ﷺ-এর বংশ পরম্পরা :** উপরিউক্ত বক্তব্যের আলোকে আমরা এখানে আদনান পর্যন্তই বংশ পরম্পরা উল্লেখ করলাম। মুহাম্মদ ﷺ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল

মুত্তালিব ইবনে হাশেম ইবনে আবদে মানাফ ইবনে কুসাই ইবনে কিলাব ইবনে মুররা ইবনে কা'ব ইবনে লুয়াই ইবনে গালেব ইবনে ফিহর ইবনে মালেক ইবনে নজর ইবনে কেনানা ইবনে মুদরিকা ইবনে মুদরিকা ইবনে ইলয়াস ইবনে মুযার ইবনে নাযার ইবনে মায়াদ ইবনে আদনান।

হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর বংশ থেকে কেনানাকে আল্লাহ তা'আলা মনোনীত করেছেন এবং কেনানা থেকে কুরাইশকে, কুরাইশ থেকে বনী হাশেমকে এবং বনী হাশেম থেকে হযরত নবী করীম ﷺ কে বিশেষভাবে মনোনীত করেছেন। কারণ রাসূল ﷺ বলেছেন–

عَنْ اَبِىْ عَمَّارٍ شَدَّادٍ اَنَّهُ سَمِعَ وَاثِلَةَ بْنَ الْاَسْقَعِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ اصْطَفٰى كِنَانَةَ مِنْ وُلْدِ اِسْمٰعِيْلَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ وَاصْطَفٰى قُرَيْشًا مِنْ كِنَانَةَ وَاصْطَفٰى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِىْ هَاشِمٍ وَاصْطَفَانِىْ مِنْ بَنِىْ هَاشِمٍ ـ اَلصَّفْحَةُ :٢٤٥ اَلْجُزْءُ : ٢ اَلرَّقْمُ :٢٢٧٦، اَلصَّحِيْحُ الْمُسْلِمُ.

قُرَيْش : قُرَيْش শব্দের ব্যুৎপত্তিগত উৎস খুঁজতে গিয়ে কুলুজিবিদগণের একটি দল অভিমত প্রকাশ করেন যে, নজর ইবনে কোনানারই উপাধি ছিল কুরাইশ। কিন্তু গবেষকগণ বলেন, প্রকৃত পক্ষে কুরাইশ নাজরের নাতি এবং মালেক ইবনে নজরের পুত্র ফিহর এর উপাধি ছিল। আর যারা তার বংশধর তারাই কুরাইশের অন্তর্ভুক্ত বলে অবিহিত হয়। -[সীরাতে ইবনে হিশাম]

কুরাইশ বংশের মর্যাদা : আল্লাহ তা'আলা কুরাইশ বংশকে বিশেষভাবে মনোনীত করার ফলে সে বংশ হতে মহানবী ﷺ-কে প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা আরো একাধিক নিয়ামত দিয়ে এই বংশকে সম্মানিত করেছেন।

রাসূল ﷺ-এর মর্যাদা : প্রত্যেকেই যেন তাঁর স্তর অনুযায়ী যথাযথ মর্যাদা পেতে পারে সে জন্য কুরআন সুন্নায় খুবই গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– وَاٰتِ كُلَّ ذِىْ حَقٍّ حَقَّهٗ অর্থাৎ প্রত্যেক হকদারের হক যথাযথভাবে ফিরিয়ে দাও। অতএব ব্যক্তি যে পরিমাণ সম্মান পাবে তা না দেওয়া জুলুমের শামিল।

তাইতো রাসূল ﷺ প্রত্যেক মানুষকে তার অর্জিত সম্মান অনুপাতে মর্যাদা দানের উদ্দেশ্যে বলেছেন– اَنْزِلُوا النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ অর্থাৎ মানুষকে তাঁর পদমর্যাদা অনুযায়ী সম্মান কর।

উপরিউক্ত বর্ণনানুযায়ী নিম্নে রাসূল ﷺ-এর মর্যাদা বিশ্লেষণ করা হলো–

১. **মহামানব :** রাসূল ﷺ -এর প্রথম মর্যাদা হলো তিনি একজন মানুষ ছিলেন। তিনি কোনো জিন বা ফেরেশতা ছিলেন না। কেননা জিন ও ফেরেশতা হতে মানুষ উত্তম। আল্লাহ তা'আলা বলেন– لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِىْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ অর্থাৎ আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি সর্বোত্তম আকৃতি দিয়ে। -[সূরা তীন : ৪]

তবে তিনি আমাদের মতো মানুষ ছিলেন না। তিনি এমন একজন মহামানব ছিলেন যাকে আল্লাহ তা'আলা রিসালাতের মর্যাদা দিয়ে মহিমান্বিত করেছেন। যেমন– আল্লাহ তা'আলা বলেন– قُلْ اِنَّمَآ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰٓى اِلَىَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ অর্থাৎ [হে রাসূল ﷺ] আপনি বলুন, আমি কেবল মাত্র তোমাদের মতোই একজন মানুষ। [তবে

তোমাদের এবং আমার মধ্যে পার্থক্য হলো এই যে] আমার উপর ওহী নাজিল হয়। আর তোমাদের প্রভু তো কেবল একজনই। –[সূরা কাহফ : ১১০]

* وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ - وَمَا جَعَلْنٰهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِيْنَ. অর্থাৎ তোমার পূর্বে আমি যেসব রাসূল প্রেরণ করেছিলাম, তারাও মানুষ ছিলেন। যাদের উপর আমি ওহী নাজিল করতাম। তোমরা তা না জানলে জ্ঞানীদেরকে প্রশ্ন করো [জেনে নাও]। আমরা ঐ সব নবীদেরকে এমন দেহ দান করিনি যে, তারা আহার করত না এবং তারা অমরও ছিল না। –[সূরা আম্বিয়া : ৭-৮]

* وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ إِلَّا أَنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُوْنَ فِي الْأَسْوَاقِ. অর্থাৎ আর আমি আপনার পূর্বে বহু রাসূল পাঠিয়েছিলাম তাঁরা আহার করত এবং বাজারে চলাফেরা করত। –[সূরা ফুরকান]

* আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন– وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً অর্থাৎ আমি তোমাদের পূর্বে অনেক রাসূল পাঠিয়েছিলাম এবং তাদের জন্য স্ত্রী সৃষ্টি করেছি, সন্তান সন্ততি দিয়েছি। –[সূরা রা'দ : ৩৮]

* مَالِ هٰذَا الرَّسُوْلِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِيْ فِي الْأَسْوَاقِ - لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُوْنَ مَعَهُ نَذِيْرًا - أَوْ يُلْقٰى إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُوْنُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا. অর্থাৎ এ আবার কেমন রাসূল যে আহার করে, হাট বাজারে যায়। তাঁর সাথে একজন ফেরেশতা কেন নেমে এলো না যে তাঁর সাথে থেকে মানুষকে সতর্ক করে দিত? অথবা তাঁর জন্য কোনো রত্নভাণ্ডার দেওয়া হতো। অথবা তাঁর সাথে কোনো ফলের বাগান থাকত। যার থেকে সে খেতে পারত। –[সূরা ফুরকান : ৭-৮]

২. **মানবীয় গুণাবলি :** মহানবী ﷺ একজন মানুষ হওয়ার কারণেই তাঁর জীবন ছিলো আনন্দ, বেদনা, দুঃখ, কষ্ট ও জয় পরাজয়ের সংমিশ্রণে এক সমন্বিত ইতিহাস।

* যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– إِنْ يَمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ - وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. অর্থাৎ [হে নবী] যদি আল্লাহ্ আপনার কোনো ক্ষতি করেন, তাহলে তিনি ছাড়া আর কেউ নেই এ ক্ষতি দূর করার। আর যদি তিনি আপনার কোনো কল্যাণ করতে চান, তবে তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। –[সূরা আন'আম : ১৭]

* قُلْ لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِيْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَاشَاءَ اللّٰهُ অর্থাৎ [হে নবী] আপনি বলে দিন, আমি নিজের জন্য কোনো লাভ ও ক্ষতির ক্ষমতা রাখি না। অবশ্য আল্লাহ চাইলে তা অন্য কথা। –[সূরা ইউনুস]

৩. **তিনি সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ :** মহান আল্লাহ তা'আলা রাসূল ﷺ কে মানব ও জিনজাতির হেদায়েতের জন্য সৃষ্টিজগতের শ্রেষ্ঠত্বের গুণে গুণান্বিত করে পাঠিয়েছেন। কুরআন হাদীসে তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের অনেক সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। যেমন হাদীসে আসছে– أَنَا سَيِّدُ وُلْدِ اٰدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ وَبِيَدِيْ لِوَاءُ الْحَمْدِ وَلَا فَخْرَ وَمَا مِنْ نَبِيٍّ يَوْمَئِذٍ اٰدَمَ فَمَنْ سِوَاهُ إِلَّا تَحْتَ لِوَائِيْ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ

وَلَا فَخْرَ অর্থাৎ [রাসূল ﷺ বলেন] আমি কিয়ামতের দিন আদম সন্তানের নেতা থাকব। এতে কোনো গর্ব নেই। আমার হাতে থাকবে হামদ-এর পতাকা। এতে কোনো অহংকার নেই। সে দিন কোনো নবীই আমার পতাকা ব্যতীত অন্য কোথাও থাকবে না আর আমিই প্রথম ব্যক্তি যার উপর থেকে জমিন সরে যাবে। আর এতে কোনো গর্ব নেই। -[তিরমিযী]

* অপর হাদীসে এসেছে- أَنَا سَيِّدُ وُلْدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ অর্থাৎ আমি হলাম কিয়ামতের দিনে আদম সন্তানের নেতা। আমার সমাধিই সর্বপ্রথম উন্মুক্ত করা হবে। আমি সর্ব প্রথম শাফায়াতকারী [পাপ ক্ষমা করার জন্য সুপারিশ করব] এবং সর্বপ্রথম আমার শাফায়াতই গৃহীত হবে। -[মুসলিম]

* রাসূল ﷺ শুধু মানবের জন্যই নয়; বরং মানব ও জিন জাতির জন্য প্রেরিত হয়েছেন।

পবিত্র কুরআনে এর স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। যেমন জিন জাতির প্রতি আল্লাহ তা'আলার আহ্বান-

* يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ অর্থাৎ হে আমাদের সম্প্রদায়! আল্লাহর প্রতি আহ্বানকারীর আহ্বানে তোমরা সাড়া দাও এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। তাহলে (আল্লাহ) তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন এবং তোমাদেরকে উদ্ধার করবেন কঠিন শাস্তি হতে। -[সূরা আহকাফ : ৩১]

* إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا অর্থাৎ আমরা শুনেছি আশ্চর্য কুরআন, যা হেদায়েতের পথ নির্দেশক। অতএব আমরা এর উপর ঈমান আনলাম। আমরা কখনো আমার প্রভুর সাথে কাউকে শরিক করবো না। -[সূরা জিন : ১-২]

রাসূল ﷺ সমগ্র মানব জাতির জন্য প্রেরিত ছিলেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন- قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا অর্থাৎ হে মানব সম্প্রদায়! নিশ্চয় আমি আল্লাহর রাসূল, তোমাদের সকলের প্রতি প্রেরিত। -[সূরা আ'রাফ : ১৫৮]

নবী করীম ﷺ-কে কাদের নিকট কি জন্য প্রেরণ করেছেন সে সম্পর্কে বলেন,

* وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا অর্থাৎ আমি আপনাকে গোটা মানব জাতির নিকট সুসংবাদ দাতা ও ভীতি প্রদর্শকরূপে প্রেরণ করেছি। -[সূরা সাবা : ২৮]

মহানবী ﷺ জগত সংসারে কি ভূমিকা পালন করবেন সে সম্পর্কে বলেন,

* تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا অর্থাৎ মহিমান্বিত ঐ সত্তা যিনি নিজ বান্দার উপর ফয়সালাকারী গ্রন্থ আল কুরআন নাজিল করেছেন। যাতে তিনি বিশ্বজগতের জন্য সতর্ককারী হন। -[সূরা ফুরকান : ১]

৪. **তাঁর চরিত্র সর্বোত্তম চরিত্র :** মহান আল্লাহ তা'আলা হযরত রাসূল ﷺ-কে সর্বোত্তম চরিত্রে বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত করে প্রেরণ করেছেন। আল কুরআনের ভাষায় যাকে خُلُقٍ عَظِيمٍ বলা হয়। মহানবী ﷺ কে মানুষদেরই মধ্য হতে যাচাই করে আল্লাহ তা'আলা সর্বোত্তম চরিত্র দান করেছেন। তাঁর পুরো জীবনে হাজারো উত্তম চরিত্রের সমাবেশ ঘটে। তাঁর চরিত্রের ঘোষণা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন- وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ অর্থাৎ অবশ্যই আপনি মহান চরিত্রের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত রয়েছেন। -[সূরা কলম : ৪]

* সাহাবায়ে কেরাম হযরত আয়েশা (রা.) কে তাঁর চরিত্রের কথা জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন- أَفَلَا تَقْرَؤُوْنَ الْقُرْآنَ خُلُقُهُ الْقُرْآنُ অর্থাৎ [আয়েশা (রা.) বলেন,] আরে তোমরা কি কুরআন পড়ো না? জেনে রাখো! গোটা কুরআনই হলো রাসূল ﷺ-এর চরিত্র। হযরত রাসূল ﷺ ছিলেন কুরআনেরই জীবন্ত প্রতিচ্ছবি যদি কেউ ইচ্ছা করে কুরআন না পড়ে রাসূল ﷺ-এর জীবন অনুসরণ করে তাহলে কুরআন সামনে এসে যাবে। তিনি জীবনের সর্বক্ষেত্রে কুরআনকে এমনি বাস্তবায়িত করে উম্মতকে দেখিয়ে গেছেন।

৫. **তাঁর আদর্শ সর্বোত্তম আদর্শ :** মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে সর্বোত্তম আদর্শ দিয়ে পাঠিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে যাকে أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ বলে স্বীকৃতি দান করা হয়েছে।

হযরত রাসূল ﷺ-এর গোটা জিন্দেগিকে সর্বস্তরের মানুষের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ বলে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা দেন, তিনি বলেন- لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ অর্থাৎ অবশ্যই তোমাদের প্রত্যেকের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবনে রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ। -[সূরা আহযাব : ২১]

আসলে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মর্যাদার কথা লেখা বা বলা কারো জন্য মোটেই সম্ভব নয়। আল্লাহর পরে যাকে স্থান দিতে হয় তিনিই হলেন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ কবি শেখ সা'দী যথার্থই বলেছেন-

لَا يُمْكِنُ الثَّنَا كَمَا كَانَ حَقُّهُ * بَعْدَ ازْ خُدَا بزرگ تُوئى قِصَّة مُخْتَصَر.

قَوْلُهُ عَبْدُهُ : এই বাক্যটিতে গ্রন্থকার (র.) রাসূল ﷺ-কে عَبْدُهُ বলে এর একটি প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন।

প্রশ্ন : গ্রন্থকার (র.) মহানবী ﷺ-এর অগণিত কামালত তথা পরিপূর্ণ গুণাবলির মধ্য হতে আবদিয়্যাত তথা দাসত্ব গুণটি কেন প্রথমে উল্লেখ করলেন?

প্রথম জবাব : আবদিয়্যাত তথা দাসত্ব গুণটি আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার জন্য প্রদত্ত সকল গুণাবলি ও মর্যাদার মধ্য হতে শ্রেষ্ঠ এবং সমস্ত কামালিয়্যাতের স্তম্ভ। বান্দার মধ্যে যতই আবদিয়্যাতের প্রমাণাদি বেশি মিলবে ততই তার মর্যাদা বৃদ্ধি পেতে থাকবে। আর যেহেতু রাসূল ﷺ আবদিয়্যাতের সর্বোচ্চ শৃঙ্গে উপবিষ্ট তাই তাঁর নামের সাথে আবদিয়্যাত সংযোগ করে আল্লাহ তা'আলার সর্বোচ্চ সম্মানিত আসনে বসানোই যথার্থ।

দ্বিতীয় জবাব : পৃথিবীতে যত নবী রাসূল আগমন করেছেন সকলেই ছিলেন মানুষ। কেউই জিন বা ফেরেশতা ছিলেন না। তাই তাঁদেরই ন্যায় মহানবীও মানুষ ছিলেন। জিন বা ফেরেশতা ছিলেন না। এই দিকে ইঙ্গিত করার জন্য গ্রন্থকার (র.) "রাসূল ﷺ-এর শানে আব্দ বা দাস" শব্দ ব্যবহার করেছেন।

* যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন- وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ يَدْعُوْهُ অর্থাৎ যখন আল্লাহর বান্দা তাঁকে ডাকার জন্য দাঁড়াল। -[সূরা জিন : ১৯]

* আল্লাহ আরো বলেন- سُبْحَانَ الَّذِيْ أَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا অর্থাৎ মহিমান্বিত সেই সত্তা যিনি নিজ বান্দাকে রাতে গমন করিয়েছেন। -[সূরা বনী ইসরাঈল : ১]

* অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন- فَاَوْحٰٓى اِلٰى عَبْدِهٖ مَآ اَوْحٰى অর্থাৎ তখন তিনি নিজ বান্দার উপর যা প্রত্যাদেশ করবার তা করলেন। -[সূরা নাজম : ১০]
* অন্য আয়াতে বলেন- وَاِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَأْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ অর্থাৎ যে ওহী আমি নাজিল করেছি বা ঐশী বাণী প্রক্ষেপণ করেছি আমার বান্দার উপর তাতে যদি তোমরা সংশয় বা সন্দেহ করে থাকো তবে তার মতো একটি সূরা দেখাও। -[সূরা বাকারা : ২৩]
* আরেক আয়াতে বলেন- تَبَارَكَ الَّذِىْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ অর্থাৎ মহিমান্বিত সেই সত্তা যিনি সত্য মিথ্যার মাঝে বিভেদকারী গ্রন্থ স্বীয় বান্দার উপর নাজিল করেছেন। -[সূরা ফুরকান : ১]

উপরিউক্ত আয়াতসমূহ থেকে বুঝা গেল আল্লাহ তা'আলা রাসূল ﷺ কে নিজ বান্দা বলে সম্বোধন করেছেন। সুতরাং গ্রন্থকার (র.) রাসূল ﷺ -এর নামের সাথে عَبْد শব্দ ব্যবহার করে অতি যৌক্তিক কার্য সম্পন্ন করেছেন।

قَوْلُهٗ اَلْمُصْطَفٰى ـ اَلْمُجْتَبٰى ـ اَلْمُرْتَضٰى : এগুলো হযতর নবী করীম ﷺ -এর বিশেষণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। শব্দত্রয় সমার্থক অর্থে ব্যবহার হয়। যার অর্থ নির্বাচিত, মনোনীত, সন্তোষভাজন ব্যক্তি। শব্দত্রয় যদিও এখানে রাসূল ﷺ -এর গুণ বা বিশেষণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু সকল নবীই এ বিশেষণে বিশেষিত ছিলেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন- اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰٓى اٰدَمَ وَنُوْحًا وَّاٰلَ اِبْرٰهِيْمَ وَاٰلَ عِمْرٰنَ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা আদম, নূহ, ইবরাহীমের পরিবার ও ইমরানের পরিবারকে বিশ্ববাসীর উপর মনোনীত করেছেন। -[সূরা আলে ইমরান : ৩৩]

যেহেতু নবী রাসূলগণ আল্লাহ তা'আলার মনোনীত ছিলেন, সেহেতু তাঁরা মাসূম তথা নিষ্পাপ থাকাটাই স্বাভাবিক। পৃথিবীতে মানুষ যে কোনো বিশেষণ বা গুণ কঠোর সাধনা ও অবিরত প্রচেষ্টার দ্বারা অর্জন করতে পারে। কিন্তু নবুয়ত ও রিসালাতের গুণ তথা বিশেষণ অর্জন করা অসম্ভব; বরং আল্লাহ যাকে মনোনীত করেন তিনিই সে বিশেষণের অধিকারী হতে পারেন।

* এতদসম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন- اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهٗ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন, তিনি স্বীয় রিসালাত কার উপর অর্পণ করবেন। -[সূরা আন'আম : ১২৪]
* নবুয়ত বা রিসালাত প্রদান সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ অর্থাৎ আপনার প্রভু যা ইচ্ছা সৃজন করেন এবং যাকে ইচ্ছা নবুয়তের জন্য চয়ন করেন। -[সূরা কাসাস : ৬৮]
* অপর আয়াতে বলেন- اَللّٰهُ يَصْطَفِىْ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا وَّمِنَ النَّاسِ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা মানুষ ও ফেরেশতার মধ্য হতে রাসূল মনোনীত করেন। -[সূরা হজ : ৭৫]

قَوْلُهٗ نَبِيُّهٗ وَ رَسُوْلُهٗ : এখানে গ্রন্থকার (র.) হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর রাসূল ও নবী হওয়ার কথা বর্ণনা করেছেন। নিম্নে নবী ও রাসূল সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা হলো।

রিসালাত পরিচিতি :

* **اَلرِّسَالَةُ -এর শাব্দিক অর্থ :** رِسَالَةٌ শব্দটি একবচন ইসমে মাসদার। এর বহুবচন হলো رَسَائِلُ যার অর্থ- ১. প্রেরণ করা। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন- هُوَ الَّذِىْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى ২. চিঠি, ৩. দূত পাঠানো, ৪. সংবাদ, ৫. مَلَكٌ বা ফেরেশতা এবং ৬. মিশন।
* **পারিভাষিক অর্থ :** রাসূল প্রেরণের ক্রমধারা বা পরিক্রমাকে রিসালাত বলা হয়। এ সম্পর্কে কয়েকটি তাত্ত্বিক সংজ্ঞা পরিলক্ষিত হয়। যথা-
* আল্লাম নাসাফী (র.) বলেন- عَنْ سِفَارَةِ الْعَبْدِ بَيْنَ اللّٰهِ وَبَيْنَ ذِى الْاَلْبَابِ مِنْ خَلِيْقَتِهٖ অর্থাৎ রিসালাত বলা হয়, আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর সৃষ্টিকুলের জ্ঞানীদের মধ্যে কোনো বান্দার মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপন করা।
* রায়েদুত তুল্লাব গ্রন্থ প্রণেতা বলেন- اَلصَّحِيْحَةُ الَّتِىْ يُكْتَبُ فِيْهَا الْكَلَامُ الْمُرْسَلُ অর্থাৎ বিশুদ্ধতম লিপি যাতে প্রেরিত কথা বা বক্তব্য অথবা ভাষণ লিখা হয়।
* আল মুনজিদ অভিধান প্রণেতা বলেন- هِىَ دَعْوَةُ الرَّسُوْلِ لِلنَّاسِ اِلٰى مَا اُوْحِىَ اِلَيْهِ অর্থাৎ রিসালাত বলা হয় আল্লাহ প্রদত্ত প্রত্যাদেশের রাসূলগণ কর্তৃক মানুষদের আহ্বান করাকে।
* ইমাম ত্বহাবী (র.) বলেন, রিসালাত বলা হয়, ঐ সংবাদ বা খবরকে যা আল্লাহ কর্তৃক তাঁর নির্বাচিত একনিষ্ঠ বান্দার প্রতি প্রেরণ করা হয় তখনকার সময়ে সাধারণ মানুষের নিকট পৌঁছানোর জন্য।
* ইমাম রাগেব (র.) বলেন- اَلرِّسَالَةُ هِىَ اَنْ يَبْعَثَ اللّٰهُ الرَّسُوْلَ بِشَرْعٍ يَعْمَلُ بِهٖ وَيُبَلِّغُهٗ অর্থাৎ রিসালাত বলা হয়, আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক এমন শরিয়ত দিয়ে দূত প্রেরণ করাকে যা তিনি আমল করবেন এবং অপরের নিকট তা পৌঁছে দিবেন।

রাসূল পরিচিতি :

رَسُوْلٌ শব্দের আভিধানিক অর্থ : رَسُوْلٌ শব্দটি رُسُلٌ-এর একবচন। অর্থ হলো- সংবাদ বাহক, দূত ও প্রেরিত পুরুষ।

পবিত্র কুরআনে এর বহুল ব্যবহার রয়েছে। যেমন- ১. اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ. ২. وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ ৩. مَا اٰتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ.

رَسُوْلٌ শব্দের পারিভাষিক সংজ্ঞা :

* ইমাম ত্বহাবী (র.) বলেন- اِنَّ الرَّسُوْلَ اَنْ يَجْعَلَ مِنْ عِبَادِهِ الْمُخْلِصِيْنَ ـ الصَّالِحِيْنَ نَبِيًّا ـ نَبَّأَهٗ بِخَبَرِ السَّمَاءِ ثُمَّ اَمَرَهٗ اَنْ يُبَلِّغَ غَيْرَهٗ. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাঁর একনিষ্ঠ সৎবান্দাদের থেকে কাউকে নবী নির্বাচিত করার পর যাকে আসমানি কিতাব দিয়ে অন্যদের নিকট তা পৌঁছিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন তাকে রাসূল বলা হয়।
* মু'জামুল ওয়াসীত গ্রন্থ প্রণেতা বলেন- مَنْ يَبْعَثُهُ اللّٰهُ بِشَرْعٍ يَعْمَلُ بِهٖ وَيُبَلِّغُهٗ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যাকে শরিয়ত দিয়ে প্রেরণ করেন। যার উপর তিনি আমল করেন এবং অন্যের নিকট পৌঁছান।

* আল মুনজিদ গ্রন্থ প্রণেতা বলেন– আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত প্রত্যাদেশ মানুষের কাছে যিনি পৌছে দেন, তিনিই হলেন রাসূল।

রাসূল সার্বক্ষণিক রাসূল : কতেক হাদীসের মাধ্যমে একদল লোক এই সন্দেহ পোষণ করেন যে, রাসূল ﷺ সার্বক্ষণিক রাসূল ছিলেন না। আর প্রত্যেকটি কাজ ও কথা রাসূল হিসেবে বলা ও করা হতো না। এই ভুল বুঝাবুঝি যে সব রেওয়ায়েতের মাধ্যমে হয়েছে সে সবের ইঙ্গিত মূলত অন্য দিকেই করা হয়েছে।

মহানবী ﷺ প্রত্যেক সময় প্রতি মূহূর্তে রাসূল ছিলেন এবং যে উদ্দেশ্য নিয়ে তাকে পাঠানো হয়েছে সে উদ্দেশ্যের প্রতি সর্বদা তিনি সচেতন ছিলেন।

নবী পরিচিতি :

اَلنَّبِيُّ শব্দটি ن - ب - ء তিন বর্ণের সমন্বয়ে গঠিত نَبَأٌ ক্রিয়ামূল হতে গৃহীত। এ হিসেবে অর্থ দাঁড়ায় খবর দেওয়া, সুসংবাদ দেওয়া ইত্যাদি। কিন্তু যদি শেষ বর্ণ و ধরা হয় তাহলে শব্দটির অর্থ হবে উচ্চ হওয়া, মর্যাদাবান হওয়া।

তবে কোনো কোনো অভিধান প্রণেতা বলেছেন এটি নবী হতে ব্যবহৃত। যার অর্থ সুউচ্চ, উঁচুকৃত, মর্যাদাবান। তবে কুরআনুল কারীমের বিভিন্ন ব্যবহার ও কেরাতের বিভিন্ন আলোকে স্পষ্ট হয় যে, "নবী" শব্দ আল্লাহর পক্ষ হতে মানুষদেরকে সংবাদ প্রদানের অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

পারিভাষিক সংজ্ঞা : নবী বলা হয় যাকে পূর্বের কিতাব অনুসারে দীনের দাওয়াত মাখলূকের কাছে পৌছানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

উপরিউক্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী বুঝা যায়, প্রত্যেক রাসূলই নবী। কিন্তু প্রত্যেক নবী রাসূল নন।

নবী ও রাসূলের মধ্যকার পার্থক্য :

শাব্দিক পার্থক্য : نَبِيٌّ শব্দটি نُبُوْءٌ শব্দ হতে উৎকলিত। যা صِفَةُ مُشَبَّهَةٍ সীগাহ। বহুবচন نَبِيُّوْنَ – اَنْبِيَاءُ অর্থ আবির্ভূত হওয়া। رَسُوْلُهُ শব্দটি ইসমে জামেদ। বহুবচন رُسُلٌ অর্থ দূত। সংবাদবাহক।

পারিভাষিক পার্থক্য :

* পরিভাষায় রাসূল বলা হয়, مَنْ اَرْسَلَهُ اللّٰهُ بِالرِّسَالَتِ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যাকে বিধান সম্বলিত গ্রন্থ সহকারে মানব জাতির নিকট পাঠিয়েছেন।
* অপরদিকে نَبِيٌّ বলা হয়– مَنْ يَكُوْنُ مُخْبِرًا عَنِ اللّٰهِ بِاَحْكَامِهِ اَوْ سَفِيْرًا بَيْنَ اللّٰهِ وَبَيْنَ عِبَادِهِ অর্থাৎ যিনি আল্লাহ তা'আলার বিধানসমূহ প্রচার করেন। অথবা আল্লাহ ও তাঁর বান্দাদের মাঝে দূত হিসেবে কাজ করেন।

ব্যবহারিক পার্থক্য : মৌলিকভাবে নবী ও রাসূলের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। পার্থক্য শুধু এতটুকুই–

* প্রত্যেক রাসূল নবী। কিন্তু প্রত্যেক নবী রাসূল নন।
* রাসূলের উপর কিতাব নাজিল হয়েছে। কিন্তু নবীর উপর কিতাব নাজিল হয়নি।
* নবী তাঁর পূর্ববর্তী রাসূলের অনুসারী হন। কিন্তু রাসূল এমনটি নন।

রাসূল প্রেরণের রহস্য : রাসূলগণকে ভূপৃষ্ঠে প্রেরণের অনেক রহস্য রয়েছে। নিম্নে তা সবিস্তারে উপস্থাপিত হলো।

* বাতিলের উপর সত্য ধর্মকে বিজয়ী করা। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন- هُوَ الَّذِىْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ. (اَلتَّوْبَةُ)
* মানুষকে প্রভু প্রদত্ত ঐশী বাণী শিক্ষা দেওয়া।
* ঈমান ও নৈতিকতা সংশোধন করা।
* আসমানি কিতাব এবং ইসলামি জীবন ব্যবস্থার যাবতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান ও কলা কৌশলের প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদেরকে পথভ্রষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করা। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন- لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ اٰيَاتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلَالٍ مُّبِيْنٍ. (اٰلِ عِمْرَانَ)
* মানুষদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ ও দোজখের ভয়ভীতি প্রদর্শনের জন্য।

رُسُلًا مُّبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌ. اَلنِّسَاءُ : ١٦٥

* মানবজাতির চারিত্রিক দিক সংশোধনের জন্য। হাদীসের ভাষায়-

اِنَّ اللّٰهَ بَعَثَنِىْ لِتَمَامِ مَكَارِمِ الْاَخْلَاقِ

* সৃষ্টি জগতের জন্য রহমত স্বরূপ। وَمَا اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ - (اَلْاَنْبِيَاءُ)
* জগতবাসীকে আল্লাহর রঙে রঙিন করার জন্য-

صِبْغَةَ اللّٰهِ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً - (اَلْبَقَرَةُ)

হযরত মুহাম্মদ ﷺ নবী ও রাসূল :

হযরত মুহাম্মদ ﷺ নবী ও রাসূলের সকল গুণে গুণান্বিত ছিলেন। কেননা আল্লাহ তা'আলা এই সম্পর্কে পবিত্র কালামে বলেন- اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِىَّ الْاُمِّىَّ الَّذِىْ يَجِدُوْنَهُ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِى التَّوْرٰةِ وَالْاِنْجِيْلِ অর্থাৎ যারা অনুসরণ করে রাসূল ও উম্মী নবীর যার সম্পর্কে [আহলে কিতাবরা] নিজেদের কাছে সংরক্ষিত তাওরাত ও ইঞ্জিলে লিখিত পায়। -[সূরা আ'রাফ : ১৫৭]

* আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মদ ﷺ-কে উদ্দেশ্য করে অন্য আয়াতে বলেন- يٰاَيُّهَا النَّبِىُّ اِنَّا اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا. অর্থাৎ হে নবী, আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি সাক্ষী ও সুসংবাদাতা এবং ভয় প্রদর্শক হিসেবে। -[সূরা আহযাব : ৪৫]
* অপর আয়াতে বলেন- يٰاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ অর্থাৎ হে রাসূল, আপনি পৌঁছে দিন যা আপনার প্রভুর পক্ষ থেকে আপনার প্রতি অবতারিত হয়েছে। -[সূরা মায়েদা : ৬৭]

উল্লিখিত প্রথম আয়াতে একসাথে এবং শেষ দু'টি আয়াতে ভিন্ন ভিন্নভাবে মহানবীকে নবী ও রাসূল নামে সম্বোধন করা হয়েছে।

মুহাম্মদ ﷺ সর্বশেষ নবী ও নবীদের সরদার

خَاتِمُ الْاَنْبِيَاءِ وَاِمَامُ الْاَتْقِيَاءِ وَسَيِّدُ الْمُرْسَلِيْنَ وَحَبِيْبُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

অনুবাদ : হযরত মুহাম্মদ ﷺ সর্বশেষ নবী এবং মুত্তাকীদের ইমাম। আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিত সকল রাসূলদের নেতা এবং সমগ্র জাহানের প্রতিপালকের একান্ত বন্ধু।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ خَاتِمُ الْاَنْبِيَاءِ : এখানে গ্রন্থকার (র.) বলেন, হযরত নবী করীম ﷺ সর্বশেষ নবী। তাঁর পরে আর কোনো নবী আসবে না। তিনিই খাতিমে নবুয়ত। নিম্নে খতমে নবুয়তের পরিচিতি তুলে ধরা হলো।

عَقِيْدَه خَتْم نُبُوَّت অর্থাৎ রাসূল ﷺ خَاتِمُ الْاَنْبِيَاءِ বা সর্বশেষ পয়গাম্বর হওয়া, তাঁর পর দুনিয়ায় আর কোনো নবী না আসা এবং তার পরবর্তী সময়ে নবুয়তের দাবিদার সকলেই মিথ্যুক ও কাফের হওয়া এমন এক অকাট্য মাসআলা যার উপর সাহাবায়ে কেরাম (রা.) থেকে আজ পর্যন্ত সকল মুসলমান ঐকমত্য পোষণ করেছেন। কিন্তু পাঞ্জাবের কাদিয়ান নামক গ্রামের এক মিথ্যাবাদী মির্জা গোলাম আহমদ নবুয়তের মিথ্যা দাবি উত্থাপন করে। অতঃপর সে তার অনুসারীদের নিয়ে উক্ত মাসআলার ব্যাপারে মুসলমানদের অন্তরে সংশয় সন্দেহ সৃষ্টির জন্য বহু পুস্তিকা রচনা করে এবং এর মাধ্যমে বিভিন্নভাবে পথভ্রষ্টতা সৃষ্টির চেষ্টা করে। পাকিস্তানের ওলামায়ে কেরামের প্রচেষ্টায় সরকারিভাবে কাফের ঘোষণা করায় সেখানে তারা অগ্রসর হতে পারেনি। এদের ব্যাপারে মুফতি শফী (র.) মারেফুল কুরআনে যা লিখেছেন তা খুবই যৌক্তিক। তিনি লিখেন–

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمًا. اَلْاَحْزَابُ : ٤٠

خَاتَم শব্দটি দুইভাবে পড়া যায়। ت বর্ণে যবর ও যের উভয়টায় জায়েজ। এতে অর্থের কোনো তফাৎ হয় না। উভয় অবস্থায়ই শেষ নবী ও মোহর অর্থে আসে।

খতমে নবুয়ত পরিচিতি :

খতমে নবুয়তের শাব্দিক অর্থ :

১. ফাদার লবইস বলেন, কোনো বস্তুর খতম বা খাতিম অর্থ হলো, তার উপর সিল করা। আর পত্র বা গ্রন্থের উপর খতমের অর্থ ঐ পত্র বা গ্রন্থের পাঠ বা পড়ে শেষ করা।

খাতম বা খাতিম উভয় উচ্চারণই ব্যবহৃত হয়। কিন্তু উভয়ের অর্থ এক ও অভিন্ন। অর্থাৎ নবীগণের আবির্ভাব ও ধারার সমাপ্ত সাধনকারী। উভয়টি আবার মহর অর্থেও ব্যবহৃত হয়। خَاتَم শব্দটির উভয় অর্থই রয়েছে। [কামূসুস সিহাহ, লিছানুল আরব, তাজুল উরূস]

২. তাফসীরে রূহুল মা'আনীতে বলা হয়েছে– اَلْخَاتَمُ اِسْمُ الَةٍ لِمَا يُخْتَمُ بِهٖ فَمَعْنٰى كَالطَّابِعِ لِمَا يُطْبَعُ بِهٖ فَمَعْنٰى خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ الَّذِيْ خَتَمَ النَّبِيُّوْنَ بِهٖ وَمَا لَهٗ اٰخِرُ النَّبِيِّيْنَ. অর্থাৎ "খাতম" বলা হয় ঐ যন্ত্রকে যার মাধ্যমে সমাপ্তি সাধন করা হয়। যেমন তাবে' বলা হয় ঐ যন্ত্রকে যার মাধ্যমে ছাপা হয়। এ হিসেবে خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ অর্থ হলো এমন ব্যক্তি যার মাধ্যমে নবীর ধারার সমাপ্তি ঘটানো হয়েছে এবং তার পরে কোনো নবীও নেই।

এই কথা তাফসীরে বায়যাবী এবং আহমদী উভয়টায় উল্লেখ করা হয়েছে

৩. ইমাম রাগেব ইস্পাহানী (র.) বলেন– خَاتَمُ النُّبُوَّةِ لِاَنَّهٗ خَتَمَ النُّبُوَّةَ اَيْ تَمَّمَهَا بِمَجِيْئِهٖ অর্থাৎ তাকে এজন্য খাতেমে নবুয়ত বলা হয়, কেননা তিনি আগমন করে নবুয়তের পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন।

৪. ইবনে সাবেদাত বলেন-- خَاتَمُ كُلِّ شَيْءٍ خَاتِمَهٗ وَعَاقِبَتُهٗ وَاٰخِرُهٗ অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তুর খাতেম হলো বস্তুর শেষ অবস্থা, পরিণতি ও পরিসমাপ্তি।

৫. খাতেম শব্দের অর্থ কখনো উপত্যকার শেষ প্রান্তও আসে আবার কখনো একদল মানুষের শেষ ব্যক্তিকেও খাতেম বলা হয়। এ হিসেবে এডওয়ার্ড উইলিয়ামলেন خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ -এর অর্থ করেছেন The last of the prophet অর্থাৎ পয়গাম্বরদের সর্বশেষ।

প্রখ্যাত আরবি ভাষাবিদদের দৃষ্টিতে :

১. ইমাম ইবনে জারীর তাবারী (র.)-এর মতে, খাতাম শব্দের অর্থ হলো নবীদের সর্বশেষ।

২. ইমাম রাগেব ইস্পাহানী বলেন, খাতাম শব্দের অর্থ হলো নবুয়ত সমাপ্তকারী।

৩. ইবনুল ফারিস বলেন, খাতামা অর্থ হলো বস্তুর শেষ পর্যন্ত পৌঁছা। আর নবী ﷺ খাতামুল আম্বিয়া। কেননা তিনি সকল নবীর পরে এসেছেন।

৪. খাজেন বলেন, খাতিমুন নাবিয়্যীন অর্থ– তার দ্বারা আল্লাহ তা'আলা নবুয়ত সমাপ্ত করে দিয়েছেন। অতএব তাঁর পর কোনো নবী নেই।

৫. সাহেবে মাজমা বলেন, খাতিম বা খাতাম নবী ﷺ-এর অন্যতম নাম। ت বর্ণটি যের যুক্ত হলে, ইসম বা বিশেষ্য হবে। অর্থাৎ সর্বশেষ নবী।

৬. মুঈজুদ্দীন ফিরোজাবাদী বলেন, প্রত্যেক বিষয়ের পেছনের বা সর্বশেষ অংশকে খাতেম বলে এবং লোকের মধ্যে শেষ ব্যক্তিকেই খাতেম বলে।

৭. ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন, একমাত্র কারী আসেম (র.)-ই ة বর্ণে যবর দিয়ে পড়েছেন। অর্থ হলো পৃথিবীতে নবীগণের আগমন তাঁর দ্বারাই শেষ করা হয়েছে। আর অধিকাংশ আলেমগণই ة বর্ণে যের দিয়ে পড়েন। অর্থ হলো তিনি তাদেরকে সমাপ্ত করেছেন।

৮. ইমাম জুবাইদী (র.) বলেন, রাসূল ﷺ-এর অন্যতম নাম খাতিম/ খাতাম। যার অর্থ ঐ ব্যক্তি যার আগমনে নবুয়ত সমাপ্ত হয়েছে।

৯. জাওহারী (র.) বলেন, কোনো বস্তুর খাতেম তার শেষ বা পরিসমাপ্তিকে বলা হয়। আর মুহাম্মদ ﷺ নবীগণের সর্বশেষ।

১০. আরবি ভাষায় বলা হয় خَاتَمُ الْقَوْمِ اٰخِرُهٗ অর্থাৎ জাতির শেষ ব্যক্তিই হলো খাতামুল কওম। –[লিসানুল আরব, নবুয়তে মুহাম্মদী, কাদিয়ানী মতবাদ, আস সিহাহ]

পারিভাষিক বিশ্লেষণ :

* ইসলামের পরিভাষায় হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর আগমনের মাধ্যমে নবুয়তের দরজা চিরতরে বন্ধ করে দিয়ে আল্লাহ তা'আলা নবুয়ত ও রিসালাতের যে পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন, তাকেই খতমে নবুয়ত বলা হয়।

উপরিউক্ত আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা দ্বারা সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, মুহাম্মদ ﷺ -ই সর্বশেষ নবী। নিম্নে এ সম্পর্কে কুরআন ও হাদীস সম্বলিত দলিল পেশ করা হলো।

কুরআনের দলিল :

* مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّنَ অর্থাৎ মুহাম্মদ ﷺ তোমাদের কোনো পুরুষের পিতা নন; বরং তিনি হলেন আল্লাহর প্রেরিত রাসূল ও সর্বশেষ নবী। —[সূরা আহযাব : ৪০]
* اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَ رَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا অর্থাৎ আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পরিপূর্ণ করলাম এবং আমার নিয়ামত তোমাদের উপর পরিসমাপ্ত করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দীন হিসেবে পছন্দ করলাম। —[সূরা মায়েদা : ৩]
* وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ قَالَ اُوْحِيَ اِلَيَّ وَلَمْ يُوْحَ اِلَيْهِ شَيْءٌ وَّمَنْ قَالَ سَاُنْزِلُ مِثْلَ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ অর্থাৎ তার চেয়ে অধিক জালেম আর কে হতে পারে? যে আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ করে অথবা সে বলে আমার প্রতি ঐশী বাণী অবতারিত হয়েছে। অথচ তার উপর কোনো প্রকার ঐশীবাণী অবতীর্ণ হয়নি। আর যে বলে অতিসত্তর আমিও অবতীর্ণ করে যেমন আল্লাহ তা'আলা অবতরণ করেছেন। —[সূরা আন'আম : ৯৩]
* উপরিউক্ত আয়াত্রয়ের মধ্য হতে প্রথমটিতে স্পষ্টভাবে মহানবী ﷺ -এর সর্বশেষ নবী হওয়ার কথা বলা হয়েছে।
* দ্বিতীয়টিতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী মুহাম্মদ ﷺ -এর মাধ্যমে তাঁর দীনকে পরিপূর্ণ হওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। আর যেহেতু দীন পরিপূর্ণ হলো সুতরাং আর কোনো নবী রাসূলের প্রয়োজন থাকল না।
* আর তৃতীয় আয়াতে মিথ্যা নবুয়তের দাবিদারদের মূলে কুঠারাঘাত করলেন।

হাদীসের দলিল :

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ كَانَتْ بَنُوْ اِسْرَائِيْلَ تَسُوْسُهُمُ الْاَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَاِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِيْ وَسَيَكُوْنُ خُلَفَاءُ.

অর্থাৎ নবী করীম ﷺ বলেন, বনী ইসরাঈলের নেতৃত্ব দিত নবীগণ। যখনই কোনো নবী মৃত্যুবরণ করতেন তখনই তাঁর স্থলাভিষিক্ত অন্যজন হতেন। আর আমার পরে কোনো নবী আসবে না। আসবে শুধু খলিফা। —[বুখারী]

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَبْعَثْ نَبِيًّا اِلَّا حَذَرَ اُمَّتَهُ الدَّجَّالَ وَاَنَا اٰخِرُ الْاَنْبِيَاءِ وَاَنْتُمْ اٰخِرُ الْاُمَمِ وَهُوَ خَارِجٌ فِيْكُمْ لَا مَحَالَةَ.

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা এমন কোনো নবী পাঠাননি যিনি নিজ উম্মতকে দাজ্জাল সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করেননি। কিন্তু তাদের যুগে সে বের হয়নি। এখন আমিই শেষ নবী এবং তোমরা শেষ উম্মত। দাজ্জাল নিঃসন্দেহে তোমাদের সময়ে আবির্ভাব হবে। -[ইবনে মাজাহ]

قَالَ النَّبِيُّ اِنَّ مَثَلِيْ وَمَثَلَ الْاَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِيْ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنٰى بَيْتًا فَاَحْسَنَهُ وَاَجْمَلَهُ اِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ زَاوِيَةٍ فَجَعَلَ النَّاسُ - اِلٰى اٰخِرِ الْحَدِيْثِ.

অর্থাৎ নবী করীম ﷺ বলেন, আমি ও আমার পূর্ববর্তী নবীদের দৃষ্টান্ত হলো এই যে, এক ব্যক্তি একটি অট্টালিকা তৈরি করল এবং সে দালানটিকে খুবই সুন্দর শোভনীয় করে সজ্জিত করল। কিন্তু তার কোনো একটি ইটের স্থান শূন্য ছিল। দালানটি চতুর্দিক হতে তার সৌন্দর্য্য বিচ্ছুরিত করছিল এবং বলছিল এই স্থানে একটি উত্তম ইট প্রতিস্থাপন করা হলো না। কাজেই আমি সেই ইট এবং সেই নবী। অর্থাৎ আমার আগমনের মাধ্যমে নবুয়তের দালান পূর্ণতা লাভ করেছে। এখন আর শূন্যস্থান নেই। অতএব আমার পরে নবীরও দরকার নেই। -[বুখারী]

খতমে নবুয়ত সম্পর্কে যৌক্তিক প্রমাণ :

* আমাদের এই নশ্বর বিশ্বের বুকে এক নবীর পর অন্য নবী আসার সাধারণত ৩টি কারণ বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। যথা-

১. প্রথম নবীর প্রদত্ত শিক্ষা লুপ্ত হয়ে গেছে। তাকে পুনরায় পেশ করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। কিন্তু এ ধরনের কোনো কারণ বর্তমানে অবশিষ্ট নেই। ভবিষ্যতেও থাকবে না। কারণ আল্লাহ তা'আলা اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهُ لَحَافِظُوْنَ অর্থাৎ আমি কুরআন নাজিল করেছি। আমিই তা সংরক্ষণ করব [বলে অবলুপ্তির যে সম্ভাবনা ছিল তা তিরোহিত করেছেন]। অতএব কুরআন এখনো রয়েছে। ভবিষ্যতেও থাকবে। [হিজর] এতে কোনো সংশয় বা সম্ভাবনা নাই।

২. প্রথম নবীর শিক্ষা একটি জাতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। যার ফলে অন্য জাতির জন্য অন্য নবীর প্রয়োজন। এ কারণটি বর্তমানে অবশিষ্ট নেই। অতএব নবীরও প্রয়োজন নেই। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا অর্থাৎ আমি আপনাকে সকল মানুষের জন্য সুসংবাদ দাতা ও ভীতি প্রদর্শকরূপে প্রেরণ করেছি। -[সূরা সাবা : ২৮]

* অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন- قُلْ يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا অর্থাৎ আপনি বলুন হে লোক সকল! নিশ্চয় আমি তোমাদের সকলের জন্য রাসূল। -[সূরা আ'রাফ : ১৫৮]

৩. প্রথম নবীর শিক্ষা অপূর্ণাঙ্গ, কাজেই তা পরিবর্তন পরিবর্ধনের একান্তই প্রয়োজন। কাজেই অন্য নবীর আগমন ছিল অতি জরুরি। এ কারণটিও বর্তমানে অনুপস্থিত। কাজেই বর্তমানে কোনো নবীর আগমন প্রয়োজন নেই।

* কেননা তৎসম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন- اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ الخ অর্থাৎ আজ তোমাদের জন্য দীনকে পূর্ণাঙ্গ করলাম এবং তোমাদের উপর আমার কর্তৃক প্রদত্ত নিয়ামতকে পরিপূর্ণ করলাম। -[সূরা মায়েদা : ৩]

উপরিউক্ত দলিল প্রমাণ দ্বারা একথা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, হযরত মুহাম্মদ ﷺ ই সর্বশেষ নবী। তাঁর পরে কোনো নবী আসবে না। সুতরাং রাসূল ﷺ কে খাতামুন নাবিয়্যীন মনে না করা বা তা অস্বীকার করা কুফরি। যে ব্যক্তি তা অস্বীকার করবে সে কাফের হয়ে যাবে। যেমন- মুসলমান থেকে হিন্দুরা বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে। এমনকি এ ব্যাপারে সন্দেহের মধ্যে থাকাটাও কুফরি। নিম্নে খতমে নবুয়ত অস্বীকারকারীদের কিছু চিত্র তুলে ধরা হলো।

খতমে নবুয়ত অস্বীকারকারীদের দলিল :

১. খতমে নবুয়ত অস্বীকারকারীরা নিম্নোক্ত আয়াতটির ভুল ব্যাখ্যা বা অপব্যাখ্যা করত: খতমে নবুয়ত অস্বীকার করে وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ এই আয়াতে خَاتَمْ শব্দটি আংটি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং এর অর্থ হবে, কিন্তু তিনি আল্লাহ রাসূল ও নবীদের আংটি।

* আবার তারা বলেন, خَاتَمْ শব্দটি এখানে শ্রেষ্ঠ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তাহলে অর্থ হবে, "তিনি নবীদের শ্রেষ্ঠ।" অতএব এই আয়াত নবুয়ত সমাপ্তি হওয়া বুঝায় না।

২. অপর একটি আয়াত দ্বারা তারা দলিল পেশ করে وَاِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيّٖنَ مِيْثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوْحٍ এই আয়াতে مِنْكَ তোমার থেকে দ্বারা আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মদ ﷺ হতে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন। আর এখানে যে অঙ্গীকারের কথা বলা হয়েছে, তা সূরা আলে ইমরানে উল্লেখ করা হয়েছে। আর সূরা আলে ইমরান ও আহযাবে উল্লিখিত অঙ্গীকারসমূহ হতে বোধগম্য হয় যে, আল্লাহ তা'আলা অন্যান্য নবী থেকে যে অঙ্গীকার নিয়েছেন তা মুহাম্মদ ﷺ থেকেও নিয়েছেন। যা পরবর্তী নবীদের উপর ঈমান আনা ও তাদেরকে সাহায্য করার অঙ্গীকার বুঝায়। সুতরাং নবুয়তের দ্বারা এখনো উন্মুক্ত। [নাউজুবিল্লাহ]

তাদের দলিলের জবাব :

খতমে নবুয়ত অস্বীকারকারীদের দলিলের অসারতা ব্যাখ্যা পূর্বক নিম্নে প্রত্যুত্তর প্রদান করা হয়েছে-

১. আয়াতের প্রেক্ষাপটের প্রতি লক্ষ্য করলে বুঝা যায় যে, خَاتَمُ النَّبِيّٖنَ -এর অর্থ নবীদের পরিসমাপ্তকারী। অর্থাৎ তিনি সর্বশেষ নবী।

২. বিশ্ববিখ্যাত অভিধান লিসানুল আরবসহ বহু গ্রন্থেই خَاتَمْ-এর অর্থ পরিসমাপ্তি বলা হয়েছে। যেমন- خَاتَمُ الْقَوْمِ اٰخِرُهُمْ জাতির শেষ ব্যক্তিই খাতামুল কাওম।

৩. যে অঙ্গীকারের কথা আয়াতে বলা হয়েছে, তার দ্বারা পরবর্তী নবীর সত্যায়নকে বুঝায়নি; বরং আল্লাহর কিতাবকে আকড়ে ধরার, তাঁর বিধানসমূহকে পালন করার ও জনসমক্ষে তা প্রকাশ করার জন্য যে অঙ্গীকার সকল নবী থেকে নেওয়া হয়েছিল এখানে তাই বলা হয়েছে।

খতমে নবুয়ত অস্বীকারকারীদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ :

রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন- اِنَّهٗ سَيَكُوْنُ فِىْ اُمَّتِىْ كَذَّابُوْنَ ثَلَاثُوْنَ كُلُّهُمْ يَزْعَمُ اَنَّهٗ نَبِىٌّ وَاَنَا خَاتَمُ النَّبِيّٖنَ لَا نَبِىَّ بَعْدِىْ অর্থাৎ অতিসত্তর আমার উম্মতের মধ্যে ত্রিশজন মিথ্যাবাদীর আবির্ভাব হবে। প্রত্যেকেই নিজেকে নবী বলে দাবি করবে। অথচ আমিই সর্বশেষ নবী আমার পরে কোনো নবী নেই। -[আবূ দাউদ]

রাসূলের এই ভবিষ্যতবাণী তাঁর ইহধাম ত্যাগের পরই বাস্তবে প্রমাণিত হয়েছে। রাসূল ﷺ -এর তিরোধানের কিছু দিন পর মুসায়লামাতুল কাজ্জাব নবী দাবি করে বসল এবং খতমে নবুয়ত অস্বীকার করল এবং তার সাথে সাথে অন্য ভূখণ্ডে আরো কিছু মিথ্যা ভণ্ড নবুয়তের দাবিদার প্রকাশ হলো। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো সাজাহ, আসওয়াদ আনাসী ও তুলাইহা প্রমুখ।

তাদের পরিণাম :

খলিফাতুল মুসলিমীন হযরত আবূ বকর (রা.) মিথ্যা নবুয়তের দাবিদারদের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম অস্ত্র ধারণ করে এদের অঙ্কুর বীজকেই দমন করেন। কালের আবর্তনে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে এদের উৎপত্তি প্রায়শই লক্ষ্য করা যায়। এদের মধ্য থেকেই বিশ্ব গাদ্দার ও মিথ্যাবাদি মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী অন্যতম। নিচে তার মিথ্যা দাবির কিছু নমুনা তুলে ধরা হলো।

কাদিয়ানির উৎপত্তি :

মুসলিম বিদ্বেষী হিন্দু ও ইংরেজদের পরম সহযোগিতা, সমর্থন ও অর্থের মাধ্যমে মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী বিংশ শতাব্দীতে সর্বপ্রথম খতমে নবুয়ত অস্বীকার করে মিথ্যা নবুয়তের দাবিদার হয়। যার ফলে অবিভক্ত ভারতের দাবিদার কংগ্রেস লাভবান হয়। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের অন্ধ প্রেমিক চরম মুসলিম বিদ্বেষী হিন্দু ও কংগ্রেসের সর্বাত্মক সহযোগিতায় ভণ্ড ও মিথ্যা নবুয়তের দাবিদার কাদিয়ানি ও তার সম্প্রদায় কিছুটা অগ্রসর হতে সক্ষম হয়।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশে এদের অপতৎপরতা :

এই ভ্রান্ত ও ভণ্ড নবুয়তের দাবিদার কাদিয়ানি ও তার সম্প্রদায় পৃথিবীর অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রে তাদের অপতৎপরতা অব্যাহত রাখে। তবে সৌদি আরব, পাকিস্তান ও ইরানসহ বেশ কয়েকটি মুসলিম রাষ্ট্রে তাদের অপতৎপরতা অব্যাহত রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। বরং এদেরকে উল্লিখিত দেশগুলো সরকারিভাবে অমুসলিম ঘোষণা করেছে।

বাংলাদেশে এদের প্রভাব :

বাংলাদেশে এই ভণ্ড ও মালাউন সম্প্রদায় ব্যাপক তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। নিজেদেরকে তারা "আহমদিয়া মুসলিম জামাত" নামে পরিচয় দিচ্ছে। ঢাকার বকশি বাজারে এই ভ্রান্ত মতাবলম্বীদের মূল কার্যালয় রয়েছে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, বাংলাদেশের সরকার এদের অমুসলিম ঘোষণা দেওয়া দূরে থাক বরং এদের গোপনে মদদই করছে। এরা ইহুদি ও বিধর্মীদের অর্থে লালিত হয়ে সর্বদা মুসলমানদের ক্ষতি সাধনে তৎপর। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এদের বেড়াজাল থেকে হেফাজত করুন।

قَوْلُهُ إِمَامُ الْأَنْبِيَاءِ : অর্থাৎ নবী করীম ﷺ সকল নবীদের বা মুত্তাকীদের ইমাম বা নেতা। কেননা নবুয়তের দশ হিজরি ২৭শে রজব মে'রাজের রাতে যখন তিনি মক্কা হতে বায়তুল মাকদিসে গেলেন, তখন তিনি সকল নবীদের নামাজের ইমামতি করেন। অতএব যিনি নবীদের ইমাম হতে পারেন তিনি তো মুত্তাকীনদের ইমাম হওয়ার কথা বলারই দরকার নেই। কারণ নবুয়তের প্রভাবে তাকওয়া অর্জিত হয়। কিন্তু তাকওয়ার প্রভাবে নবুয়ত নয়। আর নবীদের চেয়ে কেউ বেশি আল্লাহ ভীরু হতে পারে না। এজন্যই তিনি বলেছেন- وَاللّٰهِ اَخْشَاكُمْ وَاَتْقَاكُمْ اللّٰهَ অর্থাৎ আল্লাহর শপথ তোমাদের চেয়ে আমিই বেশি আল্লাহকে ভয় করি এবং আল্লাহর তাকওয়া অন্তরে রাখি।

সুতরাং যখন প্রমাণ হলো যে, নবীরা সবচেয়ে বড় মুত্তাকী। আর আমাদের নবী ﷺ সকল নবীর ইমাম। অতএব তিনি সকল মুত্তাকীদেরও ইমাম।

قَوْلُهُ سَيِّدُ الْمُرْسَلِيْنَ : অর্থাৎ হযরত নবী করীম ﷺ সকল নবীর সর্দার বা নেতা। পূর্বে বলেছিলাম যে হযরত রাসূল ﷺ কে নবুয়তের ১০ম বছর ২৭ শে রজব যখন মক্কা থেকে বায়তুল মাকদিসে নেওয়া হয়, তখন সেখানে হযরত জিবরাঈল (আ.) তাঁকে সকল নবীর

ইমামতির জন্য সামনে বাড়িয়ে দিলেন। অতএব এই আচরণ দ্বারা প্রমাণ করে যে, তিনি সকল নবীদের নেতা বা ইমাম। শুধু ইহকালীন ইমাম বা নেতা নন; বরং পরকালীন জীবনেও নেতা। কেননা তিনিই নিজেই বলেছেন- أَنَا سَيِّدُ وُلْدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ وَلَا فَخْرَ وَمَا مِنْ نَبِيٍّ يَوْمَئِذٍ آدَمَ فَمَنْ سِوَاهُ إِلَّا تَحْتَ لِوَائِي وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ وَلَا فَخْرَ অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আমি সকল আদম সন্তানের নেতা থাকব। এতে আমার কোনো গর্ব নয় এবং আমার হাতেই হামদের পতাকা থাকবে। এতেও কোনো অহংকার নয়। ঐ দিন সকল নবীই আমার পতাকা তলে থাকবেন। আর সর্ব প্রথম আমিই সমাধি হতে উঠব। আর এতেও কোনো গর্ব নয়। -[তিরমিযী]

যেহেতু কিয়ামতের দিন বাবা আদম (আ.) থেকে সর্বশেষে মৃত্যু প্রাপ্ত ব্যক্তি তথা সকল মানুষ একত্রিত হবে এবং সেই দিনই পরিপূর্ণভাবে তাঁর নেতৃত্ব প্রকাশ পাবে, তাই হাদীসে কিয়ামতের দিন নেতা হওয়ার কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যথায় হযরত নবী করীম ﷺ পৃথিবীর শুরু হতে কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল নবী ও রাসূল এবং সকল মানবের নেতা ছিলেন, আছেন এবং থাকবেন। এমন নয় যে, তিনি শুধু পরকালেই নেতা বা তাঁর যুগেই তিনি নেতা ছিলেন। এমন নয়। বরং চিরকাল তিনি এই নেতৃত্বের আসনে উপবিষ্ট থাকবেন।

قَوْلُهُ وَحَبِيبُ رَبِّ الْعٰلَمِينَ : অর্থাৎ রাসূল ﷺ সমগ্র জাহানের স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলার একান্ত সন্তোষভাজন বন্ধু। কেননা রাসূল ﷺ বলেন- فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ فَسَلَّمَ وَقَالَ سَمِعْتُ كَلَامَكُمْ وَعَجَبَكُمْ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلُ اللّٰهِ وَهُوَ كَذَالِكَ وَمُوسٰى نَجِيُّ اللّٰهِ وَهُوَ كَذَالِكَ وَعِيسٰى رُوحُهُ وَكَلِمَتُهُ وَهُوَ كَذَالِكَ - وَآدَمُ اصْطَفَاهُ اللّٰهُ - وَهُوَ كَذَالِكَ أَلَا وَأَنَا حَبِيبُ اللّٰهِ وَلَا فَخْرَ الخ অর্থাৎ [হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন] .... অতঃপর নবী ﷺ তাদের সামনে উপস্থিত হয়ে বলেন, আমি তোমাদের আলোচনা ও বিস্ময় শুনেছি। নিশ্চয় ইবরাহীম (আ.) আল্লাহ তা'আলার খলিল। আর তিনি তেমনিই ছিলেন। আর মূসা (আ.) ছিলেন নাজিয়ুল্লাহ, তিনি তেমনিই ছিলেন। আর ঈসা (আ.) কালিমাতুল্লাহ ও রূহুল্লাহ। আর তিনিও তেমনি ছিলেন এবং আদম (আ.) আসলেই ছফিউল্লাহ ছিলেন। আর জেনে রাখো! আমি হাবীবুল্লাহ তথা আল্লাহর সন্তোষভাজন এতে কোনো গর্ব নেই। -[তিরমিযী]

আর তাছাড়া যেসব গুণাবলি তথা বিশেষণে বিশেষিত ব্যক্তিদের জন্য আল্লাহ তা'আলা নিজ ভালোবাসা ও মহব্বতের কথা কুরআনে ব্যক্ত করেছেন সেসব গুণাবলি ও বিশেষণ রাসূল ﷺ -এর মধ্যে পরিপূর্ণরূপে বিদ্যমান ছিল। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন- إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সৎকর্মশীলদের পছন্দ করেন। إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তওবাকারী ও পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালোবাসেন। إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ভরসাকারীদের ভালোবাসেন। إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ইনসাফকারীদের তথা ন্যায়বিচারকদের ভালোবাসেন। إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ধৈর্য্যশীলদের ভালোবাসেন। وَاللّٰهُ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাস্তায় সারিবদ্ধভাবে যুদ্ধ করা ব্যক্তিকে ভালোবাসেন।

উপরিউক্ত আয়াতসমূহে যে সমস্ত গুণাবলির কথা উল্লেখ রয়েছে সে সব গুণাবলি এবং আরো অনেক গুণাবলির সমাবেশ শেষনবী মুহাম্মদ ﷺ -এর মাঝে পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান ছিল। অতএব শেষনবী সমগ্র জাহানের প্রতিপালকের হাবীব তথা সন্তোষভাজন থাকাটাই স্বাভাবিক।

সর্বশেষ নবী ﷺ -এর পরে নবুয়তের দাবিদার ভ্রান্ত

وَكُلُّ دَعْوَةِ نُبُوَّةٍ بَعْدَ نُبُوَّتِهِ فَغَيٌّ وَهَوًى.

অনুবাদ : হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর নবুওয়াতের পর প্রত্যেক নবুওয়াতের দাবিদার ভ্রান্ত-ভ্রষ্ট এবং আত্ম পূজারী।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَكُلُّ دَعْوَةِ الخ : যেহেতু হযরত মুহাম্মদ ﷺ সর্বশেষ নবী তাই তাঁর নবুয়ত প্রাপ্তির পর যতজনই নবুয়তের দাবি করবে সকলেই মিথ্যাবাদী, ভণ্ড ও ভ্রান্ত। এমনকি যারা এদের অনুসারী হবে তারাও তাদের ন্যায় পরিগণিত হবে।

غَيٌّ শব্দের অর্থ ভ্রষ্টতা, ভ্রান্ততা رَشَادٌ শব্দের বিপরীত। যার অর্থ হেদায়েত। আর هَوًى শব্দের অর্থ আত্মপূজারী বা সার্থান্বেষী ইত্যাদি। উদ্দেশ্য হলো নবুয়তের দাবি আত্মপ্রলুব্ধ হয়েই করে থাকে বৈ কিছু নয়। এখন প্রশ্ন হলো, যদি নবী ﷺ এর পর কেউ নবুয়তের দাবি করে এবং এর স্বপক্ষে مُعْجِزَات خَوَارِق এবং সত্য দলিল প্রমাণ উপস্থাপন করে তাহলে কিভাবে তাকে মিথ্যুক বলা হবে? এর প্রত্যুত্তরে বলা হবে, এমন হওয়াই অসম্ভব। কেননা স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা এ ব্যাপারে সংবাদ প্রদান করেছেন যে, মুহাম্মদ ﷺ হলেন সর্বশেষ নবী। অতএব কোনো ব্যক্তি নবুয়তের দাবি করার পর তার থেকে মিথ্যা, প্রতারণা এবং আত্ম প্রলুব্ধিতার নিদর্শন প্রকাশ না পাওয়াটা অসম্ভব।

কেননা রাসূল ﷺ বলেছেন- لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يُبْعَثَ دَجَّالُوْنَ كَذَّابُوْنَ قَرِيْبًا مِنْ ثَلَاثِيْنَ كُلُّهُمْ يَزْعَمُ اَنَّهُ رَسُوْلٌ অর্থাৎ অন্তত ত্রিশজন এমন দাজ্জাল ও মিথ্যুক না আসা পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না। যারা প্রত্যেকেই দাবি করবে যে, সে নবী। -[বুখারী, মুসলিম]

অপর হাদীসে বলেন- عَنْ ثَوْبَانَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّهُ سَيَكُوْنُ مِنْ اُمَّتِىْ كَذَّابُوْنَ ثَلَاثُوْنَ كُلُّهُمْ يَزْعَمُ اَنَّهُ نَبِىٌّ وَاَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ لَا نَبِىَّ بَعْدِىْ অর্থাৎ হযরত ছাওবান (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, হযরত রাসূল ﷺ বলেছেন, অতিসত্তর আমার উম্মতের মধ্য হতে ত্রিশজন মিথ্যুক আগমন করবে। এদের প্রত্যেকেই নিজেকে নবী হিসেবে দাবি করবে। অথচ আমিই সর্বশেষ খাতামে নবী। আমার পর আর কোনো নবী নেই। -[মুসলিম]

অপর এক লম্বা হাদীসে বলা হয়েছে خُتِمَ بِىَ النُّبُوَّةُ وَخُتِمَ بِىَ الرُّسُوْلُ অর্থাৎ আমাকে প্রেরণের দ্বারা নবুয়ত এবং রিসালাত প্রেরণ পরিসমাপ্তি হয়েছে। -[বুখারী]

তাছাড়া আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- وَلٰكِنْ رَسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ অর্থাৎ মুহাম্মদ ﷺ; বরং আল্লাহর রাসূল ও খাতামে নবী তথা নবুয়তের ধারার পরিসমাপ্তিকারী। -[সূরা আহযাব]

উপরিউক্ত প্রমাণ দ্বারা বুঝা গেল যে, নবী ﷺ -এর পর সকল নবুয়ত দাবিদারই মিথ্যুক, ভ্রান্ত এবং এর অনুসারীরাও। এছাড়া আরো অনেক দলিল প্রমাণ রয়েছে, এর কিছু প্রমাণ ইতঃপূর্বে অতিবাহিত হয়ে গেছে তাই এখানে আর বিস্তারিত হচ্ছে না।

মুহাম্মদ ﷺ সকল সৃষ্টির নবী

وَهُوَ الْمَبْعُوْثُ إِلَى عَامَّةِ الْجِنِّ وَكَافَّةِ الْوَرَى بِالْحَقِّ وَالْهُدَى.

অনুবাদ : হযরত মুহাম্মদ ﷺ সমগ্র জিন ও ইনসানের প্রতি সত্য ও হেদায়েতসহ প্রেরিত হয়েছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَهُوَ الْمَبْعُوْثُ الخ : এখানে গ্রন্থকার (র.) একটি প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। তা হলো,

প্রশ্ন : হযরত মুহাম্মদ ﷺ তো মানুষ। তিনি শুধু মানুষের নিকট প্রেরিত হবেন। জিন জাতি আগুনের তৈরি তার নিকট প্রেরিত হবেন কেন?

উত্তর : পূর্বেকার নবী ও রাসূলগণের মধ্য হতে কাউকে এক গোত্রের জন্য আল্লাহ তা'আলা পাঠাতেন, কাউকে এক এলাকার জন্য পাঠাতেন। আবার কাউকে একটি দেশের জন্য পাঠাতেন। কিন্তু যেহেতু হযরত মুহাম্মদ ﷺ সর্বকালের, সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ নবী। আর তিনিই একমাত্র কিয়ামত পর্যন্ত জগতের নবী, তারপরে আর কোনো নবী আসবেন না। তাই তাকে সত্য দীন, হেদায়েত এবং নূর ও জ্যোতি তথা কুরআন দিয়ে বিশ্ব জগতের সকল সৃষ্টির জন্য [চাই মানব হোক বা জিন] রহমতস্বরূপ, পথ প্রদর্শক, সুসংবাদদাতা ও ভীতিপ্রদর্শক হিসেবে আল্লাহ তা'আলা পাঠিয়েছেন। এটা তাঁর বিশেষ বিশেষণ বা বৈশিষ্ট্য। যা অন্য কোনো নবী বা রাসূলের জন্য ছিল না।

যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন- تَبَارَكَ الَّذِىْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا অর্থাৎ মহামান্বিত সত্তা তিনি, যিনি সত্য-মিথ্যার মাঝে প্রভেদকারী গ্রন্থ তাঁর বান্দার প্রতি নাজিল করেছেন। যাতে তিনি হতে পারেন বিশ্ববাসীর জন্য ভীতি প্রদর্শক।

-[সূরা ফুরকান : ১]

উপরিউক্ত আয়াতে "বিশ্ববাসী"-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আর জিন জাতি "বিশ্ববাসী" এর অন্তর্গতই বাহিরে নয়।

* অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন- قُلْ يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا অর্থাৎ আপনি বলে দিন হে লোক সকল! আমি তোমাদের সকলের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত রাসূল। -[সূরা আ'রাফ : ১৫৮]
* অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন- وَمَاۤ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا كَاۤفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا অর্থাৎ আমি আপনাকে সমস্ত মানব জাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শকরূপে প্রেরণ করেছি। -[সূরা সাবা : ২৮]

হযরত রাসূল ﷺ জিনজাতির জন্যও রাসূল হিসেবে প্রেরিত।

* আল্লাহ তা'আলা বলেন- يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ অর্থাৎ হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহর ডাকে সাড়া দাও এবং তাঁর উপর ঈমান আনয়ন করো। তিনি তোমাদের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন এবং তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হতে মুক্ত করবেন।

–[সূরা আহকাফ : ৩১]

* অপর আয়াতে [জিনজাতি রাসূল ﷺ-এর কুরআন তেলাওয়াত শুনে ঈমান আনলো এবং অপর জিনকে দাওয়াত দিয়ে] বলেন- إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا অর্থাৎ নিশ্চয় আমরা আশ্চর্যময় কুরআন শুনেছি। যা সঠিক পথের নির্দেশ করে। অতএব আমরা তার প্রতি ঈমান এনেছি। আর কখনো আমাদের রবের সাথে কাউকে শরিক করব না। –[সূরা জিন : ১-২]

* হযরত রাসূল ﷺ গাজওয়ায়ে তাবুকের সময় তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ছিলেন। সাহাবায়ে কেরামের ভয় হচ্ছিল যে, যদি শত্রুরা আক্রমণ করে বসে, তাই তাঁরা রাসূল ﷺ কে বেষ্টন করে রেখেছিলেন। নবীজী নামাজ শেষে সাহাবাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, আজ রাতে আমাকে পাঁচটি জিনিস দান করা হয়েছে। যা পূর্বেকার কোনো নবীকে দেওয়া হয়নি। এর মধ্যকার একটি হলো আমার নবুয়ত ও রিসালাত সকল [মানব-জিন] জাতির জন্য ব্যাপক করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমার পূর্বেকার সকল নবী-রাসূলরাই এসেছিলেন নিজ সম্প্রদায়ের দাওয়াতের জন্য। –[মুসনাদে আহমাদ]

* অপর একটি হাদীসে তিনি বলেন- فُضِّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسِتٍّ (مِنْهَا) أَنِّي أُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ অর্থাৎ আমি সকল নবীর উপর ৬টি বস্তু দ্বারা মর্যাদায় উন্নীত হয়েছি। এর মধ্যকার একটি হলো আমি সকল সৃষ্টির প্রতি [নবী-রাসূল হিসেবে] প্রেরিত এবং আমার মাধ্যমেই নবীগণ সমাপ্ত হয়েছেন। –[মুসলিম]

উপরিউক্ত আয়াত ও হাদীসের অকাট্য প্রমাণ দ্বারা একথাই সাব্যস্ত হলো, হযরত মুহাম্মদ ﷺ সর্বকালের সর্বযুগের সকল জাতির জন্যই (চাই মানব কিংবা জিন) রাসূল হিসেবে প্রেরিত। তাঁর পরে আর কোনো নবী-রাসূল আসবেন না। এটাই আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আকিদা।

قَوْلُهُ بِالْحَقِّ وَالْهُدَى : অর্থাৎ মহানবী ﷺ প্রেরিত হয়েছেন সত্য ও হেদায়েত সহকারে।

* কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন- إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا অর্থাৎ [হে নবী] আপনাকে সত্যসহ সুসংবাদদাতা ও ভীতিপ্রদর্শকরূপে প্রেরণ করেছি।

–[সূরা বাকারা : ১১৯]

* অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন- هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ অর্থাৎ তিনি সেই সত্তা যিনি তাঁর রাসূলকে হেদায়েত ও সত্য ধর্মসহ পাঠিয়েছেন।

–[সূরা তাওবা : ৩৩, সূরা ফাতাহ : ২৮]

পঞ্চম পাঠ

আল কুরআন সম্পর্কীয় আকিদা

কুরআন আল্লাহর কালাম ও তাঁর ঐশী বাণী :

وَاِنَّ الْقُرْاٰنَ كَلَامُ اللّٰهِ تَعَالٰى مِنْهُ بَدَا بِلَا كَيْفِيَّةٍ قَوْلًا.

অনুবাদ : মহাগ্রন্থ আল কুরআন সন্দেহাতীতভাবে আল্লাহ তা'আলার কালাম। যা তাঁর পক্ষ হতে (সাধারণ) কথাবার্তার পদ্ধতি ছাড়া কথা হিসেবে প্রকাশ হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَاِنَّ الْقُرْاٰنَ الخ : এখান থেকে গ্রন্থকার (র.) কুরআনুল কারীমের ব্যাপারে কি আকিদা হওয়া উচিত, তার বর্ণনা শুরু করেছেন। নিম্নে কুরআন সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা হলো। اَهْلُ سُنَّتْ এবং মু'তাযিলাদের মধ্যে কুরআন مَخْلُوْق কি না, এ ব্যাপারে মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। এই জন্যই উক্ত মাসআলার নাম مَسْئَلَةُ خَلْقِ الْقُرْاٰنِ হয়ে গেল। অথচ এই মাসআলার নাম مَسْئَلَةُ عَدَمِ خَلْقِ الْقُرْاٰنِ অথবা مَسْئَلَةُ الْكَلَامِ হওয়া উচিত ছিল এ সম্পর্কে সাধারণত নয়টি অভিমত পাওয়া যায়। যথা–

১. ফালাসিফা তথা দার্শনিকদের মতে, কালামুল্লাহ ঐ অর্থকে বলা হয়, যা আকলি ক্রিয়াকর্ম বা অন্য কোনো বস্তু থেকে মতপার্থক্য ব্যতীত উপকৃত হওয়া যায়।
২. মুতাযিলাদের অভিমত হলো, কালামুল্লাহ মাখলুক যাকে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় জাত থেকে পৃথক করে সৃষ্টি করেন।
৩. আশয়ারী ও অন্যান্যদের মতে, কালামুল্লাহ এমন এক অর্থবোধক বস্তু যা আল্লাহ তা'আলার জাতের সাথে সম্পৃক্ত। مَعْنٰى দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আদেশ, নিষেধ ও সংবাদ ইত্যাদি। যখন এটা আরবি ভাষায় প্রকাশ করা হয় তখন তা কুরআন। আর যখন ইবরানী ভাষায় প্রকাশ করা হয় তখন তা তাওরাত।
৪. মুতাকাল্লীমিন ও মুহাদ্দিসীনদের একদলের অভিমত হলো, কালামুল্লাহ মূলত অক্ষরসমূহ ও اَصْوَاتْ اَزَلِيَّه কে বলা হয়।
৫. কাররামিয়াদের মতে حُرُوْف এবং اَصْوَاتْ ই কালামুল্লাহ। প্রথমে আল্লাহ কথাবার্তা বলেননি পরে এর সাথে কথাকে মিল করেছেন।
৬. কালামুল্লাহ বা আল্লাহর বাণী প্রত্যাবর্তনশীল আল্লাহ তা'আলার ঐ عِلْم حَادِث এবং اِرَادَه এর প্রতি যা قَائِمٌ بِذَاتِه হয়। এটা গ্রন্থকারের গ্রহণযোগ্য অভিমত। আর ইমাম রাযী (রা.) এমনই মত প্রকাশ করেন। আল মুতালিবুল আলীয়ায় এমনই রয়েছে।
৭. কালামুল্লাহ এমন অর্থের জামেন তথা এমন অর্থ বহন করে যা قَائِمٌ بِذَاتِه তথা স্বয়ং সম্পূর্ণ হয়। যা আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র সৃষ্টি করেন। এটা আবুল মনসুর মাতুরিদির অভিমত।

৮. কালামুল্লাহ তথা আল্লাহর বাণী এমন এক অর্থ যা قَدِيْم ইহা قَائِمٌ بِالذَّاتِ এবং اَصْوَاتٌ উভয়টার মধ্যে সম্পৃক্ত। যাকে আল্লাহ তা'আলা অন্যের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন। এটা আবুল মুয়ালী এবং তার অনুসারীদের অভিমত।

৯. আল্লাহ তা'আলা সার্বক্ষণিক কথক, তিনি যখন যেভাবে চান। আর তিনি এমনভাবে কথা বলেন, যাতে শ্রুত হয়। তাঁর কথা বলার ধরনটা قَدِيْم যদিও صُوْرَت مُعَيَّنْ টা قَدِيْم না। এটা হলো সুন্নত ও হাদীস শাস্ত্রজ্ঞদের অভিমত।

মহাগ্রন্থ আল কুরআন পরিচিতি :

শাব্দিক অর্থ : قُرْاٰن শব্দটির মূলবর্ণ (ق - ر - ء) হলে অর্থ হবে পঠিত, পাঠ, পঠন ও আবৃত্তি। যেহেতু কুরআন বিশ্বের সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ। তাই একে কুরআন বলা হয়।

আর যদি মূলবর্ণ হয় (ق - ر - ن) হয়, তবে অর্থ হবে নিকটবর্তী হওয়া। যেহেতু কুরআন পাঠ বান্দাকে আল্লাহর নিকটতম বন্ধু বানিয়ে দেয় তাই একে কুরআন বলা হয়।

পারিভাষিক অর্থ : আবূল বারাকাত আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ ইবনে মাহমূদ (র.) তাঁর স্বীয় গ্রন্থ আল মানারে আল কুরআনের সংজ্ঞা এভাবে দিয়েছেন- فَالْقُرْاٰنُ الْمُنَزَّلُ عَلَى الرَّسُوْلِ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْمَكْتُوْبُ فِى الْمَصَاحِفِ الْمَنْقُوْلُ عَنْهُ نَقْلًا مُتَوَاتِرًا بِلَا شُبْهَةٍ. অর্থাৎ আল কুরআন যা হযরত নবী করীম ﷺ-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ হয়েছে এবং তাঁর [নবী করীম ﷺ] থেকে মুতাওয়াতির পদ্ধতিতে সন্দেহহীন প্রক্রিয়ায় বর্ণিত হয়েছে।

মহাগ্রন্থ আল কুরআন :

মহাগ্রন্থ আল কুরআন জগতস্রষ্টা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে মানব জাতিকে মঙ্গল ও কল্যাণের দিকে আহ্বানের জন্য প্রেরিত হয়েছে। যা তিনি তাঁর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর উপর অবতরণ করেছেন। কুরআনই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে প্রেরিত চূড়ান্ত গ্রন্থ। এটাই সকল মুসলমানের বিশ্বাস। আল কুরআনই সকল কল্যাণ ও মঙ্গলের উৎস। এই গ্রন্থকে আল্লাহ তা'আলা এমন কতেক বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছেন যা অন্য কোনো গ্রন্থে আল্লাহ তা'আলা দেননি। নিম্নে আল কুরআনের কিছু বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করা হলো।

আল কুরআনের অলৌকিকত্ব :

কুরআনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো অলৌকিকত্ব। পূর্বেকার নবী রাসূলগণকে আল্লাহ তা'আলা অনেক মু'জিযা দান করেছেন, যা ছিল সমসাময়িকের জন্য। তা ছিল তাৎক্ষণিক ও তৎকালীন লোকেরা তা দেখতো এবং বিশ্বাস করতো। কিন্তু পরবর্তী লোকেরা তা দেখেনি। শুধুমাত্র বর্ণনার মাধ্যমে শুনত। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ ﷺ কে অসংখ্য আয়াত ও মু'জিযার পাশাপাশি চিরন্তন মু'জিযা হিসেবে আল কুরআন দান করেছেন। এই গ্রন্থের অলৌকিকত্ব যেমন তৎকালীন লোকেরা প্রত্যক্ষ করেছে। অনুরূপ পরবর্তী লোকেরাও তা

প্রত্যক্ষ করছে এবং মেনে নিচ্ছে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন- مَا مِنَ الْاَنْبِيَاءِ مِنْ نَبِيٍّ اِلَّا قَدْ اُعْطِيَ مِنَ الْاٰيَاتِ وَمَا مِثْلُهُ اٰمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ وَاِنَّمَا كَانَ الَّذِىْ اُوْتِيْتُ اَوْحَى اللّٰهُ اِلَىَّ فَاَرْجُوْ اَنْ اَكُوْنَ اَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ অর্থাৎ হযরত নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন, নবীগণের মধ্যে সকলেই এমন আয়াত বা মু'জিযা প্রাপ্ত হয়েছেন। যে মু'জিযার পরিমাণে লোকেরা তাঁর উপর ঈমান এনেছে। আর আমাকে যে আয়াত বা মু'জিযা দেওয়া হয়েছে তা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে অবতারিত ঐশী বাণী। এ জন্য আমি আশা করি নবীগণের মধ্যে আমার অনুসারী হবে বেশি।

আসলে কুরআনের অলৌকিকতাই হলো চিরন্তন সত্য। প্রত্যেক যুগের লোকেই তা হতে নতুন নতুন অলৌকিকত্বের সন্ধান পায়। বর্তমান যুগে বিজ্ঞানীরা পৃথিবী, মানবদেহ ও মহাকাশ সম্পর্কে কতো নতুন তথ্য উদঘাটন করছেন। তারা অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করছে বর্তমান কতো নতুন আবিষ্কারের সাথে কুরআনের শতভাগ সামঞ্জস্যপূর্ণ। তারা স্বীকার করতে বাধ্য যে, কুরআন এক অলৌকিকত্বের প্রমাণ।

আল কুরআনের চ্যালেঞ্জ :

* আল কুরআনের অলৌকিকত্ব সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَاِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَأْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ وَادْعُوْا شُهَدَائَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ . فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا الخ.

অর্থাৎ আমি আমার বান্দার উপর যা অবতীর্ণ করেছি তাতে যদি তোমরা সন্দেহ পোষণ করে থাক, তাহলে তোমরা এর মতো একটি সূরা নিয়ে আসো এবং এ কাজে আল্লাহ ছাড়া তোমাদের [তোমরা যাদেরকে প্রভু মনে কর] আহ্বান করো। যদি তোমরা তোমাদের দাবিতে সত্যবাদী হয়ে থাক। আর যদি তা করতে না পারো এবং তোমরা অবশ্যই তা কখনো করতে পারবে না। -[সূরা বাকারা : ২৩-২৪]

এভাবে আল্লাহ তা'আলা বহু জায়গায়াই চ্যালেঞ্জ করেছেন।

* অপর আয়াতে [চ্যালেঞ্জ হিসেবে] বলেন- قُلْ فَأْتُوْا بِكِتٰبٍ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ هُوَ اَهْدٰى مِنْهُمَا اَتَّبِعْهُ (الاية) অর্থাৎ হে নবী আপনি বলে দিন, যদি তোমাদের দাবি সত্য হয়, তবে তাওরাত ও কুরআন অপেক্ষা অধিক পথ প্রদর্শনকারী কোনো গ্রন্থ আল্লাহ হতে নিয়ে এসো এবং আমিও সেই কিতাবের অনুসরণ করবো। -[সূরা কাছাছ : ৪৯]

* অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- قُلْ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰى اَنْ يَّأْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَأْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا অর্থাৎ বলুন! যদি এই কুরআনের অনুরূপ কুরআন আনয়নের জন্য সমগ্র বিশ্বের সকল মানুষ ও জিন একত্রিত হয় এবং তারা এ ব্যাপারে একে অপরকে সাহায্য করে তবুও তারা এতে সক্ষম হবে না। -[সূরা ফুরকান]

* অন্যত্র বলেন− قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ অর্থাৎ বলুন, এর মতো দশটি সূরা রচনা করে তোমরা দেখাও এবং তাতে আল্লাহ ছাড়া কেউ ক্ষমতাবান থাকলে তাকেও ডেকে নাও। যদি তোমরা তোমাদের দাবির ব্যাপারে সত্যবাদী হও। −[সূরা হূদ]

* অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন− اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰهُ قُلْ فَأْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ. অর্থাৎ তারা কি একে মিথ্যা বলছে? আপনি বলুন, তোমরা কুরআনের অনুরূপ একটি সূরা রচনা করে দেখাও। আল্লাহ ব্যতীত কারো যদি ক্ষমতা থাকে তাহলে তাকে আহ্বান [তোমাদের সঙ্গে তোমাদের সাহায্যকারী হিসেবে] নিয়ে নাও এবং তোমাদের দাবির সত্যতা প্রমাণ কর।

−[সূরা ইউনুস]

উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা প্রমাণ হয়ে গেল যে, মহাগ্রন্থ আল কুরআন রাসূল এর জন্য চিরন্তন মু'জিযা। যার মোকাবিলা করার সাধ্য পৃথিবীর কারো নেই। যা পৃথিবীর মানুষের জন্য চ্যালেঞ্জ।

কুরআন রাসূল ﷺ-এর জীবন্ত মু'জিযা :

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত হযরত রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, মানুষের আস্থা লাভের জন্য সকল নবীকেই কিছু কিছু মু'জিযা দেওয়া হয়েছে। আর আমার মু'জিযা হলো মহাগ্রন্থ আল কুরআন। তাই আমি আশা পোষণ করি তাঁদের তুলনায় আমার উম্মত বেশি হবে। কারণ তাঁদের মু'জিযা সমসাময়িকের জন্য যা তাঁদের ইন্তেকালের পর বিলুপ্ত হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে আমার মু'জিযা তথা কুরআন আমার ইহধাম ত্যাগের পরও অবশিষ্ট থাকবে। এমনকি কিয়ামত পর্যন্ত। −[বুখারী ও মুসলিম]

قَوْلُهُ كَلَامُ اللّٰهِ : আল কুরআন শব্দ ও অর্থ এ দুয়ের সমন্বয়ে প্রতিষ্ঠিত। যা আল্লাহ তা'আলার কালাম বা কথা এবং ইহার প্রকাশ সাধারণ কথা তথা সৃষ্টিজীবের কথাবার্তার পদ্ধতি ছাড়াই কথা হিসেবে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রকাশ হয়েছে।

প্রশ্ন : এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, কুরআন কি আল্লাহর সৃষ্টি?

উত্তর : উপরিউক্ত প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলবো, কুরআন আল্লাহর সৃষ্টি নয়; বরং তা আল্লাহ তা'আলার কালাম। আর কালাম তাঁর সিফাতসমূহের অন্তর্ভুক্ত। আর সিফাত কখনো সৃষ্টিগত হয় না; বরং তা সত্তাগতই হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা যেহেতু মহান তাই তিনি কারো সৃষ্টি নন; বরং সবই তাঁর সৃষ্টি। আর তাঁর সকল সিফাত সত্তাগত, কারো দেওয়া নয়। তাই কালাম [কুরআন] তাঁর সত্তাগত সিফাত কারো সৃষ্ট বা উপহার নয়।

এর চেয়ে সহজ জবাব হলো, কুরআন আল্লাহর সৃষ্টি নয়; বরং তাঁর সত্তাগত সিফাত, এটা মেনে নিলাম। কেননা মুসলমান তো তিনি যিনি আল্লাহর হুকুম শুনেন ও মেনে নেন।

আল্লাহ তা'আলা নিজ সিফাত অনুযায়ী কথোপকথন করেন, যা কোনো মাখলুকের কথাবার্তার পদ্ধতিতে নয়। যেমন কুরআনে ইরশাদ হয়েছে− وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوْسٰى تَكْلِيْمًا অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা মূসা (আ.)-এর সাথে [সরাসরি] কথা বলেছেন। −[সূরা নিসা]

* অপর আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন- تِلْكَ اٰيَاتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَاِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ অর্থাৎ এই সব আল্লাহ্ তা'আলার আয়াত। একে আমি যথাযথভাবে পড়ে শুনাচ্ছি। নিশ্চয় আপনি প্রেরিত রাসূলদের (আ.) অন্তর্ভুক্ত। -[সূরা বাকারা]

তেলাওয়াত করাও এক প্রকার কথা। চাই তা প্রকাশ্যে হোক বা গোপনে। অতএব সাব্যস্ত হলো যে, আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন ও আয়াত দ্বারা কথা বলেন। কিন্তু এটা এমন নয় যে, যা তিনি মাখলুকের অন্তরে ঢেলে দেন।

* অপর আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন- فَاِذَا قَرَاْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهٗ অর্থাৎ যখন আমরা তা পড়বো তখন আপনি সেই পঠনের অনুসরণ করবেন। -[সূরা কিয়ামা]

পাঠ করাটা পঠিতব্য বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত আর তা কালামই হয়ে থাকে। সুতরাং কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে পঠিতব্য বিষয়। কিন্তু তার ধরন কেমন তা আমরা জানিনা। কেননা তিনি কথা বলেন তবে আমাদের মতো নয়। তিনি শুনেন তবে আমাদের মতো নয়। কেননা لَيْسَ بِمِثْلِهٖ شَيْئٌ

* অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন- وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের সাথে কথা বলেন ওহীর মাধ্যমে। -[সূরা শূরা]

সুতরাং সাব্যস্ত হলো যে, আল্লাহ্ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে কথা বলেন যা কালামের অন্তর্ভুক্ত।

قَوْلُهٗ مِنْهُ بَدَا بِلَا كَيْفِيَّةٍ : অর্থাৎ তাঁর থেকে কথা প্রকাশ হয় ধরণ তথা আকৃতি প্রকৃতি ছাড়া। যেমন- আল্লাহ্ তা'আলা বলেন- تَنْزِيْلُ الْكِتَابِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ অর্থাৎ পরম ক্ষমতাবান, প্রজ্ঞাময় আল্লাহর পক্ষ হতে এ কিতাব অবতারিত। -[সূরা যুমার]

* অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন- تَنْزِيْلٌ مِّنْ حَكِيْمٍ حَمِيْدٍ অর্থাৎ প্রশংসিত প্রজ্ঞাময় মহান সত্তার পক্ষ হতে অবতীর্ণ। -[সূরা হামীম সেজদা]

* অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন- تَنْزِيْلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ অর্থাৎ বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক আল্লাহর পক্ষ হতে অবতারিত এই কিতাব এতে কোনো সন্দেহ নেই। -[সূরা আহকাফ]

* অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন- اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا অর্থাৎ নিশ্চয় আমি কুরআন নাজিল করেছি আরবি ভাষায়। -[সূরা দুখান]

উপরিউক্ত আয়াতসমূহ দ্বারা একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, কুরআন আল্লাহর কালাম। যা তাঁর নিকট হতে কুরআন হিসেবে অবতীর্ণ করেছেন। একথা দ্বারা মু'তাযিলাদের ভ্রান্ত বিশ্বাস খণ্ডিত হয়। তারা বলে, আল্লাহ্ তা'আলা প্রথমে কালাম কুরআন এক স্থানে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর সেই স্থান হতে তা নাজিল হয়েছে।

কুরআন রাসূল ﷺ-এর উপর অবতারিত

وَاَنْزَلَهُ عَلَى نَبِيِّهِ وَحْيًا . وَصَدَّقَهُ الْمُؤْمِنُوْنَ عَلَى ذٰلِكَ حَقًّا . وَاَيْقَنُوْ اَنَّهُ كَلَامُ اللّٰهِ تَعَالٰى بِالْحَقِيْقَةِ وَلَيْسَ بِمَخْلُوْقٍ كَكَلَامِ الْبَرِيَّةِ.

অনুবাদ : আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবী (মুহাম্মদ ﷺ)-এর উপর নিজ কুরআন [কালাম] ঐশী বাণী হিসেবে নাজিল করেছেন এবং মু'মিনগণ উক্ত কালামকে ওহী হিসেবে নাজিল হওয়ার ব্যাপারে তাঁকে সত্যায়ন করেছে এবং তাঁর এ কথাকে অন্তরে স্থান দিয়েছে যে, নিশ্চয় উক্ত কুরআন বাস্তবে আল্লাহ্র কালাম [বার্তা] উক্ত কালাম সৃষ্টিজীবের কথার ন্যায় মাখলুক নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَاَنْزَلَهُ عَلَى نَبِيِّهِ وَحْيًا : অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর উপর কুরআন নাজিল করেছেন। [হযরত জিবরাঈল আমীন (আ.)-এর দ্বারা] ওহীর মাধ্যমে। এমন নয় যে, কুরআন লিখিত আকারে তাঁর উপর নাজিল করেছেন। এই অভিমতের সপক্ষে কতিপয় দলিল নিম্নে প্রদত্ত হলো-

* যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন- وَاُوْحِيَ اِلَيَّ هٰذَا الْقُرْاٰنُ لِاُنْذِرَكُمْ بِهٖ وَمَنْ بَلَغَ অর্থাৎ আমার প্রতি এই কুরআন প্রত্যাদেশ করা হয়েছে। যাতে আমি তোমাদেরকে ও যাদের নিকট এ কুরআন পৌঁছবে তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করি। -[সূরা আন'আম]
* অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন- اُتْلُ مَاۤ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ অর্থাৎ হে নবী আপনি পাঠ করুন যা কিতাব হতে আপনার নিকট প্রত্যাদেশ করা হয়েছে। -[সূরা আনকাবূত]
* অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন- وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَاۤ اِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ اَمْرِنَا অর্থাৎ এভাবেই আমরা আপনার প্রতি ঐশী বাণী প্রেরণ করেছি, কুরআন আমার নির্দেশ। -[সূরা আশ-শূরা]
* অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন- وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَاۤ اِلَيْكَ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِّتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرٰى অর্থাৎ অনুরূপভাবে আমি আপনার প্রতি কুরআনকে আরবি ভাষায় ওহীরূপে নাজিল করেছি। যাতে আপনি মক্কাবাসী ও তার পার্শ্ববর্তী লোকদেরকে সতর্ক করতে পারেন। -[সূরা আশ-শূরা]
* অপর আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন- بِمَاۤ اَوْحَيْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ অর্থাৎ সে মতে আমি আপনার নিকট এ কুরআন ওহী করেছি।
* অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন- اِنَّاۤ اَوْحَيْنَاۤ اِلَيْكَ كَمَاۤ اَوْحَيْنَا اِلٰى نُوْحٍ وَّالنَّبِيِّيْنَ مِنْ بَعْدِهٖ অর্থাৎ নিশ্চয় আমি আপনার প্রতি ওহী করেছি, যেমনটি করেছি নূহ ও তাঁর পরবর্তী নবীদের প্রতি।
* অপর আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করে বলেন- اِنَّاۤ اَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ অর্থাৎ আমি আপনার প্রতি সত্যসহ কুরআন অবতরণ করেছি যাতে আপনি মানুষের মাঝে বিচার কার্য সম্পাদন করতে পারেন। -[সূরা মায়েদা]

উপরিউক্ত আয়াতসমূহ দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহপাক তাঁর নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর উপর কুরআন ওহীরূপে নাজিল করেছেন। এটা শুধু আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলেরই দাবি নয়; বরং মুহাম্মদ ﷺ নবুয়ত দাবি করার পর থেকে এ পর্যন্ত সকল মু'মিন একথাকে নত শিরে মেনে নিয়েছেন। এতে কারো দ্বিমত ছিল না। নেই। থাকবেও না। [এমনকি হযরত খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ (রা.)-এর চাচাতো ভাই ওয়ারাকা বিন নাওফেল পর্যন্ত তা মেনে নিয়েছিল পূর্বেকার আসমানি গ্রন্থানুসারে।

এর দ্বারা মু'তাযিলা সম্প্রদায় ও তাদের বর্তমানের অনুসারীদের বিশ্বাস রদ হয়ে যায়। কেননা তারা বলে যে, ধারণা সৃষ্টির মাধ্যমে কুরআন জিবরাঈল (আ.)-এর অন্তরে অবতরণ করা হয়েছে। অতঃপর হযরত জিবরাঈল (আ.) নবী করীম ﷺ-এর নিকট এসে নিজ ভাষানুযায়ী ব্যক্ত করেছেন।

قَوْلُهُ وَصَدَّقَهُ الْمُؤْمِنُوْنَ : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মদ ﷺ-এর উপর কুরআনকে ওহী করেছেন। এ কথাকে মু'মিনগণ শতভাগ সত্যায়ন করেছেন। কেননা এই আকিদা আল্লাহ তা'আলার সম্পৃক্ততার সনদে ওহী নাজিল হওয়ার প্রথম দিন হতে এ কালের উম্মত পর্যন্ত রাসূল ﷺ-এর মাধ্যমে এসেছে এবং প্রত্যেক যুগেই এর উপর ঐকমত্য সংঘটিত হয়েছে। আর তারা মনে প্রাণে বিশ্বাস করে নিয়েছে যে, কুরআন আল্লাহর কালাম। যা শব্দ ও অর্থের সমন্বয়ে পূর্ণরূপ পরিগ্রহ করেছে।

قَوْلُهُ وَاَيْقَنُوْا اَنَّهُ كَلَامُ اللّٰهِ الخ : অর্থাৎ সর্বকালের সর্বযুগের সকল মু'মিন এ কথা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন যে, কুরআন বাস্তবেই আল্লাহর কালাম। এতে কোনো সন্দেহ নেই এবং তা আল্লাহর সত্তাগত সিফাত। তা মানুষের কথাবার্তার ন্যায় সৃষ্ট নয়; বরং জগত স্রষ্টার একান্ত গুণ।

* এতদসম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন– وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوْسٰى تَكْلِيْمًا অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে কথা বলেছেন। –[সূরা নিসা] যদি তাঁর কালাম সৃষ্ট হতো তাহলে অবশ্যই তিনি বলতেন اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ كَلَامَهُ لِمُوْسٰى অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা মুসা'র সাথে কালাম সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু তিনি এমনটি বলেননি।
* অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– وَلَمَّا جَاءَ مُوْسٰى لِمِيْقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ অর্থাৎ যখন মূসা প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী হাজির হলেন এবং তাঁর পালনকর্তা তাঁর সাথে কথা বললেন। [আ'রাফ] এখানে একথাও বলা হয়নি যে, خَلَقَ رَبُّهُ كَلَامَهُ [তাঁর প্রভূ তাঁর সাথে কথা সৃষ্টি করেছেন] তাছাড়া কথিত আছে যে, اِنَّ فُلَانًا يَتَكَلَّمُ [অমুক ব্যক্তি কথা বলেছে] কিন্তু বলা হয়নি যে, অমুক কথা সৃষ্টি করেছে।

অতএব উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা বুঝা গেল যে, কুরআন আল্লাহর কালাম মাখলুক বা সৃষ্ট নয়। এটাই প্রকৃত মু'মিনের বিশ্বাস। এ কারণেই ইমাম আজম (র.) বলেছেন, মহাগ্রন্থ আল কুরআন পুস্তিকায় লিপিবদ্ধ, মানুষের অন্তরে রক্ষিত, রসনায় পঠিত, নবীর প্রতি অবতারিত এবং আমাদের কুরআনের উচ্চারণ সৃষ্টি। কিন্তু তা সৃষ্ট নয়।

আল কুরআন বা কালামুল্লাহ অমান্যকারী কাফের

فَمَنْ سَمِعَهُ فَزَعَمَ اَنَّهُ كَلَامُ الْبَشَرِ فَقَدْ كَفَرَ . وَقَدْ ذَمَّهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَعَابَهُ وَاَوْعَدَهُ عَذَابَهُ حَيْثُ قَالَ سَاُصْلِيْهِ سَقَرَ فَلَمَّا اَوْعَدَ اللّٰهُ تَعَالٰى بِسَقَرَ لِمَنْ قَالَ اِنْ هٰذَا اِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ عَلِمْنَا اَنَّهُ قَوْلُ خَالِقِ الْبَشَرِ وَلَا يُشْبِهُهُ قَوْلُ الْبَشَرِ .

অনুবাদ : অতএব যে ব্যক্তি কুরআন শ্রবণ করতঃ একথা বলবে যে, কুরআন মানুষের কথা। তাহলে সে অবশ্যই কাফের হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা এ প্রকৃতির লোকদের প্রতি নিন্দা ও দোষারোপ করেছেন এবং তাকে জাহান্নামের শাস্তি প্রদানের ধমকও দিয়েছেন। যেমন তাঁর বাণী অতি শীঘ্রই তাকে আমি সাকার জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। সুতরাং যখন আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তিকে সাকার নামক জাহান্নামের ধমক দিলেন, যে বলবে নিশ্চয় এটি [আল কুরআন] মানুষের কথাবার্তা বৈ কিছু নয়। এখন আমরা অবগত হলাম যে, নিশ্চয় আল কুরআন মানুষের স্রষ্টার বাণী। মানুষের কথাবার্তার সাথে এর কোনো সাদৃশ্যতা নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَمَنْ سَمِعَهُ الخ : অর্থাৎ যে ব্যক্তি কালামুল্লাহ শ্রবণ করতঃ বলবে এটি আল্লাহর বাণী নয়; বরং মানুষের কথা। তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে। কারণ আল্লাহ তা'আলাই এই কুরআনকে কালামুল্লাহ বলে অবহিত করেছেন।

* যেমন তিনি বলেন– وَاِنْ اَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَاَجِرْهُ حَتّٰى يَسْمَعَ كَلَامَ اللّٰهِ ثُمَّ اَبْلِغْهُ مَاْمَنَهٗ অর্থাৎ মুশরিকদের কেউ যদি তোমাদের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে, তাহলে তাকে আশ্রয় দাও। যে পর্যন্ত সে আল্লাহর কালাম শুনবে। অতঃপর তাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দাও। –[সূরা তাওবা]

উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা নিজেই আল কুরআনকে কালামুল্লাহ বলেছেন। অতএব যে কেউ একে মানুষের কালাম বলবে উপরিউক্ত আয়াতের বিরোধিতা বিবাদী বশতঃ সে অবশ্যই কাফের হয়ে যাবে। কারণ কুরআনের কোনো আয়াত বা অংশের বিরোধী, বিবাদী বা প্রতিবাদকারী কাফের বৈ কিছু নয়।

قَوْلُهُ فَقَدْ كَفَرَ : কাফের كُفْر -এর পরিচিতি বিস্তারিতভাবে ভূমিকায় দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনে সেখানে দেখা যেতে পারে।

قَوْلُهُ وَقَدْ ذَمَّهُ اللّٰهُ الخ : মহাগ্রন্থ আল কুরআন আল্লাহ তা'আলার পবিত্র কালাম। এটা কোনো মানবের কালাম নয় এবং মানুষের সৃষ্টিও নয়। এমনকি আল্লাহ তা'আলারও সৃষ্টি নয়।

এতদসত্ত্বেও যদি কোনো ব্যক্তি আল কুরআনকে মানুষের কালাম, তার সৃষ্ট বলে, কিংবা বিশ্বাস করে তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন এবং তাকে তিরস্কারও করেছেন। যেমন- তিনি বলেন سَأُصْلِيهِ سَقَرَ অর্থাৎ অতি সত্তর আমি তাকে সাকার (নামক) জাহান্নামে হাজির করবো। [মুদ্দাসসির] যদি তিনি এই ব্যক্তিকে তিরস্কার না-ই করতেন, তবে সাকারে হাজির করার অর্থ কি?

قَوْلُهُ وَلَا يَشْبَهُ قَوْلَ الْبَشَرِ الخ : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার সিফাতে কামালিয়া যেমন অনাদি ও কাদীম। অনুরূপ তাঁর কালাম তথা আল কুরআন তাঁরই সিফাত হওয়ার কারণে তাও অনাদি ও কাদীম। আর যেহেতু আল্লাহ তা'আলা কোনো সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য রাখেন না [যেমন তাঁর বাণী لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ অর্থাৎ কোনো বস্তুই তাঁর সাদৃশ্যশীল নয়।] তাই তাঁর কুরআনও কোনো সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য রাখতে পারে না। অতএব কোনো ব্যক্তি যদি আল্লাহ তা'আলার কোনো সিফাতে কামালিয়াকে সৃষ্টির সাদৃশ্য মনে করে তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে। আর কুরআন যখন সিফাতে কামালিয়া সাব্যস্ত হলো তাই কুরআনকে সৃষ্টির কালামের সাদৃশ্যশীল মনে করলে কাফের হয়ে যাবে।

আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আকিদা এটাই। এর বিপরীতই ভ্রষ্টতা। যেমনটি হয়েছে, মু'তাযিলাদের বেলায়।

আল্লাহর গুণকে মানুষের গুণের সাথে তুলনা করা অবৈধ

وَمَنْ وَصَفَ اللّٰهَ تَعَالٰى بِمَعْنًى مِنْ مَعَانِي الْبَشَرِ فَقَدْ كَفَرَ . فَمَنْ أَبْصَرَ هٰذَا فَقَدِ اعْتَبَرَ وَعَنْ مِثْلِ قَوْلِ الْكُفَّارِ انْزَجَرَ وَعَلِمَ اللّٰهَ تَعَالٰى بِصِفَاتِهِ لَيْسَ كَالْبَشَرِ .

অনুবাদ : যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলাকে মানবীয় বিশেষণ হতে কোনো একটি দ্বারা বিশেষিত করবে সে কাফের হয়ে যাবে। অতএব যে ব্যক্তি এ ব্যাপারে অর্ন্তদৃষ্টিতে দেখবে সে, শিক্ষা গ্রহণ করবে এবং সে কাফেরদের মতো অবাস্তব ও অবান্তর কথা বলা থেকে বিরত থাকবে এবং সে সঠিক ভাবে জানবে যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় গুণাবলিতে মানুষের মতো নন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمَنْ وَصَفَ الخ : এখান হতে গ্রন্থকার (র.) আল্লাহর গুণাবলির সাথে মাখলুকের গুণাবলি কিংবা মাখলুকের গুণাবলির সাথে আল্লাহর গুণাবলির তুলনা দেওয়ার বিধান বর্ণনা করেছেন। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা স্রষ্টা। সত্তাগত ভাবেই তিনি নিজ বিশেষণ তথা গুণাবলির অধিকারী, তাঁর কোনো গুণ কারো থেকে উপহার বা দান হিসেবে পাননি; বরং তিনি সকল সৃষ্টিকে অনেক গুণ দান করেছেন। তাই তাঁর গুণাবলি মাখলুকের গুণাবলির সাথে তুলনা দেওয়া বৈধ নয়। কিন্তু যদি কেউ আল্লাহর কোনো গুণকে মানবীয় গুণের সাথে তুলনা করে বা তাঁর গুণ মানুষের মধ্যে রয়েছে বলে স্বীকার করে, তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে।

এর সত্যতার ঘোষণা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন- لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ। অর্থাৎ তাঁর সাদৃশ্য কোনো বস্তু নেই। আর তিনিই সর্ব শ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।

উপরিউক্ত আয়াতটি দ্বারা প্রমাণ হয় যে, আল্লাহ তা'আলা জাত ও সিফাতসমূহের সাথে মাখলুকের জাত বা গুণাবলির কোনো তুলনা চলে না। সুতরাং যে তুলনা করল সে আয়াতটিকে অস্বীকার করলো। আর যে কুরআনের আয়াতকে অস্বীকার করল, সে কাফের বলেই গণ্য হলো। অনুরূপ আল্লাহ তা'আলার কোনো গুণকে অস্বীকার করাও কুফরি। কেননা তিনি স্বীয় সত্তার সাথে বিভিন্ন গুণাবলি সংযুক্ত করে কুরআনে বহু আয়াত নাজিল করেছেন। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন- وَهُوَ الْغَفُوْرُ الْوَدُوْدُ অর্থাৎ তিনি ক্ষমাশীল প্রেমময়।

* অপর আয়াতে বলেন- وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ অর্থাৎ তিনি সূক্ষ্মদর্শী সংবাদ দাতা।

* তিনি আরো বলেন- وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ অর্থাৎ তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল।

* তিনি আরো বলেন- وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ অর্থাৎ তিনি সর্বোচ্চ, মহান।

* তিনি আরো বলেন- وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْقَدِيْرُ অর্থাৎ তিনি সর্বজ্ঞানী, সর্বশক্তিমান।

* তিনি আরো বলেন- وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ অর্থাৎ তিনি পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ।

* তিনি আরো বলেন- وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ অর্থাৎ তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

এসব গুণাবলি হতে কোনো একটিকে যদি আল্লাহর গুণাবলি মনে না করা হয়, তাহলে অবশ্যই কুরআনের আয়াতকে অস্বীকার করা হয়। আর কুরআনের আয়াতকে অস্বীকার করা কুফরি।

قَوْلُهُ : فَمَنْ اَبْصَرَ هٰذَا : অর্থাৎ উপদেশ গ্রহণকারী যখন আল্লাহ তা'আলার কোনো সিফাতে কামালিয়া অস্বীকারকারীর পরিণাম সম্পর্কে অবগত হবে, তখন সে এ ধরনের ভ্রান্ত মতবাদ হতে বিরত থাকবে। যেমন ইহুদিরা হযরত মূসা (আ.) কে বলেছিল- لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى نَرَى اللّٰهَ جَهْرَةً অর্থাৎ তোমার উপর আমরা কখনো ঈমান আনবো না যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা সরাসরি আল্লাহকে না দেখবো। -[সূরা বাকারা]

উম্মতে মূসার এই বিভ্রান্তির কারণ হলো, তারা মনে করেছিল আল্লাহ তা'আলা মানবীয় গুণাবলির সাদৃশ্য। মানুষ যেভাবে কথা বলে, শ্রবণ করে, অনুরূপ আল্লাহ তা'আলাও করে থাকেন। তাই তাদের মধ্যে এই আপত্তি উত্থাপিত হয়েছিল।

অতএব, আল্লাহকে আমরা কথা বলাবস্থায় সরাসরি দেখবো। তাদের এই বিভ্রান্তির কারণে আল্লাহ তা'আলার শাস্তি এসেছিল। অতএব যে সকল লোক তাদের মত অনুসরণ করবে, তারা তাদের মতো বিভ্রান্ত হবে। আর যারা জ্ঞানী বা উপদেশ গ্রহণকারী তারা এ ধরনের পরিণাম হতে শিক্ষা গ্রহণ করতঃ এ বিভ্রান্তি হতে বিরত থাকবে। এমনকি জ্ঞানী ব্যক্তিরা বিরত থাকেন ঐ ধরনের কথা হতে যেমনটি বলেছিল মক্কার তৎকালীন কাফেররা। اِنْ هٰذَا اِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ অর্থাৎ ইহা মানুষের কথা বৈ কিছু নয়। আল্লাহ তা'আলা এদেরকে ধমক তথা সতর্ক করেছেন سَاُصْلِيْهِ سَقَرَ অর্থাৎ অতি সত্তর আমি "সাকার" নামক জাহান্নামে তাদেরকে উপস্থিত করবো। -[সূরা মুদ্দাসসির]

ষষ্ঠ পাঠ

আল্লাহ তা'আলাকে দর্শন সম্পর্কীয় আকিদা

وَالرُّؤْيَةُ حَقٌّ لِاَهْلِ الْجَنَّةِ بِغَيْرِ اِحَاطَةٍ وَلَا كَيْفِيَّةٍ كَمَا نَطَقَ بِهٖ كِتَابُ رَبِّنَا وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ.

অনুবাদ : জান্নাতবাসীদের জন্য আল্লাহ তা'আলার দর্শন লাভ সত্য। এতে কোনো প্রকার সীমাবদ্ধতা, প্রতিবন্ধকতা ও ধরন থাকবে না। যেমন– আমাদের রবের কিতাব এ সম্পর্কে ঘোষণা দিয়েছে "সে দিন (পরকাল) অনেক চেহারা উজ্জ্বল সজীব থাকবে। তারা তাদের প্রভুর প্রতি দৃষ্টিমান থাকবে।"

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اَلرُّؤْيَةُ حَقٌّ الخ : আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের মতে, মু'মিনগণ [বেহেশতবাসী] অবশ্যই আল্লাহ তা'আলার দর্শন লাভে চির ধন্য হবেন।

* কেননা আল্লাহ তা'আলা নিজেই বলেন– وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ অর্থাৎ ঐ দিন অনেক চেহারা উজ্জ্বল ও সজীব হয়ে স্বীয় প্রতিপালকের প্রতি তাকাতে থাকবে। –[সূরা কিয়ামা]

* এ সম্পর্কে হযরত নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, اِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ الْقَمَرَ لَيْلَةَ الْبَدْرِ অর্থাৎ নিশ্চয় তোমরা তোমাদের প্রভুকে (জান্নাতে) দেখতে পাবে, যেমনিভাবে পূর্ণিমার রাতে তোমরা চাঁদ দেখতে পাও। [বুখারী ও মুসলিম] অর্থাৎ আমরা সকলেই আল্লাহ তা'আলার দর্শন লাভে চির ধন্য হবো। আর এ দেখার মধ্যে আমরা তাঁকে পরিবেষ্টন করতে পারবো না। এটা কখনো সম্ভবও নয়। কেননা তিনি নিজেই বলেন– لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ অর্থাৎ দৃষ্টসমূহ তাঁকে পরিবেষ্টন করতে পারবে না। অবশ্য তিনি দৃষ্টিসমূহকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন। –[সূরা আন'আম] কেনান اَلْاِدْرَاكُ-এর অর্থ হলো اَلرُّؤْيَةُ مَعَ الْاِحَاطَةِ তথা নির্দিষ্ট পরিমণ্ডলের মধ্যে বা পরিবেষ্টনসহ দর্শন করা। আর اَلرُّؤْيَةُ বা দেখার জন্য পরিসীমা পরিমণ্ডল ও পরিবেষ্টন জরুরি নয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)-এর সম্পর্কে বলেন– فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعٰنِ قَالَ اَصْحٰبُ مُوْسٰى اِنَّا لَمُدْرَكُوْنَ যখন উভয় দল উভয় দলকে দেখল, তখন মূসা (আ.)-এর সাথিরা বলল, নিশ্চয় আমরা ধরা পড়ে গেলাম। হযরত মূসা (আ.) বললেন, না আমরা ধরা পড়িনি। –[সূরা শু'আরা]

অতএব, বুঝা গেল আমরা আল্লাহ তা'আলার দর্শন লাভে চির ধন্য হবো। তবে তাঁকে দেখায় পরিবেষ্টন করতে পারবে না। পরিবেষ্টন বলা হয় যা সীমা ও দিকের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা হলো ঐ সত্তার নাম যাঁর কোনো দিক নেই। যাঁর কোনো সীমা নেই।

তিনি এসব হতে সম্পূর্ণ রূপে মুক্ত ও পবিত্র। সুতরাং তাঁকে কোনো বান্দা দেখায় পরিবেষ্টন করতে পারবে না। অনুরূপ তিনি كَيْفِيَّة তথা ধরন ও অবস্থা হতে পবিত্র। কারণ তা অবয়বের বৈশিষ্ট্য। আর তিনি অবয়ব হতেও পবিত্র।

কিন্তু বিপদগামী মু'তাযিলা, খাওয়ারিজ, ইমানিয়া ও জাহমিয়া সম্প্রদায় আল্লাহকে দর্শন সম্পর্কে বলে তাঁর দর্শন লাভ বান্দার জন্য দুনিয়াতে তো সম্ভবই নয় এমনকি আখেরাতেও সম্ভব নয়। তাদের মতামতের স্বপক্ষে দলিল হিসেবে যুক্তি পেশ করে বলে যে, কোনো বস্তুর দর্শন লাভের জন্য পূর্বশর্ত হলো–

১. দর্শকের মধ্যে বস্তু দর্শনের শক্তি সামর্থ্য থাকা।

২. বস্তুটি দর্শকের সামনে বিদ্যমান থাকা।

৩. বস্তুটি আলো কর্তৃক পরিবেষ্টিত থাকা।

৪. এবং দর্শনের উপযুক্ত স্থানে থাকা। অদি দূরে বা অতি নিকটে না হওয়া।

কারণ বস্তুটি অতি নিকটে থাকলে বা অতি দূরে থাকলে তা দর্শনে ব্যাঘাত ঘটে। সুতরাং তা উপযুক্ত স্থানে থাকাই দর্শনের জন্য যথার্থ। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা স্থান, কাল, দিক, সীমা, অবস্থা ও ধরন হতে সম্পূর্ণ পবিত্র। [যা উপরে বর্ণিত হয়েছে] অতএব যখন আল্লাহ তা'আলা উপরিউক্ত বিষয় হতে পূতঃপবিত্র, তখন তাঁকে দর্শনের শর্তসমূহ পাওয়া অসম্ভব। যার কারণে তাঁর দর্শন দুনিয়া ও আখেরাতে একেবারেই অসম্ভব।

উপরিউক্ত আপত্তির জবাব কয়েকটি হতে পারে। নিম্নে তা দেওয়া হলো–

প্রথম জবাব : এদের জবাবে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতগণ বলেন, যখন স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা বান্দার সাথে নিজ দিদারের কথা ব্যক্ত করেছেন এবং রাসূল ﷺ ও তাঁর হাদীসে একথার স্বীকৃতি দান করেছেন। যার কথা উপরে বর্ণনা করা হয়েছে। তখন এর বিরোধী কোনো যুক্তি বা প্রমাণ পেশ করা মু'মিনের জন্য আদৌ সমীচীন নয়। কেননা মু'মিন ব্যক্তি যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কোনো বাণী শোনে قَالُوا سَمِعْنَا وَاطَعْنَا غُفْرَانَكَ অর্থাৎ তখন তারা বলে, আমরা এটা শ্রবণ করলাম ও মেনে নিলাম। হে আমাদের পালনকর্তা তুমি আমাদেরকে ক্ষমা কর। [বাকারা] এটাই প্রকৃত মু'মিনের বৈশিষ্ট্য।

পক্ষান্তরে এর বিপরীত কোনো যুক্তি প্রমাণ পেশ করার মানেই হলো তাঁদের কথা-হুকুম অমান্য করা। আর তাদের কথা হুকুম অমান্য করা কুফরির শামিল। (আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুন।)

দ্বিতীয় জবাব : আল্লাহর দর্শন অস্বীকারকারীদের জবাবে বলা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা নিজেই বলেছেন, إِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। –[সূরা বাকারা]

যা দ্বারা প্রতীয়মান হয়, যেকোনো কাজ সম্পাদন করতে তাঁকে ক্লান্তি পেতে হয় না; বরং সকল কাজ সম্পাদন করা একেবারেই তাঁর নিকট সহজ। সুতরাং যে সমস্ত প্রতিবন্ধকতার কারণে বান্দার জন্য আল্লাহ তা'আলার দর্শন লাভ অসম্ভব মনে করা হয়, সে সমস্ত প্রতিবন্ধকতা দূরীভূত করে আল্লাহ তা'আলা বান্দার সাথে দেখা দেওয়া তার জন্য সহজ বৈ কিছু নয়। কারণ এ কাজটিও আয়াতে বর্ণিত অন্যসব কাজের অন্তর্ভুক্ত। যেমন নবী করীম ﷺ কে তিনি সামনে পেছনে দেখার শক্তি দান করেছিলেন।

তৃতীয় জবাব : পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে যে, হযরত মুসা (আ.) আল্লাহ তা'আলার নিকট আবেদন করেছিলেন যে, رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ অর্থাৎ হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে দেখা দাও। আমি তোমার দর্শন লাভ করবো।

উপরিউক্ত আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, যদি আল্লাহ তা'আলাকে মানুষের পক্ষে দেখা অসম্ভব হতো তবে নবী হযরত মূসা (আ.) আল্লাহ তা'আলার নিকট এই আবেদন করতেন না। যেহেতু সম্ভব সেহেতু তিনি আবেদন করেছেন। যদি একথা অস্বীকার করা হয় তাহলে বলতে হবে যে, হযরত মূসা (আ.) আল্লাহ তা'আলার জাত ও সত্তা সম্পর্কে জানতেন যে, কোনটি সম্ভব এবং কোনটি অসম্ভব। অথচ হযরত মূসা (আ.) এ সম্পর্ক অনভিজ্ঞ ছিলেন না; বরং বিজ্ঞই ছিলেন। কারণ হযরত মূসা (আ.) আল্লাহর সত্তা সম্পর্কে বিজ্ঞ ছিলেন এবং তাঁর আবেদন সঠিক হওয়ার কারণে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– لَنْ تَرَانِي وَلٰكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي - فَلَمَّا تَجَلَّى الخ অর্থাৎ হে মূসা! তুমি আমাকে কখনো দেখতে পাবে না; বরং তুমি দৃষ্টি দাও পর্বতের দিকে যদি তা নিজ স্থানে অনড় থাকে তবে শীঘ্রই তুমি আমাকে দেখতে পারবে। –[সূরা আন'আম]

যেহেতু মূসা (আ.)-এর দেখা পাহাড় নিজ স্থানে অনড় থাকার উপর স্থগিত রাখা হয়েছে। আর পাহাড় নিজ স্থানে থাকা সম্ভব। তাই আল্লাহ তা'আলাকে দেখাও সম্ভব। চাই উক্ত দর্শন দুনিয়াতে হোক বা আখেরাতে। যদি দুনিয়াতে মানুষ দুর্বলতার কারণে আল্লাহর দর্শন লাভে মানুষ চিরধন্য হতে পারছে না। কিন্তু উক্ত দুর্বলতা জান্নাতবাসীর থাকবে না।

এই দুনিয়ায় আল্লাহকে কেউ দেখেছে কি না :

এই দুনিয়ায় কারো পক্ষে আল্লাহ তা'আলাকে দেখা সম্ভব কিনা? মুসলিম উম্মাহ এ ব্যাপারে একমত যে দুনিয়ায় থাকাবস্থায় আমাদের এই চর্ম চোখ দ্বারা আল্লাহকে দেখা কারো দ্বারা সম্ভব হয়নি। কিন্তু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর ব্যাপারে মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। কতক হযরত চর্ম চোখে দেখাকে অস্বীকার করেন আর কতক হযরতের ব্যাপারে তা স্বীকার করেন। আর এটা এমন এক মাসআলা, যে মাসআলায় সাহাবায়ে কেরামের মধ্যেও মতানৈক্য হয়েছে। হযরত আয়শা (রা.) তা অস্বীকার করেন। যখন হযরত মাসরূক (রা.) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন هَلْ رَأَى مُحَمَّدٌ رَبَّهُ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি তাঁর রব বা প্রতিপালককে দেখেছেন? তখন আয়শা (রা.) বলেন, لَقَدْ قَفَّ شَعْرِي مِمَّا قُلْتَ অর্থাৎ তোমার কথায় আমার শরীরের লোম দাঁড়িয়ে গেল। যে ব্যক্তি বলবে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহকে দেখেছে সে মিথ্যাবাদী।

কিন্তু একদল লোক এমনই বলে; হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহকে স্বীয় চোখ দ্বারা দেখেছেন। কিন্তু হযরত আতা (রা.) এটাই বর্ণনা করেন, তবে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহকে অন্তর দিয়ে প্রত্যক্ষ করেছেন। এর দ্বারা বুঝা যায়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনার মধ্যে اِضْطِرَابٌ তথা ভাবনা রয়েছে। সর্বোপরি কথা হলো উক্ত মাসআলায় আল্লাহকে দেখার উপর قَطْعِي نَصّ নাই, যার দ্বারা প্রমাণ করা যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চোখ দ্বারা আল্লাহকে দেখেছেন।

সিদ্ধান্ত হলো এ ব্যাপারে আল্লাহ-ই ভালো জানেন। সুতরাং উপরিউক্ত দলিল প্রমাণ দ্বারা ভ্রান্তমতাবলম্বনকারী মু'তাযিলা, খাওয়ারিজ ও জাহমিয়াদের যুক্তির খণ্ডন সুস্পষ্ট হয়ে গেল।

আল্লাহর দর্শন সম্পর্কীয় ঈমান রাখা কর্তব্য

وَتَفْسِيْرُهُ عَلٰى مَا اَرَادَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَكُلُّ مَا جَاءَ فِيْ ذَالِكَ مِنَ الْحَدِيْثِ الصَّحِيْحِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَهُوَ كَمَا قَالَ وَمَعْنَاهُ عَلٰى مَا اَرَادَ وَلَا نَدْخُلُ فِيْ ذٰلِكَ مُتَاَوِّلِيْنَ بِاٰرَائِنَا . وَلَا مُتَوَهِّمِيْنَ بِاَهْوَائِنَا فَاِنَّهُ مَا سَلِمَ فِيْ دِيْنِهِ اِلَّا مَنْ سَلِمَ لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلِرَسُوْلِهِ ﷺ وَرَدَّ عِلْمَ مَا اشْتَبَهَ عَلَيْهِ اِلٰى عَالِمِهِ.

অনুবাদ : উপরিউক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা হবে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ও জ্ঞানানুসারে এবং এ সম্পর্কে মহানবী ﷺ থেকে যে সব বিশুদ্ধ হাদীস বর্ণিত হয়েছে তা এমনভাবে গ্রহণ করতে হবে। যেভাবে তিনি বলেছেন এবং এর দ্বারা তিনি যে অর্থ উদ্দেশ্য করেছেন তা স্বীকার করে নিতে হবে। এতে আমরা নিজেদের রায় মোতাবেক অপব্যাখ্যা এবং নিজেদের প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে কোনো ব্যাখ্যা তথা সন্দেহের অনুপ্রবেশ করবো না। কারণ দীনের ব্যাপারে কেবল সেই ব্যক্তিই পদস্খলন হতে নিরাপদ থাকে যে নিজেকে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর নিকট সমর্পণ করেছে এবং যেসব বিষয়ে তার সংশয় হয়, যেসব বিষয়ে সে তৎসম্পর্কে পণ্ডিতগণের উপর ছেড়ে দিবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَتَفْسِيْرُهُ عَلٰى الخ : অর্থাৎ সঠিক ও প্রকৃত মু'মিনগণ কখনো নিজের ইচ্ছা প্রবৃত্তি অনুযায়ী কুরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে না। বরং সব বিষয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর বাণীর উপর শ্রদ্ধাশীল হয়। কিন্তু যে সব বিষয়ে তাঁর সংশয় সৃষ্টি হয় সেসব বিষয়ে কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ না করে তৎসংশ্লিষ্ট পণ্ডিতগণের উপর ছেড়ে দিবে এবং তাঁর থেকে জিজ্ঞাসা করতঃ সংশয় দূর করে নিবে।

কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেন- فَاسْئَلُوْآ اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ অর্থাৎ যদি তোমরা কোনো বিষয় সম্পর্কে না জেনে থাক, তবে জ্ঞানী পণ্ডিতগণ হতে জেনে নাও। -[সূরা নাহল]

উপরিউক্ত নীতি সাহাবায়ে কেরাম হতে এ পর্যন্ত সর্ব পর্যায়ক্রমে চলে আসছে। যার কারণে সঠিক ইলম আমাদের পর্যন্ত এসেছে। তার এ নীতিই সঠিক ইলমের মাপকাঠি।

قَوْلُهُ اِلَّا مَنْ سَلِمَ اللّٰهُ الخ : অর্থাৎ দীনের ব্যাপারে কেবল সে ব্যক্তিই সঠিক ইলম তলব করে ভ্রান্ত মতবাদ হতে মুক্ত থাকে যে, নিজেকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যে সমর্পণ করেছেন। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ অর্থাৎ কেবল সে ব্যক্তিই মুক্তি পাবে, যে স্বচ্ছ অন্তর নিয়ে আল্লাহর নিকট আসবে। -[সূরা শু'আরা]

অতএব বুঝা গেল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কদমে নিজেকে সমর্পণ করা ছাড়া মুক্তির অন্য কোনো পথ নেই।

আত্মসমর্পণ ইসলামের মূলনীতি

وَلَا يَثْبُتُ قَدَمُ الْإِسْلَامِ إِلَّا عَلَى ظَهْرِ التَّسْلِيْمِ وَالْإِسْتِسْلَامِ فَمَنْ رَامَ عِلْمَ مَا حُجِزَ عَنْهُ عِلْمُهُ وَلَمْ يَقْنَعْ بِالتَّسْلِيْمِ فَهْمُهُ حَجَبَهُ مَرَامُهُ عَنْ خَالِصِ التَّوْحِيْدِ وَصَافِي الْمَعْرِفَةِ وَصَحِيْحِ الْإِيْمَانِ فَيَتَذَبْذَبُ بَيْنَ الْكُفْرِ وَالْإِيْمَانِ وَالتَّصْدِيْقِ وَالتَّكْذِيْبِ وَالْإِقْرَارِ وَالْإِنْكَارِ مُوَسْوَسًا تَائِهًا شَاكًّا زَائِغًا لَا مُؤْمِنًا مُصَدِّقًا وَلَا جَاحِدًا مُكَذِّبًا.

অনুবাদ : পূর্ণ আত্মসমর্পণ ও বশ্যতা মেনে নেওয়া ব্যতীত ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয় না। অতএব যে ব্যক্তি এমন ইলম তথা জ্ঞান অর্জনের প্রতি ঝুঁকে যাবে যে জ্ঞান তার থেকে বিলুপ্ত/ ফিরিয়ে রাখা হয়েছে। এবং যার আত্মা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কদমে সমর্পণ করে তুষ্ট হয়নি। তার এ বুঝ নিজ উদ্দেশ্যকে নির্ভেজাল একত্ববাদ স্বচ্ছ মারেফাত এবং বিশুদ্ধ ঈমান হতে বহু দূরে রাখবে। যার ফলে কুফরি ও ঈমান সত্যায়ন ও মিথ্যা, স্বীকার ও অস্বীকারের মাঝে প্রবঞ্চক দিশেহারা ও সংশয়ী অবস্থায় দোদুল্যমান থেকে যায়। এমতাবস্থায় সে না হয় পূর্ণ সমর্থক মু'মিন এবং না হয় দৃঢ় অবিশ্বাসী মিথ্যাশ্রয়ী।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَا يَثْبُتُ قَدَمُ الْإِسْلَامِ الخ : ইসলাম বলা হয় নিজ আত্মাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দায়িত্বে ছেড়ে দেওয়াকে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন- إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ অর্থাৎ যখন তাকে তাঁর প্রভু বললেন, তুমি ইসলামের বশ্যতা স্বীকার কর। সে বলল, আমি বিশ্ব জাহানের প্রতিপালকের নিকট আত্মসমর্পণ করলাম। -[সূরা বাকারা]
যেহেতু ইসলাম মানে আত্মসমর্পণ করা তাই ইসলাম কোনো ব্যক্তির মাধ্যমে ঐ সময়ই প্রতিষ্ঠা লাভ করবে যখন সে পূর্ণভাবে কুরআন ও সুন্নাহ এর সামনে নিজের আত্মাকে সমর্পণ করবে। কারণ ইসলাম কুরআন ও সুন্নাহ এর সমন্বয়ে। যে ব্যক্তি এর বিপরীত করবে সেই বিপদগামী হবে। আর ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো পথ আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ তিনি নিজেই বলেন- إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহর নিকট মনোনীত ধর্ম ইসলাম। -[সূরা আলে ইমরান]
কোনো ব্যক্তির ইসলাম ঐ সময়ই প্রমাণিত হবে যখন সে কুরআন ও হাদীসের দলিলসমূহ পরিপূর্ণরূপে মেনে নিবে। কিন্তু তার বিপরীতে স্বীয় জ্ঞান ও কিয়াসকে অনুপ্রবেশ করাবে না এবং এতে সংশয় সন্দেহ, বৈপরীত্ব ও অভিযোগ উত্থাপন করবে না। এ ব্যাপারে ইমাম বুখারী (র.) জুহরী (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, مِنَ اللّٰهِ الرِّسَالَةُ، وَمِنَ الرَّسُوْلِ الْبَلَاغُ، وَعَلَيْنَا التَّسْلِيْمُ আল্লাহর কাজ হলো রাসূল প্রেরণ করা। আর রাসূলের কাজ হলো আহকাম বান্দার নিকট পৌঁছে দেওয়া। আর আমাদের কাজ হলো তা মেনে নেওয়া।

عَقْل ও نَقْل -এর মধ্যে পার্থক্য : عَقْل ও نَقْل -এর মধ্যকার যে তফাৎ পরিলক্ষিত হয় তা একটি উদাহরণের মাধ্যমে পরিষ্কার হয়ে যায়। عَقْل -এর উদাহরণ হলো মূর্খ অনুসারীর ন্যায়। نَقْل شَرْعِىْ হলো গবেষক আলেমের ন্যায়, বরং عَقْل -এর স্তর نَقْل شَرْعِىْ -এর বিপরীতে এর চেয়ে কম। কেননা মূর্খ ব্যক্তির জন্য জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে আলেম হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু কোনো গবেষক আলেম তার চেষ্টা প্রচেষ্টার মাধ্যমে নবী বা রাসূল হওয়া একেবারেই অসম্ভব। যা কখনো সম্ভব হওয়ার কল্পনাই করা যায় না। তাই عَقْل এবং نَقْل এর মধ্যে যখন বৈপরীত্ব প্রকাশ পাবে তখন نَقْلِى সিদ্ধান্তকে আবশ্যিক রূপে পালন করতে হবে। কেননা عَقْل ভুল করতে পারে। কিন্তু نَقْل ভুল ত্রুটির অবকাশ রাখে না। অতএব উভয়ের মাঝে পার্থক্য সূচিত হলো।

সুতরাং আমাদেরকে ইসলামের জন্য নিজ আত্মা (জীবন-মরণ) এমনভাবে সমর্পণ করা যেমন মৃত লাশ গোসল দেওয়ার সময় গোসলদাতার নিকট অর্পিত হয়ে থাকে।

যেমন নবীকে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন- قُلْ إِنَّ صَلٰوتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ অর্থাৎ আপনি বলুন, নিশ্চয় আমার নামাজ, কুরবানি, আমার জীবন ও মরণ বিশ্বজাহানের প্রতিপালকের জন্য। -[সূরা আন'আম]

قَوْلُهُ وَلَمْ يَقْنَعْ بِالتَّسْلِيْمِ الخ : অর্থাৎ যে ব্যক্তি ইসলামের হুকুম আহকাম এর উপর তুষ্ট না হয়ে নিজের রুচি মাফিক যুক্তির নিরিখে ইসলামের অপব্যাখ্যা দান করতঃ ভ্রান্ত মতবাদের অনুসরণ করবে সে খালেছ তাওহীদ, স্বচ্চ মারেফাত ও বিশুদ্ধ ঈমানের ধারে কাছেও যেতে পারবে না। ফলে বিভ্রান্ত হবে এবং জাহান্নামী হবে।

وَلَمْ يَقْنَعْ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো দীনের আকিদা ও মূলনীতির ব্যাপারে অনুমানভিত্তিক কথাবার্তা বলা থেকে নিষেধ করা। কেননা এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন- وَلَاتَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلًا যে কথা সম্পর্কে তুমি সঠিকভাবে পরিজ্ঞাত না, তার উপর আমল করো না। কেননা কিয়ামত দিবসে প্রত্যেক মানুষের চোখ, কান, নাক ও প্রতিটা অঙ্গকে পৃথকভাবে জিজ্ঞাসা করা হবে। -[সূরা বনী ইসরাঈল : ৩৬] অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন إِنْ يَتَّبِعُوْنَ إِلَّا الظَّنَّ الخ অর্থাৎ ঐ সমস্ত লোক কেবলমাত্র অনৈতিক কিছু ধারণার উপর এবং আত্মলোভী কতিপয় নীতির উপর জীবন যাপন করে। অথচ তাদের নিকট তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে রাসূলের মাধ্যমে সত্য পথ প্রদর্শিত হয়েছে।

এ সম্পর্কে হযরত আবূ উমামিয়া বাহালী থেকে বর্ণিত রাসূল ﷺ বলেন- مَا ضَلَّ قَوْمٌ بَعْدَ هُدًى كَانُوْا عَلَيْهِ إِلَّا أُوْتُوا الْجَدَلَ ثُمَّ تَلَا مَا ضَرَبُوْهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا অর্থাৎ কোনো জাতি সৎপথ প্রাপ্ত হওয়ার পর তারা পথভ্রষ্ট হবে না। তবে ঐ সময় পথভ্রষ্ট হবে যখন তারা পরস্পর সংগ্রামে লিপ্ত হবে। অতঃপর তিনি কুরআনের বাণী তেলাওয়াত করেন- مَا ضَرَبُوْهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا অতএব নিজস্ব চিন্তা, চেতনা, জ্ঞান, উপলব্ধি ইত্যাদির অনুসরণ না করে শরিয়ত প্রবর্তিত জীবন পদ্ধতির অনুকরণ করতে হবে।

কারণ রাসূল ﷺ বলেছেন- مَنْ قَالَ فِى الْقُرْاٰنِ بِرَأْيِهٖ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهٗ مِنَ النَّارِ অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজ রায় মোতাবেক কুরআন সম্পর্কে আলোচনা করবে সে নিজ বাসস্থান জাহান্নামে করে নিবে। অন্য এক বর্ণনায় বলেছেন- مَنْ قَالَ فِى الْقُرْاٰنِ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهٗ مِنَ النَّارِ অর্থাৎ যে কুরআন সম্পর্কে অনবিজ্ঞ হয়ে কিছু বলবে, সে নিজ বাসস্থান জাহান্নামে করে নিবে।

এর মূল কারণ হলো আল্লাহর দীন আল্লাহর প্রদত্ত হয়ে থাকে। জ্ঞান বা মস্তিষ্ক হতে নয়। অন্যথায় তিনি কোনো রাসূল পাঠাতেন না এবং কিতাবও অবতরণ করতেন না।

وَلَا يَصِحُّ الْإِيْمَانُ بِالرُّؤْيَةِ لِأَهْلِ دَارِ الْإِسْلَامِ (أَى الْجَنَّةِ). لِمَنِ اعْتَبَرَهَا مِنْهُمْ بِوَهْمٍ أَوْ تَأَوَّلَهَا بِفَهْمٍ. (مِنْ رَأْيِهِ) إِذْ كَانَ تَأْوِيْلُ الرُّؤْيَةِ وَتَأْوِيْلُ كُلِّ مَعْنًى يُضَافُ إِلَى الرُّبُوْبِيَّةِ لَا يَصِحُّ فَلَا يَصِحُّ الْإِيْمَانُ بِالرُّؤْيَةِ إِلَّا بِتَرْكِ التَّأْوِيْلِ وَلُزُوْمِ التَّسْلِيْمِ وَعَلَيْهِ دِيْنُ الْمُرْسَلِيْنَ.

অনুবাদ : জান্নাতবাসীদের জন্য আল্লাহ তা'আলার দর্শন লাভের উপর ঐ ব্যক্তি ঈমান আনয়ন করা বিশুদ্ধ হবে না, যে দর্শনকে কল্পনা মনে করে বা উহাকে নিজের বিবেক বুদ্ধি অনুযায়ী ব্যাখ্যা করে। যেহেতু আল্লাহ তা'আলার দর্শনলাভের ব্যাখ্যা দান ও তাঁর অন্যান্য যে কোনো গুণের অনুমান প্রসূত ব্যাখ্যা মোটেই শুদ্ধ নয়, তাই তার জন্য দর্শনের ঈমানই শুদ্ধ নয়। হ্যাঁ অপব্যাখ্যা বর্জন ও আনুগত্য স্বীকার করার মাধ্যমে শুদ্ধ হবে। এর উপরই রাসূলগণের দীন প্রতিষ্ঠিত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَا يَصِحُّ الْإِيْمَانُ الخ : অর্থাৎ জান্নাতবাসীদের জন্য আল্লাহ তা'আলা দর্শন সম্পর্কে নিজস্ব ধারণা প্রসূত জ্ঞান, বুদ্ধি, চিন্তা, ধারণা ও বিবেক দ্বারা ব্যাখ্যা করা মু'মিনের জন্য বৈধ নয়। এতে ঈমান সঠিক থাকে না। কেননা ঈমান রাসূল ﷺ কর্তৃক বর্ণিত বিষয়াবলির অনুসরণ ও মেনে নেওয়ার সাথে সম্পৃক্ত। বিবেক, চিন্তা ও যুক্তির মাধ্যমে ব্যাখ্যা করার নাম নয়। কেননা এমনটি মনের বক্রতা। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন–

هُوَ الَّذِىٓ أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ اٰيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ. فَأَمَّا الَّذِيْنَ فِى قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيْلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيْلَهُ إِلَّا اللّٰهُ وَالرَّاسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ يَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا.

অর্থাৎ সেই সত্তা যিনি আপনার উপর কিতাব অবতরণ করেছেন, এতে আছে দ্ব্যর্থহীন সুস্পষ্ট আয়াত, সেগুলো গ্রন্থের মূল অংশ। আর কতক হলো রূপক। সুতরাং যাদের অন্তরে রয়েছে বক্রতা, কেবল তারাই ফেতনা সৃষ্টি ও অপব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে রূপক এর অনুসরণ করে। অথচ আল্লাহ ব্যতীত এর ব্যাখ্যা কেউ জানেনা। আর যারা জ্ঞানে সুগভীর তারা বলে– এর প্রতি আমরা ঈমান আনলাম। এসবই আমাদের রবের পক্ষ হতে। –[আলে ইমরান : ৭]

উপরিউক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা "মুতাশাবিহাত আয়াতসমূহ" বা সাদৃশ্যশীল আয়াতগুলো ব্যাখ্যার চেষ্টাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন, বরং তা মেনে নেওয়ার আদেশ দিয়েছেন। আর ঈমান হলো মেনে নেওয়াই। এতদসত্ত্বেও যে ব্যক্তি এসব বিষয়ে অপব্যাখ্যার চেষ্ট চালায় এবং নিজ যুক্তিকে প্রাধান্য দেয় আর নিজেকে সালফে সালেহীনগণের অনুসরণে আল্লাহ তা'আলা রঙ্গে রঙ্গিন হয় না। তার ঈমান কিভাবে বিশুদ্ধ থাকতে পারে?

সুতরাং জান্নাতবাসীদের পক্ষে আল্লাহ তা'আলার দর্শন লাভ করার প্রতি মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে সতর্ক ও মেনে নেওয়াই যথার্থ এবং কোনো প্রকার যুক্তি, চিন্তা, বিবেক ও ধারণার মাধ্যমে অপব্যাখ্যার চেষ্টা না করাই উচিত। এটাই ছিল রাসূলগণের পূর্ণ বিশ্বাস বা ঈমান।

গ্রন্থকার (র.) বর্ণিত ইবারত দ্বারা মু'তাযিলাদের বিশ্বাস আল্লাহর দর্শন অসম্ভব" উক্তিকে খণ্ডন করেছেন এবং ঐ সব লোকের মতবাদকে খণ্ডন করেছেন, যারা আল্লাহ তা'আলার গুণাবলিকে সৃষ্টির সাথে তুলনা দিয়ে তাঁর দর্শনকে অস্বীকার করে।

আল্লাহর গুণাবলি অস্বীকারের পরিণতি

وَمَنْ لَمْ يَتَوَقَّ النَّفْيَ وَالتَّشْبِيْهَ زَلَّ وَلَمْ يُصِبِ التَّنْزِيْهَ فَإِنَّ رَبَّنَا جَلَّ وَعَلَا مَوْصُوفٌ بِصِفَاتِ الْوَاحْدَانِيَّةِ مَنْعُوْتٌ بِنُعُوْتِ الْفَرْدَانِيَّةِ لَيْسَ بِمَعْنَاهُ أَحَدٌ مِنَ الْبَرِيَّةِ.

অনুবাদ : যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার গুণাবলিকে অস্বীকার এবং তুলনা করা হতে বিরত থাকতে পারেনি। সে প্রলাপ করা ও পথভ্রষ্টতা হতে বাঁচতে পারেনি এবং আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্রতা প্রমাণ করতে পারেনি। কারণ মহামহিম প্রভু একক গুণে গুণান্বিত এবং স্বাতন্ত্র বিশেষণে বিশেষিত। ভূ-পৃষ্ঠে কেউ তাঁর গুণে গুণান্বিত নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمَنْ لَمْ يَتَوَقَّ النَّفْيَ الخ : এখানে গ্রন্থকার (র.) আল্লাহর দর্শন অস্বীকারী ও তাঁর গুণাবলি মাখলুকের সাথে তুলনা দাতার পরিণতি বর্ণনা করতে শুরু করেছেন। তিনি বলেন, যারা জান্নাতবাসীদের জন্য দিদারে এলাহী তথা আল্লাহর দর্শন লাভ এবং আল্লাহ্ তা'আলা মাখলুকের গুণাবলি হতে পূত, পবিত্র, একথা অস্বীকার করা থেকে বাঁচতে পারল না। তারা অবশ্যই সত্যের পথ হতে ছিটকে পড়ল এবং আল্লাহর পবিত্রতায় বিশ্বাসী হতে ব্যর্থ হলো। আল্লাহর গুণাবলি অস্বীকার করা অথবা তাকে মাখলুকের সাথে তুলনা দেওয়া এমন মারাত্মক ভ্রষ্টতা যা অনুপস্থিত বস্তুকে উপস্থিত বস্তুর উপর কিয়াস করার নামান্তর। অথচ অনুপস্থিত বস্তুর কিয়াস উপস্থিত বস্তুর উপর করা নিতান্তই মূর্খতা ছাড়া অন্য কিছুই নয়। এর কারণে এতে সীমালঙ্ঘন হয়।

যেহেতু কিছু সংখ্যক মানুষ এমন রয়েছে যারা আল্লাহ্ তা'আলার গুণাবলি সাব্যস্ত করার ব্যাপারে অতিরঞ্জন করে এবং আল্লাহ্ তা'আলাকে মাখলুকের সাথে তুলনা করে। [যেমনটি করেছে মুশাব্বিহ সম্প্রদায়] এবং যারা আল্লাহ্ তা'আলার গুণাবলি অস্বীকারের উদ্দেশ্যে মনগড়া ব্যাখ্যা করে এমনকি অপব্যাখ্যার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলাকে অকেজো বানিয়েছে। [যেমনটি করেছে মু'তাযিলা সম্প্রদায়] তাই তাদের প্রতি উত্তর হিসেবে গ্রন্থকার (র.) উপরিউক্ত ইবারতটি উল্লেখ করেছেন। অতএব যারা আল্লাহ্ তা'আলার গুণাবলি অস্বীকার করত অনস্তিত্বের ইবাদত করে এবং যারা আল্লাহ্ তা'আলাকে মাখলুকের সাথে তুলনা করত প্রতিমা দেবতার ইবাদত করে এদের ইবাদতের কোনো মূল্য নেই। কারণ এদের মূল ভিত্তিই ঠিক নেই।

قَوْلُهُ بِصِفَاتِ الْوَحْدَانِيَّةِ : অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্ব উর্ধ্বে। তিনি এক ও একক গুণে গুণান্বিত। তাঁর কোনো গুণের সাথে মাখলুক শরিক হতে পারে না এবং তাঁর গুণাবলির সাথে মাখলুকের গুণাবলির তুলনা বা উপমাও চলে না।

وَصْفٌ এবং نَعْتٌ সমার্থক শব্দ। কিন্তু কেউ কেউ বলেন উভয়ের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যথা– ১. সিফাত শব্দটা জাত তথা সত্তার সাথে ব্যবহার হয় আর نَعْتٌ টা فِعْل এর সাথে ব্যবহৃত হয়। অনুরূপভাবে وَاحْدَانِيَّتٌ এবং فَرْدَانِيَّتٌ শব্দ দুটিও সমার্থক। তবে কিছু সংখ্যক মানুষ এ দুটি শব্দেও পার্থক্য সূচিত করেছেন। وَاحْدَانِيَّتٌ শব্দটি জাতি তথা সত্তাগত বস্তুর জন্য ব্যবহৃত হয় আর فَرْدَانِيَّتٌ সিফাত বা গুণাবলির জন্য ব্যবহৃত হয়। অতএব সাব্যস্ত হলো যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় জাতের মধ্যে وَاحِدٌ এবং সিফাতের মধ্যে مُنْفَرِدٌ ; গ্রন্থকার (র.) গুরুত্ব বুঝানোর জন্য উক্ত ইবারতটি সংযুক্ত করেছেন। আসলে তা সূরায়ে ইখলাসের প্রতিরূপ।

যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন– هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ অর্থাৎ তিনিই আল্লাহ এক। اَللّٰهُ الصَّمَدُ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা অমুখাপেক্ষী। لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও কেউ জন্ম দেয়নি। –[সূরা ইখলাস]

উপরিউক্ত আয়াত দ্বারা সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে, তাঁর গুণাবলির অধিকারী অন্য কেউ না এবং কারো গুণাবলি তাঁর সাথে তুলনাও চলে না। কারণ সাধারণত বাপ পুত্র জন্ম দেওয়ার কারণে [অনেক সময়] পুত্র বাবার গুণাবলির অধিকারী হয়ে থাকে। আর যেহেতু আল্লাহ তা'আলা জন্ম ও জন্মদাতা হতে সম্পূর্ণ পবিত্র। তাই তাঁর গুণাবলির সাথে কারো উপমা দেওয়া যায় না এবং তার গুণাবলির অধিকারী কেউ হতেও পারে না।

قَوْلُهُ لَيْسَ بِمَعْنَاهُ الخ : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার কোনো গুণের সাথে কারো উপমা, উদাহরণ বা সাদৃশ্য দেওয়া চলে না। কারণ কেউ যদি আল্লাহ তা'আলার কোনো গুণের সমতুল্য হতো, তবে সেও স্বতন্ত্র প্রভু হতে পারতো।

অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেন– لَوْ كَانَ فِيْهِمَا اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا অর্থাৎ যদি ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলে একাধিক প্রভু থাকতো তাহলে অবশ্যই তাদের মাঝে ফ্যাসাদ তথা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতো। –[সূরা আম্বিয়া] যার ফলে দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যেত। আর এখন যেহেতু দুনিয়া ধ্বংস হয়নি। তাই একাধিক প্রভুর কল্পনাই করা যায় না। আর যেহেতু একাধিক প্রভুর কল্পনা নিতান্তই কুফরি, তাই আল্লাহর গুণে কেউ গুণান্বিত হওয়ার দাবিও কুফরি। তাইতো আল্লাহ তা'আলা তাঁর وَاحْدَانِيَّتٌ এর ঘোষণা দিয়ে বলেন– وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا اَحَدٌ অর্থাৎ তাঁর সমকক্ষ কেউ হতে পারে না। –[সূরা ইখলাস]

আজকের সাম্যবাদ আর মানবতাবাদী যুগে যদি আমরা লক্ষ্য করি তাহলে দেখব সমগ্র বিশ্বের সর্বত্র মানুষ মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো প্রজা রাজার গুণ অর্জন করতে পারেনি। কোনো শ্রমিক মালিকের গুণে গুণান্বিত হয়নি। কোনো যাত্রী চালকের গুণে গুণান্বিত হয় না। তাই স্রষ্টার কোনো গুণের সাথে সৃষ্টির তুলনা চলে না।

আল্লাহ তা'আলা সীমা, পরিধি, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হতে পবিত্র

تَعَالَى عَنِ الْحُدُوْدِ وَالْغَايَاتِ وَالْاَرْكَانِ وَالْاَعْضَاءِ. وَالْاَدَوَاتِ وَلَا تَحْوِيْهِ الْجِهَاتُ السِّتُّ كَسَائِرِ الْمُبْتَدِعَاتِ.

অনুবাদ : আল্লাহ তা'আলা সীমা, পরিধি, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও উপাদান উপকরণ এবং যন্ত্রপাতি হতে বহু উর্ধ্বে। যাবতীয় উদ্ভাবিত সৃষ্টির ন্যায় তাঁকে ৬ষ্ঠ দিক পরিবেষ্টন করতে পারে না। (এমন কোনো দিকই নেই যে দিক তাকে পরিবেষ্টন করতে পারে)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ تَعَالَى عَنِ الْحُدُوْدِ الخ : অর্থাৎ এখানে গ্রন্থকার (র.) আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি জগতের সাদৃশ্য হতে পবিত্র হওয়ার কথা ব্যক্ত করেছেন। গ্রন্থকার বলেন, আল্লাহ তা'আলা ছাড়া সকল সৃষ্টি পরিমিত তা মানুষের দৃষ্টিতে যতই অপরিসীম, অগণিত আর অসীম হোক না কেন। তার থেকে যত কাজ প্রকাশিত হবে, সবই পরিমিত। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ অর্থাৎ সকল বস্তুই তাঁর নিকট পরিমিত রয়েছে। -[সূরা রা'দ]

* অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন- وَمَا نُنَزِّلُهُ اِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ অর্থাৎ আমি নির্দিষ্ট পরিমাণই অবতরণ করি। -[সূরা হিজর]

* অন্য আরেক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন- اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ অর্থাৎ প্রতিটি বস্তুই আমি পরিমিত পরিমাণ সৃষ্টি করেছি। -[সূরা কামার]

উপরিউক্ত আয়াতসমূহ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সকল বস্তুই সীমিত। যা তাদের মজ্জাগত স্বভাব। আর এই সকল সীমানা ও পরিমাণ নির্ধারণকারী হলেন আল্লাহ তা'আলা। তাহলে কিভাবে সম্ভব হয় যে, তাঁরই সৃষ্ট মাখলুকের জন্য তারই সৃষ্ট সীমানা বা পরিমাণ তাঁর জন্য সাব্যস্ত হতে পারে? কারণ এতে দুটি বিপরীত বস্তু একত্র হওয়া জরুরি হয়। যা মোটেই সম্ভব নয়। সুতরাং একথা সাব্যস্ত হলো যে, তাঁর সত্তা অসীমিত, অপরিমিত। তাঁর সীমা, সত্তা ও পরিধি প্রান্তসমূহের উর্ধ্বে। তাঁর সীমা ও প্রান্ত নেই। আল্লাহ তা'আলা কোনো প্রান্ত ও সীমার পরিবেষ্টনের দোষ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও পবিত্র।

* যেমন তিনি বলেন- وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيْطًا অর্থাৎ সকল বস্তু আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক পরিবেষ্টিত। -[সূরা নিসা]

* অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন- وَكَانَ اللّٰهُ وَاسِعًا حَكِيْمًا অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ব্যাপক তথা সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। -[সূরা নিসা]

উপরিউক্ত প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত হলো যে, আল্লাহ তা'আলা অপরিমিত, অসীমিত। অন্যথা এই বিষয় জরুরি হয়ে পড়ে যে, একই সত্তা স্রষ্টা এবং সৃষ্টি, সীমিত এবং অসীমিত, পরিমিতি এবং অপরিমিত। আর এটা কখনো সম্ভব নয়। কেননা একই সত্তার মধ্যে পরস্পর বিপরীতমুখী বস্তুর উপস্থিতি সাব্যস্ত হয়। সুতরাং উপরিউক্ত আয়াত দ্বারা প্রমাণ সাব্যস্ত হলো যে, আল্লাহ তা'আলা নিজ সিফাতে কামালিয়াসহ সীমা হতে পবিত্র। প্রকৃত মু'মিনের বিশ্বাস এমনই হওয়া চাই।

قَوْلُهُ وَالْغَايَاتِ : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যেরূপ সীমা হতে পবিত্র। অনুরূপ প্রান্ত হতে পবিত্র। তাঁর কোনো প্রান্ত নেই। তাঁর নিকটই সব সৃষ্টির প্রান্ত কিন্তু তাঁর কোনো প্রান্ত নেই। সব সৃষ্টি তাঁর নিকট একত্রিত হবে, তাঁর নিকট যাবে। যেমন তিনি বলেন- وَاِنَّ اِلٰى رَبِّكَ الرُّجْعٰى অর্থাৎ নিশ্চয় আপনার প্রভুর দিকেই প্রত্যাবর্তন। -[সূরা আলাক]

وَاَنَّ اِلٰى رَبِّكَ الْمُنْتَهٰى অর্থাৎ অবশ্য আপনার প্রভুর নিকটই শেষ প্রান্ত। -[সূরা নাজম]

وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ অর্থাৎ আল্লাহরই দিকে সর্ববিষয় প্রত্যাবর্তিত হবে। -[সূরা বাকারা]

رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ অর্থাৎ হে আমাদের প্রভু, তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন। উপরিউক্ত আয়াতসমূহ দ্বারা বুঝা যায় সর্ব বিষয়ের প্রান্ত তাঁর নিকট। কিন্তু তাঁর প্রান্ত কারো নিকট নয়। বরং তিনি প্রান্ত নামক সীমা দ্বারা সীমিত নন। তিনি প্রান্ত হতে মুক্ত। কোথাও গিয়ে তাঁর সমাপ্তি ঘটবে না। আল্লাহর জন্য কোনো সীমা বা প্রান্ত নেই। এ ব্যাপারে তাঁর ক্ষমতা কত অসীম তা মানব জ্ঞান অনুমান করার শক্তি রাখে না।

قَوْلُهُ وَالْاَرْكَانِ الخ : আল্লাহ তা'আলা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে পূত পবিত্র। কারণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মূল দেহের অংশ হয়ে থাকে এবং পৃথক পৃথক ও অংশ বিশেষ হয়ে থাকে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এক ও একক। এ ব্যাপারে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা বলেন- وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ তোমাদের প্রভু এক একক। -[সূরা বাকারা]

তাঁর কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নেই এবং এসবের কোনো প্রয়োজনও নেই। তাঁর ইচ্ছা পূরণ করতে কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রয়োজন হয় না; বরং তাঁর আদেশ মাত্রই বস্তু বা কাজ সম্পাদন হয়ে যায়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন- اِنَّمَا اَمْرُهٗ اِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ অর্থাৎ তাঁর শান বা অবস্থা হলো, যখন কোনো বস্তু সৃষ্টির ইচ্ছা করেন তখন বস্তু সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বলেন হয়ে যাও। তখন তা হয়ে যায়। -[সূরা ইয়াসীন]

পক্ষান্তরে মানুষ কোনো কাজ করতে হলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রয়োজন খুবই গভীরভাবে অনুভব করে। মানুষ এবং মাখলুককে আল্লাহ তা'আলা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে সৃষ্টি করেছেন তা ছাড়া মানুষ অসহায়, অচল ও বিকলাঙ্গ হয়ে পড়বে। তাই বিকশিত মানুষ হতে হলে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আবশ্যিক ভাবে জরুরি। কিন্তু আল্লাহর এগুলোর কোনো প্রয়োজন নেই। তাই তিনি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হতে পূত ও পবিত্র।

* এখন প্রশ্ন হতে পারে যে, যখন আল্লাহ তা'আলার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নেই। তাহলে পবিত্র কুরআনে কিভাবে তিনি নিজের ব্যাপারে বলেছেন- يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ অর্থাৎ আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর। -[সূরা ফাতাহ]

অপর এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন- فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ অর্থাৎ সেখানেই আল্লাহর চেহারা। [বাকারা] এসব দ্বারা কি আল্লাহ তা'আলার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আছে বলে প্রমাণিত হয় না?

জবাব : সালফে সালেহীন, যারা আল্লাহ তা'আলার আরশে বিরাজমান হওয়া বা অন্যান্য বিশ্লেষণের যে সীমারেখা উল্লেখ করেছেন তাতে ঐ সীমারেখাই উদ্দেশ্য যার সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহই সম্যক পরিজ্ঞাত। মাখলুকের ইন্দ্রিয় শক্তি যার চিন্তাও করেনি। অনুরূপভাবে কুরআনে বর্ণিত আল্লাহ তা'আলার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা তাই উদ্দেশ্য হবে। যা আল্লাহ তা'আলার জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও হেকমত জাতীয় মৌলিক গুণাবলি [যেমন হাত, চেহারা ও পা ইত্যাদি] ক্ষেত্রে সৃষ্টির সাদৃশ্য থেকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র। তিনি এসব গুণাবলির দ্বারা গুণান্বিত। তবে তাঁর এই গুণাবলি সৃষ্টির গুণাবলি মতো নয়। এর আকার, আকৃতি, প্রকৃতি ও ধরন একমাত্র তিনিই

জানেন। যেমন হযরত ইমাম মালেক (র.) বলেছেন- إِنَّ مَعْنَاهَا مَعْلُوْمٌ وَالْكَيْفُ مَجْهُوْلٌ وَالْإِيْمَانُ بِهَا وَاجِبٌ وَالسُّؤَالُ عَنْهَا بِدْعَةٌ অর্থাৎ এসব গুণাবলির শাব্দিক অর্থ আমাদের জানা রয়েছে। এর ধরন অজ্ঞাত রয়েছে। আর এর প্রতি ঈমান রাখা ওয়াজিব এবং এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা বিদ'আত। অতএব প্রকৃত মু'মিন এর কর্তব্য হলো তার অর্থ জানা সত্ত্বেও এর অবস্থা সম্পর্কে প্রশ্ন করে না এবং এর প্রতি দৃঢ় ঈমান রাখে। আর এমনটিই যথার্থ।

قَوْلُهُ وَالْأَدَوَاتُ : এ শব্দটিতে উপকার অর্জন বা গ্রহণ করার অর্থ রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা এসকল উপাদান উপকরণ হতে সম্পূর্ণ মুক্ত। কারণ তাঁর সত্তা লাভ ক্ষতি হতে পবিত্র, তাই তাঁর কোনো উপকরণ ও উপাদানের প্রয়োজনই হয় না। ভূ-পৃষ্ঠের কোনো কিছুই তাঁর কোনো উপকার করতে পারবে না; বরং তিনিই সকল বস্তুর উপকার করেন এবং সবকিছুই তাঁর অনুগত ও অধীনে।

* যেমন কুরআন পাকে ইরশাদ হচ্ছে- فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا ـ بَلْ كَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا. অর্থাৎ কে তোমাদেরকে আল্লাহ হতে বিরত রাখবেন যদি তিনি তোমাদের অপকার বা উপকার সাধন করতে চান; বরং তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তা'আলা সে সম্পর্কে সংবাদ রাখেন। -[সূরা ফাতাহ]
* অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন- لَنْ يَضُرُّ اللّٰهَ شَيْئًا অর্থাৎ কোনো সৃষ্টিই আল্লাহ তা'আলার কখনো ক্ষতি সাধন করতে পারবে না।

উপরিউক্ত আয়াত দ্বারা বুঝা যায়, তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষতি অথবা উপকার সাধন করতে পারেন। কিন্তু কেউ তাঁর উপকার বা অপকার সাধন করতে পারে না। তাহলে কিভাবে কল্পনা করা যায় যে, স্রষ্টার নিজ সৃজিত উপকরণ হতে তিনি নিজেই উপকৃত হতে চাইবেন এবং তাঁর নিজের সৃজিত অপকার দ্বারা নিজেই অনোপকৃত হতে চাইবেন? যদি এমনটি হয় তবে আল্লাহ তা'আলা উপকার ও অপকার হতে অমুখাপেক্ষী হন না এবং তাঁর প্রতিমুখাপেক্ষী হওয়া জরুরি হয়ে পড়ে অথচ এটি অসম্ভব। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা উপায় উপকরণ হতে সম্পূর্ণরূপে পূত পবিত্র একথা প্রমাণিত হলো।

قَوْلُهُ وَلَا تَحْوِيْهِ الْجِهَاتُ .... الخ : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা এতো বড় এতো বিরাজমান যে, তাঁকে ষষ্ঠ দিক তথা আকাশ (উপর) মাটি (নিচ) পূর্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ ও উত্তর দিক তাঁকে পরিবেষ্টন করতে পারে না। যেমনটি পরিবেষ্টন করে মাখলুক তথা সৃষ্টিকে; বরং তিনি সব কিছুকে বেষ্টন করে রেখেছেন।

* যেমন তিনি বলেন- وَاللّٰهُ مِنْ وَّرَائِهِمْ مُّحِيْطٌ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাদের পিছন হতে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন। -[সূরা বুরূজ]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা এ সম্পর্কে আরো বলেন- وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْأَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيْطًا অর্থাৎ নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে যা কিছু রয়েছে, সবই আল্লাহর জন্য এবং প্রত্যেক বস্তুই আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক পরিবেষ্টিত। (একটা নির্দিষ্ট সীমায় আবদ্ধ) -[সূরা নিসা]

উপরোল্লিখিত আয়াতদ্বয় দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলাকে কোনো কিছুই তথা ছয়দিক বা দশ দিক যথা পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, ঈশান, বায়ু, অগ্নিত, নৈরিত, উপর ও নিচ অর্থাৎ কোনো দিকই তাকে পরিবেষ্টন করতে পারে না; বরং তিনিই সব দিককে বেষ্টন করে রেখেছেন।

সপ্তম পাঠ

মি'রাজ সম্পর্কীয় আকিদা

وَالْمِعْرَاجُ حَقٌّ قَدْ أُسْرِيَ بِالنَّبِيِّ ﷺ وَعُرِجَ بِشَخْصِهِ فِي الْيَقْظَةِ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ إِلَى حَيْثُ مَاشَاءَ اللّٰهُ مِنَ الْعُلٰى وَأَكْرَمَهُ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰى بِمَا شَاءَ وَأَوْحٰى إِلٰى عَبْدِهِ مَا أَوْحٰى.

অনুবাদ : মি'রাজ সত্য। হযরত রাসূল ﷺ কে রাতের বেলায় আকসায় ভ্রমণ করানো হয়েছে এবং তাঁকে জাগ্রতাবস্থায় স্বশরীরে নভোমণ্ডলে উঠানো হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা যেখানে চেয়েছেন সেখানেই নিয়েছেন। তিনি নবী করীম ﷺ কে যে জিনিস দিয়ে সন্তুষ্ট করতে চেয়েছেন তা দিয়েই সম্মানিত করেছেন এবং যা ওহী করার ইচ্ছা তাই ওহী করেছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَالْمِعْرَاجُ حَقٌّ **:** গ্রন্থকার (র.) বলেন, হযরত রাসূল ﷺ-এর নবুয়তের ১০ম বছর বায়তুল আকসা হতে ঊর্ধ্বগমন করেছিলেন। যা বাস্তবেই তাঁর জন্য একটি মু'জিযা। যা অন্য কোনো নবীর বৈশিষ্ট্য নয়। নিম্নে মি'রাজ সম্পর্কিত কিছু আলোচনা করা হলো–

মি'রাজ পরিচিতি :

আভিধানিক অর্থ : مِعْرَاجٌ শব্দটি عُرُوْجٌ শব্দ হতে নির্গত। মূলবর্ণ (ع - ر - ج) যেহেতু এটি ইসমে আলা এর ওয়াহিদ কুবরা; যার অর্থ উর্ধ্বগমনের একটি বড় যন্ত্র। উপরের দিকে উঠার যন্ত্র, উর্ধ্বগমনের সিঁড়ি বা আরোহণকরা যায় এমন একটি বস্তু।

পারিভাষিক সংজ্ঞা : ইসলামি পরিভাষায় মি'রাজের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে هُوَ عُرُوْجُ الرَّسُوْلِ إِلَى السَّمَاءِ حَيْثُمَا شَاءَ اللّٰهُ। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় তাঁর সান্নিধ্যে রাসূল ﷺ-এর উর্ধ্বাকাশে ভ্রমণ করাকে মি'রাজ বলা হয়।

ইমাম ত্বহাবী (র.) বলেন, মি'রাজ হলো রাসূল ﷺ-এর জীবনে একটি সত্য ঘটনা। নবী করীম ﷺ-কে সে রাতে জাগ্রতাবস্থায় সশরীরে ভ্রমণ করানো হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা যতদূর ইচ্ছা করেছেন আকাশের দিকে উত্তোলন করেছেন এবং তিনি যা ইচ্ছা করছেন তা দ্বারা সম্মানিত করেছেন। যা প্রত্যাদেশ করার ইচ্ছা করেছেন তাই করেছেন।

সশরীরে মি'রাজ :

মি'রাজ হযরত রাসূল ﷺ-এর জীবনে সংঘটিত একটি ঐতিহাসিক ঘটনা যা আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল ﷺ-কে উপহার ও মুজিযা স্বরূপ দান করেছেন। এটা তাঁর উম্মতের জন্য শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ। এ মি'রাজ সশরীরে জাগ্রত অবস্থায় হয়েছে, নাকি ঘুমন্ত অবস্থায় আত্মিকভাবে হয়েছে? এ নিয়ে আহলে হক ও কতক ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়।

১. আহলে হকদের অভিমত :

* হযরত আল্লামা লোকমান নাসাফী (র.) বলেন- اَلْمِعْرَاجُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ فِى الْيَقْظَةِ بِشَخْصِهِ اِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ مَا شَاءَ اللّٰهُ اِلَى الْعُلٰى حَقٌّ অর্থাৎ রাসূল ﷺ-এর আকাশপানে সশরীরে জাগ্রতাবস্থায় মি'রাজ সংঘটিত হওয়া, অতঃপর যা আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করেছেন ততটুকু উপরের দিকে গমন হওয়াটা সত্য।

* ইমাম ত্বহাবী (র.) বলেন- اَلْمِعْرَاجُ حَقٌّ قَدْ اُسْرِىَ بِالنَّبِىِّ ﷺ وَعُرِجَ بِشَخْصِهِ فِى الْيَقْظَةِ اِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ حَيْثُ مَاشَاءَ اللّٰهُ مِنَ الْعُلٰى অর্থাৎ মি'রাজ হলো একটি সত্য বিষয়। মহানবী ﷺ-কে রাত্রিকালে ভ্রমণ করানো হয়েছে। অতঃপর জাগ্রত অবস্থায় আল্লাহ তা'আলা যতটুকু ইচ্ছা উর্ধ্বগমন করিয়েছেন।

হকপন্থিদের নকলী দলিল :

* আল্লাহর রাসূল, কর্তৃক মি'রাজ সম্পন্ন হওয়া সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে- سُبْحَانَ الَّذِىْ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَى الَّذِىْ بَارَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَا অর্থাৎ পবিত্রতা ঐ সত্তার যিনি তাঁর বান্দাকে রাতে মসজিদে হারাম হতে মসজিদে আকসা পর্যন্ত গমন করিয়েছেন। যার চারপাশে বরকত দান করেছি। যাতে তাকে দেখাতে পারি আমার নিদর্শনাবলি হতে কিছু। -[সূরা বনী ইসরাঈল : ১]

এ আয়াতে اَسْرٰى শব্দটি দৈহিকভাবে রাত্রিকালীন পরিভ্রমণ বলা হয়। لِنُرِيَهٗ শব্দটি চাক্ষুষে দেখানোর অর্থ বহন করে। عَبْد শব্দটি দ্বারা বুঝা যায় সশরীরে মি'রাজ হয়েছে। কারণ রূহশূন্য দেহকে যেমন عَبْد বলা হয় না। অনুরূপ দেহহীন রূহকে عَبْد বলা হয় না; বরং উভয়টির সমন্বয়ে عَبْد হয়ে থাকে। যদি দেহহীন রূহকে عَبْد বলা হতো তবে আল্লাহ তা'আলা اَسْرٰى بِرُوْحِهٖ কিংবা ذَهَبَ بِرُوْحِهٖ বলতেন।

উপরিউক্ত তিনটি শব্দই সশরীরে মি'রাজ হওয়ার প্রমাণ বহন করে।

এতদ সম্পর্কে আরো পরিষ্কার কথা সূরা নাজমে বলা হয়েছে- ذُوْ مِرَّةٍ فَاسْتَوٰى وَهُوَ بِالْاُفُقِ الْاَعْلٰى ثُمَّ دَنٰى فَتَدَلّٰى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى ـ فَاَوْحٰى اِلٰى عَبْدِهٖ مَا اَوْحٰى ...... وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى অর্থাৎ সে তার আসল আকৃতিতে দৃশ্যমান হয়েছিল। তখন সে ঊর্ধ্ব দিগন্তে ছিল। তারপর সে তাঁর নিকটবর্তী হয়েছিল, অতি নিকটবর্তী। অবশেষে তাদের মাঝে দুই ধনুকের কিংবা এর চেয়ে কম দূরত্ব রইল। তখন আল্লাহ তা'আলা যা ওহী করার ছিল তা ওহী করলেন। .... তিনি এই ফেরেশতাকে আরো একবার দেখেছেন। সিদরাতুল মুনতাহার সন্নিকটে। [নাজম]

উক্ত আয়াতসমূহ হতে দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট হয় যে, মি'রাজ স্বশরীরে হয়েছে এবং জাগ্রতাবস্থায় হয়েছে।

* রাসূল ﷺ বলেন- رَكِبْتُ الْبُرَاقَ وَاَتَيْتُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ ثُمَّ عُرِجْنَا اِلَى السَّمَاءِ অর্থাৎ আমি বোরাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত বিশেষ ধরনের দ্রুতগামী বাহনে আরোহণ করলাম এবং বায়তুল মাকদিসে আসলাম। অতঃপর আমাকে নিয়ে উর্ধ্বগমন করা হলো। এ হাদীস দ্বারা আরো স্পষ্ট বুঝা যায় যে, মি'রাজ সশরীরে জাগ্রতাবস্থায় হয়েছে।

যৌক্তিক (আকলী) দলিল :

যদি ঘুমন্ত অবস্থায় মি'রাজ হতো তবে মুশরিকদের সাথে এ নিয়ে বিতর্ক হতো না। কারণ ঘুমন্ত অবস্থায় মানুষ স্বপ্নের মাধ্যমে প্রাচ্য হতে পাশ্চাত্য পর্যন্ত মুহূর্তের মধ্যে সফর করা সহজ ব্যাপার। আরবদের এটা জানা ছিল। অথচ মুশরিকরা মি'রাজের কথা শুনে তুমুল বিতর্কে লিপ্ত হলো। অতএব এটাই সশরীরে মি'রাজ হওয়ার প্রমাণ।

২. দার্শনিকদের মতামত :

দার্শনিকগণ রাসূল ﷺ -এর মি'রাজকে সম্পূর্ণরূপে কাল্পনিক মনে করে। তাদের মতে উর্ধ্বগমন সশরীরে মানুষের জন্য সম্ভব নয়।

তাদের দলিল : দার্শনিকগণ তাদের মতের স্বপক্ষে দলিল দিতে গিয়ে বলেন, আকাশে উর্ধ্বগমনের জন্য দ্রুত যান এর প্রয়োজন। আর সে সময়ে উর্ধ্বগামী কোনো যান ছিল না। অতএব মহানবী ﷺ-এর সশরীরে মি'রাজ অসম্ভব।

* উর্ধ্বগমন করতে হলে আকাশ ফেঁটে যাওয়া এবং তা পুনরায় জোড়া লাগা আবশ্যক। আর আকাশ ফেটে যাওয়া ও জোড়া লাগা সম্ভব নয় তাই এটাও আদৌ সম্ভব নয়। ফলে মি'রাজও সম্ভব নয়।

দার্শনিকদের প্রত্যুত্তর :

* কিছু সংখ্যক জ্ঞান পাপী, দার্শনিকদের অলীক প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়, সে কালে উর্ধ্বগামী যান ছিল না ঠিক। কিন্তু মহান আল্লাহ তা'আলার দেওয়া বোরাক নামক যান চোখের পলকের চেয়েও বেশি দ্রুত ও গতি সম্পন্ন ছিল।
* দ্বিতীয় দলিলের জবাব আসমান ফাটা ও পুনরায় জোড়া লাগা সম্ভব। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন- إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ - وَإِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ

৩. কতিপয় আলেমের মতামত :

একদল আলেম তাদের নিজস্ব অভিমত ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন, মি'রাজ স্বপ্নযোগে হয়েছিল। তারা তাদের মতের স্বপক্ষে দলিল উপস্থাপন করে বলেন- মহান আল্লাহ তা'আলার বাণী- وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ অর্থাৎ আমি আপনাকে যে স্বপ্ন দেখিয়েছি তা মানুষের পরীক্ষার জন্য দিয়েছি। এ আয়াতে স্পষ্ট কথা বলা হয়েছে। যা মি'রাজ হিসেবে পরিগণিত।

* হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-কে মি'রাজের কথা জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, كَانَتْ رُؤْيَةً صَالِحَةً তা ছিল নেক স্বপ্ন।
* হযরত আয়েশা (রা.) বলেন- مَا فُقِدَ جَسَدُ مُحَمَّدٍ لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ অর্থাৎ মুহাম্মদ ﷺ-এর শরীর মি'রাজের রাতে নিখোঁজ হয়নি।

উপরিউক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মি'রাজ স্বপ্নযোগে হয়েছে।

কতিপয় আলেমের প্রত্যুত্তর :

* তাদের উপস্থাপিত আয়াতের অর্থ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) কর্তৃক নিম্নরূপভাবে গৃহীত হয়েছে। তিনি বলেন رُؤْيَا দ্বারা رُؤْيَا بِالْعَيْنِ তথা চাক্ষুষ দেখা উদ্দেশ্য; নিজ শারীরিক চোখে কোনো কিছু প্রত্যক্ষ করা। স্বপ্ন নয় যা অবচেতনভাবে হয়ে থাকে।
* হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি ৮ম হিজরিতে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। আর মি'রাজ হয়েছেন নবুয়তের ১০ বছরে।
* হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাদীসের মর্মার্থ হলো রাসূল ﷺ-এর দেহ মোবারক রূহ হতে পৃথক হয়নি; বরং দেহ ও আত্মা একই সাথে ছিল।
* আল-কুরআনের মোকাবিলায় হাদীসের দলিল গ্রহণযোগ্য নয়।
* বর্তমান যুগে মানুষের চন্দ্র ও বিভিন্ন গ্রহ পরিভ্রমণের মাধ্যমে মি'রাজ সত্যায়িত হচ্ছে।

আল্লামা নাসিরুদ্দিদন আলবানী (র.) শরহে আকিদাতুত তাহাবী এর টীকা অংশে লিখেন, হযরত আয়েশা (রা.) এবং হযরত মুয়াবিয়া (রা.) থেকে এই কথা বিশুদ্ধ পন্থায় প্রমাণিত হয় নেই। এজন্য এই তাবিলের কোনো প্রয়োজন নেই। প্রকৃত অবস্থা আল্লাহই ভালো জানেন।

قَوْلُهُ قَدْ أُسْرِىَ بِالنَّبِيِّ ... الخ : এখানে মহানবী ﷺ-এর রাত্রিকালীন ভ্রমণ ও এক আশ্চর্যময় অলৌকিক মু'জিযা। যা অন্য কোনো নবীর ছিল না। নিম্নে এর আলোচনা করা হলো।

اَسْرٰى -এর পরিচিতি :

আভিধানিক অর্থ : اَلْإِسْرَاءُ শব্দটি سَرْىٌ হতে নির্গত, মূলবর্ণ (س - ر - ى) অর্থ হলো রাতে ভ্রমণ করা। আর আরবি ভাষায় اَسْرٰى বলা হয় সফর বা ভ্রমণকে।

পারিভাষিক সংজ্ঞা : পরিভাষায় ইসরা বলা হয় রাসূল ﷺ-এর মি'রাজের রাত্রিতে মক্কা হতে বায়তুল মাকদিস পর্যন্ত সফর তথা পরিভ্রমণ করাকে। এ সংজ্ঞাই মুহাদ্দিসীনগণ ব্যক্ত করেছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- سُبْحَانَ الَّذِيْٓ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَى الَّذِيْ بَارَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيَاتِنَا اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ. অর্থাৎ পবিত্রতা সেই মহাসত্তার জন্য যিনি নিজ বান্দাকে রাতে মসজিদে হারাম হতে মসজিদে আকসা পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়েছেন।

কাফেরদের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া : মহানবী ﷺ-এর মুখে একথা (বায়তুল্লাহ থেকে বায়তুল মাকদাস পর্যন্ত ভ্রমণ করেছেন) শুনে কাফেররা বলতে শুরু করল মুহাম্মদ এক রাতে হারাম শরীফ হতে আকসা পর্যন্ত গেল এবং ফিরে আসল। এটা কি করে সম্ভব! অথচ মক্কা হতে সিরিয়াতে কাফেলা যেতে সময় লাগে এক মাস। তখন তারা বলতে লাগল اِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ নিশ্চয় এটা একটি আশ্চর্য কাহিনী।

নওমুসলিমদের অবস্থা : হাসান বসরী (র.) বলেন, এ ঘটনা শুনে বহু নওমুসলিম মুরতাদ হয়ে যায়। লোকেরা এসে হযরত আবূ বকর (রা.)-কে বলল, আবূ বকর! তুমি কি তোমার বন্ধুকে বিশ্বাস কর? সে নাকি গত রাতে বায়তুল মাকদিসে গিয়ে নামাজ পড়ে এসেছে। তাৎক্ষণিকভাবে হযরত আবূ বকর (রা.) বললেন, তোমরা কি তাঁর কথা অবিশ্বাস কর। তারা বলল হ্যাঁ, এতো লোকজন মসজিদে এসে এ কথাই তো বলছে।" হযরত আবূ বকর (রা.)

বললেন, আল্লাহর শপথ! কখনোই তা অবিশ্বাস্য নয়। যাঁর কাছে আকাশ হতে ওহী আসে। তাঁর দূরত্ব এর চেয়ে লক্ষ লক্ষ গুণ বেশি। তাঁর জন্য এক রাতে হারাম থেকে বায়তুল মাকদিস পর্যন্ত পরিভ্রমণ করা মোটেই অবিশ্বাস্য কোনো ঘটনা নয়। অতএব তিনি যা বলেছেন অবশ্য অবশ্যই তা তিনি সত্য বলেছেন। এতে সামান্য পরিমাণ সন্দেহ নেই।

মি'রাজ ও ইসরা এর মধ্যকার পার্থক্য :

* আভিধানিক পার্থক্য সংজ্ঞা থেকে বুঝা যায়।
* পারিভাষিক পার্থক্যও সংজ্ঞা হতে বোধগম্য হয়।
* মি'রাজ বলা হয় মসজিদে আকসা হতে উর্ধ্ব জগৎ ভ্রমণ করাকে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন– وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى –
* পক্ষান্তরে ইসরা বলা হয় মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত ভ্রমণকে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন– سُبْحَانَ الَّذِىْٓ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ الخ

মি'রাজ ও ইসরার হুকুম :

হযরত শায়খ আহমদ মুল্লা জিয়ূন (র.) বলেন–

* মসজিদে হারাম হতে আকসা পর্যন্ত মি'রাজ কুরআন দ্বারা সাব্যস্ত এর অস্বীকারকারী কাফের।
* আকসা হতে প্রথম আসমান পর্যন্ত মি'রাজ হাদীসে মশহুর দ্বারা প্রমাণিত। এর অস্বীকারকারী বেদ'আতী।
* প্রথম আসমান হতে সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত হাদীসে আহাদ দ্বারা প্রমাণিত। এর অস্বীকারকারী ফাসেক। –[তাফসীরে আহমদী]

মহানবী ﷺ-কে প্রদত্ত কাওছার

وَالْحَوْضُ الَّذِيْ اَكْرَمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى بِهٖ غِيَاثًا لِاُمَّتِهٖ حَقٌّ . وَالشَّفَاعَةُ الَّتِىْ اِدَّخَرَهَا لَهُمْ حَقٌّ كَمَا رُوِىَ فِى الْاَخْبَارِ .

অনুবাদ : হাউজে কাওছার চিরসত্য, যা দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবীকে উম্মতের পিপাসা নিবারণার্থে দানস্বরূপ সম্মানিত করেছেন এবং (নবী করীম ﷺ-এর) সুপারিশ সত্য। তিনি তা নিজ উম্মতের জন্য সংরক্ষিত করে রেখেছেন। যেমন হাদীসে এর বিশদ আলোচনা রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَالْحَوْضُ الخ : জাগতিক জীবন অতিবাহিত করার পর মানুষ মৃত্যুবরণ করে, মৃত্যুর পর পুনরুত্থান, মিজান, আমলনামা, পুলসিরাত ও প্রশ্নোত্তর পর্বের ন্যায় হাউজে কাওছারও একটি সত্যপর্ব। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রিয় হাবীব ﷺ কে তা দান করেছেন বা করবেন। এটা সত্য ঘটনা। কোনো মু'মিনের জন্য একে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই।

* কেননা পবিত্র কুরআনে কাওছার দানের সত্যতা প্রসঙ্গে ইরশাদ হয়েছে- اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ অর্থাৎ নিশ্চয় আমি আপনাকে [হাউজে] কাওছার দান করলাম। [কাওছার আয়াত-১] কাওছার শব্দের অর্থ অধিক কল্যাণ, প্রচুর, প্রাচুর্যপূর্ণ, বিপুল ও অসংখ্য। গ্রন্থকার (র.) বলেন, হাউজ বলে উল্লেখ করেছেন, যা মহান রাব্বুল আলামীন তাঁর প্রিয় বান্দাকে হাশরের ময়দানে তৃষ্ণার্ত মুহূর্তে পানি পান করাবেন। এর সত্যতা সম্পর্কে মহানবী ﷺ বলেন- حَوْضِىْ مَسِيْرَةُ شَهْرٍ وَزَوَايَاهُ سَوَاءٌ وَمَاءُهٗ اَبْيَضُ مِنَ اللَّبَنِ وَرِيْحُهٗ مِنَ الْمِسْكِ وَكِيْزَانُهٗ اَكْثَرُ مِنْ نُجُوْمِ السَّمَاءِ مَنْ يَشْرَبُ مِنْهَا فَلَا يَظْمَأُ اَبَدًا. অর্থাৎ হাউজে কাওছারের দৈর্ঘ্য হবে একমাসের পথ। আর এর চতুষ্পার্শ্বের বাহুগুলো সমান। এর পানি দুধ হতে সাদা। এর সুগন্ধী মেশকে আম্বর হতেও বেশি। এর পানপাত্র সমূহ আকাশের তারকা রাজি হতে অধিক। এ হাউজ থেকে যে একবার। পানি পান করবে সে কখনো তৃষ্ণার্ত হবে না।
* হযরত আনাস (রা.) হতে হাউজে কাওছার সম্পর্কে বর্ণিত بَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ اَظْهُرِ فِى الْمَسْجِدِ اِذَا غَفِىَ اَغْفَاهُ الخ অর্থাৎ একদিন রাসূল ﷺ মসজিদে আমাদের সামনে উপস্থিত হলেন। হঠাৎ তাঁর মধ্যে তন্দ্রা বা অচেতনতার ভাব প্রকাশ পেল। অতঃপর হাসি মুখে মাথা মোবারক উঠালেন। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! হাসির কারণ কি? জবাবে রাসূল ﷺ বললেন, এ মুহূর্তে আমার নিকট একটি সূরা অবতীর্ণ হলো। অতঃপর বিসমিল্লাহ সহ সূরা কাওছার পাঠ করলেন এবং বললেন, তোমরা কি জান হাউজে কাওছার কি? আমরা বললাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ﷺ এ ব্যাপারে ভালো জানেন। তিনি বললেন, এটি জান্নাতের একটি নহর। আমার প্রভু

আমাকে দিবেন বলে ওয়াদা করেছেন। এতে অসংখ্যা কল্যাণ নিহিত রয়েছে। এই হাউজ হতে আমার উম্মত পানি পান করতে যাবে। এর পানপাত্র আকাশের তারকারাজির চেয়ে বেশি। কতেক উম্মতকে হাউজে কাওছার হতে ফেরেশতারা হটিয়ে দিবেন। তখন আমি বলব, প্রভু হে, এরাতো আমার উম্মত। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, আপনি জানেন না। আপনার পরে ঐ সমস্ত লোকেরা কি নতুন পথ ও মত অবলম্বন করেছিল। −[বুখারী ও মুসলিম]

হাদীসটি ত্রিশের অধিক সাহাবী বর্ণনা করেছেন। অতএব তা অস্বীকার করা কুফরি।

حَوْض ও كَوْثَرْ কি একই জিনিস?

জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে হাউজ ও কাওছার এক জিনিস নয়। حَوْض হাশরের মাঠে এবং كَوْثَرْ জান্নাতে লাভ করবেন। কতক আলেম বলেন, حَوْض কাওছারে অংশ বিশেষ। অতএব উভয়টিকে এক হওয়ার হুকুম দেওয়া জায়েজ।

হাউজে কাওছারের বৈশিষ্ট্য :

হযরত রাসূল ﷺ বলেছেন− حَوْضِيْ مَسِيْرَةُ شَهْرٍ অর্থাৎ আমার হাউজের দৈর্ঘ্য হবে এক মাসের পথ। আর এ চতুষ্পার্শের বাহুগুলো সমান। এর পানি দুধ হতে সাদা এবং মেশক আম্বর হতে অধিক সুগন্ধিময়। এর পানপাত্রসমূহ আকাশের তারকারাজি হতে অধিক উজ্জ্বল। একবার কেউ তা হতে পানি পান করলে আর কখনো তার পিপাসা লাগবে না।

মিজান প্রথম প্রতিষ্ঠিত হবে না হাউজ প্রথম প্রতিষ্ঠিত হবে, এর মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। কিন্তু বিশুদ্ধ অভিমত হলো হাউজ প্রথম প্রতিষ্ঠিত হবে। ইমাম কুরতুবি (র.) লিখেন, বর্তমান দুনিয়ার পর স্ফটিক সদৃশ স্বচ্ছ, স্বর্ণের ন্যায় পরিচ্ছন্ন এক দুনিয়া তৈরি করা হবে সেখানে হাউজ হবে। সেখানে বা ঐ জমিনে কোনো প্রকার প্রবাহিত হয়নি বা জবরদখল অথবা জুলুম-অত্যাচার হয়নি।

قَوْلُهُ وَالشَّفَاعَةُ الخ : অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আল্লাহর আদেশক্রমে নবীগণ ও বিশেষ ব্যক্তিবর্গ গুনাহগারদের গুনাহ ক্ষমা করে কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য শাফায়াত তথা সুপারিশ করবেন। নিম্নে শাফায়াত সম্পর্কে অল্প বিস্তর আলোচনা করা হলো।

শাফায়াত পরিচিতি :

শাব্দিক অর্থ : শাফায়াত শব্দটি বাব ফাতাহ হতে ব্যবহৃত। এর অর্থ−সুপারিশ করা, সাহায্য করা, সহায়তা করা, সহানুভূতি করা। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন− وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَّهُ نَصِيْبٌ مِّنْهَا

শাফায়াতের পারিভাষিক সংজ্ঞা : আল্লামা মুকাতিল (র.) বলেন− اَلشَّفَاعَةُ هِيَ تَوَسُّلُ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَالصَّالِحِيْنَ اِلَى تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِلْمُذْنِبِيْنَ لِاِنْقَاذِهِمْ مِنَ الْعَذَابِ فِيْ يَوْمِ الْحِسَابِ অর্থাৎ শাফায়াত হলো, মহাপ্রলয়ের দিন পাপিষ্ট লোকদের শাস্তি লাঘবের জন্য নবী রাসূল (আ.) ও পুণ্যবান লোকগণ কর্তৃক মহান আল্লাহর নিকট নিতান্ত বিনীত আবেদন করা।

কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তির জন্য নবী রাসূল (আ.) ও পুণ্যবানরা শাফায়াত করতে পারবে :

১. হাশরের দিন আল্লাহ তা'আলার আদেশক্রমে নবী রাসূলগণ কবীরা গুনাহগারদের জন্য শাফায়াত করতে পারবেন। এই দাবির স্বপক্ষে নিম্নে দলিল পেশ করা হলো–

ক. কুরআন পাকে আল্লাহ তা'আলা বলেন– مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗ اِلَّا بِاِذْنِهٖ অর্থাৎ এমন কে আছে, যে আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট শাফায়াত করবে। –[সূরা বাকারা]

অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন– لَا يَتَكَلَّمُوْنَ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ অর্থাৎ তারা কোনো ধরনের বাক্যলাপ করতে পারবে না। আল্লাহ যাকে অনুমতি দিবেন সে ছাড়া। –[সূরা নাবা]

অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন– اِسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ অর্থাৎ আপনি নিজ অপরাধ ও মু'মিন নর-নারীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন।

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন– فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِيْنَ অর্থাৎ শাফায়াতকারীদের শাফায়াত তাদের (কাফেরদের) কোনো কাজে আসবে না। –[সূরা মুদ্দাচ্ছির]

উপরিউক্ত প্রথম তিনটি আয়াতে কবীরা গুনাহগারের জন্য শাফায়াত উপকারে আসবে বলে প্রমাণিত এবং চতুর্থ আয়াতে কাফেরদের জন্য তা অপ্রমাণিত।

খ. হাদীসে বলা হয়েছে– يَشْفَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَةٌ الْاَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْعُلَمَاءُ ثُمَّ الشُّهَدَاءُ অর্থাৎ হাশরের দিন তিন ব্যক্তি শাফায়াত করবে। নবীগণ, ওলামাগণ ও শহীদগণ।

অপর আরেক হাদীসে রাসূল ﷺ বলেন– شَفَاعَتِىْ لِاَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ اُمَّتِىْ অর্থাৎ আমার উম্মতের কবীরা গুনাহগারদের জন্য আমার শাফায়াত উপকারে আসবে।

অপর আরেক হাদীসে রাসূল ﷺ আরো বলেন– اَنَا اَوَّلُ شَفِيْعٍ فِى الْجَنَّةِ اَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ অর্থাৎ জান্নাতে আমিই সর্বপ্রথম শাফায়াতকারী।

অপর আরেক হাদীসে রাসূল ﷺ বলেন– شَفَعَتِ الْمَلٰئِكَةُ وَشَفَعَ النَّبِيُّوْنَ وَشَفَعَ الْمُؤْمِنُوْنَ وَلَمْ يَبْقَ اِلَّا اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ.

উপরিউক্ত সবকটি হাদীস দ্বারা প্রমাণ হয় যে, হাশরের দিন নবী ও পুণ্যবানদের শাফায়াত কবীরা গুনাহগারদের জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট গৃহীত হবে।

গ. **ইজমা ভিত্তিক দলিল :** কিয়ামতের দিন শাফায়াত গ্রহণীয় হওয়ার উপর ঐকমত্য হয়েছেন সবসময়ের সকল ওলামায়ে কেরাম। অতএব এর বিপরীত মতামত অগ্রহণযোগ্য।

ঘ. **যৌক্তিক দলিল :** আল্লাহ তা'আলা বলেন– وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ অর্থাৎ তিনি ক্ষমা করবেন উহা ব্যতীত যাকে ইচ্ছা তাকে। এ আয়াতের দ্বারা বুঝা যায়, গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তিকে মাফ করা জায়েজ শাফায়াত ছাড়া। তাহলে শাফায়াত করার দ্বারা ক্ষমা করা আরো ধ্রুব সত্য বলে প্রমাণিত হলো।

উপরিউক্ত প্রমাণাদি দ্বারা সাব্যস্ত হলো যে, শাফায়াত আহলে কাবাইরদের জন্য ফলপ্রসু হবে। কিন্তু এ বক্তব্য মু'তাযিলা সম্প্রদায় মেনে নিতে নারাজ। নিম্নে তাদের মতামত প্রদত্ত হলো।

২. **মু'তাজিলাদের মতামত :** মু'তাযিলা সম্প্রদায় শাফায়াতকে অস্বীকার করে এবং তারা বলে لَا شَفَاعَةَ لِتَخْلِيْصِ الْيَوْمِ يَوْمَ الْجَزَاءِ অর্থাৎ বিচার দিনে অপরাধীর মুক্তির জন্য কোনো শাফায়াত গ্রহণযোগ্য হবে না।

তাদের দাবির স্বপক্ষের দলিল :

ক. আল্লাহ্ তা'আলার বাণী–

* وَاتَّقُوْا يَوْمًا لَا تَجْزِىْ نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ.
* يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ وَاُمِّهٖ وَاَبِيْهِ وَصَاحِبَتِهٖ وَبَنِيْهِ.
* اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ.
* وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمٍ وَّلَا شَفِيْعٍ يُّطَاعُ.

উপরিউক্ত আয়াতসমূহ দ্বারা বুঝা যায়, কারো জন্য কোনো ধরনের শাফায়াত চলবে না। একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন। আর যাকে ইচ্ছা শাস্তি দিবেন।

খ. রাসূল ﷺ-এর বাণী–

* اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ يَابَنِىْ عَبْدِ مَنَافٍ لَا اَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا - يَا صَفِيَّةُ عَمَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَا اَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا - يَا عَبَّاسُ عَمُّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَا اَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا،
* مَنْ تَرَكَ سُنَّتِىْ لَمْ يَنَلْ شَفَاعَتِىْ،

উপরিউক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণ হয় যে, কবীরা গুনাহগারদের ক্ষমা নেই এবং তাদের জন্য শাফায়াতও অকার্যকর।

গ. যৌক্তিক প্রমাণ : যে গুনাহ্ করে সে পূর্ণাঙ্গ মু'মিন না গুনাহ্গার মু'মিনকে ক্ষমা করা না জায়েজ। তাই তার জন্য শাফায়াত করাও না জায়েজ।

মু'তাযিলাদের দলিলের জবাব :

১. মু'তাযিলাদের বর্ণিত আয়াতগুলো কাফেরদের ক্ষমা না হওয়া ও তাদের পক্ষে শাফায়াত ফলপ্রসু না হওয়ার ব্যাপারে নাজিল হয়েছে। গুনাহ্গার মু'মিনদের উদ্দেশ্যে নয়। অতএব এর দ্বারা মু'মিন গুনাহগার উদ্দেশ নেওয়া নিছক মূর্খতা ছাড়া আর কিছু না।

২. ক. হাদীসে বর্ণিত لَا اَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا দ্বারা হাশরের দিনের ভয়াবহতা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। শাফায়াত অগ্রহণীয় হওয়া নয়।

খ. لَمْ يَنَلْ شَفَاعَتِىْ দ্বারা উন্নত মর্যাদা হতে বঞ্চিত হওয়ার আভাস পাওয়া যায় এবং সুন্নত পরিহারের ব্যাপারে কঠোরতা বুঝানো হয়েছে। শাফায়াত না হওয়ার [গুনাহগারদের জন্য] কথা বলা হয়নি।

৩. গুনাহ্গার মু'মিনকে ক্ষমা করা জায়েজ। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন– وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ অতএব তাদের জন্য শাফায়াতও জায়েজ।

شَفَاعَتْ -এর প্রকারভেদ : شَفَاعَتْ কয়েকভাবে হতে পারে। যথা–

১. শাফায়াতে কুবরা, যা আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ সমগ্র সৃষ্ট জীবের জন্য কিয়ামতের দিন ঐ সময় করবেন, যখন সমগ্র সৃষ্টিকুল হযরত আদম, নূহ, ইবরাহীম, মূসা ও ঈসা (আ.)-এর নিকট শাফায়াতের আবেদন করে এবং তাদের কাছ থেকে উত্তর পেয়ে হযরত মুহাম্মদ ﷺ

-এর নিকট পৌঁছবে। ঐ সময় নবী ﷺ আরশে এলাহী তথা আল্লাহর সিংহাসনের নিচে সেজদায় আত্ম নিমগ্ন হবেন। আর সৃষ্টজীবের ফয়সালা তথা বিচারকার্য শুরুর জন্য সুপারিশ করবেন। আল্লাহ্ তা'আলা দয়াপরবশ হয়ে তাঁর শাফায়াত গ্রহণ করবেন।

২. ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের জন্য শাফায়াত যাদের পাপ ও পুণ্য সমান সমান। হুযূর ﷺ তাদেরকে জান্নাত দানের জন্য সুপারিশ করবেন।

৩. ঐ সকল ব্যক্তির জন্য শাফায়াত যাদের দোজখে প্রবেশ করানোর জন্য নির্দেশ হয়ে গেছে। তাদেরকে যেন দোজখে প্রবেশ না করায়।

৪. আহলে সুন্নত এর মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য শাফায়াত করবেন। মু'তাযিলা সম্প্রদায় শুধুমাত্র এ ধরনের শাফায়াতকেই স্বীকার করে। এ ছাড়া অন্য কোনো শাফায়াতকে স্বীকার করে না।

৫. কিছু সংখ্যক লোককে বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশ করানোর জন্য হুযূর ﷺ শাফায়াত করবে।

৬. লঘু শাস্তির জন্য শাফায়াত করা তথা শাস্তিকে কম করা। যেমন আবূ তালেবের জন্য হুযূর ﷺ -এর শাফায়াত করার দ্বারা তার হালকা হয়ে যাওয়া। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (র.) থেকে বর্ণিত হুযূর ﷺ বলেন- لَعَلَّهُ تَنْفَعُهُ شَفَاعَتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُجْعَلُ فِيْ ضَحْضَاحٍ مِنْ نَارٍ تَبْلُغُ كَعْبَيْهِ يَغْلِيْ مِنْهُ أُمُّ دِمَاغِهِ. যদিও আয়াতে বলা হয়েছে- فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِيْنَ -এর জবাব হলো এই শাফায়াতকে নিষেধ করার দ্বারা উদ্দেশ্য জাহান্নামে প্রবিষ্ট ব্যক্তিকে শাফায়াত করে জাহান্নাম থেকে বের করা যাবে না। সাধারণভাবে উপকৃত হতে পারবে না একথা বলা হয়নি। অতএব, আয়াত ও হাদীসের মধ্যকার কোনো বৈপরীত্ব থাকল না।

৭. নবী করীম ﷺ -এর শাফায়াতের দ্বারা সকল মু'মিন নর নারীকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে।

৮. স্বীয় উম্মতের ঐ সমস্ত লোক যারা কবীরা গুনাহ্ করেছে, এবং জাহান্নামে প্রবিষ্ট হয়েছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর শাফায়াতের কারণে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে। এটা হাদীসে মুতাওয়াতির দ্বারা প্রমাণিত। কিন্তু এ বিষয়টা খাওয়ারিজ ও মু'তাযিলা সম্প্রদায় অস্বীকার করে। তারা বলে, জাহান্নামে প্রবেশ হওয়ার পর কেউ তা থেকে বের হতে পারবে না। এ সুপারিশ রাসূলুল্লাহ ﷺ ব্যতীত অন্যান্য নবী, ফেরেশতা এবং মু'মিনদের মধ্যে যারা উঁচু স্তরের তারাও করবে।

আল্লাহ কর্তৃক নেওয়া অঙ্গীকার সত্য

وَالْمِيْثَاقَ الَّذِىْ اَخَذَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى مِنْ اٰدَمَ وَ ذُرِّيَّتِهٖ حَقٌّ وَقَدْ عَلِمَ اللّٰهُ فِيْمَا لَمْ يَزَلْ عَدَدَ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَيَدْخُلُ النَّارَ جُمْلَةً وَاحِدَةً وَلَا يَزْدَادُ فِىْ ذٰلِكَ الْعَدَدِ وَلَا يَنْقُصُ مِنْهُ.

অনুবাদ : আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ.) ও তাঁর সন্তানদের থেকে [রূহ জগতে] যে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন তা চিরসত্য। তিনি অনাদিকাল হতে পূর্ণরূপেই জানেন কত সংখ্যক লোক জান্নাতে ও কত সংখ্যক লোক জাহান্নামে প্রবেশ করবে। এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে না এবং হ্রাসও হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَالْمِيْثَاقَ الخ : অর্থাৎ "মীছাক" আরবি শব্দ। মীছাকের আকিদা শরিয়তে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো–

اَلْمِيْثَاقُ –এর পরিচিতি :

اَلْمِيْثَاقُ -এর আভিধানিক অর্থ : مِيْثَاقٌ শব্দটি مِفْعَالٌ-এর ওজনে। এর বহুবচন مَوَاثِيْقُ যার অর্থ হলো অঙ্গীকার, চুক্তি, প্রতিজ্ঞা, প্রতিশ্রুতি।

এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِىْٓ اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَاَشْهَدَهُمْ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوْا بَلٰى شَهِدْنَا اَنْ تَقُوْلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غٰفِلِيْنَ.

যেমন আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন– وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ وَ رَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْرَ

পারিভাষিক সংজ্ঞা : শরিয়তের পরিভাষায় হযরত আদম (আ.) ও তাঁর সন্তান-সন্ততি থেকে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক আলমে আরওয়াহে [রূহের জগতে] নেওয়া ওয়াদাকে মীছাক (مِيْثَاقٌ) বলা হয়। আল্লাহ তা'আলা যে অঙ্গীকার নিয়েছেন এতে কোনো সন্দেহ নেই। তা বিনা দ্বিধায় মেনে নেওয়াও ঈমানের দাবি।

মীছাকের সত্যতা : আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে মানুষকে পাঠানোর পূর্বে মানুষের সকল রূহ বা আত্মাকে একত্রিত করলেন এবং সেখানে আল্লাহ তা'আলা সকল রূহ বা আত্মা থেকে তাঁর প্রভুত্বের সত্যতা সম্পর্কে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন। এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। নিম্নে কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা দলিল পেশ করা হলো।

কুরআনের দলিল :

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِىْٓ اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَاَشْهَدَهُمْ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوْا بَلٰى شَهِدْنَا اَنْ تَقُوْلُوْا يَوْمَ

الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غٰفِلِيْنَ. অর্থাৎ স্মরণ কর যখন আদম সন্তানদের পৃষ্ঠদেশ হতে বের করলেন তাদের বংশধরদেরকে এবং তাদের স্বীকারোক্তি নিলেন তাদেরই সম্বন্ধে এবং বললেন "আমি কি তোমাদের প্রভু নই"? তারা বলল হ্যাঁ আমরা সাক্ষী রইলাম। তা এজন্য যে, তোমরা যে কিয়ামতের দিন বলতে না পার যে, আমরা তো এ সম্পর্কে বেখবর বা অজ্ঞ ছিলাম। –[সূরা আ'রাফ : ১৭২]

সুন্নাহর দলিল :

মুসলিম ইবনে ইয়াছার (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, হযরত ওমর (রা.) কে উপরিউক্ত আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, হযরত নবী করীম ﷺ কে আয়াতটির তাফসীর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো তখন জবাবে তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম হযরত আদম (আ.) কে সৃজন করেন। অতঃপর নিজ কুদরতের হাতে তাঁর পৃষ্ঠে হাত বুলালেন, তখন তাঁর ঔরশে যত সৎ মানুষ জন্মাবার ছিল, সব মানুষ বের হয়ে এলো। তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন, তাদেরকে আমি জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেছি এবং এদেরকে জান্নাতীদের ন্যায় আমল করার জন্য সৃষ্টি করেছি। এরা জন্নাতের জন্য সৎ আমল করবে। অতঃপর পুনরায় তাঁর পিঠে কুদরতী হাত বুলালেন। তখন যত অসৎ মানুষ জন্মাবার সব বের হয়ে এলো এবং বললেন, এদের আমি জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি। এরা জাহান্নামীদের মতো আমল করবে। সে কথা শুনে সাহাবীদের একজন প্রশ্ন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! প্রথমেই যখন জাহান্নামী ও জান্নাতী সাব্যস্ত হয়ে গেছে, তখন আর আমল করার কি প্রয়োজন? তখন নবী করীম ﷺ বললেন, যখন আল্লাহ তা'আলা কাউকে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেন, তখন সে জান্নাতের আমলই করবে। পরিশেষে তার মৃত্যু এমন কর্মের উপর সংঘটিত হবে যে, তা হবে জান্নাতবাসী হওয়ার জন্য উপযুক্ত কাজ। আর আল্লাহ তা'আলা যখন কাউকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেন তখন সে জাহান্নামের আমল করা শুরু করে। অবশেষে তার মৃত্যু এমন কর্মের উপর হয় যা হবে জাহান্নামবাসীর আমল। –[তিরমীযী, আবূ দাউদ]

উপরিউক্ত আয়াত ও হাদীস দ্বারা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে গেল যে, আলমে আরওয়াহের মীছাক সত্য এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

ইজমা-এর দলিল :

নবী করীম ﷺ-এর যুগে কোনো সাহাবী এ সম্পর্কে কোনো দ্বিমত প্রকাশ করেন নি এবং তাঁদের যুগ হতে এ পর্যন্ত আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের সকল ওলামাগণ এতে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

মীছাক-এর স্থান : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে ইমাম আহমদ, নাসায়ী ও হাকিম (র.) নির্ভরযোগ্য সনদে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর বান্দাদের মাঝে যে মীছাক হয়েছে তা হলো ওয়াদিয়ে না'মান। যা আরাফার ময়দান নামে বিখ্যাত। (পরিভাষায় তাকে আলমে আরওয়াহ বলা হয়।)

قَوْلُهُ وَقَدْ عَلِمَ اللّٰهُ الخ : অর্থাৎ যেহেতু আল্লাহ তা'আলা সকল বস্তু সৃষ্টি করেছেন, তাই সে বস্তুর সকল তথ্য সম্পর্কে তিনি সম্যক জ্ঞানী। উক্ত বস্তুর কোনো তথ্য সম্পর্কে তিনি কখনই বেখবর বা অজ্ঞ নন। যেমন তিনি বলেন- إِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ অর্থাৎ নিশ্চয়

আল্লাহ্ তা'আলা সকল বস্তু সম্পর্কে সব সময় সম্যক সুপরিজ্ঞাত। -[সূরা আনফাল : ৭৫] চাই উক্ত তথ্য দৃশ্যমান হোক অথবা অদৃশ্যমান হোক। আর তাঁর এ জ্ঞান মাখলুক বা বস্তু সৃষ্টি করার পর অর্জিত হয়নি; বরং বস্তুটি সৃজন করার পূর্ব হতেই তিনি উক্ত বস্তুর সকল তথ্যাদি সম্পর্কে জ্ঞানী। এ কারণে মানুষের সকল বিষয়েও আল্লাহ্ তা'আলা জানেন। এমনকি কতজন মানুষ পাপ কাজে লিপ্ত হবে। কতজন সৎকর্ম সম্পাদন করবে। কতজন জান্নাতী হবে এবং কতজন জাহান্নামী হবে। এসব বিষয়ে সব ধরনের খবর আল্লাহ্ তা'আলা মানুষ সৃষ্টি করার পূর্বেই জানতেন। এর কম-বেশি লোক জান্নাতেও যাবে না এবং জাহান্নামেও যাবে না।

আল্লাহ্ তা'আলা এ সম্পর্কে ইরশাদ করেন- فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ
অর্থাৎ একদল জান্নাতে ও একদল জাহান্নামে প্রবেশ করবে। -[সূরা শুআরা]

এ আয়াত দ্বারা পরিপূর্ণভাবে বুঝা যায় তিনি সৃষ্টি করার পূর্ব থেকে জান্নাতী ও জাহান্নামী সম্পর্কে জানতেন।

* অন্যত্র তিনি আরো বলেন- وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা সব কিছু বেষ্টন করে রেখেছেন এবং প্রত্যেক বস্তুর সংখ্যা হিসাব করে রেখেছেন। -[সূরা জিন]

হযরত আলী (রা.) বলেন, আমরা কিছু সংখ্যক লোক একটি জানাযার সাথে জান্নাতুল বাকীতে ছিলাম। ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিকট আগমন করলেন, সাথে সাথে আমরা তাঁর চার পার্শ্বে উপবেসন করলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট একটি লাঠি ছিল। নবী করীম ﷺ-এর মাথা নিম্নগামী করত এর দ্বারা ভূমি খুঁড়তে লাগলেন। আর বললেন, এমন কোনো প্রাণ নাই যাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। অথচ জান্নাত বা জাহান্নামে তার স্থান লিখা হয়নি। এমনকি সে পুণ্যবান হবে না পাপী হবে তাও লিখে দেওয়া হয়েছে। হযরত আলী (রা.) বলেন, কোনো এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ তাহলে আমরা তাকদীরের ফায়সালার উপর নির্ভর করে কর্ম সম্পাদন পরিহার করছি না কেন? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যে ব্যক্তি নেককারদের অন্তর্ভুক্ত হবে সে নেক কাজ করার দিকে অগ্রসর হবে এবং নেক কাজ তার জন্য সহজ হবে। আর যে ব্যক্তি পাপী হবে তার জন্য পাপ কার্য সম্পাদন করা সহজ হবে। অতঃপর তিনি নিম্নোক্ত আয়াত তেলাওয়াত করেন।

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى - وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى - فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى - وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى - وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى.

বিশাল সমুদ্রে কি পরিমাণ পানি বিদ্যমান এবং কি পরিমাণ মাছ ও কীট রয়েছে। পাহাড়ের অভ্যন্তরে কি পরিমাণ অণু-পরমাণু বিদ্যমান, বৃষ্টিতে কি পরিমাণ ফোঁটা বর্ষিত হবে বা হয়েছে আর সমগ্র বিশ্বজুড়ে বৃক্ষরাজির কি পরিমাণ পাতা বিদ্যমান সে সম্পর্কেও আল্লাহ্ তা'আলা পরিপূর্ণ জ্ঞানী। এব্যাপারে তিনি বলেন- وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ অর্থাৎ আপনার রব হতে আসমান ও জমিনের ক্ষুদ্রাতি-ক্ষুদ্র কোনো কিছুই [সংখ্যা] অস্পষ্ট নয়। -[সূরা ইউনুস] অনুরূপ তিনি কতজন জান্নাতী ও জাহান্নামী হবে তা পূর্ব থেকে জানেন, তাঁর এই জানার মধ্যে কোনো ত্রুটির অবকাশ নেই।

আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির কর্ম সম্পর্কে অবগত

وَكَذٰلِكَ اَفْعَالَهُمْ فِيْمَا عَلِمَ مِنْهُمْ اَنْ يَفْعَلُوْهُ وَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خَلَقَهُ وَالْاَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيْمِ ـ وَالسَّعِيْدُ مَنْ سَعِدَ بِقَضَاءِ اللّٰهِ وَالشَّقِيُّ مَنْ شَقِيَ بِقَضَاءِ اللّٰهِ.

অনুবাদ : অনুরূপ আল্লাহ তা'আলা নিজ বান্দাদের কর্ম সম্পর্কে পূর্ব থেকেই অবগত আছেন। যাকে যে কর্মের জন্য সৃষ্টি করেছেন, তার জন্য সে কর্ম সহজসাধ্য করা হয়েছে এবং সকল কাজের মূল্যায়ন তার শেষ পরিণতির উপর নির্ভর করে। সৌভাগ্যবান ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহ তা'আলার ফয়সালার কারণে সৌভাগ্যবান হয়েছে এবং দুর্ভাগা সেই ব্যক্তি যে আল্লাহ তা'আলার ফয়সালার কারণে হতভাগা হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَكَذٰلِكَ اَفْعَالَهُمْ الخ : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যেরূপ তার বান্দাদের মধ্য হতে জান্নাতী ও জাহান্নামীর সংখ্যা পরিপূর্ণরূপে তাদেরকে সৃষ্টি করার পূর্ব থেকেই অবগত অনুরূপ তাদেরকে সৃষ্টি করার পূর্ব হতেই তাদের কর্ম সম্পর্কে পূর্ণ অবগত আছেন। এই জানার মধ্যে কোনো প্রকার ত্রুটি নেই। কারণ কাজ কর্ম ও তাঁর সৃষ্টি। যেমন- তিনি বলেন, وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলাই তোমাদেরকে ও তোমাদের কর্মকে সৃষ্টি করেছেন। -[সূরা ছাফ্ফাত]

* অন্যত্র বলেন- وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَعْمَلُوْنَ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কর্ম সম্পর্কে অবগত। তাছাড়া একথা সর্বজন স্বীকৃত যে, স্রষ্টা তাঁর সৃষ্টি ও তাঁর কর্ম সম্পর্কে পূর্ণ অবগত থাকেন। অন্যথা স্রষ্টার স্রষ্টাত্বের ত্রুটি প্রমাণিত হয়। আর আল্লাহ তা'আলা এ থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। অতএব একথা প্রমাণিত হলো যে, আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি জীব সৃজন করার পূর্ব হতেই তার কর্ম সম্পর্কে অবগত।

قَوْلُهُ وَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خَلَقَهُ الخ : অর্থাৎ সৃষ্টজীবের যাকে যে কর্মের জন্য মহান স্রষ্টা সৃষ্টি করেছেন, অবশ্যই সে কর্ম তার জন্য সহজ সাধ্য করেছেন এবং অবশ্যই সে ঐ কর্ম সম্পাদন করবেই। এ হিসেবে তাকে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। তার জন্য জান্নাতের কর্ম সম্পাদন সহজ এবং যাকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছেন, তার জন্য জাহান্নামের কর্ম সম্পাদন করা সহজ। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন- فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْيُسْرٰى অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় দান করে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে এবং উত্তম বিষয় তথা জান্নাতকে সত্যায়ন করে; সত্তর তাকে সহজসাধ্য করে দেই সুখের জন্য। -[সূরা লাইল : ৫-৭]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন- وَاَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰى فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْعُسْرٰى অর্থাৎ আর যে ব্যক্তি কার্পণ্য করে এবং বেপরওয়া হয় এবং হুসনা তথা জান্নাতকে অস্বীকার করে, তাকে সহজসাধ্য করে দেই কাঠিন্যের জন্য। -[সূরা লাইল : ৮-১০]

উপরিউক্ত আয়াতগুলো প্রমাণ দিচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলা যাকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করেছেন তার জন্য সেই কাজ সহজসাধ্য করে দেন। উপরে উল্লিখিত বক্তব্য দ্বারা একটি প্রশ্ন জাগে। তা হলো-

প্রশ্ন : যদি আল্লাহ তা'আলা প্রাণীজগৎ তথা মানুষ সৃষ্টি করার শুরুতে জান্নাতবাসীকে জান্নাতবাসীর আমল এবং জাহান্নামবাসীকে জাহান্নামবাসীর আমল দিয়ে সৃষ্টি করে থাকেন, তাহলে আমাদের আমল করার প্রয়োজন কি? কারণ তা তো আল্লাহ তা'আলা পূর্ব থেকে নির্ধারণ করেই রেখেছেন।

উত্তর : এর জবাবে হযরত রাসূলে কারীম ﷺ হাদীস শরীফে দিয়েছেন। হাদীসটির ভাষ্য এমন- একবার রাসূল ﷺ সাহাবীদের উদ্দেশ্য করে বললেন, আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ.) কে সৃষ্টি করে তাঁর ঔরসে জান্নাতবাসী ও জাহান্নামবাসী যা জন্মাবে তা নিজ কুদরতি হাত দ্বারা হাত বুলিয়ে বের করলেন। এক সাহাবী প্রশ্ন করলেন ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ আল্লাহ তা'আলা যখন পূর্ব হতে জান্নাতী ও জাহান্নামী নির্ধারণ করে রেখেছেন। তখন আর আমল করার প্রয়োজন কি? জবাবে নবী করীম ﷺ বললেন, আল্লাহ তা'আলা যখন কাউকে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেন তখন সে জান্নাতের কাজ করে এবং জান্নাতবাসীর আমলের উপরই মৃত্যুবরণ করে। যাকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেন তাঁর বিধানও অনুরূপ।

قَوْلُهُ وَالْاَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيْمِ الخ : বান্দার সকল কাজের মর্যাদা বা প্রতিদান শেষ পরিণতির উপর নির্ভরশীল। যেমন-

১. কোনো ব্যক্তি সারা জীবন কুফরি অবস্থা জীবন যাপন করে। অতঃপর সে মৃত্যুর সময় ঈমান তথা এক আল্লাহ তা'আলার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে। তাহলে তার পূর্বেকার কুফরি জীবনের কোনো হিসাব নিকাশ হবে না। এই ব্যক্তি ঈমানের উপর মৃত্যুবরণ করার কারণে জান্নাতী হবে।

২. পক্ষান্তরে যদি কোনো ব্যক্তি সারা জীবন ঈমানী অবস্থায় জীবন যাপন করে। অতঃপর মৃত্যুর সময় কুফরি অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তাহলে তার পূর্বেকার ঈমানী জীবন যাপনের কোনো প্রতিদান সে পাবে না; বরং তার শেষ পরিণতি কুফরির উপর সে পরিগণিত হবে। ফলে সে জাহান্নামী হবে। [আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে হেফাজত করুন]

নিম্নে প্রমাণ দেওয়া হলো :

কুরআনের দলিল :

উল্লিখিত বক্তব্যের স্বপক্ষে আল্লাহ তা'আলা বলেন- اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ اَحَدِهِمْ مِلْءُ الْاَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدٰى بِهٖ অর্থাৎ নিশ্চয় যারা কুফরি করেছে এবং কুফরি অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে তাদের কারো থেকে পৃথিবী পূর্ণ স্বর্ণ কখনো গ্রহণ করা হবে না। যদিও তারা তা কুফরির পরিবর্তে দিতে চায়। এদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাকর শাস্তি। -[সূরা আ লে ইমরান]

* অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন- اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ. অর্থাৎ যারা কুফরি করেছে এবং এরই উপর মৃত্যুবরণ করেছে তাদের উপর আল্লাহ তা'আলা, সকল ফেরেশতা ও সকল মানুষের অভিসম্পাত। -[সূরা বাকারা]

* আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র আরো বলেন- وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّئَاتِ .... وَلَا الَّذِيْنَ يَمُوْتُوْنَ وَهُمْ كُفَّارٌ وَاَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا. অর্থাৎ যারা পাপ কার্য করে .... এবং কুফরি অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তাদের জন্য কোনো তওবা নেই। আর এদের জন্য লাঞ্ছনাকর শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি। -[সূরা নিসা]

হাদীসের দলিল :

* হযরত রাসূল ﷺ বলেছেন- سَدِّدُوْا وَقَارِبُوْا فَاِنَّ صَاحِبَ الْجَنَّةِ يُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَاِنْ عَمِلَ اَىَّ عَمَلٍ وَاِنَّ صَاحِبَ النَّارِ يُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ وَاِنْ عَمِلَ اَىَّ عَمَلٍ. অর্থাৎ তোমরা সত্য পথে অনড় থেকে সঠিক তথা নেক কর্ম সম্পাদন কর এবং আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভে সচেষ্ট হও। কেননা জান্নাতী লোকের মৃত্যু হবে জান্নাতবাসীদের আমলের উপর। পূর্বে সে যে আমলই করুক না কেন। অনুরূপ জাহান্নামীর মৃত্যু হবে জাহান্নামীদের আমলের উপর। পূর্বে সে যে কাজই করুক না কেন। -[তিরমিযী]
* অন্য এক হাদীসে রাসূল ﷺ বলেন- اِنَّ الرَّجُلَ يَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ فِيْمَا يَبْدَأُ لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ اَهْلِ النَّارِ وَاِنَّ الرَّجُلَ يَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ فِيْمَا يَبْدَأُ لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ - অর্থাৎ ব্যক্তি জান্নাতবাসীদের আমল করে যা মানুষের নিকট প্রকাশ হয়। অথচ সে জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত এবং ব্যক্তি জাহান্নামীদের আমল করে যা লোকদের নিকট প্রকাশ হয়। অথচ সে জান্নাতীদের অন্তর্ভুক্ত। -[বুখারী ও মুসলিম]

উপরিউক্ত প্রমাণাদি দ্বারা বুঝা গেল যে, মানুষ পূর্বে কি কর্ম করল তা গ্রহণীয় নয়; বরং তার শেষ পরিণাম কি হলো তা গ্রহণীয় বা লক্ষণীয় বিষয়। তাই তো রাসূল ﷺ বলেছেন اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيْمِ অর্থাৎ নিশ্চয় আমল শেষ পরিণামের উপরই নির্ভরশীল। -[বুখারী]

قَوْلُهُ وَالسَّعِيْدُ مَنْ سَعِدَ الخ : অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি নিজ চেষ্টা ও সাধনার মাধ্যমে কখনো সৌভাগ্যবান হতে পারবে না। এখানে সৌভাগ্য দ্বারা হেদায়েত তথা সঠিক পথ প্রাপ্ত হওয়াকেই বুঝানো হয়েছে। সৌভাগ্যবান ঐ ব্যক্তিই যাকে আল্লাহ সৃষ্টি করার পূর্বে সৌভাগ্যবান বলে ঘোষণা দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন- مَنْ يَّهْدِى اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُّضِلٍّ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যাকে হেদায়েত দিবেন, তাকে বিপথগামী করার মতো কেউ নেই। -[সূরা যুমার]

অনুরূপভাবে কোনো মানুষ চেষ্টা সাধনার ত্রুটির কারণে হতভাগা বা বিপদগ্রস্থ হয় না। হতভাগা দ্বারা এখানে উদ্দেশ্য হলো পথ ভ্রষ্টতা তথা ঈমান থেকে বঞ্চিত হওয়া। অতএব বিপথগামী সে ব্যক্তিই হবে যাকে সৃষ্টি করার পূর্বেই মহান স্রষ্টা হতভাগ্য বলে ঘোষণা দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন- وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যাকে বিপথগামী করেন। তার কোনো পথ প্রদর্শক বা বিপথ থেকে পরিত্রাণ দাতা নেই। -[সূরা যুমার]

উপরিউক্ত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা সহজ, সরল ও সঠিক পথ দেখান এবং যাকে ইচ্ছা বিপথগামী করেন। আর এটি হয় মায়ের উদরে থাকাবস্থায়। যেমন রাসূল ﷺ বলেন- ثُمَّ يَبْعَثُ اللّٰهُ اِلَيْهِ مَلَكًا بِاَرْبَعِ كَلِمَاتٍ فَيَكْتُبُ عَمَلَهُ وَاَجَلَهُ وَرِزْقَهُ وَشَقِىٌّ وَسَعِيْدٌ ثُمَّ يَنْفُخُ فِيْهِ الرُّوْحَ. অর্থাৎ অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তার নিকট একজন ফেরেশতা চারটি জিনিস দিয়ে প্রেরণ করেন। অতঃপর সে গিয়ে ১. তার আমল, ২. মৃত্যু, ৩. রিজিক, এবং ৪. সে দুর্ভাগ্যবান হলে দুর্ভাগ্য এবং সৌভাগ্যবান হলে সৌভাগ্য লিখেন। অতঃপর তার ভিতর রূহ ফুঁকে দেন।

উপরিউক্ত আয়াত ও হাদীস দ্বারা প্রমাণ হচ্ছে যে, নিজ ইচ্ছায় কেউ ভাগ্যবান হতে পারে না এবং নিজ ইচ্ছার বিচ্যুতির কারণে হতভাগ্যও হয় না।

তাকদীর আল্লাহর একটি রহস্য

وَاَصْلُ الْقَدْرِ سِرُّ اللّٰهِ فِيْ خَلْقِهٖ لَمْ يَطَّلِعْ عَلٰى ذٰلِكَ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ وَالتَّعَمُّقُ وَالنَّظْرُ فِيْ ذٰلِكَ ذَرِيْعَةُ الْخِذْلَانِ وَسُلَّمُ الْحِرْمَانِ وَدَرَجَةُ الطُّغْيَانِ فَالْحَذَرَ كُلَّ الْحَذَرِ مِنْ ذٰلِكَ نَظْرًا اَوْ فِكْرًا اَوْ وَسْوَسَةً.

অনুবাদ : আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির জন্য তাকদীরের মূল হলো তা তাঁর গোপন রহস্য সম্পর্কে কোনো নিকটবর্তী ফেরেশতা এবং প্রেরিত রাসূল ও অবগত নয়। আর তাকদীর নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করা বঞ্চনার কারণ, দুর্ভাগ্যের সিঁড়ি এবং অবাধ্যতার মাধ্যম। অতএব এ সম্পর্কে চিন্তা, গবেষণা ও কল্পনা ইত্যাদি হতে বেঁচে থাকা সকল মানুষের জন্য একান্তই কর্তব্য।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَاَصْلُ الْقَدْرِ الخ : পূর্বে তাকদীর সম্পর্কিত বিশদ আলোচনা হয়েছে। বিষয়টি গ্রন্থকার (র.) সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন। মূলত তাকদীর জিনিসটি আল্লাহ তা'আলার একটি গোপন রহস্য। যা কোনো নিকটবর্তী ফেরেশতা কিংবা প্রেরিত নবীও জানে না। যেহেতু বিষয়টি রহস্যজনক, তাই এ ব্যাপারে বেশি কথাবার্তা বলা, চিন্তা গবেষণা করা, যৌক্তিক নীতি বাক্য উত্থাপন করা ইত্যাকার বিষয় বিপদমুক্ত নয়।

تَقْدِيْر একটি অজানা ভেদ বা রহস্য : তাকদীর এর আসল বা মূল কি? এর উত্তরে বলা হয় এটা একটা ভেদ বা রহস্য। এর প্রকৃত জ্ঞান আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নেই। তিনি কোনো কিছু তৈরি করেন আবার ধ্বংস করে দেন। যাকে ইচ্ছা নিঃস্ব ও অসহায় করেন আবার যাকে ইচ্ছা ধন জন, প্রভাব প্রতিপত্তি ইত্যাদি দান করেন। কাউকে পথভ্রষ্ট করেন আর কাউকে হেদায়েতের নুর দ্বারা আলোকিত করেন। এ সম্পর্কে হযরত আলী (রা.) বলেন, اَلْقَدْرُ سِرُّ اللّٰهِ فَلَا نَكْشِفُهٗ। অর্থাৎ তাকদীর হলো মহান আল্লাহ তা'আলার ভেদ বা রহস্য। আমরা তা উদঘাটন বা উন্মোচন করার ক্ষমতা রাখি না।

সত্যিই এই রহস্য উদঘাটন করার শক্তি সৃষ্টি কিংবা মানুষের পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়। কারণ এর সূক্ষ্মতা বুদ্ধি-বিবেকের সূক্ষ্মতা হতে অনেক উর্ধ্বে। উপরিউক্ত বিষয়টির সম্যক জ্ঞান আল্লাহ নিজ হাতে রেখেছেন অন্য কারো হাতে অর্পণ করেন নি। এমনকি এর অনুসন্ধানের দায়িত্বও দেন নি। সুতরাং কেউ যদি এ সম্পর্কে নাক গলাতে, বিচার বিশ্লেষণ কিংবা চিন্তা করতে যায় অবশ্যই সে বঞ্চনা ও পথ ভ্রষ্টতার শিকার হবে। আর এটা হবে খুবই যৌক্তিক ও স্বাভাবিক কথা।

তাকদীর সম্পর্কে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের মাসলাক হলো, প্রতিটা বস্তুই আল্লাহ তা'আলার শক্তি ও ইচ্ছায় সংঘটিত হয়ে থাক। আর স্বয়ং আল্লাহই বান্দার কর্মের স্রষ্টা। এতদসম্পর্কে আল্লাহ নিজেই বলেন– اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنٰهُ بِقَدَرٍ অর্থাৎ আমি প্রতিটি বস্তু পরিমিত পরিমাণ সৃষ্টি করেছি। –[সূরা কমর : ৪৯]

এক قَدْرِيْ এবং مَجُوْسِيْ এর কাহিনী : ওমর ইবনে উলাইছিম বলেন– আমরা কোনো এক সময় নৌকা ভ্রমণে বের হলাম। আমাদের সাথে একজন তাকদীর অস্বীকারকারী ও একজন অগ্নিপূজারীও ছিল। কাদরী অগ্নিপূজারীকে বলল– হে ভাই ইসলাম গ্রহণ কর। অগ্নি

পূজক বলল, হ্যাঁ আল্লাহ চাইলে ইসলাম কবুল করব। কাদরী বলে আল্লাহ তো চায়, কিন্তু শয়তান এটা চায় না যে মানুষ ইসলাম কবুল করুক। তখন অগ্নিপূজক বলে, এ যখন একই জিনিস আল্লাহ ও চায় এবং শয়তানও চায়। আর দু চাওয়ার মধ্যে শয়তানের চাওয়া তথা ইচ্ছা সফল হয় বা বিজয়ী হয়। তাই বুঝা গেল শয়তানই আল্লাহর চাওয়া তথা ইচ্ছার মোকাবিলায় শক্তিশালী [নাউযুবিল্লাহ]। তাই আমি অধিক শক্তিশালী সত্তার পক্ষ অবলম্বন করলাম।

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর :

কোনো এক ব্যক্তি আবূ ঈসাম কাসতলামীকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আবূ ঈসাম আপনার এ ব্যাপারে কি অভিমত? আল্লাহ আমাকে হেদায়েত তথা সৎ পথ প্রদর্শন করল না বরং পথভ্রষ্টতার মধ্যে নিক্ষেপ করল। তদুপরি আমাকে পথভ্রষ্টতার জন্য শাস্তিও দিল। এটা কি স্রষ্টার জন্য ন্যায়বিচার হলো? প্রতি উত্তরে ঈসাম বলেন, হেদায়েত এমন একটা বস্তু যা আল্লাহ তা'আলার একচ্ছত্র মালিকানায় রয়েছে। তাই এটা একমাত্র তাঁরই ইচ্ছা যাকে ইচ্ছা হেদায়েত দান করবেন যাকে ইচ্ছা করবেন না। এতে কারো কোনো এখতিয়ার নেই।

তাকদীরের বিষয়টি মানুষের নিকট রহস্যাবৃত হলেও আল্লাহ তা'আলার নিকট তা সুস্পষ্ট। কারণ যে কোনো উদ্দেশ্যে বস্তু গঠন করার আগে সে বস্তু সম্পর্কে কর্তার পূর্ণ ধারণা থাকা অত্যাবশ্যক। অন্যথা কাজটি সুষ্ঠুভাবে আঞ্জাম দেওয়া সম্ভব হয় না। যেমন কেউ দালান নির্মাণ করতে চাইলে তাঁর নকশা করা জরুরি। খাবার রান্না করলে প্রথমে তার পরিমাণ নির্ধারণ করা জরুরি।

অতএব প্রয়োজন হলো আল্লাহ তা'আলা যা কিছু সৃষ্টি করেছেন বা করবেন এর পূর্ব পরিকল্পনা, নমুনা ও পরিমাণ তার নিকট থাকা। আল্লাহ তা'আলা যা কিছু করেছেন তা তিনিই ভালো জানেন এবং কেন করছেন এর রহস্যও তিনি জানেন। এ সম্পর্কে আলোচক, পর্যালোচক ও বিশ্লেষক বিপথগামী হওয়ারই সম্ভাবনা বেশি। রাসূল ﷺ তাকদীর সম্পর্কিত পর্যালোচনাকারী সাহাবীদের প্রতি রাগ হয়ে বলেছিলেন–

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) اَنَّهُ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَنَحْنُ نَتَنَازَعُ فِى الْقَدْرِ فَغَضِبَ حَتّٰى احْمَرَّ وَجْهُهُ حَتّٰى كَاَنَّمَا فُقِئَ فِىْ وَجْنَتَيْهِ حَبُّ الرُّمَّانِ فَقَالَ اَبِهٰذَا اُمِرْتُمْ اَمْ بِهٰذَا اُرْسِلْتُ اِلَيْكُمْ اِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حِيْنَ تَنَازَعُوْا فِىْ هٰذَا الْاَمْرِ عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ اَنْ لَا تَنَازَعُوْا فِيْهِ.

অর্থাৎ হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, একদা আমরা তাকদীর নিয়ে পরস্পর বিতর্ক করছিলাম তথা কথাবার্তা বলছিলাম। এমন সময় হযরত রাসূল ﷺ আমাদের নিকট আসলেন এবং আমাদের পরস্পরের কথাগুলো শুনলেন। অতঃপর তখন তিনি অত্যন্ত রাগান্বিত হলেন অবস্থা এমন হলো যে, তাঁর চেহারা লাল বর্ণের হয়ে গেল যেন তাতে আনারের দানা নিংড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। অতঃপর তিনি বললেন, তোমাদেরকে কি এ বিষয়ে আলোচনা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কিংবা আমি তোমাদের নিকট এ নিয়ে প্রেরিত হয়েছি? তোমরা কি জান? একমাত্র এ নিয়ে বিতর্ক করেই তোমাদের পূর্বেকার লোকেরা ধ্বংস হয়েছে। আমি তোমাদের শপথ দিয়ে বলছি, আল্লাহর শপথ দিয়ে বলছি, তোমরা এ সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয়ো না। –[তিরমিযী]

উপরিউক্ত হাদীস দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তাকদীর আল্লাহ তা'আলার গোপনীয় রহস্য। এ নিয়ে বিতর্কে যাওয়া মু'মিনের জন্য আদৌ উচিত নয়। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার একত্বতা স্বীকার করল এবং তাকদীর অস্বীকার করল কিংবা আপত্তি করতঃ বলল যে, আল্লাহ তা'আলা কেন এমন করলেন বা কেন করলেন না, তাহলে সে কুফরি করল।

তাকদীরের জ্ঞান আল্লাহ তা'আলারই

فَإِنَّ اللّٰهَ طَوٰى عِلْمَ الْقَدْرِ عَنْ أَنَامِهٖ وَنَهَاهُمْ عَنْ مَرَامِهٖ كَمَا قَالَ تَعَالٰى لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُوْنَ فَمَنْ سَأَلَ لِمَ فَعَلَ فَقَدْ رَدَّ حُكْمَ الْكِتَابِ وَمَنْ رَدَّ حُكْمَ الْكِتَابِ كَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ.

অনুবাদ : কেননা আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং নিজেই তাকদীরের জ্ঞান সৃষ্টিকুল হতে গোপন রেখেছেন এবং এর তত্ত্ব উদঘাটনে চেষ্টা হতেও তাদেরকে বারণ করেছেন। যেমন– আল্লাহ্ তা'আলা বলেন– "তিনি যা করেন তা সম্পর্কে তাঁকে প্রশ্ন করা যাবে না; বরং তাঁরাই নিজ কৃতকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।" অতএব যে ব্যক্তি (আপত্তি করতঃ) বলবে তিনি কেন এ কাজ করলেন, সে আল্লাহ্র কিতাবের আদেশ প্রত্যাখ্যান করল। আর যে কিতাবের বিরোধিতা করল, সে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ فَإِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى طَوٰى الخ : এখান হতে গ্রন্থকার (র.) তাকদীরের হুকুম বর্ণনা আরম্ভ করেছেন। যেহেতু তাকদীর ইসলামের মৌলিক আকিদাসমূহের অন্যতম একটি এবং স্রষ্টার গোপন রহস্যের এমন একটি যা মানুষের বিবেক, বিবেচনা, বুদ্ধি ও কল্পনার উর্ধ্বে এবং এর কর্মসমূহ এমন যার উপর তাঁকে জিজ্ঞাসা করা যাবে না; বরং তারই নিজ কৃতকর্মের জন্য জিজ্ঞাসিত হবে।

তাকদীর বিষয়টি মানুষের বিচক্ষণতা ও সূক্ষ্মবুদ্ধি হতে এমন সূক্ষ্ম যার সূক্ষ্মতা সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই ভালো জানেন। এগুলো বুঝা বা গবেষণার চেষ্টা মানুষ বা মাখলুকের জন্য অসম্ভব। তাই এর চিন্তা বা বুঝার চেষ্টা গোমরাহী বা পথভ্রষ্টতার দিকে অগ্রসর করে।

তাকদীর অমান্যের হুকুম :

তাকদীর এর বিষয়টি যে ব্যক্তি এমনিতে মেনে নেয়, সেই হলো প্রকৃত মু'মিন। কিন্তু যে মেনে নেয়নি কিংবা গবেষণার চেষ্টা চালায় সে নির্ঘাত বিপথগামী এবং যে ব্যক্তি আপত্তি করতঃ বলে আল্লাহ্ তা'আলার এমনটি কেন করলেন বা কিই বা তাঁর উদ্দেশ্য তবে সে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

দলিল : আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন– لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُوْنَ অর্থাৎ আল্লাহ্ কি করেছেন এ সম্পর্কে তিনি জিজ্ঞাসিত হবেন না; বরং তারা কি করেছে সে সম্পর্কে তারা জিজ্ঞাসিত হবে [আল্লাহর কাছে]। –[সূরা আম্বিয়া] বুঝা গেল তাকদীর নিয়ে বিশ্লেষণ গোমরাহী বা পথ ভ্রষ্টতা।

ইলম দু'প্রকার

فَهٰذِهٖ جُمْلَةٌ مَا يَحْتَاجُ اِلَيْهِ مَنْ هُوَ مُنَوَّرٌ قَلْبُهٗ مِنْ اَوْلِيَاءِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَهِيَ دَرَجَةُ الرَّاسِخِيْنَ فِي الْعِلْمِ لِاَنَّ الْعِلْمَ عِلْمَانِ عِلْمٌ فِي الْخَلْقِ مَوْجُوْدٌ وَعِلْمٌ فِي الْخَلْقِ مَفْقُوْدٌ فَاِنْكَارُ الْعِلْمِ الْمَوْجُوْدِ كُفْرٌ وَادِّعَاءُ الْعِلْمِ الْمَفْقُوْدِ كُفْرٌ وَلَا يَصِحُّ الْاِيْمَانُ اِلَّا بِقَبُوْلِ الْعِلْمِ الْمَوْجُوْدِ وَتَرْكِ طَلَبِ الْعِلْمِ الْمَفْقُوْدِ.

অনুবাদ : মোটকথা উপরিউক্ত বিষয়গুলোর প্রতি আল্লাহ তা'আলার প্রিয়জনদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই মুখাপেক্ষী যার অন্তর আলোকিত হয়ে আছে। আর এটাই জ্ঞানে পরিপক্ক লোকদের স্তর। কেননা ইলম দু'প্রকার। যথা– ১. ঐ ইলম যা সৃষ্টজীবের মধ্যে বিদ্যমান এবং ২. ঐ ইলম যা সৃষ্টজীবের মধ্যে বিদ্যমান নেই। অতএব বিদ্যমান ইলম অস্বীকার করা কুফরি এবং অবিদ্যমান ইলমের দাবি করাও কুফরি। আর বিদ্যমান ইলম কবুল করা এবং অবিদ্যমান ইলমের অন্বেষণ পরিহার করা ব্যতীত ঈমান বিশুদ্ধ হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ فَهٰذِهٖ جُمْلَةٌ الخ : ইতঃপূর্বে তাকদীর সম্পর্কিত যে আলোচনা করা হয়েছে এবং যেগুলো ছাড়া আকিদা বিনষ্ট হয়ে যায় যেগুলো ব্যতীত ঈমান পরিপূর্ণ হয় না। সেগুলো মেনে নেওয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলার প্রিয়জন সর্বদা প্রস্তুত এবং মুখাপেক্ষী।

আর এদের অন্তরই আলোকিত অন্তর বলে স্রষ্টার নিকট গৃহীত তথা রহমতপূর্ণ। আর এরূপভাবে মেনে নেওয়া ও মেনে নেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকাই হলো জ্ঞানের গভীরতা অর্জনকারীদের স্তর। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন– وَالرَّاسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ يَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِهٖ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّا اُولُو الْاَلْبَابِ. অর্থাৎ ইলমে যারা সুগভীর তারা [আল্লাহর বিধানাবলি সম্পর্কে] বলে আমরা এগুলোর প্রতি ঈমান আনলাম। এর প্রত্যেকটিই আমাদের প্রভুর পক্ষ হতে। আর জ্ঞানীগণ ভিন্ন অন্য কেউ উপদেশ গ্রহণ করে না। –[সূরা আলে ইমরান]

قَوْلُهٗ لِاَنَّ الْعِلْمَ عِلْمَانِ الخ : এখান থেকে গ্রন্থকার (র.) জ্ঞানে সুগভীরদের বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করে ইলমের প্রকারভেদ নির্ণয় ও তার হুকুম বর্ণনা শুরু করেছেন। নিম্নে ইলমের প্রকারভেদ তুলে ধরা হলো।

ইলম পরিচিতি :

ইলমের আভিধানিক অর্থ : عِلْم অর্থ হলো জানা, অবগত হওয়া, জ্ঞাত হওয়া, অবহিত হওয়া। যেমন– আল্লাহ তা'আলার বাণী– يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ

ইলমের প্রকারভেদ :

আকাইদের ক্ষেত্রে ইলম দু'প্রকার :

১. عِلْمٌ فِى الْخَلْقِ مَوْجُوْدٌ : আর এটি ঐ ইলমকে বলে যা সামগ্রিকভাবে দীন তথা ধর্মের বিস্তারিত আদেশ ও নিষেধ হিসেবে হযরত মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নিজ উম্মতের জন্য নিয়ে এসেছেন। (যাকে পরিভাষায় ইলমে শরিয়তও বলা হয়)

* এতদসম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন– مَا اٰتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا অর্থাৎ রাসূল তোমাদের নিকট যে ইলম [আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে] নিয়ে এসেছেন, তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেছেন তা তোমরা বর্জন কর। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। উল্লেখ্য উপরিউক্ত ইলম অর্জনকারীরাই সফলকাম। তারাই দুনিয়া ও আখেরাতে ভাগ্যবান। আল্লাহ তা'আলার ভাষায় এদেরকে اَلرَّاسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ বলা হয়। এদের গুণাগুণ বর্ণনা করে আল্লাহ তা'আলা বলেন– اَلرَّاسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ يَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِهٖ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا অর্থাৎ ইলমে সুগভীর ব্যক্তিরা (রাসূল ﷺ-এর আনীত হুকুম সম্পর্কে) বলে, আমরা এর উপর ঈমান আনলাম। এগুলো সব আমাদের রবের পক্ষ হতে। –[সূরা আলে ইমরান]

উপরে বর্ণিত ইলম হলো ঐ ইলম, যা কিতাবুল্লাহ ও সুন্নত এর মধ্যে সমুদয়, বিস্তারিত ও শাখাগতভাবে উপদেশ মালা, দৃষ্টান্ত ও ঘটনা ইত্যাদি সৃষ্টিকুলে বিদ্যমান রয়েছে।

* আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ.) সম্পর্কে অন্য আয়াতে বলেন– يٰاَبَتِ اِنِّىْ قَدْ جَاءَنِىْ مِنَ الْعِلْمِ مَالَمْ يَاْتِكَ فَاتَّبِعْنِىْ اَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا অর্থাৎ হে আমার পিতা! নিশ্চয় আমি এমন ইলম নিয়ে এসছি যা আপনার নিকট আসেনি। সুতরাং আপনি আমার অনুসরণ করুন। আমি আপনাকে সরল পথ দেখাব। –[সূরা মারইয়াম]

বিদ্যমান ইলমের হুকুম : গ্রন্থকার (র.) বলেন اَلْعِلْمُ الْمَوْجُوْدُ তথা বিদ্যমান ইলম অস্বীকার করা এবং ইলমে মাওজুদ গ্রহণ না করলে ঈমান বিশুদ্ধ হবে না।

২. عِلْمٌ فِى الْخَلْقِ مَفْقُوْدٌ (সৃষ্টিকুলে অবিদ্যমান ইলম) বলা হয় ঐ ইলমকে যা স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিকুল হতে গোপন রেখেছেন এবং তাঁর উদ্দেশ্য উদঘাটন করা থেকে তাদেরকে বারণ করেছেন। যেমন– রূহ কি জিনিস? এর ইলম। কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার ইলম। এ সবের ইলম একমাত্র আল্লাহরই নিকট বিদ্যমান। আর সৃষ্টিকুলের নিকট অবিদ্যমান। এর জ্ঞান অন্বেষণ করতে আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিকুলকে বারণ করেছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন– يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ অর্থাৎ লোকেরা আপনাকে প্রশ্ন করে রূহ সম্পর্কে। আপনি বলে দিন রূহ আমার রবের হুকুমের অন্তর্গত। –[সূরা বনী ইসরাঈল]

অপর আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন- يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسٰهَا فِيْمَ اَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا اِلٰى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا অর্থাৎ তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে কিয়ামত সম্পর্কে যে তা কখন ঘটবে? তার আলোচনার সাথে আপনার কি সম্পর্ক? আপনার রবের নিকট রয়েছে এর সুনির্দিষ্ট সময়ের চূড়ান্ত জ্ঞান। -[সূরা নাযি'আত]

* অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন- وَعِنْدَهُ مَفَاتِيْحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا اِلَّا هُوَ অর্থাৎ আল্লাহরই নিকট রয়েছে, গায়েবের চাবিকাঠি। তিনি ছাড়া আর কেউ গায়েব জানে না। -[সূরা আন'আম]

* অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন- اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِى الْاَرْحَامِ وَمَاتَدْرِىْ نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِىْ نَفْسٌ بِاَىِّ اَرْضٍ تَمُوْتُ. اَلْاٰيَةَ অর্থাৎ নিশ্চয় কিয়ামতের জ্ঞান আল্লাহরই হাতে। তিনি বৃষ্টিবর্ষণ করেন এবং জরায়ুতে কি রয়েছে তিনি জানেন। মানুষ কাল কি উপার্জন করবে এবং সে কোথায় মারা যাবে তা তিনিই জানেন। -[সূরা লোকমান]

উপরিউক্ত আয়াতসমূহ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, উল্লিখিত বিষয়সমূহের জ্ঞান মানুষের নিকট অবিদ্যমান। একমাত্র আল্লাহরই নিকট বিদ্যমান। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন- وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا অর্থাৎ তোমাদেরকে অল্প বিদ্যাই দেওয়া হয়েছে। -[বনী ইসরাঈল] আর উক্ত অল্প বিদ্যাই হলো আলোচ্য শাস্ত্রের اَلْعِلْمُ الْمَوْجُوْدُ বা [সৃষ্টির নিকট] বিদ্যমান জ্ঞান। কিন্তু اَلْعِلْمُ الْمَفْقُوْدُ তথা (সৃষ্টির নিকট) অবিদ্যমান জ্ঞান নয়। কেননা তা একমাত্র আল্লাহরই নিকট পরিজ্ঞাত অন্য কারো নিকট তার বোধগম্যতা নেই।

অবিদ্যমান ইলম-এর হুকুম :

* গ্রন্থকার (র.) বলেন, ইলমে মাফকূদ বা অবিদ্যমান ইলমের দাবি করা কুফরি। এতে ঈমান বিনষ্ট হয়।

* ইলমে মাফকূদের অনুসন্ধান বা বিশ্লেষণ বর্জন করা ছাড়া ঈমান বিশুদ্ধ হবে না। (আল্লাহ তা'আলা আমাদের হেফাজত করুন।)

অষ্টম পাঠ

লাওহে মাহফুজ ও কলম সম্পর্কে আকিদা

وَنُؤْمِنُ بِاللَّوْحِ وَالْقَلَمِ وَبِجَمِيْعِ مَا قَدْ رَقَمَ فَلَوِ اجْتَمَعَ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ عَلٰى شَيْءٍ كَتَبَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى فِيْهِ اَنَّهُ كَائِنٌ لِيَجْعَلُوْهُ غَيْرَ كَائِنٍ لَمْ يَقْدِرُوْا عَلَيْهِ وَلَوِ اجْتَمَعُوْا كُلُّهُمْ عَلٰى مَا لَمْ يَكْتُبْهُ اللّٰهُ لِيَجْعَلُوْهُ كَائِنًا لَمْ يَقْدِرُوْا عَلَيْهِ جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا هُوَ كَائِنٌ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

অনুবাদ : আর আমরা লাওহে মাহফূজ ও কলমের উপর ঈমান আনয়ন করি এবং কলম যা কিছু লিপিবদ্ধ করেছে তাতেও ঈমান রাখি। সুতরাং যদি সমস্ত সৃষ্টজীব একত্রিত হয়ে চেষ্টা করে ঐসব বিষয় না হওয়ার জন্য যা সংঘটিত হওয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলা লাওহে মাহফূজে লিখে রেখেছেন। তবে তাতে তারা সক্ষম হবে না। পক্ষান্তরে যদি সমস্ত সৃষ্টজীব একত্রিত হয়ে ঐসব বিষয় সংঘটিত করার চেষ্টা চালায় যা হওয়ার কথা আল্লাহ তা'আলা লাওহে মাহফূজে লেখেননি। তাহলে এতেও তারা সক্ষম হবে না। কিয়ামত সম্পর্কে যা কিছু ঘটবে সে সম্পর্কে কলম শুকিয়ে গেছে। অর্থাৎ কলম লিখে দায়িত্ব মুক্ত হয়ে গেছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَنُؤْمِنُ بِاللَّوْحِ الخ : গ্রন্থকার (র.) এখান থেকে লাওহে মাফুজ ও কলম সম্পর্কিত আকিদা বর্ণনা করেছেন। নিম্নে লাওহে মাহফূজ ও কলম সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

লাওহে মাহফূজ পরিচিতি :

اَللَّوْحُ -এর আভিধানিক অর্থ : ফলক, বোর্ড, তক্তা, চেপটাতক্তা বা খণ্ড। এর বহুবচন হলো اَلْوَاحٌ যেমন আল্লাহ পাক বলেন– وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوْسَى الْغَضَبُ اَخَذَ الْاَلْوَاحَ

পারিভাষিক অর্থ : লাওহে মাহফূজ ঐ সংরক্ষিত ফলককে বলে, যাতে আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিকুলের ভাগ্য ও কিয়ামত পর্যন্ত সকল ঘটমান বিষয় লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। যেমন মহান স্রষ্টা কুরআনুল কারীমে এ সম্পর্কে বলেন, بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌ فِىْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ [সূরা বুরূজ আয়াত ২১-২২] এ সম্পর্কে সুনানে আবূ দাউদে হযরত উবাদা ইবনে সামেত (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা প্রথম কলম সৃষ্টি করলেন এবং কলমকে বললেন লিখ। কলম বলল, হে আমার প্রতিপালক কি লিখব? আল্লাহ তা'আলা বললেন, কিয়ামত পর্যন্ত সকল বস্তুর তাকদীর তথা ভাগ্য লিপিবদ্ধ কর।

লাওহে মাহফূজের ধরন :

ইমাম ভগবী (র.) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, লাওহে মাহফূজ সাদা মুক্তার তৈরি। এর দৈর্ঘ্য আকাশ হতে ভূ-পৃষ্ঠ পর্যন্ত। অর্থাৎ পাঁচশত বছরের রাস্তা এবং এর প্রশস্ততা দুনিয়ার পূর্ব হতে পশ্চিম পর্যন্ত। লাওহে মাহফূজের কিনারায় পদ্মরাগ মনি বসানো এবং প্রান্তসমূহ পদ্মরাগ দিয়ে তৈরি। এতে নূরের কলম তথা কলমে কাদীম দ্বারা লিখিত আছে। এর উপরের প্রান্ত আরশে আজীম এর সাথে ঝুলন্ত এবং নিচ প্রান্ত একজন সম্মানিত ফেরেশতার উপর রাখা হয়েছে। আর উক্ত ফেরেশতা আরশের অন্য পার্শ্বে দণ্ডায়মান রয়েছেন। লাওহে মাফূজে লিপিবদ্ধ রয়েছে– لَاإِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاحِدٌ دِيْنُهُ الْاِسْلَامُ وَمُحَمَّدٌ عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ فَمَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَصَدَّقَ بِوَحْدِهِ وَاتَّبَعَ رَسُوْلَهُ اَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ. অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। তিনি এক, তাঁর মনোনীত ধর্ম ইসলাম। মুহাম্মদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল। অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহ উপর ঈমান আনবে এবং তাঁর ওয়াদা বিশ্বাস করবে এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য প্রকাশ করবে, আমি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাব। –[মুয়াল্লিমুত তানযীল, তাফসীরে ফাতহুল আজীজ]

লাওহে মাহফূজের সত্যতা :

আল্লাহ তা'আলা নিজ কুদরতে লাওহে মাহফূজে সৃষ্টিকুলের ভাগ্যলিপিগুলো লিখে দিয়েছেন। আর তা লিখেছেন কলম দিয়ে। আল্লাহ তা'আলা কলমকে লিখার আদেশ করলে আরজ করল ইয়া আল্লাহ! আমি কি লিখব?

আল্লাহ তা'আলা বলেন, কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু ঘটবে, তা তুমি লিখ। নিম্নে এর সত্যতা সম্পর্কে দলিল দেওয়া হলো–

* আল্লাহ তা'আলা বলেন– بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌ فِىْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ অর্থাৎ এই সম্মানিত কুরআন লাওহে মাহফুজে সংরক্ষিত রয়েছে। –[সূরা বুরূজ]
* অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন– يَمْحُوا اللّٰهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ اُمُّ الْكِتَابِ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার যা ইচ্ছা তা মিটিয়ে দেন এবং যা ইচ্ছা তা বহাল রাখেন। আর তাঁর নিকটই রয়েছে উম্মুল কিতাব। –[সূরা রা'দ]

  এ আয়াতে উম্মুল কিতাব দ্বারা লাওহে মাহফূজকে বুঝানো হয়েছে।
* অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন– وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِى السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ اِلَّا فِىْ كِتَابٍ مُّبِيْنٍ অর্থাৎ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে এমন কোনো গোপন ভেদ নেই যা স্পষ্ট কিতাবে লিখিত নেই। –[সূরা নামল] এই আয়াতে "স্পষ্ট কিতাব" দ্বারা লাওহে মাহফূজ বুঝানো হয়েছে।

উপরিউক্ত দলিল দ্বারা সাব্যস্ত হয় যে লাওহে মাফূজ চির সত্য। অতএব এর উপর আমরা ঈমান রাখি।

قَوْلُهُ وَالْقَلَمُ وَبِجَمِيْعِ : আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত কলম ও তার সকল লিখনির উপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করেন। আল্লাহ তা'আলা সর্ব প্রথম কলম সৃষ্টি করেছেন। হযরত কাতাদা (রা.) বলেন, কলম আল্লাহ প্রদত্ত বড় একটি নিয়ামত। তিনি নিজ কুদরতি হাত দ্বারা এটি সৃষ্টি করেছেন। এ সম্পর্কে হযরত নবী ﷺ বলেছেন– اِنَّ اَوَّلَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ الْقَلَمَ وَقَالَ لَهُ اُكْتُبْ قَالَ مَا اَكْتُبُ قَالَ اُكْتُبِ الْقَدْرَ فَكَتَبَ مَا كَانَ وَمَا هُوَ كَائِنٌ اِلَى الْاَبَدِ. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সর্ব প্রথম যে বস্তু সৃষ্টি করেছেন তা হলো কলম। অতঃপর তিনি কলমকে বললেন, লিখ। কলম আরজ করল হে আল্লাহ! কি লিখব? তিনি বললেন তাকদীর লিখ। কলম আদেশানুযায়ী কিয়ামত পর্যন্ত সংঘটিতব্য সকল বিষয় লিপিবদ্ধ করল। –[তিরমিযী]

* তাফসীরে মুজাহিদ আবূ আমর হতে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তা'আলা সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে সর্বপ্রথম ৪টি বস্তু সৃষ্টি করেছেন। এগুলো ছাড়া অন্য সব মাখলূক তাঁর নির্দেশ كُنْ বলে সৃষ্টি করেছেন। এ চারটি বস্তু হলো, কলম, আরশ, জান্নাতের আনন্দ ও আদম (আ.)।

কলম ও লাওহ-এর কোনটি প্রথম সৃষ্টি?

আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করেছেন? না লাওহ সৃষ্টি করেছেন, এ নিয়ে দু'টিতে অভিমত পাওয়া যায়।

১. প্রথমে আল্লাহ তা'আলা আরশ সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর কলম সৃষ্টি করেছেন।

২. প্রথম কলম ও পরে আরশ সৃষ্টি করেছেন। হাদীসে এ দু'প্রকার বর্ণনা পাওয়া যায়।

কলমের প্রকার :

যে কলম দ্বারা মহান স্রষ্টা সৃষ্টির সমূহ বিষয়াদি লিপিবদ্ধ করেছেন সেই কলম সম্পর্কে হাদীসে চার ধরনের কথা পাওয়া যায়। যথা-

১. প্রথম কলম ঐ টি যেটি আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে লাওহে মাফূজে সব কিছু লিখেছেন।

২. দ্বিতীয় কলম যা বনি আদমের আমল, রুজি এবং আয়ুষ্কাল, সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য সবগুলো লিখেছে। এটি হযরত আদম (আ.)-এর সৃষ্টির পর সৃজিত।

৩. তৃতীয় কলম, যেটি দ্বারা ফেরেশতাগণ সন্তান পেটে থাকাবস্থায় তার রুজি, আমল, সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য লিখে দেন।

৪. চতুর্থ কলম হলো যা দ্বারা বান্দা সাবালক বা প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পর ফেরেশতা তার আমল লিখেন।

কলম-এর সত্যতা :

আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করেছেন, যার প্রমাণ পূর্বের বর্ণিত হাদীস থেকে পাওয়া যায় এবং এর প্রমাণ নিম্নের আয়াতটিতেও পাওয়া যায়।

* আল্লাহ তা'আলা বলেন- نٓ - وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ অর্থাৎ নূন! শপথ কলমের ও সে যা কিছু লিখেছে তার। -[সূরা কলম : ১]

* অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন- فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِه وَاِنَّا لَهٗ كَاتِبُوْنَ. অর্থাৎ যে মু'মিন অবস্থায় সৎকর্ম করে তবে তার চেষ্টা অস্বীকৃত হবে না। আর আমি তা লিপিবদ্ধ করে রেখেছি। -[সূরা আম্বিয়া : ৯৪]

উপরিউক্ত আয়াতদ্বয় একথা প্রমাণ দিচ্ছে যে, কলম চির সত্য। অতএব এর উপর ঈমান রাখা জরুরি।

قَوْلُهٗ فَلَوِ اجْتَمَعَ الْخَلْقُ الخ : অর্থাৎ কলম লাওহে মাহফূজে যে সব বিষয়াদি হওয়ার জন্য লিপিবদ্ধ করেছে যদি সকল সৃষ্টি ঐক্যবদ্ধ হয়ে উক্ত বস্তু প্রতিহত করার চেষ্টা চালায়, তবে তারা উক্ত বস্তু প্রতিহত করতে পারবে না। কারণ এর ক্ষমতা বা অধিকার তারা রাখে না। পক্ষান্তরে কলম যে বস্তু না হওয়ার কথা লাওহে মাহফূজে লিখেছে সে বস্তু হওয়ার জন্য যদি সকল সৃষ্টি ঐক্যবদ্ধ হয় তাতেও তারা উক্ত বস্তু সংঘটিত করতে সক্ষম হবে না। কারণ তারা এর অধিকার সংরক্ষণ করে না।

আর উক্ত কলম দ্বারা লাওহে মাহফূজে নতুন করে কোনো কিছু লেখা হবে না। কারণ কলম পূর্বে লিখে নিজ দায়িত্ব হতে মুক্ত হয়ে গেছে।

মানুষের ভাগ্যে লিখিত সবই তার উপর আসে

وَمَا اَخْطَأَ الْعَبْدَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيْبَهُ وَمَا اَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ وَعَلَى الْعَبْدِ اَنْ يَعْلَمَ اَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى سَبَقَ عِلْمُهُ فِىْ كُلِّ كَائِنٍ مِنْ خَلْقِهٖ فَقَدَّرَ ذٰلِكَ بِمَشِيَّتِهٖ تَقْدِيْرًا مُحْكَمًا مُبْرَمًا لَيْسَ لَهُ نَاقِضٌ وَلَا مُعَقِّبٌ وَلَا مُزِيْلٌ وَلَا مُغَيِّرٌ وَلَا مُحَوِّلٌ وَلَا زَائِدٌ وَلَا نَاقِصٌ مِنْ خَلْقِهٖ فِىْ سَمٰوَاتِهٖ وَاَرْضِهٖ.

অনুবাদ : যা বান্দার নিকট পৌঁছেনি, তা পৌঁছার ছিল না এবং যা পৌঁছেছে তা পৌঁছারই ছিল। বান্দার জন্য একথা জেনে রাখা অত্যাবশ্যক যে, মাখলুকের প্রতিটি সংঘটিত বিষয় সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা পূর্ব হতেই জানেন। অতঃপর তিনি সেগুলোকে স্বেচ্ছায় এমন তাকদীরের সাথে সম্পৃক্ত করে দিয়েছেন, যা অবিচল। যাকে আসমান ও জমিনের কেউ খণ্ডন করার শক্তি বা ক্ষমতা রাখে না। আবার কেউ স্থগিত রাখারও সামর্থ রাখে না এবং কেউ রহিত করতে পারে না। রদ-বদলও করতে পারে না এবং কম-বেশিও করতে পারে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمَا اَخْطَأَ الْعَبْدَ الخ **:** বান্দার নিকট যত বিপদ আপদ, সুখ শান্তি এবং মান সম্মান ইত্যাদি পৌঁছে, বুঝে নিতে হবে এসবই লাওহে মাহফুজে লিখিত ছিল। যার কারণে তার নিকট এসব পৌঁছেছে। এমন নয় যে, এগুলো তার নিকট পৌঁছার ছিল না। কিন্তু তার কোনো কৃতিত্বের কারণে পৌঁছেছে। অনুরূপভাবে যখন তার নিকট কোনো ধন সম্পদ, মান সম্মান, সুখ দুঃখ পৌঁছবে না তখনো বুঝে নিবে যে, এগুলো লাওহে মাহফূজে তার জন্য লিখিত ছিল না। এমন নয় যে, তার চেষ্টা সাধনার ব্যর্থতার কারণে পৌঁছেনি। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন– كُلٌّ فِىْ كِتَابٍ مُبِيْنٍ অর্থাৎ সবকিছুই স্পষ্ট গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

মু'তাযিলা সম্প্রদায় আল্লাহ তা'আলার اَزَلِىْ তথা অনাদিকালের জ্ঞানকে অস্বীকার করে। তারা বলে, আল্লাহ তা'আলা বান্দার ক্রিয়া কর্ম সম্পর্কে ঐ সময় জানতে পারে যখন বান্দা কর্তৃক ক্রিয়া সম্পাদিত হয়ে যায়। আর যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দা কর্তৃক ক্রিয়া সম্পন্ন না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ সে সম্পর্কে অজ্ঞ থাকেন। আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত বলে, আল্লাহ তা'আলা জানেন যে অমুক বান্দা অমুক কাজটি করায় সক্ষম বা অমুক বান্দা অমুক কাজটি করবে। আল্লাহই অমুক বান্দার অমুক কাজটি করার জন্য পুণ্য দান করবেন। আর তিনিই জানেন যে, অমুক বান্দা ঐ কাজটি করার উপর ক্ষমতা রাখে; কিন্তু করবে না যে জন্য সে শাস্তি পাবে। عَارِف مَجْذُوْب ঠিকই বলেছেন–

نفع دینی دیکھ تو دنیا کی بھبودی نہ دیکھ ☆ مرضی حق پر نظر کر اپنی بھبودی نہ دیکھ،

تو اکیلا تیرے دشمن سیکڑوں یہ بھی نہ دیکھ ☆ قدرت حق پر نظر کر اپنی کمزوری نہ دیکھ.

অর্থাৎ তুমি যদি ধর্মীয় মঙ্গল চাও তবে দুনিয়াবি কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য করো না, আর স্রষ্টার সন্তুষ্টির প্রতি দৃষ্টি দিয়ে স্বীয় স্বেচ্ছাচারিতার আশা করো না। তুমি একা আর শত্রু শত সহস্র এর প্রতি তুমি খেয়াল করো না, স্রষ্টার শক্তির প্রতি নজর দিয়ে নিজস্ব দুর্বলতার প্রতি মনোযোগী হয়ো না।

قَوْلُهُ وَعَلَى الْعَبْدِ اَنْ يَعْلَمَ الخ : বান্দা বা সৃষ্টজীবের মধ্যে যা কিছু অতীতে ঘটেছে এবং ভবিষ্যতে ঘটবে সে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা পূর্ব থেকেই অবগত ছিলেন। তাঁর জ্ঞানের বাইরে কোনো কিছুই নেই। উপরিউক্ত কথাগুলো জেনে রাখা প্রত্যেক বান্দার উপর জরুরি। নিম্নে এর সত্যতা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় প্রমাণ পেশ করা হলো–

* আল্লাহ তা'আলা বলেন– اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ অর্থাৎ তিনি কি জানে না যা তিনি সৃষ্টি করেছেন? তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সুবিজ্ঞ, সর্বজ্ঞ। –[সূরা মূলক]
* অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন– وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا– অর্থাৎ পৃথিবীতে বিচরণশীল কোনো প্রাণী নেই যার রিজিকের দায়িত্ব আল্লাহর উপর ন্যস্ত নয়। তিনি জানেন তারা কোথায় থাকে এবং সমাপিত হয়। –[সূরা হূদ]
* একই বিষয়ে অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন– وَيَعْلَمُ مَا فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِى ظُلُمَاتِ الْاَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَّلَا يَابِسٍ اِلَّا فِى كِتَابٍ مُّبِيْنٍ. অর্থাৎ স্থলে জলে যা কিছুই রয়েছে সবকিছু তিনি জানেন। এমন কোনো পাতা ঝরে না যা তিনি জানেন না এবং জমিনের অন্ধকারে এমন কোনো শষ্যের দানা আদ্র ও শুষ্ক দ্রব্য নেই যা প্রকাশ্য কিতাবে নেই। সব কিছুই আল্লাহর জানা। স্পষ্ট কিতাবে তা লিখা রয়েছে। স্পষ্ট কিতাবের বাইরে একটি বিন্দুও নেই। [অর্থাৎ এমন কোনো বস্তুরই অস্তিত্ব নেই যা তাঁর জানা নেই।] –[সূরা আন'আম]
* এতদসম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন– وَهُوَ الَّذِىْ يَتَوَفّٰكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيْهِ لِيُقْضٰى اَجَلٌ مُّسَمًّى. অর্থাৎ তিনিই রাতে তোমাদের করায়ত্ত করে নেন এবং যা কিছু তোমরা দিনের বেলা কর তা জানেন। অতঃপর তোমাদের দিবসে সমুত্থিত করেন। –[সূরা আন'আম]
* অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন– اَلَا اِنَّهُمْ يَثْنُوْنَ صُدُوْرَهُمْ لِيَسْتَخْفُوْا مِنْهُ اِلَّا حِيْنَ يَسْتَغْشُوْنَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ - اِنَّهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ. অর্থাৎ জেনে রাখ, নিশ্চয় তারা নিজেদের বক্ষদেশ ঘুরিয়ে দেয়। যেন আল্লাহর নিকট হতে আত্মগোপন করতে পারে। আর তারা যখন কাপড়ে আচ্ছাদিত করে ফেলে, আল্লাহ তখনো তাদের কথা শুনেন যা কিছু তারা চুপিসারে ও প্রকাশ্যে বলে। –[সূরা হূদ]

উপরিউক্ত আয়াতসমূহ দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা'আলা আদিকাল হতে যা কিছু হয়েছে এবং অনন্ত কাল পর্যন্ত যা কিছু ঘটবে সব কিছু সম্পর্কে সুপরিজ্ঞাত।

দার্শনিকদের ভ্রান্ত মতবাদ :

এ সম্পর্কে দার্শনিকগণ বলেন, সৃষ্টিকুল সৃজিত হওয়ার পূর্বে এবং তার অর্থাৎ মহান স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে কোনো কর্ম সংঘটিত হওয়ার পূর্বে জুযইয়্যাত সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং অনবগত ছিলেন এবং এতে তিনি সক্ষম ছিলেন না।

এদের জবাব :

যেহেতু কুরআনুল কারীমের ভাষ্য তাদের আকিদার বিপরীত তাই তাদের মতামত গ্রহণযোগ্য নয়। অতএব দার্শনিকদের বাদড়দৃষ্টির অভিমত পরিত্যক্ত বলে বিবেচিত হলো এবং এরা গোমরাহীকে নিজেদের জন্য বেছে নিল।

قَوْلُهُ فَقَدَّرَ ذٰلِكَ بِمَشِيَّتِهِ الخ : মানুষের ভাগ্যলিপি আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছানুযায়ী লিখেছেন। এতে অন্য কারো ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ ঘটেনি। এ কারণে কারো ইচ্ছার বিপরীত হওয়ায় তাঁর এ নির্ধারণকে কেউ রদ করতে পারবে না, উল্টিয়ে দিতে পারবে না এবং কোনো অবস্থাতেই এর পরিবর্তন বা পরিবর্ধন সাধিত হবে না।

* এতদসম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন- وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗ اِلَّا هُوَ وَاِنْ يُّرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهٖ. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আপনার প্রতি কোনো ধরনের কষ্ট আরোপ কারলে তিনি ভিন্ন অন্য কেউ তা হটাতে পারবে না এবং তিনি আপনার কল্যাণ সাধন করলে তাঁর অনুগ্রহকে কেউ রদ করতে পারবে না। -[সূরা ইউনুস]

قَوْلُهُ لَيْسَ لَهٗ نَاقِضٌ الخ : আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ কেউ ভঙ্গ করতে পারবে না। চাই উক্ত অনুগ্রহ মাখলুক সৃষ্টির ব্যাপারে হোক বা শরিয়তের হুকুম চালু করার ব্যাপারে হোক।

* যেমন কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলা বলেন- وَاللّٰهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهٖ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ফয়সালা দেন, যা পশ্চাতে নিক্ষেপকারী কেউ নেই। -[সূরা রা'দ]

قَوْلُهُ وَلَا مُغَيِّرَ وَلَا مُحَوِّلَ : আল্লাহ তা'আলা বান্দার জন্য যে তাকদীর লিখে দিয়েছেন তাঁর সেই লিখিত তাকদীর কোনো শক্তি কোনোভাবেই পরিবর্তন পরিবর্ধন করতে পারবে না। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন- لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللّٰهِ অর্থাৎ আল্লাহর কালিমার কোনো পরিবর্তন নেই। -[সূরা আন'আম]

* অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন- مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ অর্থাৎ আমার নিকট কথার কোনো রদ বদল তথা পরিবর্তন পরিবর্ধন নেই। -[সূরা কাফ]

قَوْلُهُ وَلَا زَائِدَ : আল্লাহর সৃষ্টির সিদ্ধান্তে কিংবা ফায়সালায় কেউ কোনো বৃদ্ধি করতে পারবে না। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন- يَزِيْدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ অর্থাৎ যখন তিনি ইচ্ছা করেন তখন তার সৃষ্টিতে বর্ধিত করেন। -[সূরা ফাতির]

অথচ তিনি ছাড়া সৃষ্টজীবের কোনো স্রষ্টা নেই, তাহলে তিনি ছাড়া অন্য কেউ কিভাবে সৃষ্টজীবে বর্ধন ঘটাবে? অতএব সৃষ্টিতে তিনি ব্যতীত অন্য কেউ বর্ধনকারী নেই।

* অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন- يَمْحُو اللّٰهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যা চান তা মিটিয়ে দেন এবং যা চান তার অস্তিত্ব ঠিক রাখেন বা স্থির রাখেন। -[সূরা রা'দ]

মূলকথা আল্লাহ তা'আলা লাওহে মাহফূজে যা কিছু নিজ ইচ্ছানুযায়ী লিখেছেন। তার বিপরীত কোনো কিছুই হওয়া সম্ভব নয়। এতে ঈমান রাখা বান্দার জন্য একান্তই জরুরি।

আল্লাহ তা'আলাই একমাত্র স্রষ্টা

وَلَا يَكُوْنُ مُكَوَّنٌ اِلَّا بِتَكْوِيْنِهِ وَالتَّكْوِيْنُ لَا يَكُوْنُ اِلَّا حَسَنًا جَمِيْلًا وَذٰلِكَ مِنْ عَقْدِ الْاِيْمَانِ وَاُصُوْلِ الْمَعْرِفَةِ وَالْاِعْتِرَافِ بِتَوْحِيْدِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَرَبُوْبِيَّتِهِ كَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيْرًا. وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ قَدَرًا مَّقْدُوْرًا.

অনুবাদ : আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি ব্যতীত কোনো জিনিস অস্তিত্ব লাভ করতে পারে না এবং তাঁর সকল সৃষ্টি সুন্দরই হয়ে থাকে। উপরিউক্ত বিষয়গুলো ঈমান, আকিদা ও মারেফাতের মূলনীতির আওতাভুক্ত। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, আর তিনি সকল সৃষ্টিকে সৃজন করেছেন। অতঃপর সেগুলোকে শোধিত করেছেন পরিমিতভাবে এবং তিনি আরো বলেন, আল্লাহ তা'আলার আদেশ সুনির্ধারিত থাকে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَا يَكُوْنُ مُكَوَّنٌ الخ : পৃথিবীর বুকে আমরা যা কিছু দেখি সব কিছুই আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন। তিনি এসবকে অস্তিত্ব দান না করলে কোনো কিছুই অস্তিত্ব লাভে সক্ষম হতো না।

* এ কথার ঘোষণা দিয়ে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন– اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَنْ يَخْلُقُوْا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوْا لَهُ وَاِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوْهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوْبُ. অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের পূজা বা অর্চনা কর তারা কখনো একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারবে না। যদিও তারা এ ব্যাপারে একত্রিত হয়। আর যদি মাছি তাদের থেকে কোনো কিছু ছিনিয়ে নেয় তবে তারা তার কাছ থেকে তা উদ্ধার করতেও অক্ষম। প্রার্থনাকারী ও যার কাছে প্রার্থনা করা হয় উভয়ই দুর্বল। –[সূরা হজ]

উপরিউক্ত আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, কোনো বস্তুই মাখলুক হতে পারে না তাঁর সৃষ্টি ব্যতীত। কোনো বস্তুই অস্তিত্ব লাভ করতে পারে না তার অস্তিত্ব দান ছাড়া। কোনো কিছুই দয়া প্রাপ্ত হয় না তাঁর দয়া ছাড়া। কেউই রিজিক প্রাপ্ত হয় না তিনি রিজিক দেওয়া ছাড়া। কেউই পবিত্র হতে পারে না তিনি তা করা ছাড়া। কেউই জ্ঞানী হতে পারে না তাঁর শিক্ষা ছাড়া। কেউই বিপদগামী হয় না তিনি বিপদগ্রস্ত করা ছাড়া। কেউই পথ প্রদর্শিতও হয় না তাঁর পথ নির্দেশ ছাড়া। এর উপরই আমরা ঈমান আনয়ন করি।

قَوْلُهُ وَالتَّكْوِيْنُ لَا يَكُوْنُ الخ : আল্লাহ তা'আলা সকল বস্তুর অস্তিত্ব দান করেন। তাঁর রূপদান ছাড়া কোনো কিছুই অস্তিত্ব লাভ করতে পারে না এবং উক্ত অস্তিত্ব দান তথা রূপ দেওয়া হয় সুন্দর ও সুসংহতভাবে। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে– صُنْعَ اللّٰهِ الَّذِىْ اَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ اِنَّهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَفْعَلُوْنَ অর্থাৎ এটা মহান আল্লাহর সুদক্ষ কারিগরির বহিঃপ্রকাশ যিনি সব কিছুকে করেছেন সুসংহত ও সুদৃঢ়। –[সূরা নাহল]

* এতদসম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা হাদীসে কুদসীতে বলেন, হে আমার বান্দাগণ! নিশ্চয় আমি আমার উপর জুলুম করা হরাম করেছি এবং এটা তোমাদের জন্যও হারাম করেছি। সুতরাং তোমরা পরস্পর একে অপরের উপর জুলুম, অত্যাচার, অন্যায় ও অবিচার করো না। হে আমার বান্দারা! তোমরা সবাই পথ হারা কেবলমাত্র ঐ ব্যক্তি ব্যতীত যাকে আমি পথ প্রদর্শন করেছি। অতএব তোমরা শুধু আমার নিকট সঠিক পথ চাও। আমি তোমাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করব। হে আমার বান্দাগণ! তোমরা সকলেই ক্ষুধার্ত আমি যার ক্ষুধা নিবারণ করেছি সে ব্যতীত। সুতরাং তোমরা আমার নিকট রিজিক চাও, আমি তোমাদেরকে অন্যদান করব। হে আমার বান্দাগণ তোমরা সবাই বিবস্ত্র ঐ ব্যক্তি ছাড়া যাকে আমি বস্ত্র পরিয়েছি। অতএব তোমরা আমার নিকট পরিধেয় বস্ত্র চাও, আমি তোমাদেরকে বস্ত্র দান করব। হে আমার বান্দারা তোমরা অহরনিশি গুনাহে লিপ্ত থাক, আর আমি যাবতীয় গুনাহ মার্জনা করে থাকি। অতএব তোমরা আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাক, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিব। হে আমার বান্দাগণ আমার কোনো ক্ষতি করার ক্ষমতা তোমাদের নেই এবং তোমরা আমার কোনো উপকার করার ক্ষমতাও রাখ না। −[মুসলিম]

উপরিউক্ত আয়াত ও হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হয় যে, আল্লাহই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তিনিই একমাত্র স্রষ্টা। তিনি ছাড়া কেউ সৃষ্টি করার আদৌ ক্ষমতা রাখে না।

قَوْلُهُ وَذٰلِكَ مِنْ عَقْدِ الْاِيْمَانِ الخ : বিশ্বচরাচরে যা কিছু রয়েছে সবকিছুর ব্যাপারে একমাত্র আল্লাহ তা'আলা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তিনিই একমাত্র স্রষ্টা বলে পূর্ণ বিশ্বাস রাখাটা হলো ঈমান ও মা'রেফাত এর মূল ভিত্তি এবং আল্লাহ তা'আলার একত্বতার সঠিক স্বীকৃতি। কারণ ঈমান প্রতিষ্ঠিত হয় না মা'রেফাত ব্যতীত। আর মা'রেফাতের ভিত্তি হলো আল্লাহ তা'আলার একত্বতা স্বীকার করা। এবং একত্বতা [তাওহীদ] দুটি জিনিস ব্যতীত পূর্ণ হয় না। একমাত্র আল্লাহই সৃষ্টিকর্তা। তিনিই সৃষ্টিকুল সৃজন করেছেন। একথা মনে প্রাণে বিশ্বাস ও মুখে স্বীকার করে নেওয়া।

আর অন্য কাউকে সৃষ্টিকর্তা মনে না করা বা স্বীকার না করা এবং আল্লাহ তা'আলাই সৃষ্টিকুলের অস্তিত্বদানকারী অন্য কেউ নয় একথাও মনেপ্রাণে বিশ্বাস করা ও স্বীকার করে নেওয়া।

২. একমাত্র আল্লাহই সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক, সৃষ্টিজগতের সমূহ বিষয়ের নিয়ন্ত্রক, ইহকাল ও পরকালের একমাত্র পরিচালক বলে মনে প্রাণে বিশ্বাস ও স্বীকার করা। এতে কাউকে শরিক না করা এবং একমাত্র তিনিই আসমান জমিনের স্থায়িত্ব দানকারী একথা স্বীকার করাও বিশ্বাস করা। একমাত্র আল্লাহকেই আইন দাতা, আদেশ দাতা তথা তিনি যে সকল প্রেরিত বান্দার কথা মনে প্রাণে মানা ও আনুগত্যের আদেশ দিয়েছেন তাদের আনুগত্য আন্তরিকতার সাথে মানা ও স্বীকার করা। আর এটাকেই তাওহীদ ফিল-আমর" বলা হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন− وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা কুরআন সুন্নাহর অনুসারী দায়িত্বশীলদের অনুসরণ কর। −[সূরা নিসা]

আর এই সব বিষয়ে তাওহীদ ও তাকদীর মেনে নেওয়া ব্যতীত কারো ঈমান পূর্ণ হয় না। এই তাকদীর সম্পর্কেই গ্রন্থকার (র.) নিম্নোক্ত আয়াতদ্বয় পেশ করেছেন। وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ قَدَرًا এবং وَخَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ فَقَدَّرَهٗ تَقْدِيْرًا مَّقْدُوْرًا অতঃপর মু'মিন তাকদীরের উপর পূর্ণ আস্থা রাখবে। তবেই খাঁটি মু'মিন বিবেচিত হবে।

তাকদীর অস্বীকারকারী কাফের

فَوَيْلٌ لِّمَنْ صَارَ لِلّٰهِ تَعَالٰى فِى الْقَدْرِ خَصِيْمًا وَ اَحْضَرَ لِلنَّظْرِ فِيْهِ قَلْبًا سَقِيْمًا. لَقَدِ الْتَمَسَ بِوَهْمِهٖ فِيْ فَحْصِ الْغَيْبِ سِرًّا كَتِيْمًا وَعَادَ بِمَا قَالَ فِيْهِ اَفَّاكًا اَثِيْمًا.

অনুবাদ : অতএব ধ্বংস অনিবার্য ঐ ব্যক্তির জন্য যে তাকদীর নিয়ে আল্লাহর সাথে বিরোধে লিপ্ত হয় এবং যে ব্যক্তি তাকদীর নিয়ে চিন্তা ভাবনা করার জন্য রুগ্‌ণ অন্তরকে লিপ্ত রেখেছে। নিঃসন্দেহে সে স্বীয় কল্পনা প্রসূত শক্তি দিয়ে অদৃশ্যের এক গোঢ় রহস্যময় বস্তু অনুসন্ধানে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। আর সে তাকদীর সম্পর্কে যা কিছু বলেছে তার কারণে সে নিজেই মিথ্যাবাদী ও পাপী বলে সাব্যস্ত হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ فَوَيْلٌ لِّمَنْ صَارَ الخ : অনেক সময় মানুষ রোগাক্রান্ত হয় আবার সুস্থও হয়। কিছু জীবিত থাকে আবার কতেক মরে যায়। অন্তরেরও অনুরূপ অবস্থা হয়ে থাকে। অন্তর সুস্থ থাকে আবার অসুস্থও হয়। আবার কখনো অন্তর জীবিত থাকে, আবার রুগ্‌ণতার কারণে মরেও যায়। কুরআন ও হাদীসে অন্তরের রুগ্‌ণতা ও সুস্থতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। নিম্নে তার বর্ণনা দেওয়া হলো–

অন্তরের রুগ্‌ণতা :

মানুষের শরীরের উপর যেমন জীবন মরণ, সুস্থ ও অসুস্থতা প্রকাশ পায় ঠিক তেমনি বরং তার চেয়ে গভীরভাবে কলব তথা আত্মার উপর জীবন মরণ এবং সুস্থতা ও অসুস্থার প্রভাব প্রকাশমান। এতদসম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন– اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَاَحْيَيْنٰهُ وَجَعَلْنَا لَهٗ نُوْرًا يَّمْشِىْ بِهٖ فِى النَّاسِ كَمَنْ مَّثَلُهٗ فِى الظُّلُمٰتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا আর যে মৃত ছিল অতঃপর আমি তাকে জীবিত করেছি এবং তাকে এমন একটি আলো দিয়েছি যা নিয়ে সে মানুষের মধ্যে চলাফেরা করে সেকি ঐ ব্যক্তির সমতুল্য হতে পারে যে অন্ধকারে রয়েছে– সেখান থেকে বের হতে পারছে না? এ সম্পর্কে হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসঊদ (রা.) বলেন– هَلَكَ مَنْ لَّمْ يَكُنْ لَهٗ قَلْبٌ يَعْرِفُ بِهِ الْمَعْرُوْفَ وَالْمُنْكَرَ. অর্থাৎ যে ব্যক্তির ভালো মন্দ যাচাইকারী অন্তর নেই সে ধ্বংস হয়েছে।

অন্তরের রোগ দু'প্রকার :

১. কু-প্রবৃত্তির রোগ : যেমন– গুনাহের কাজে লিপ্ত হওয়া এবং মন গুনাহের দিকে ধাবিত হওয়া ইত্যাদি।

বাঁচার উপায় : এ ধরনের রোগ থেকে বাঁচার উপায় হলো দীনের ওয়াজ ও নসিহত মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করা ও আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করা এবং ভয়ভীতি মনে রাখা।

২. **সন্দেহ রোগ :** এ রোগটি একেবারেই মারাত্মক, বিশেষত তাকদীর নিয়ে সন্দেহ করা। এ রোগটি অনেকের মাঝে এমনভাবে প্রভাব লাভ করে যে, যার ফলশ্রুতিতে অন্তর মৃত্যুবরণ করে। এর কারণ হলো, অন্তরধারী লোকটি এর প্রতিকার সম্পর্কে অজ্ঞ। কিংবা বিজ্ঞ থাকলেও এসম্পর্কে সে একেবারেই উদাসীন থাকে। ফলে সে অন্তরের রোগ ও মৃত্যু সম্পর্কে কিছুই জানতে পারে না। আর অন্তর মরে যাওয়ার নিদর্শন হলো জঘন্যতম কাজ করতেও তার অন্তরে ন্যূনতম প্রতিক্রিয়া অনুভব হয় না।

প্রতিকার : এ রোগ হতে বাঁচার প্রধান হাতিয়ার হলো কু-প্রবৃত্তি হতে বেঁচে থাকা এবং মনে প্রাণে একথা মানা ও স্বীকার করা। আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল যা করেছেন ও বলেছেন সবই সঠিক ও সত্য। আর আমরা এসব মেনে নিলাম। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন- قَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ অর্থাৎ তারা বলে, আমরা শ্রবণ করলাম ও মানলাম। হে আমাদের প্রভু! আমরা তোমার ক্ষমা চাই। -[সূরা বাকারা]

এ রোগের হুকুম :

যদি কোনো ব্যক্তির অন্তর এ রোগে রোগাক্রান্ত হয়ে মরে যায়, তাহলে অবশ্যই সে চরম মিথ্যুক ও মহাপাপী এবং তার ধ্বংস অনিবার্য। এমনকি এক পর্যায়ে সে কাফেরও হয়ে যাবে। (আল্লাহ আমাদের সবাইকে হেফাজত করুন)

নবম পাঠ

আরশ ও কুরসী সম্পর্কে আকীদা

وَالْعَرْشُ وَالْكُرْسِيُّ حَقٌّ كَمَا بَيَّنَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِىْ كِتَابِهٖ وَهُوَ مُسْتَغْنٍ عَنِ الْعَرْشِ وَمَا دُوْنَهٗ مُحِيْطٌ بِكُلِّ شَئٍ وَفَوْقَهٗ قَدْ عَجَزَ عَنِ الْاِحَاطَةِ خَلْقُهٗ وَنَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اتَّخَذَ اِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلًا وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوْسٰى تَكْلِيْمًا اِيْمَانًا وَتَصْدِيْقًا وَتَسْلِيْمًا.

অনুবাদ : আরশ ও কুরসী চির সত্য। যেমন– আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবে বলেছেন, তিনি আরশ কুরসী ও অন্যান্য সকল বিষয় থেকে অমুখাপেক্ষী। প্রত্যেক জিনিসই তার পরিবেষ্টনে রয়েছে এবং তিনি সব কিছুর উর্ধ্বে। কিন্তু সৃষ্টিকুল তাঁকে পরিবেষ্টনে অক্ষম। আর আমরা ঈমান, তাসদিক ও তাসলিমের সাথে ঘোষণা দিচ্ছি যে, আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে খলিল নির্বাচিত করলেন এবং হযরত মূসা (আ.)-এর সঙ্গে কথা বললেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَالْعَرْشُ : মহান আল্লাহর আরশ বিদ্যমান রয়েছে একথা সত্য। এ সম্পর্কে কুরআন সুন্নাহর অনেক প্রমাণ রয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন– رَفِيْعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ। অর্থাৎ তিনি সু-উচ্চ মর্যাদার অধিকারী আরশের মালিক। –[সূরা মু'মিন]

* অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন– وَهُوَ الْغَفُوْرُ الْوَدُوْدُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيْدِ অর্থাৎ তিনি ক্ষমাশীল প্রেমময়, মহান আরশের অধিকারী। –[সূরা বুরূজ]
* অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন– لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ অর্থাৎ তিনি ছাড়া কোনো প্রভু নেই। আর তিনি সম্মানিত আরশের প্রতিপালক। –[সূরা মু'মিন]

  দার্শনিকদের একদল বলেন, আরশ ঐ আকাশের নাম যা গোলাকার বৃত্তের ন্যায় এবং সমগ্র বিশ্ব জগতকে সব দিক থেকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। আর এটার নামই "ফালাকে আতলাস" এটাই হলো নবম আকাশ। কিন্তু তাদের এ কথা মোটেও সঠিক নয়। কেননা শরিয়তের ভাষ্যমতে বিশুদ্ধ কথা হলো আরশের জন্য পায়া হয়। যা ফেরেশতাগণ উঠিয়ে রেখেছেন। এ সম্পর্কে বুখারী ও মুসলিমে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

সুতরাং উপরিউক্ত আয়াতসমূহ দ্বারা আরশ বিদ্যমান হওয়া সাব্যস্ত হলো। কিন্তু দার্শনিকরা আরশের অস্তিত্বই অস্বীকার করে। উপরিউক্ত আয়াতসমূহ দ্বারা তাদের মতবাদভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হলো।

قَوْلُهٗ وَالْكُرْسِيُّ الخ : আরশ যেভাবে চিরসত্য। অনুরূপ কুরসীর বিদ্যমানও চিরসত্য। নিম্নে এর প্রমাণ তুলে ধরা হলো।

* আল্লাহ্ তা'আলা কুরসীর সত্যতার ঘোষণা দিতে গিয়ে বলেন- وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ অর্থাৎ তাঁর কুরসী আসমান ও জমিনকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। -[সূরা বাকারা]
* হযরত আবূ জর গিফারী (রা.) হযরত নবী করীম ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ কুরসী কি? এবং এটি কেমন? উত্তরে তিনি বলেছিলেন যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ। কুরসীর সাথে সাত আসমান ও জমিনের তুলনা বড় একটি ময়দানে ফেলে দেওয়া হাতের একটি আংটির মতো।

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, আরশের তুলনা কুরসীও অনুরূপ। উপরিউক্ত হাদীস হতেও কুরসীর সত্যতা মিলে। -[তাফসীরে ইবনে কাছীর]

قَوْلُهُ وَهُوَ مُسْتَغْنٍ عَنِ الْعَرْشِ الخ : আরশ ও কুরসীর আলোচনার পর গ্রন্থকার (র.) বলেন- আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবীর সব কিছুর খালেক ও মালেক। অনুরূপ আরশেরও খালেক। তিনি আরশ ও কুরসীর মুখাপেক্ষী নন।। যেমন তিনি বলেন- اِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা সমগ্র বিশ্ব থেকে অমুখাপেক্ষী।

* যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন- اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত কিছুর স্রষ্টা এবং তিনি মহান আরশের প্রতিপালক।
* অন্য আয়াতে আরো বলেন- اَللّٰهُ الصَّمَدُ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা অমুখাপেক্ষী। -[সূরা ইখলাছ]
* অপর আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন- وَاللّٰهُ الْغَنِيُّ وَاَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ধনী আর তোমরা গরিব। -[সূরা মুহাম্মদ]
* অপর আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন- حَسْبِيَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ অর্থাৎ আমার হিসাব গ্রহিতা কেবলই আল্লাহ। তিনি ব্যতীত কোনো প্রভু নেই। আমি তাঁরই উপর ভরসা করলাম। আর তিনিই মহান আরশের রব। -[সূরা তাওবা]

মহান আল্লাহ তাঁর নিজ পরিচয় তুলে ধরে বলেন- وَاللّٰهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ অর্থাৎ আর আল্লাহ, তিনি হলেন অমুখাপেক্ষী প্রশংসিত প্রাচুর্যশীল। তিনি আরো বলেন- ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ অর্থাৎ তিনি মহান আরশে অধিষ্ঠিত তথা উপবিষ্ট হলেন।

উপরিউক্ত আয়াতসমূহ দ্বারা বুঝা যায়, আল্লাহ্ তা'আলা আরশের মুখাপেক্ষী নন। কিন্তু এতে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়।

প্রশ্ন : কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলা আরশে অধিষ্ঠিত হওয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু এখানে বলা হয়েছে আল্লাহ্ আরশ হতে অমুখাপেক্ষী। উভয় কথার মধ্যে বিরোধ পাওয়া যায়। এর সমাধান কি?

জবাব :

১. উল্লিখিত প্রশ্নের সমাধান এভাবে দেওয়া যায় যে, কোনো মানুষকে শ্রোতা বা দৃষ্টিমান বলার অর্থ হলো তার কাছে দেখার জন্য চোখ ও শ্রবণের জন্য কান রয়েছে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এখানে দুটি জিনিস বিদ্যমান। ১. ঐ যন্ত্র যাকে চক্ষু বলা হয়। ২. তার পরিণাম এবং উদ্দেশ্য দেখা। অর্থাৎ ঐ বিশেষ জ্ঞান যা চোখে দেখার মাধ্যমে অর্জিত হয়। মানুষকে যখন দৃষ্টিমান বলা হয় তখন উৎস ও পরিণাম উভয়টি উদ্দেশ্য হয়। কিন্তু যখন এ গুণটি আল্লাহ্ তা'আলার জন্য ব্যবহার করা হয় তখন উৎস ও শারীরিক

অবস্থা উদ্দেশ্য হয় না। কারণ এটি মাখলুকের বৈশিষ্ট্যবলির অন্তর্ভুক্ত যাতে আল্লাহ্ পূত পবিত্র। তবে এ বিশ্বাসটি রাখতে হবে যে, দেখার উৎস তাঁর সত্তায় বিদ্যমান। ঠিক তদ্রূপ আল্লাহ্ তা'আলার আরশে অধিষ্ঠিত হওয়াটা বুঝে নেওয়া উচিত।

আরশ অর্থ শাহী আসন। অধিষ্ঠিত হওয়ার অর্থ স্থিরতা। উক্ত অর্থ দ্বারা একথাই বুঝে আসে যে, শাসনের শাহী আসনকে এমন এভাবে আকড়ে ধরা, যা দ্বারা তার কোনো অংশ বা কোনো কিছুই আয়ত্তের বাইরে না থাকে; বরং প্রত্যেকটি বস্তুকে সুশৃঙ্খলভাবে আঞ্জাম দেওয়া যায়। দুনিয়াবি বাদশাহদের শাহী আসনের একটি মূল উৎস এবং বাহ্যিক আকৃতি থাকে। আরেকটি হলো দেশময় প্রভাবে, কর্তৃত্ব ও প্রতিপত্তি অর্জিত হওয়া। আল্লাহ তা'আলা আরশে অধিষ্ঠিত হওয়ার মধ্যেও এই উদ্দেশ্যটি ভালোভাবে বিদ্যমান। অর্থাৎ পৃথিবী সৃষ্টির পর তার উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব এবং সব ধরনের কর্মকাণ্ড তাঁর আয়ত্তাধীন।

২. প্রশ্নের আলোকে যৌক্তিক যে উত্তর প্রদান করা হয়েছে এর চেয়ে সহজ জবাব হলো, আল্লাহ্ তা'আলা এ বিষয়টিকে বিশ্লেষণের জন্য কোনো বান্দা বা মাখলুকের উপর ন্যস্ত করেননি। অতএব এ নিয়ে বিশ্লেষণের অপচেষ্টা ঠিক নয়।

قَوْلُهُ مُحِيْطٌ بِكُلِّ شَيْءٍ الخ : আল্লাহ্ তা'আলা আরশের চুতষ্পার্শ্বে যা কিছু আছে সব কিছু পরিবেষ্টন করে রেখেছেন। তাঁর বেষ্টনের বাইরে কোনো কিছু নেই। যেমন- আল্লাহ্ তা'আলা বলেন- وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيْطًا অর্থাৎ সব জিনিস আল্লাহ তা'আলা বেষ্টন করে রেখেছেন। অন্যত্র বলেন وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيْطًا অর্থাৎ সব বস্তু আল্লাহ কর্তৃক বেষ্টিত।

তাছাড়া আরশ তাঁবুর ন্যায় সমগ্র জাহানকে বেষ্টন করে রেখেছে এবং আল্লাহ তা'আলা আরশ ও তাঁর উপর-নিচের সব বেষ্টন করে রেখেছে। উল্লেখ্য উক্ত বেষ্টন দ্বারা আসমানের ন্যায় বেষ্টন উদ্দেশ্য নয়; বরং তাঁর দৃষ্টি ও ইলম এসবকে ঘিরে রেখেছে।

قَوْلُهُ وَقَدْ عَجَزَ عَنِ الْاِحَاطَةِ : অর্থাৎ আল্লাহর সত্তাকে কোনো মাখলুক বেষ্টন করতে পারবে না আয়ত্ব বা উপলব্ধিতে আনতে সক্ষম হবে না। তাকে বেষ্টন করতে অক্ষম। যেমন- তিনি বলেন- وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِهٖ عِلْمًا অর্থাৎ আল্লাহকে তারা জ্ঞান দ্বারা বেষ্টন করতে পারে না। -[সূরা তাহা]

একথা সকলেরই জানা যে, যে জিনিস জ্ঞান দ্বারা বেষ্টন অসম্ভব, তা শক্তি বা ক্ষমতা দ্বারা আয়ত্ব করাও অসম্ভব। অতএব আল্লাহকে মাখলুক বেষ্টন করা অসম্ভব।

قَوْلُهُ اتَّخَذَ اِبْرَاهِيْمَ : অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ.) কে খলিল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন- وَاتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلًا অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ইবরাহীমকে খলিলরূপে গ্রহণ করেছেন। -[সূরা নিসা]

দার্শনিকদের মতে, বন্ধুত্ব স্থাপন ঐ পর্যন্ত সম্ভব নয় যতক্ষণ পর্যন্ত উভয় (প্রেমিক ও প্রেমাস্পদ) একই সত্তার বা একই জাতীয় না হবে। কিন্তু উপরিউক্ত আয়াত দ্বারা দার্শনিকদের ভ্রান্ত মতবাদ খণ্ডিত হয়ে গেল।

قَوْلُهُ وَكَلَّمَ مُوْسٰى : আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে সরাসরি কথা বলেছেন। এর প্রতি আমরা ঈমান রাখি। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন- وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوْسٰى تَكْلِيْمًا অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে সরাসরি কথা বলেছেন। -[সূরা নিসা]

অনুরূপভাবে হযরত রাসূল ﷺ ও হাদীসে বলেছেন।

ফেরেশতা, নবী ও অবতারিত কিতাবের প্রতি বিশ্বাস

وَنُؤْمِنُ بِالْمَلَائِكَةِ وَالنَّبِيِّيْنَ وَالْكُتُبِ الْمُنَزَّلَةِ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَنَشْهَدُ أَنَّهُمْ كَانُوْا عَلَى الْحَقِّ الْمُبِيْنِ.

অনুবাদ : আমরা সকল ফেরেশতা, নবীগণ এবং রাসূলদের প্রতিও অবতারিত সকল ঐশী কিতাবের প্রতি ঈমান রাখি এবং আমরা সাক্ষী দিচ্ছি যে, সকল নবী উজ্জ্বল ও সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَنُؤْمِنُ بِالْمَلَائِكَةِ : ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান রাখা ঈমানের দ্বিতীয় স্তম্ভ। ফেরেশতাদের সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো।

ফেরেশতাদের পরিচিতি :

اَلْمَلَائِكَةُ শব্দটি اَلْمَلَكُ-এর বহুবচন। এটি اَلْوَكِيْلُ হতে নির্গত। যার অর্থ প্রেরণ করা। যেমন বিশিষ্ট কবি লবীদের ভাষায়- وَغُلَامٌ أَرْسَلَتْهُ أُمُّهُ ـ بِالْوَكِيْلِ فَبَذَلْنَا مَا سَأَلَ اَلْمَلَائِكَةُ শব্দের ة অক্ষরটি তাকীদের জন্য সংযোজিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদেরকে সকল কাজ সমাপন করার জন্য নির্ধারণ করেছেন।

ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান আনার পদ্ধতি :

ফেরেশতাদের প্রতি নির্ভুল ঈমান রাখতে হলে যেসব বিষয়ের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে হবে তা নিম্নরূপ-

১. তাঁরা আল্লাহ তা'আলার সম্মানিত বান্দা। নৈকট্যপ্রাপ্ত, সদাচারী ও আপন প্রভুর একান্ত অনুগত ও সর্বদা আল্লাহর ভয়ে প্রকম্পিত। অতএব তাঁদের মধ্যে প্রভুত্বের কোনো গুণ বিদ্যমান নেই। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন- وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُوْنَ ـ لَا يَسْبِقُوْنَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُوْنَ ـ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُوْنَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُوْنَ. অর্থাৎ তারা বলে দয়াময় আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদের সন্তান হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এ থেকে তিনি সম্পূর্ণরূপে পবিত্র; বরং তারা তো তাঁর সম্মানিত বান্দা। আগে বেড়ে তারা কথা বলতে পারে না। তাঁর আদেশেই কাজ করতে থাকেন। তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা কিছু আছে তা তিনি অবগত। তারা শুধু তাদের জন্যই সুপারিশ করেন যাদের প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্টি রয়েছে এবং তারা আল্লাহর ভয়ে প্রকম্পিত। -[সূরা আম্বিয়া : ২৬-২৮]

* অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন- يَخَافُوْنَ رَبَّهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ অর্থাৎ তারা তাদের উপর পরাক্রমশালী আল্লাহকে ভয় করে এবং তারা যে কাজের জন্য আদিষ্ট হয়েছে তা তারা পালন করে। -[সূরা নাহল]

* অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন- لَا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ অর্থাৎ তারা আল্লাহ তা'আলার অবাধ্য কোনো কাজ করে না এবং আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে যা আদেশ করেন তারা তা পালন করেন। -[সূরা তাহরীম]

* তাদের পবিত্রতার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন- كِرَامٍ بَرَرَةٍ অর্থাৎ যারা মহৎ চরিত্রবান। -[সূরা আবাসা]
* যারা ফেরেশতাদের পূজা করে এবং আল্লাহর সাথে অসামঞ্জস্য সম্পর্ক নির্ণয়ের চেষ্টা করে তাদের ব্যাপারে বলেন- وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ - قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ - بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ وَأَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ. -[সূরা সাবা]
* অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন- قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. -[সূরা বাকারা]

২. ফেরেশতারা নূরের তৈরি, বিশাল আকার বৈচিত্র্যময় পাখা বিশিষ্ট। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন- جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. অর্থাৎ যিনি ফেরেশতাদেরকে দূত হিসেবে এক, দুই, তিন ও চার পাখা বিশিষ্ট বানিয়েছেন। -[সূরা ফাতির : ১]

* হযরত রাসূল ﷺ বলেছেন- خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍ অর্থাৎ ফেরেশতারা নূরের তৈরি। -[মুসলিম]
* হযরত ইবনে মাসঊদ (রা.) বলেন- رَأَى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ جِبْرَائِيلَ عَلَى صُورَتِهِ وَلَهُ سِتُّ مِائَةِ جَنَاحٍ كُلُّ جَنَاحٍ مِنْهَا قَدْ سَدَّ الْأُفُقَ يَسْقُطُ مِنْ جَنَاحِهِ التَّهَاوِيلُ مِنَ الدُّرِّ وَالْيَوَاقِيتِ অর্থাৎ হযরত রাসূল ﷺ জিবরাঈল (আ.) কে তাঁর রূপে দেখেছেন। তাঁর রয়েছে ছয়শত পাখা। প্রতিটি পাখা দিগন্ত জোড়া। তাঁর বিশাল পাখা হতে মোতি ও ইয়াকূত ঝড়ে পড়ছে।
* অপর হাদীসে রাসূল ﷺ বলেন- أُذِنَ لِي أَنْ أُحَدِّثَ عَنْ أَحَدٍ حَمَلَةِ الْعَرْشِ مَا بَيْنَ شَحْمَةِ أُذُنِهِ وَعَاتِقِهِ سَبْعُمِائَةِ عَامٍ অর্থাৎ আমাকে আরশ বহনকারী একজন ফেরেশতা সম্পর্কে বর্ণনা করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তাঁর গর্দান হতে কানের লতি পর্যন্ত সাতশত বছরের দূরত্ব। -[আবূ দাঊদ]
* অন্য হাদীসে রাসূল ﷺ আরো বলেন- إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ رُفِعَ لَهُ الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ فِي السَّمَاءِ السَّابِعَةِ يُصَلِّي فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ إِذَا خَرَجُوا لَمْ يَعُودُوا إِلَيْهِ. -[বুখারী মুসলিম]
* অন্য হাদীসে রাসূল ﷺ আরো বলেন- رِجْلُهُ فِي الْأَرْضِ السُّفْلَى وَعَلَى قَرْنِهِ الْعَرْشُ وَبَيْنَ شَحْمَتِهِ أُذُنِهِ وَعَاتِقِهِ خَفَقًا مِنَ الْمُطَيْرِ سَبْعًا مَا عَامَ يَقُولُ سُبْحَانَكَ حَيْثُ كُنْتَ. (الطَّبَرَانِيُّ)

৩. তাঁরা সারিবদ্ধভাবে আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে যা আল্লাহ তা'আলা তাদের শিক্ষা দিয়েছেন। তাঁরা সর্বদা আল্লাহর নির্দেশ মান্য করেন। আর এসবই তাঁরা আল্লাহর প্রদত্ত ক্ষমতা বলেই করে থাকেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন- وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ অর্থাৎ আমাদের প্রত্যেকের জন্য নির্দিষ্ট স্থান রয়েছে। আমরা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকি। আমরা আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করি। -[সূরা সাফফাত]

* অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন- فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ. -[সূরা হামীম সাজদাহ]
* অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন- يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَهُمْ لَا يَفْتُرُونَ

* হযরত হাকীম বিন হেজাম (র.) বলেন, একদিন রাসূল ﷺ সাহাবীদের মাঝে ছিলেন। হঠাৎ তিনি বললেন, আমি যা শুনেছি তোমরা কি তাশুনতে পাচ্ছ? তারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ আমরা কিছুই শুনছি না। তিনি বললেন, আমি আকাশের গুঞ্জন শুনতে পাচ্ছি। তথায় পা রাখার মতো জায়গা নেই। যাতে কোনো ফেরেশতা দণ্ডায়মান ও সেজদারত নেই। -[মুসলিম]

৪. তাঁরা দৃষ্টির অন্তরালে থাকেন। তাঁরা অদৃশ্য জগতের অধিবাসী তাদেরকে এ পৃথিবীর মানুষ দেখতে পায় না। তবে আল্লাহ যাকে দেখাতে চান তিনিই কেবল দেখতে পান।

* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন- يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّحْجُورًا অর্থাৎ যেদিন তারা ফেরেশতাদেরকে দেখবে। সেদিন তারা কোনো সুসংবাদ পাবে না এবং তারা বলবে, যদি কোনো বাধা তাদেরকে আটকে রাখতো। -[সূরা ফুরকান]

* অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন- وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ অর্থাৎ ফেরেশতারা প্রত্যেক দরজা দিয়ে তাদের নিকট প্রবেশ করবে। -[সূরা রা'দ]

* অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন- فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا অর্থাৎ অতঃপর আমরা তার নিকট আমাদের রূহ প্রেরণ করলাম। সে তার নিকট পূর্ণ মানবাকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করল। -[সূরা মারইয়াম]

ফেরেশতাদের কাজ :

আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদের কার্যাবলি সম্পর্কে বলেন- لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. অর্থাৎ তাদের যা আদেশ করা হয় তারা তার অবাধ্য হয় না এবং যে ব্যাপারে আদিষ্ট হয় তারা তাই সম্পাদন করে। আমরা তাদের উপর ও তাদের বণ্টিত কর্মের উপর বিশ্বাস স্থাপন করি। নিম্নে কতিপয় ফেরেশতাদের বণ্টিত দায়িত্বের আলোচনা করা হলো।

হযরত জিবরাঈল (আ.) :

সকল ফেরেশতাদের মধ্যে হযরত জিবরাঈল (আ.) হলেন শ্রেষ্ঠ। তাঁর দায়িত্ব হলো নবী-রাসূলদের প্রতি ঐশী বাণী পৌঁছে দেওয়া। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন- قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ অর্থাৎ আপনি বলুন, একে পবিত্র ফেরেশতা আপনার পালন কর্তার পক্ষ থেকে নিশ্চিত সত্যসহ অবতরণ করেন। যাতে মু'মিনদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন। এটি মুসলমানদের জন্য পথ নির্দেশ ও সুসংবাদ স্বরূপ। -[সূরা নাহল]

হযরত মিকাঈল (আ.) :

তিনি ফেরেশতাদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফেরেশতা। তাঁকে সৃষ্ট জীবের জন্য রিজিক ও বৃষ্টি পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ভূখণ্ডের যেখানে বৃষ্টির প্রয়োজন হয় সেখানে তিনি মেঘমালাকে হাঁকিয়ে নেন।

হযরত ইসরাফীল (আ.) :

তিনি পুনরুত্থানের জন্য ফুঁৎকার দিবেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ.

হযরত আজরাঈল (আ.) :

সৃষ্টজীবের মৃত্যুদান এই ফেরেশতার দায়িত্ব। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন–

قُلْ يَتَوَفّٰكُمْ مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِىْ وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ تُرْجَعُوْنَ.

খাজিনে জান্নাত ও জাহান্নাম :

জান্নাত ও জাহান্নামের তদারকির জন্য কতেক ফেরেশতা নিযুক্ত রয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন– وَمَا جَعَلْنَا اَصْحٰبَ النَّارِ اِلَّا مَلٰئِكَةً –[সূরা মুদ্দাচ্ছির]

মুনকার নাকীর :

কবরে মানুষকে তার ধর্ম, প্রভু ও নবী সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য এই ফেরেশতা নিয়োজিত।

রাক্বীবুন আতীদ :

রাক্বীবুন আতীদ মানুষকে রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত। আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে বলেন– لَهٗ مُعَقِّبٰتٌ مِّنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ يَحْفَظُوْنَهٗ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ.

কিরামান কাতেবীন :

কিরামান কাতেবীন ফেরেশতাদ্বয় মানুষের আমল সংরক্ষণ করার জন্য নিয়োজিত। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন– كِرَامًا كَاتِبِيْنَ يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ

قَوْلُهٗ وَالنَّبِيِّيْنَ : মহান আল্লাহ তা'আলা মানব জাতির হেদায়েতের জন্য অগণিত নবী রাসূল প্রেরণ করেছেন। যাদের নির্দিষ্ট সংখ্যা কোনো বিশুদ্ধ বর্ণনায় পাওয়া যায় না।

সকল রাসূলগণের উপর ঈমান রাখা ওয়াজিব কিনা তা নিয়ে দু'টি মতামত পাওয়া যায়। যথা–

১. জমহুর ওলামাদের মতে সকল নবীদের উপর ঈমান আনা ওয়াজিব।

দলিল : আল্লাহ তা'আলা বলেন– لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيِّيْنَ. –[সূরা বাকারা]

* অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন– اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ.

সুতরাং স্পষ্ট ভাবে বলা যায় যে, আল্লাহ তা'আলার সকল নবীর উপর ঈমান রাখা ওয়াজিব।

২. কিছু ভ্রান্ত চিন্তায় বিশ্বাসী লোকের মতে সকল নবীদের উপর ঈমান রাখা ওয়াজিব নয়। এ ছাড়া ইহুদি ও নাসারাদের মতে নিজ নিজ রাসূলের প্রতি ঈমান আনলেই যথেষ্ট।

দলিল : اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالصَّابِئِيْنَ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ.

এই আয়াতে মুক্তির জন্য আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান আনা ও সৎকর্মের শর্ত করা হয়েছে। কোনো নবীর প্রতি ঈমান আনার কথা বলা হয়নি।

তাদের দলিলের জবাব : আল্লাহ তা'আলা কুরআনের এক আয়াতকে অন্য আয়াত দ্বারা তাফসীর করেছেন। যদিও এই আয়াতে নবী-রাসূলের প্রতি ঈমান আনার কথা বলা হয়নি। কিন্তু অন্য অনেক আয়াত দ্বারা অন্য নবী বা সকল নবীর উপর ঈমান আনার কথা বলা হয়েছে। অতএব তাদের এই দলিল যথার্থ নয়।

নবীদের নাম : কুরআনে ২৫ জন নবীর নাম উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু এরা ছাড়াও আরো অসংখ্য নবী রাসূল ছিলেন।

সকল নবী রাসূল আল্লাহ তা'আলার বান্দা, মানুষ ও পুরুষ ছিলেন :

পৃথিবীতে আগত সকল নবীই মানুষ ছিলেন এতে কোনো সন্দেহ নেই। কুরআনের অসংখ্য আয়াত দ্বারা এর প্রমাণ পাওয়া যায়। নিম্নে তা থেকে কয়েকটি তুলে ধরা হলো।

* قَالُوْا اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا .... قَالَتْ رُسُلُهُمْ اِنْ نَحْنُ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ـ الاية. (سُوْرَةُ اِبْرَاهِيْمَ)
* وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهٖ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. (سُوْرَةُ اِبْرَاهِيْمَ)
* وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِيْ اِلَيْهِمْ. (سُوْرَة نَحْل)
* وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ـ (سُوْرَة نِسَاء)
* وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَّذُرِّيَّةً. (سُوْرَةُ اٰلِ عِمْرَانَ)
* اِلَّا قَوْلَ اِبْرَاهِيْمَ لِاَبِيْهِ لَاَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ. (سُوْرَة مُمْتَحِنَة)

তাদের সকলের দাওয়াত এক। কুরআনের বিবরণ অনুযায়ী বুঝা যায়, সকল নবীর দায়িত্ব এক ছিল। সেটি হলো আল্লাহর একত্ববাদের আহ্বান এবং আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করতে বারণ করা। এর বিপরীত কোনো কিছুই তাদের দায়িত্ব ছিল না।

قَوْلُهٗ وَالْكِتَابُ الْمُنَزَّلُ : আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে আসমানি কিতাব নাজিল করেছেন। এগুলোর প্রতি আমরা ঈমান রাখি।

কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান আনার পদ্ধতি :

আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে অবতারিত কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান রাখার সাধারণ পদ্ধতি হলো, সকল মু'মিন সুদৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে এ কথা বিশ্বাস করবে যে, আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে নবীদের উপর ওহীর মাধ্যমে কিতাব নাজিল করেছেন। আর সেগুলো সন্দেহ ছাড়া আল্লাহ তা'আলার বাণী। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে প্রেরিত সত্য নির্দেশনা সম্বলিত গ্রন্থ হেদায়েত ও মানব জাতির জন্য পথ নির্দেশক তথা নূর স্বরূপ। তবে পূর্বের কিতাবগুলো বিলুপ্ত হওয়ায় আল কুরআন নাজিল করেন। যা পূর্বের কিতাবসমূহকে সত্যায়ন করে এবং পূর্ববর্তী সব কিতাবকে রহিত করে দিয়েছে। আল্লাহ তা'আলার কিতাবের প্রতি ঈমানের স্বরূপ নিম্নে প্রদত্ত হলো–

ক. আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে নবী-রাসূলগণকে কিতাব দিয়েছেন। মানব জাতির ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্য আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে নবী রাসূগণকে ওহীর মাধ্যমে কিতাব দান করেছেন। আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত ঐ সমস্ত কিতাব ছিলো সংশ্লিষ্ট জাতির জন্য পথ নির্দেশক। যার মধ্যে তিনি তৎকালীন জাতির জন্য সঠিক পথনির্দেশ দান করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيّٖنَ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ ـ وَاَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ.

অর্থাৎ সকল মানুষ ছিল একই উম্মতের অন্তর্ভুক্ত। অতঃপর আল্লাহ তা'আলার সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শক রূপে নবীগণকে প্রেরণ করেন এবং তাদের সাথে সত্যসহ কিতাব নাজিল করেন। যাতে মানুষের মাঝে ফয়সালা করতে পারে যা নিয়ে তারা মতবিরোধ করেছে। –[সূরা বাকারা]

* এতদ সম্পর্কে মহান স্রষ্টা অপর আয়াতে বলেন–

قُوْلُوْا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَا اُنْزِلَ اِلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَا اُوْتِيَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَمَا اُوْتِيَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ.

অর্থাৎ তোমরা বলো, আমরা ঈমান আনলাম আল্লাহ তা'আলা এবং তিনি যা অবতীর্ণ করেছেন এবং ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক ও ইয়াকুবসহ অন্যান্য নবীদের উপর যা অবতীর্ণ করেছেন এবং হযরত মূসা ও ঈসা (আ.) ও অন্যান্য নবীগণকে তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা দেওয়া হয়েছে তার প্রতি। অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন- إِنَّ هٰذَا لَفِى الصُّحُفِ الْأُوْلٰى صُحُفِ إِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسٰى অর্থাৎ নিশ্চয় এটা লিখিত রয়েছে পূর্ববর্তী সহীফাগুলোতে। আর তা হলো ইবরাহীম ও মূসা (আ.)-এর সহীফাতে।

খ. জানা ও অজানা কিতাব :

নবীগণের প্রতি নাজিলকৃত সকল কিতাবই সত্য। যা জাতির হেদায়েতের জন্যই নবীদের নিকট প্রেরণ করেছেন। কিন্তু আমরা ঐ সব গ্রন্থের অধিকাংশের নাম বা বিষয় বস্তু জানি না। আমরা কেবল বিশ্বাস করি তিনি যুগে যুগে কিতাব পাঠিয়েছেন জাতিকে সঠিক পথের দিশা দেওয়ার জন্য।

গ. প্রসিদ্ধ তিন কিতাব :

কুরআন ও হাদীসে পূর্ববর্তী সকল কিতাব হতে তিনটি কিতাবের নাম বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে। আর তা হলো তাওরাত, যাবূর ও ইঞ্জিল।

ঘ. তিন গ্রন্থ তিন প্রসিদ্ধ নবীকে দান :

১. **তাওরাত :** আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে হযরত মূসা (আ.)-এর উপর তাওরাত নাজিল করেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন- ثُمَّ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِيْ أَحْسَنَ وَتَفْصِيْلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً

   অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন-

   إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرٰةَ فِيْهَا هُدًى وَّنُوْرٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّوْنَ الَّذِيْنَ أَسْلَمُوْا لِلَّذِيْنَ هَادُوْا وَالرَّبَّانِيُّوْنَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوْا مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ وَكَانُوْا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ.

২. **যাবূর :** যাবূর হযরত দাঊদ (আ.)-কে প্রদান করা হয়েছে। যেমন তিনি বলেন- واتينا داود زبورا

৩. **ইঞ্জিল :** এটি হযরত ঈসা (আ.)-এর উপর নাজিল করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন- وَاٰتَيْنَاهُ الْإِنْجِيْلَ فِيْهِ هُدًى وَّنُوْرٌ

আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত কিতাবে বিশ্বাসের কল্যাণ :

মহান স্রষ্টা আল্লাহর প্রেরিত গ্রন্থে বিশ্বাস করা আমাদের জীবনের জন্য অফুরন্ত কল্যাণের উৎস। এই বিশ্বাসের ফলে স্রষ্টার সাথে মনের ভাব আরো সুদৃঢ় হয় এবং এই বিশ্বাসের কারণে প্রেরিত গ্রন্থের অনুসরণ এবং তার শিক্ষানুযায়ী জীবন পরিচালনায় উদ্বুদ্ধ করে। আর আল্লাহর বাণীর অনুসরণেই রয়েছে জীবনের সকল কল্যাণ, মঙ্গল, উন্নতি ও সফলতা।

এছাড়া আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত গ্রন্থ বিশ্বাসে আমরা বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন সমাজে বিরাজিত ধর্মীয় আচার আচরণের বিভিন্নতার কারণ জানতে পারি।

আল্লাহ তা'আলা, ফেরেশতা, নবী ও কিতাব অস্বীকারীর হুকুম :

এদের হুকুম সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন- وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيْدًا অর্থাৎ যারা আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর ফেরেশতা, রাসূল এবং পরকালকে অস্বীকার করবে, সে মারাত্মক পথভ্রষ্ট হবে। -[সূরা নিসা] সুতরাং এথেকে বিরত থাকাই যথার্থ।

মুসলমানকে কাফের বলা যাবে না

وَنُسَمِّيْ اَهْلَ قِبْلَتِنَا مُسْلِمِيْنَ مُؤْمِنِيْنَ مَا دَامُوْا بِمَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ مُعْتَرِفِيْنَ وَلَهُ بِكُلِّ مَا قَالَهُ وَاَخْبَرَ مُصَدِّقِيْنَ وَلَا نَخُوْضُ فِي اللّٰهِ وَلَا نُمَارِيْ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ وَلَا نُجَادِلُ فِي الْقُرْاٰنِ.

অনুবাদ : আহলে কিবলাদের [যারা কিবলামুখী হয়ে নামাজ পড়ে] আমরা তাদেরকে মুসলমান ও মু'মিন নামে আখ্যা দিই। যতক্ষণ পর্যন্ত তার নবী ﷺ-এর আনীত কথার উপর বিশ্বাসী থাকবে এবং তাঁর বলা ও সংবাদ দেওয়া কথাগুলো সত্যায়ন করবে। আমরা আল্লাহ তা'আলা সত্তা নিয়ে অহেতুক গবেষণা করবো না এবং আল্লাহর দীন সম্পর্কে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করি না এবং কুরআনের ব্যাপারে কোনো বিবাদে লিপ্ত হই না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَنُسَمِّيْ اَهْلَ قِبْلَتِنَا الخ : যারা আমাদের কিবলা তথা বায়তুল্লাহকে কিবলা হিসেবে মান্য করে এবং সে দিকে মুখ করে নামাজ পড়ে তাদেরকে আমরা মুসলমান মনে করি। যতক্ষণ তারা রাসূল ﷺ কর্তৃক আনীত বিষয় মান্য করে এবং সেটাকে নিজেদের জন্য উভয় জাহানের মঙ্গল মনে করবে। এসব লোকদেরকে পূর্ব থেকেই মুসলমান নামে আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

* যেমন এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন- مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرَاهِيْمَ هُوَ سَمّٰكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ قَبْلُ وَفِيْ هٰذَا অর্থাৎ তোমরা তোমাদের পিতা হযরত ইবরাহীমের ধর্মে অটল ও অবিচল থাকো। তিনি তোমাদেরকে মুসলমান নামে পূর্বে আখ্যা দিয়েছেন এবং এ কুরআনেও তাই করা হয়েছে।

* অপর আয়াতে হযরত ইবরাহীম (আ.) দোয়া করতে গিয়ে বলেন- رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ অর্থাৎ হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদের তোমার জন্য মুসলমান (আনুগত্যশীল) করো এবং আমার বংশধরদের থেকেও তোমার জন্য মুসলমান (আনুগত্যশীল) উম্মত বানাও। -[সূরা বাকারা]

সুতরাং বুঝা গেল, এই উম্মতকে পূর্ব হতেই মুসলমান বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। অতঃপর কুরআনে স্পষ্টভাবেই মুসলমান বলা হয়েছে। এতে কোনো ধরনের অস্পষ্টতা নেই। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন- وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ অর্থাৎ তোমরা মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না। -[সূরা আলে ইমরান]

* অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন–

قُوْلُوْٓا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَآ اُنْزِلَ اِلٰٓى اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَآ اُوْتِىَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَمَآ اُوْتِىَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ.

অর্থাৎ তোমরা বল, আমরা আল্লাহ তা'আলার প্রতি এবং যা কিছু আমাদের প্রতি ও ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব আসবাত, মূসা, ঈসা ও নবীদের প্রতি অবতারিত হয়েছে সেগুলোর প্রতি ঈমান আনলাম এবং তাঁদের কারো মাঝে আমরা পার্থক্য করি না। আর আমরা সকলেই তাঁর জন্য মুসলমান (অনুগত)। –[সূরা বাকারা]

* এ সম্পর্কে হযরত রাসূল ﷺ বলেন– مَنْ صَلّٰى صَلٰوتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَاَكَلَ ذَبِيْحَتَنَا فَهُوَ الْمُسْلِمُ الَّذِىْ لَهٗ ذِمَّةُ اللّٰهِ فَلَا تُخْفِرُوا اللّٰهَ فِىْ ذِمَّتِهٖ অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমাদের ন্যায় নামাজ পড়ে, আমাদের কিবলার অনুসরণ করে এবং আমাদের জবাইকৃত পশুর গোশত, সেই মুসলমান। তাঁর জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জিম্মাদারী রয়েছে। –[মিশকাত]

উপরিউক্ত প্রমাণাদি দ্বারা একথা স্পষ্ট হয় যে, আহলে কিবলাকে মুসলমান বলতে হবে। তাকে অমুসলিম বলার কোনো অবকাশ নেই। আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের সঠিক আকিদা এটিই।

قَوْلُهٗ وَلَا نَخُوْضُ فِى اللّٰهِ : আল্লাহ তা'আলার সত্তা নিয়ে অহেতুক চিন্তা ভাবনা, কাল্পনিকভাবে নানা ধারণা অথবা আল্লাহর সত্তা সম্পর্কে দার্শনিক গবেষণা করা সঠিক চিন্তাশীল ও বুদ্ধিমান মু'মিনের জন্য সমীচীন নয়। কারণ এরূপ করা আল্লাহ তা'আলা সত্তার সাথে মারাত্মক কলহের বহিঃপ্রকাশ এবং জ্ঞানের দৈন্যতার কারণে নিজের রায় প্রকাশ করা মাত্র।

* কেননা আল্লাহ তা'আলা এর অসারতা সম্পর্কে বলেছেন– وَهُمْ يُجَادِلُوْنَ فِى اللّٰهِ وَهُوَ شَدِيْدُ الْمِحَالِ অর্থাৎ তারা আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে বিতণ্ডা করে অথচ তিনি মহা শক্তিশালী। –[সূরা রা'দ]

* অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন– كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابٌ اَلَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِىْ اٰيَاتِ اللّٰهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ اَتَاهُمْ. অর্থাৎ এমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা সীমালঙ্ঘনকারী ও সংশয় পোষণকারীকে বিপথগামী করেন। যারা আল্লাহ তা'আলার আয়াত সম্পর্কে চিন্তা করে নিজেদের কাছে আগত কোনো প্রমাণ ও ভিত্তি ছাড়াই। –[সূরা মু'মিন]

তাছাড়া আল্লাহ তা'আলার সত্তা হলো অসীম। আর মানুষের জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক, চিন্তা ও গবেষণা হলো সসীম। আর অসীম সত্তাকে কখনো সসীম বস্তু অনুধাবন তথা গবেষণা করতে পারে না। তাই আল্লাহর সত্তা নিয়ে গবেষণা করা গোমরাহী ছাড়া আর কিছু নয়। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন– وَلَا يُحِيْطُوْنَهٗ عِلْمًا অর্থাৎ তারা আল্লাহ তা'আলাকে জ্ঞান দ্বারা বেষ্টন করতে পারে না। –[সূরা ত্বাহা]

قَوْلُهُ وَلَا نُمَارِىْ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ. : কুরআন সুন্নাহ তথা শরিয়তের নির্ধারিত বিধি বিধান এর পরিপন্থি মতামত বা মতবাদ প্রকাশ করে আল্লাহর দীনে দ্বন্দ্ব, কলহ ও ফেৎনা সৃষ্টি করা সঠিক মু'মিনের কাজ নয়; বরং যারা এমনটি করে, তারা গোমরাহী বা বিপদগামী।

* কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন- يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَتَحَاكَمُوْا اِلَى الطَّاغُوْتِ وَقَدْ اُمِرُوْا اَنْ يَكْفُرُوْا بِهٖ অর্থাৎ তারা বিরোধপূর্ণ বিষয়কে শয়তানের দিকে নিয়ে যেতে চায়। অথচ তাদের প্রতি নির্দেশ এসেছে তারা যেন তাকে মান্য না করে। -[সূরা নিসা]

* অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন- وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ। অর্থাৎ তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রণ করো না এবং জেনেশুনে সত্যকে গোপন করো না। -[সূরা বাকারা]

قَوْلُهُ وَلَا نُجَادِلُ فِى الْقُرْاٰنِ. : পবিত্র কুরআনের অপব্যাখ্যা না করা, কুরআনরে শব্দাবলি ও এর কেরাত নিয়ে বিবাদে জড়িয়ে না যাওয়া হলো আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

সুতরাং আমরা কুরআনের কোনো অপব্যাখ্যায় লিপ্ত হব না এবং রাসূল ﷺ হতে যেরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে ঐরূপ আমরা গ্রহণ করবো। এতে বিবাদে লিপ্ত হবো না।

* কেননা হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, একবার আমি এক ব্যক্তি হতে শুনলাম, সে একটি আয়াত তেলাওয়াত করছে। অথচ উক্ত আয়াত আমি রাসূল ﷺ থেকে অন্যভাবে শুনলাম। অতঃপর তাকে নিয়ে রাসূল ﷺ -এর নিকট গেলাম এবং সংঘটিত ঘটনার আগাগোড়া বর্ণনা করলাম। আর আমি বুঝলাম, রাসূল ﷺ -এর চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেছে। অতঃপর বললেন উভয়টিই সুন্দর। তোমরা কুরআন নিয়ে মতভেদ করো না। কারণ তোমাদের পূর্বে যারা মতভেদ করেছে তারা ধ্বংস হয়েছে।

পবিত্র কুরআন আল্লাহ তা'আলার বাণী

وَنَشْهَدُ أَنَّهُ كَلَامُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ نَزَلَ بِهِ رُوْحُ الْأَمِيْنِ فَعَلَّمَهُ سَيِّدَ الْمُرْسَلِيْنَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ.

অনুবাদ : আমরা সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, কুরআন সমগ্র জাহানের প্রতিপালকের বাণী। যা নিয়ে এসেছেন হযরত জিবরাঈল (আ.)। অতঃপর তিনি উক্ত কুরআন রাসূলদের নেতা মুহাম্মদ ﷺ -কে শিক্ষা দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর পরিবারবর্গ ও সকল সাহাবাদের উপর রহমত অবতীর্ণ করুন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَنَشْهَدُ الخ : অর্থাৎ কুরআন আল্লাহ তা'আলা হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর উপর নাজিল করেছেন। সর্বপ্রথম হেরা গুহায় অতঃপর স্থান কাল পাত্রভেদে কুরআন নাজিল করেছেন। উক্ত কুরআন একমাত্র বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার বাণী। এটাই আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আকিদা। এর বিপরীত বিশ্বাস করা গোমরাহী ও বিপদগামী বৈ কিছু নয়।

দলিল :

* আল্লাহ তা'আলা বলেন- إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا অর্থাৎ নিশ্চয় আমি তা আরবি ভাষায় কুরআন হিসেবে নাজিল করেছি। -[সূরা ইউসুফ]
* অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন- وَإِنَّهُ لَتَنْزِيْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ نَزَلَ بِهِ رُوْحُ الْأَمِيْنُ عَلٰى قَلْبِكَ لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ অর্থাৎ এই কুরআন বিশ্ব চরাচরের প্রভু আল্লাহর পক্ষ হতে অবতীর্ণ যা হযরত জিবরাঈল (আ.) আপনার অন্তরে অবতারিত করেছেন। যাতে আপনি ভীতি প্রদর্শনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হন।
* অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন- عَلَّمَهُ شَدِيْدُ الْقُوٰى অর্থাৎ অত্যন্ত শক্তিশালী সত্তা জিবরাঈল (আ.) কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন। -[সূরা নাজম]

অতএব সকল মু'মিনের সহীহ বিশ্বাস এমনটিই হওয়া উচিত। কিন্তু ভ্রান্ত দলগুলো বলে কুরআন রাসূল ﷺ -এর অন্তরে ইলহাম হয়েছে। যা এক রকম কল্পনা, চিন্তা ও ধারণা। যা মূলত কুরআন ও সুন্নাহ বিরোধী। এ কারণে তারা ভ্রান্ত বলে আখ্যায়িত হলো।

* অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

قُوْلُوْا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَإِسْمٰعِيْلَ وَإِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوْتِيَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَمَا أُوْتِيَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ.

قَوْلُهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : এটি জুমলায়ে মুতারেজা। যার পূর্বাপরের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই। এটি রাসূল ﷺ -এর উপর দুরূদ পাঠের অন্তর্গত। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- إِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يٰأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا. অর্থাৎ আল্লাহ ও ফেরেশতারা নবীর উপর দরূদ পড়েন। হে ঈমানদারগণ তোমরা তাঁর উপর দরূদ ও সালাম পেশ কর। -[সূরা আহযাব]

তাছাড়া রাসূল ﷺ বলেছেন, যে আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করে তার উপর আল্লাহ তা'আলা দশবার রহমত বর্ষণ করে। এই আয়াত ও হাদীসের অনুসরণে উরিউক্ত বাক্যটি রাসূল ﷺ -এর উপর দরূদ হিসেবে লিখেছেন।

আল্লাহ তা'আলার বাণী মানবীয় কথার মতো নয়

وَكَلَامُ اللّٰهِ تَعَالٰى لَا يُسَاوِيْهِ شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ الْمَخْلُوْقِيْنَ وَلَا نَقُوْلُ بِخَلْقِهٖ وَلَا نُخَالِفُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِيْنَ.

অনুবাদ : মানুষের কথা আল্লাহ্ তা'আলার কালামের সমান কখনো হতে পারে না। আমরা কুরআনকে সৃষ্টি বলব না এবং মুসলিম জামাতের বিরোধিতাও করবো না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَكَلَامُ اللّٰهِ الخ : অর্থাৎ দুনিয়ার মানুষের কথা আল্লাহ তা'আলার কথার সাথে কোনো ধরনের তুলনা হতে পারে না এবং কিয়ামত পর্যন্ত সকল মাখলুক ঐক্যবদ্ধভাবে তাঁর কালামের ন্যায় কোনো কালাম বানাতেও পারবে না। যার চ্যালেঞ্জ আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনের অনেক আয়াতে দিয়েছে। যেমন- আল্লাহ্ তা'আলা বলেন- لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰى اَنْ يَّاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا. অর্থাৎ যদি মানব ও জিনজাতি ঐক্যবদ্ধ হয় এই কুরআনের ন্যায় অন্য কোনো গ্রন্থ বানাতে, তবে তারা এর অনুরূপ গ্রন্থ রচনায় অক্ষম হয়ে যাবে। যদিও তারা একে অপরের সাহায্যকারী হয়। -[সূরা বনী ইসরাঈল]

* অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা এ সম্পর্কে আরো বলেন- قُلْ فَاْتُوْا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهٖ مُفْتَرَيَاتٍ وَّادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ. অর্থাৎ আপনি বলুন! তোমরা একটিই সূরা নিয়ে এসো আর এর জন্য ডেকে নাও আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া অন্য যাদেরকে তোমরা সক্ষম মনে কর। যদি তোমরা [তোমাদের দাবিতে] সত্যবাদী হও। -[সূরা হূদ]
* অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন- وَاِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ وَادْعُوْا شُهَدَآئَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ. অর্থাৎ তোমরা যদি আমার বান্দার উপর যা অবতীর্ণ করেছি সে সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে থাক তাহলে তার মতো একটি সূরা নিয়ে এসো এবং তোমরা আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া তোমাদের সাক্ষীদেরকে ডেকে নাও। -[সূরা বাকারা]
* অন্য আয়াতে বলেন- فَلْيَاْتُوْا بِحَدِيْثٍ مِّثْلِهٖ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ অর্থাৎ আহলে কিতাব তোমরা তার [কুরআনের যে কোনো অংশের ন্যায়] মতো একটি কালাম নিয়ে এসো। যদি তোমরা সত্যবাদী হও। -[সূরা তূর]

উপরিউক্ত প্রমাণাদি দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলার কালামের সাথে মানুষের কালাম এর তুলনা চলে না এবং এর সমান বাণী কেউ বানাতেও পারবে না। কিয়ামত পর্যন্ত সকল মানব ও জিন জাতির জন্য এ কুরআন চ্যালেঞ্জ হিসেবে থাকবে।

قَوْلُهٗ وَلَا نَقُوْلُ بِخَلْقِهٖ : অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার গুণাবলি যেমন অনাদি ও অনন্ত এবং অসৃষ্ট, অনুরূপ কুরআনও অনাদি, অনন্ত ও অসৃষ্ট। তা কোনো মাখলুক নয় বরং তাঁর সিফাতে কামালিয়ার অন্তর্গত। আর তাঁর সিফাত মাখলুক নয় একে মাখলুক মনে করা গোমরাহী। এটাই সঠিক মু'মিনের বিশ্বাস। এর বর্ণনা ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে।

قَوْلُهٗ وَلَا نُخَالِفُ الخ : গ্রন্থকার (র.) এ বাক্যটি দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার কালাম মাখলুক নয় একথার উপর সকল মুসলমান তথা সালফে সালেহীনগণ ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন। অতএব কালামুল্লাহ অসৃষ্ট না বলার কারণে মুসলিম জামাতে বিরোধ হয়ে যাবে। সুতরাং আমরা মুসলিম জামাতের বিরুদ্ধাচারণ করবো না।

পাপের কারণে কেউ ঈমান থেকে বের হয় না

وَلَا نُكَفِّرُ اَحَدًا مِّنْ اَهْلِ الْقِبْلَةِ بِذَنْبٍ مَا لَمْ يَسْتَحِلَّهُ وَلَا نَقُوْلُ لَا يَضُرُّ مَعَ الْاِيْمَانِ ذَنْبٌ لِمَنْ عَمِلَهُ.

অনুবাদ : আমরা কোনো পাপের কারণে কোনো কেবলাপন্থি মুসলমানকে কাফের বলি না। যতক্ষণ পর্যন্ত সে গোনাহকে হালাল মনে না করবে। আর আমরা একথা বলি না যে, ঈমান থাকাবস্থায় কোনো পাপীর পাপ ক্ষতিসাধন করবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَا نُكَفِّرُ اَحَدًا الخ : যদি কোনো মুসলমান গুনাহকে হালাল মনে না করে কিন্তু কু-প্রবৃত্তির কারণে গুনাহ করে ফেলে তবে তাকে এই গুনাহ করার কারণে কাফের বলা যাবে না। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন- يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰى اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى فَمَنْ عُفِىَ لَهُ مِنْ اَخِيْهِ شَىْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ- অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ তোমাদের উপর নিহতদের ব্যাপারে কেসাস নেওয়ার বিধান ধার্য করা হয়েছে। স্বাধীনের পরিবর্তে স্বাধীন, গোলামের পরিবর্তে গোলাম এবং নারীর পরিবর্তে নারী। উক্ত বিধান যথাযথভাবে কার্যকর করবে। যদি তার ভাইয়ের পক্ষ হতে কাউকে কিছুটা মাফ করা হয়, তাহলে প্রচলিত নিয়মানুসারে তা করবে। -[সূরা বাকারা]

উপরিউক্ত আয়াতে স্পষ্টভাবে একথা বলা হয়েছে যে, অন্যায়ভাবে হত্যা করলেও সে মু'মিন থেকে বের হয় না; বরং সে মু'মিনের ভাই রয়ে যায়। অথচ হত্যা মহাপাপ।

সুতরাং এ কথা খুব পরিষ্কারভাবেই বলা যায় যে, যেহেতু হত্যার মতো মারাত্মক গুনাহের কারণে সে ঈমান হতে বের হয় না; বরং সে মু'মিনের ভাই-ই থেকে যায়। সেহেতু তাকে কাফের বলা যাবে না। এটা হলো সঠিক মুসলমানদের নির্ভুল আকিদা বা বিশ্বাস।

* অনুরূপভাবে অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন- وَاِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ. অর্থাৎ যদি মু'মিনদের দু'টি দল পরস্পর হত্যাযজ্ঞ চালায় তবে তাদের দু'দলের মাঝে মীমাংসা করে দাও। .... নিশ্চয় মু'মিনরা পরস্পর ভাই ভাই। -[সূরা হুজুরাত]

উপরিউক্ত আয়াতের মধ্যেও অনুরূপ হত্যার মতো পাপ করা সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে মু'মিন বলেছেন। তাদেরকে ঈমান হতে বের হয়ে যাওয়ার কথা বলেননি।

কিন্তু খারেজী সম্প্রদায় কবিরা গুনাহের দায়ে মুসলমানদের কাফের আখ্যা দিয়ে থাকে এবং মু'তাযিলা সম্প্রদায় কবীরা গুনাহের কারণে ঈমান হতে বের হয়ে যাওয়ার মতবাদে বিশ্বাসী। যার কারণে তারা আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত হতে খারিজ বা বহিষ্কৃত। অবশ্য যদি কবীরা গুনাহকে হালাল মনে করে তবে তার ব্যাপারে ভিন্ন বিধান।

قَوْلُهُ مَا لَمْ يَسْتَحِلَّهُ : কোনো ব্যক্তি কবীরাগুনাহকে হালাল মনে করলে তার ঈমান থাকবে না। কিন্তু হালাল মনে না করে পাপ করলে তা হবে মারাত্মক গুনাহ।

قَوْلُهُ وَلَا نَقُولُ لَا يَضُرُّ مَعَ الْإِيمَانِ. : কোনো মু'মিন ঈমানের সাথে গুনাহ করলে অবশ্যই তার ক্ষতি হবে। আর উক্ত ক্ষতি দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানেই হবে। এই আকিদাই হলো আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের।

* যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন- وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ অর্থাৎ তোমাদের উপর যে বিপদ আসে তা তোমাদের গুনাহের কারণে হয়।
* অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন- ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ অর্থাৎ জলে ও স্থলে যে সকল বিপর্যয় প্রকাশ হয়েছে তার সবকিছুই মানুষের হাত অর্জন করেছে। অর্থাৎ সব ধরনের আপদ বিপদই মানুষের কৃত অপরাধের কারণে হয়ে থাকে।
* অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন- إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ অর্থাৎ নিশ্চয় যে তার প্রতিপালকের নিকট পাপী হয়ে আসবে তার জন্য রয়েছে জাহান্নাম।
* অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন- فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ অর্থাৎ যে সরিষা পরিমাণ ভালো করবে সে তা দেখবে এবং যে সরিষা পরিমাণ মন্দ করবে সে তা দেখবে।

উপরিউক্ত আয়াতসমূহ প্রমাণ দিচ্ছে যে পৃথিবীতে কেউ সরিষা পরিমাণ পাপ করলে দুনিয়া ও আখেরাতে তার এ শাস্তি ভোগ করতে হবে। হ্যাঁ যদি তাওবা করে নেয় সেটা ভিন্ন কথা।

* কিন্তু মুরজিয়া সম্প্রদায় এর বিশ্বাস হলো, ঈমান অবস্থায় গুনাহ করলে তার কোনো ক্ষতি বা প্রতিক্রিয়া নেই। তাদের অভিমতের স্বপক্ষে দলিল হলো, কোনো ব্যক্তি কুফরি অবস্থায় সৎকর্ম করলে তার কোনো লাভ নেই। অনুরূপ ঈমান অবস্থায় পাপ করলে পাপের কারণে পাপীর কোনো ধরনের ক্ষতিও নেই। পক্ষান্তরে খারেজী সম্প্রদায়ের বিশ্বাস হলো, ঈমান অবস্থায় পাপ করলে তার ঈমানই থাকে না।

এদের জবাব :

* মুরজিয়া সম্প্রদায়ের জবাবে আমাদের বর্ণিত আয়াতসমূহই যথেষ্ট। যদি পাপে কোনো ক্ষতি না হতো তাহলে আল্লাহ তা'আলার উপরিউক্ত আয়াত নাজিল করার অর্থ কী?
* খারেজী সম্প্রদায়ের জবাবে বলবো, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- إِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিবেন। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন- وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّئَاتِكُمْ অর্থাৎ তিনি তোমাদের পাপকে রহিত করে দিবেন।

উপরিউক্ত আয়াত এ কথাই প্রমাণ করে যে, বান্দার পাপ আল্লাহ তা'আলা বান্দার তওবার মাধ্যমে ক্ষমা করে দেন। কিন্তু যদি পাপের কারণে কুফরি হতো বা ঈমান হতে বের হয়ে যেত তবে তা মাফ হতো না। কারণ কুফরি শিরকের অন্তর্ভুক্ত। আর আল্লাহ তা'আলা বলেন- إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُّشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তাঁর সাথে শিরক করাকে ক্ষমা করবেন না এবং এছাড়া যাকে ইচ্ছা তাকে ক্ষমা করবেন। -[সূরা নিসা]
অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন- وَعَدَ اللّٰهُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী এবং কাফেরদেরকে জাহান্নামে পাঠানোর ওয়াদা করেছেন। -[সূরা তাওবা]
সুতরাং উপরিউক্ত বর্ণনা দ্বারা খারেজী সম্প্রদায়ের গোমরাহী ও ভ্রষ্টতা প্রকাশ পেল।

আশা ও ভয়ের মাঝে পূর্ণ ঈমান

وَنَرْجُوْ لِلْمُحْسِنِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَيُدْخِلَهُمْ بِرَحْمَتِهِ وَلَا نَأْمَنُ عَلَيْهِمْ وَلَا نَشْهَدُ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ وَنَسْتَغْفِرُ لِمُسِيْئِهِمْ وَنَخَافُ عَلَيْهِمْ وَلَا نُقَنِّطُهُمْ.

অনুবাদ : মু'মিনদের মধ্য হতে সৎকর্মশীলদের জন্য আমরা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আশা পোষণ করি যে, তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন এবং আমরা তাদের ব্যাপারে নির্ভীক নই। আর আমরা মু'মিনদেরকে নিশ্চিতভাবে জান্নাতী বলে সাক্ষ্য প্রদান করবো না এবং মু'মিনদের মধ্যে যারা অসৎ কার্য সম্পাদনকারী পাপী। তাদের জন্য আমরা ক্ষমা প্রার্থনা করি। তাদের ব্যাপারে আশঙ্কাও করি এবং তাদের ব্যাপারে নিরাশও হই না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَنَرْجُوْ لِلْمُحْسِنِيْنَ : যেহেতু আমরা সৎকর্মশীল পাপীদের অন্তরের অবস্থা সম্পর্কে অবগত। তাই তাদের সৎকর্মগুলো যাতে আল্লাহর নিকট গ্রহণীয় হয় এবং তাদেরকে ক্ষমা করে দেন এ আশাই আমরা করি।

* কারণ আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন- اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ অর্থাৎ নিশ্চয় সৎকর্ম অসৎকর্মকে দূরীভূত করে ফেলে বা সৎকর্ম অসৎ কর্মকে রহিত করে দেয়। -[সূরা হূদ]
* অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন- وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَحْسَنَ الَّذِىْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ. অর্থাৎ যারা ঈমান এনেছে ও সৎ কর্ম করেছে অবশ্যই তাদের পাপ মুছে দিবো এবং যারা আমল করেছে তাদের উত্তম বদলা দিবে। -[সূরা আনকাবূত]

উপরিউক্ত আয়াতদ্বয় এ কথার প্রমাণ দেয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা সৎকর্মশীলদের ক্ষমা করে দিবেন। অতএব প্রকৃত মু'মিনের জন্য এই আকিদা বা বিশ্বাস রাখা উচিত যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের গুনাহ্ ক্ষমা করে দিবেন। তারা তাদের গুনাহের কারণে জাহান্নামী বা কাফের নয়। যেমনটি আকিদা পোষণ করে খারেজী সম্প্রদায়। এমন আকিদা পোষণকারীরা নিশ্চিত গোমরাহী।

قَوْلُهُ وَلَا نَأْمَنُ : অর্থাৎ খাঁটি মু'মিন এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া অনুচিত যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে গুনাহের কারণে শাস্তি দিবেন না; বরং উচিত হলো এই আকিদা পোষণ করা যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের এই গুনাহের কারণে জাহান্নামে নিক্ষেপ করতে পারেন। অথবা নিজ দয়ার গুণে ক্ষমাও করতে পারেন তবে কোনো ব্যাপারেই সিদ্ধান্তমূলক কিছু বলা যাবে না। কারণ এর বিপরীত আকিদা পোষণ করে মুরজিয়া সম্প্রদায় বিপথগামী হয়েছে।

যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন- أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ অর্থাৎ তারা কি আল্লাহর গ্রেফতারি হতে নিশ্চিত হয়ে গেছে? বস্তুত তারাই আল্লাহর গ্রেফতারি হতে নিশ্চিত হতে পারে, যারা ধ্বংসের নিকট এসে গেছে। -[সূরা আ'রাফ] مَكْر শব্দের অর্থ হলো গোপন পরিকল্পনা। যে সম্পর্কে আমরা অনবগত। অতএব আমরা কিভাবে নিশ্চিত হতে পারি?

* অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলেন- يَغْفِرُ مَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ অর্থাৎ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দিবেন।
* অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন- عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ অর্থাৎ আশা করা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের ক্ষমা করবেন। -[সূরা তাওবা]
* আর এ সম্পর্কে হযরত নবী করীম ﷺ বলেন- لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَحَدٌ بِعَمَلِهِ قِيلَ وَلَا أَنْتَ قَالَ وَلَا أَنَا অর্থাৎ রাসূল ﷺ বলেছেন, আল্লাহর রহমত ব্যতীত কেউ জান্নাতে নিজ আমলের দ্বারা যেতে পারবে না। বলা হয়েছে ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ আপনিও না? তিনি বললেন, না, আমিও না।

আর আমরা একথাও জানি না যে, আল্লাহ্ কাকে ক্ষমা করবেন এবং কাকে তাঁর রহমত দ্বারা বেষ্টন করবেন। সুতরাং আমরা কীভাবে নিশ্চিত হতে পারি?

তাছাড়া উপরিউক্ত আয়াতে বলা হয়েছে নিশ্চিত ঐ ব্যক্তি-ই হয় যে ধ্বংসের নিকট। সুতরাং সঠিক মু'মিনের জন্য নিশ্চিত হওয়া উচিত নয়; বরং আল্লাহ্ তা'আলার রহমতের আশা করা ও তাঁর শাস্তিকে ভয় করা।

قَوْلُهُ وَلَا نَشْهَدُ لَهُمْ : অর্থাৎ আমরা কারো জন্য নিশ্চিতভাবে সাক্ষ্য প্রদান করি না যে, সে জান্নাতী। কারণ এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলাই ভালো জানেন। আর ধারণা বশত বা অনুমানভিত্তিক কোনো কথা বলতে আল্লাহ্ তা'আলাই নিষেধ করেছেন।

* যেমন তিনি বলেন- وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ অর্থাৎ যে সম্পর্কে তোমার জ্ঞান নেই সে সম্পর্কে কিছু বলতে যেয়োনা। -[সূরা বনী ইসরাঈল] কারণ কোনো কিছু জানা ব্যতীত বলে দেওয়ার কারণে আল্লাহর নিকট জিজ্ঞাসিত হতে হবে।

* হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ -কে মুশরিকদের সন্তান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ তারা কি জান্নাতে যাবে না জাহান্নামে? জবাবে তিনি বললেন- اَللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِيْنَ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলাই তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে বেশি জ্ঞাত। -[বুখারী, মুসলিম]

উপরিউক্ত হাদীস ও আয়াত দ্বারা সাব্যস্ত হলো যে, কারো ব্যাপারে মুক্তি বা ধ্বংস দ্বারা জাহান্নামী ও জান্নাতির ফায়সালা দেওয়া জায়েজ নেই। তাছাড়া সম্ভাবনা রয়েছে পাপী ব্যক্তি, ভুল ইবাদতকারী তার জন্য ক্ষমার ফায়সালা করে রেখেছে। তাহলে কীভাবে ক্ষমা না পাওয়ার সিদ্ধান্ত দেওয়া যাবে?

তাছাড়া গুনাহ মাফ হওয়ার জন্য দশটি কারণ রয়েছে যেমন- ১. তওবা, ২. ইস্তেগফার, ৩. সৎকর্ম, ৪. মসিবত, ৫. কবরের ভয়, ৬. হাশরের ভয়, ৭. মু'মিনের দোয়া তার ভাইয়ের জন্য,

৮. সুপারিশকারীদের সুপারিশ, ৯. এবং দয়াময় আল্লাহর ক্ষমা, ১০. আল্লাহ তা'আলার কোনো সৃষ্টির প্রতি দয়া করার কারণে। এ গুণগুলো পাওয়ার কারণে তাকে মাফ করে দিবেন। জানি না উক্ত ব্যক্তির মধ্যে এগুলোর কোনটি বিদ্যমান ছিল এবং কোনোটি ছিল না। হতে পারে কোনোটিই ছিল না যার কারণে সে জাহান্নামী। অতএব সঠিক মু'মিনের জন্য উচিত নয়, কারো জন্য জান্নাতের সাক্ষ্য প্রদান করা।

উল্লেখ্য যে আমাদের আকিদা হলো আল্লাহ তা'আলা মুত্তাকীদের জন্য জান্নাত প্রস্তুত করে রাখেন।

* যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন– إِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের থেকে তাদের জান ও মাল জান্নাতের বিনিময়ে খরিদ করেছেন। –[সূরা তাওবা]
* অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন– إِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَنَعِيْمٍ নিশ্চয় মুত্তাকীরা জান্নাতে ও নিয়ামতে থাকবেন। –[সূরা তূর]
* অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন–

وَعَدَ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنّٰتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللّٰهِ أَكْبَرُ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْكَبِيْرُ.

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা মু'মিন পুরুষ ও নারীদের জন্য জান্নাতের ওয়াদা করেছেন। যার পাদদেশ দিয়ে ঝরনা প্রবাহিত হবে। এর মধ্যে তারা অনন্তকাল থাকবে। আরো ওয়াদা রয়েছে জান্নাতে আদনে উত্তম বাসস্থানের। আর আল্লাহর সন্তুষ্টি হলো সর্বাপেক্ষা বড়। এটা হলো শ্রেষ্ঠ সাফল্য। –[সূরা তাওবা]

অনুরূপ মুনাফিক ও কাফেরদের জন্য আল্লাহ তা'আলা জাহান্নাম প্রস্তুত করেছেন।

* যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন– إِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْرًا নিশ্চয় মুনাফিকরা জাহান্নামের নিম্ন গহ্বরে থাকবে। আর তাদের জন্য আপনি কোনো সাহায্যকারী পাবেন না। –[সূরা নিসা]
* অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন– وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضٰى عَلَيْهِمْ فَيَمُوْتُوْا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا অর্থাৎ যারা কুফরি করেছে, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের অগ্নি তাদেরকে সেখানে মৃত্যুর ফয়সালা দেওয়া হবে না। ফলে তারা সেখানে মারাও যাবে না এবং তাদের আজাবও হ্রাস করা হবে না। এরূপই প্রত্যেক কাফেরকে প্রতিদান দিব।

قَوْلُهُ وَنَسْتَغْفِرُ لِمُسِيْئِهِمْ : অর্থাৎ এক মু'মিন অপর মু'মিনের ভাই। একজনের কিছু হলে অপরজনের তাতে দুঃখ হওয়া চাই। কারণ রাসূল ﷺ বলেছেন– إِنِ اشْتَكٰى عَيْنُهُ اشْتَكٰى كُلُّهُ إِنِ اشْتَكٰى رَأْسُهُ اشْتَكٰى كُلُّهُ অর্থাৎ একজনর মাথায় ব্যথা হলে তার পূর্ণ শরীর ব্যথা করবে এবং একজনের চোখ ব্যথা হলে তার পূর্ণ শরীর ব্যথা করবে। এটাই হলো প্রকৃত মু'মিনের নিদর্শন। তাই এক মুসলমানের গুনাহের জন্য অপর মুসলমান দুঃখে দুঃখিত হয়ে তার জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে।

* এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন– وَالَّذِيْنَ جَاءُوْا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِىْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَا اِنَّكَ رَؤُوْفٌ رَّحِيْمٌ অর্থাৎ যারা এদের পরে আসবে তারা বলবে, প্রভু হে! আমাদেরকে এবং আমাদের ঐ সকল ভাইদেরকে ক্ষমা করো, যারা ঈমানের সাথে অতীত হয়েছেন এবং ঈমানদারদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কুটিলতা রেখ না। হে আমাদের প্রভু! নিশ্চয় আপনি দয়ালু পরম করুণাময়।

অতএব প্রত্যেক মু'মিনের জন্য উচিত হলো, তাদের অতীত হওয়া মুমিনদের প্রতি বিদ্বেষ না রাখা; বরং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা। কারণ হতে পারে তাদের তাওবা অগ্রহণযোগ্য। যার ফলে তাকে ক্ষমা করা হয়নি।

قَوْلُهٗ وَنَخَافُ عَلَيْهِمْ : সত্যিকারের মু'মিনগণ সর্বদা গুনাহগার মুমিনদের জন্য সংশয়ে থাকেন এবং তাদের জন্য দোয়া করতে থাকেন। কারণ হতে পারে তাকে ক্ষমা করা হয়নি। কিংবা তার তওবা কবুল হয়নি। কারণ এটি একটি গোপনীয় বিষয়। যা সম্পর্কে আমরা অবগত নই। সুতরাং আমাদের জন্য উচিত হলো, আল্লাহ তা'আলার রহমত তার জন্য আশা করা ও আজাবের ভয় করা। এক্ষেত্রে কোনো অকাট্য ফয়সালা না দেওয়া হলো অধিক যুক্তিসঙ্গত।

قَوْلُهٗ وَلَا نُقَنِّطُهُمْ : আল্লাহ তা'আলা তাঁর রহমত থেকে নিরাশ না হওয়ার জন্য আদেশ করেছেন। এ কারণে সঠিক মু'মিনরা সর্বদা পাপী সৎকর্মশীলদের জন্য নিরাশ থাকে না, বরং সর্বদা আশা করেন যে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন এবং তাদেরকেও ক্ষমা করবেন। যেমন– আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা শোন, তিনি বলেন– لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সবগুনাহ ক্ষমা করে দিবেন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল ও দয়াময়। –[সূরা জুমার]

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন– لَا تَيْأَسُوْا مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ اِنَّهٗ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكٰفِرُوْنَ অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হয়ো না। আল্লাহর রহমত হতে কাফের সম্প্রদায় ব্যতীত অন্য কেউ নিরাশ হয় না। –[সূরা ইউসুফ]

সুতরাং যারা মু'মিনদেরকে চির জাহান্নামী মনে করে আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ থাকে, তারা গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট। তাই আমরা আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হবো না; বরং আশা করব ও ভয় রাখবো।

নির্ভীক ও নিরাশ হওয়া ইসলামের বহির্ভূত

وَالْاَمْنُ وَالْاِيَاسُ سَبِيْلَانِ عَنْ غَيْرِ مِلَّةِ الْاِسْلَامِ وَسَبِيْلُ الْحَقِّ بَيْنَهُمَا لِاَهْلِ الْقِبْلَةِ وَلَا يَخْرُجُ الْعَبْدُ مِنَ الْاِيْمَانِ اِلَّا بِجُحُوْدِ مَا اَدْخَلَهُ فِيْهِ.

অনুবাদ : নির্ভীক ও নিরাশ হওয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের বিশ্বাস বহির্ভূত দুটি পন্থা। আর কিবলাপন্থিদের জন্য এ দুয়ের মাঝামাঝি সত্যের পথ নিহিত রয়েছে। বান্দা ঈমান হতে বের হবে না। কিন্তু ঐসব বিষয় অস্বীকার করার কারণে বের হবে যেগুলো তাকে ঈমানের আওতাভুক্ত করেছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَالْاَمْنُ وَالْاِيَاسُ : অর্থাৎ আল্লাহর শাস্তি ও নারাজি থেকে একেবারে ভয়হীন নিশ্চিন্ত থাকা এবং তাঁর রহমত ও দয়া হতে আশাহীন নিরাশ হওয়া শরিয়তের পরিপন্থি পথ। এ দুটির কারণে মু'মিনগণ বিপথগামী হয়ে যায়। কেননা এমনটি করা কাফেরদের কাজ।

যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন- فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْخٰسِرُوْنَ অর্থাৎ আল্লাহর কৌশল হতে একমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত জাতিই নিশ্চিন্ত থাকে। -[সূরা আ'রাফ]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন- لَا تَيْأَسُوْا مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكٰفِرُوْنَ অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহর রহমত হতে একমাত্র কাফের জাতিই নিরাশ হয়। -[সূরা ইউসুফ]

সুতরাং মু'মিন ঐ ব্যক্তি, যে আশা ও ভয়ের মাঝে সমন্বয় ঘটাতে পারবে। সে একেবারে নিরাশও হবে না এবং একেবারে নিশ্চিন্তও থাকবে না।

* আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং এ দুয়ের মাঝে সমন্বয় ঘটিয়ে মু'মিনের জন্য বলেন- اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ يَبْتَغُوْنَ اِلٰى رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ وَيَرْجُوْنَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُوْنَ عَذَابَهُ. অর্থাৎ তারা যাদেরকে আহ্বান করে, তারা নিজেরাই তো তাদের পালনকর্তার নৈকট্য লাভের জন্য মধ্যস্থতা তালাশ করে যে, তাদের মধ্যে কে নৈকট্যশীল? তারা তাঁর রহমতের আশা করে আর সাথে সাথে তাঁর আজাবকে ভয় করে।

-[সূরা বনী ইসরাঈল]

* অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন- تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا অর্থাৎ তাদের পার্শ্বদেশ শয্যা হতে পৃথক হয় এমতাবস্থায় তারা তাদের প্রভুকে ভয় ও আশা নিয়ে ডাকছে। -[সূরা সেজদা]

* অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন- اَمْ مَنْ هُوَ قَانِتٌ اٰنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْاٰخِرَةَ وَيَرْجُوْ رَحْمَةَ رَبِّهِ অর্থাৎ যে ব্যক্তি রাত্রিকালে

সেজদার মাধ্যমে অথবা দাঁড়িয়ে ইবাদত করে পরকালের আশা করে এবং তার প্রভুর রহমতের আশা করে। –[সূরা যূমার]

অতএব সঠিক মু'মিন সম্পূর্ণরূপে ভয় হতে নিশ্চিন্ত ও রহমত হতে নিরাশ হতে পারে না।

قَوْلُهُ وَسَبِيْلُ الْحَقِّ بَيْنَهُمَا الخ : অর্থাৎ আহলে কিবলা ও সত্যিকারে মু'মিন পূর্ণরূপে আল্লাহ তা'আলার রহমতের আশা করতে পারে না এবং এ থেকে নিরাশও হতে পারে না আর তাঁর আজাব হতে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হতে পারে না। আবার নিশ্চিত জাহান্নামী বলেও রহমত হতে হতাশ হতে পারে না; বরং রহমতের আশা, নিরাশা, আজাবের ভয় ও অভয় এর মাঝামাঝি হতে হবে। এর বিপরীত হলে নির্ঘাত সে বিপথগামী হবে এবং সে ভ্রষ্ট বলে বিবেচিত হবে।

قَوْلُهُ وَلَا يَخْرُجُ الْعَبْدُ : এ বাক্য দ্বারা গ্রন্থকার (র.) খারেজী ও মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের আকিদার বিরুদ্ধাচরণ করেছেন। কারণ কোনো মু'মিন গুনাহে লিপ্ত হওয়া। যেমন: মদপান, জুয়া খেলা, ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া, সুদ খাওয়া, ঘুষ খাওয়া ও হত্যা করা ইত্যাদি কার্য সম্পাদন করার কারণে তারা ঈমান থেকে খারেজ হয়ে গেছে একথা আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত মনে করে না। তারা অবশ্যই তা মারাত্মক গুনাহের কাজ বলে মনে করেন। আর বান্দা ঐ সকল গুনাহের যে কোনো একটির জন্যেই জাহান্নামে যাওয়ার উপযোগী হয় এবং তা তাওবা ছাড়া ক্ষমাও হয় না। কিন্তু যদি উক্ত গর্হিত কাজকে তারা হালাল মনে করে সম্পাদন করে তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে। এ ছাড়াও সে যদি নবী করীম ﷺ-কে দোষারোপ করে, শিরক করে, প্রতিমা পূজা করে, মাজারে গিয়ে কবরবাসী থেকে সাহায্য চায় তবে এসব গুনাহের কারণে ঈমান থেকে বের হয়ে যাবে। তখন তাকে পুনরায় কালিমা পাঠ করে মুসলমান হতে হবে।

কিন্তু খারেজী ও মু'তাযিলা সম্প্রদায় মনে করে প্রথমোক্ত গুনাহের কারণে মানুষ ঈমান হতে বের হয়ে যায়। এমতাবস্থায় মারা গেলে সে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে।

অবশ্য দলের মধ্যে পার্থক্য হলো এ ধরনের গুনাহের কারণে খারেজীরা কাফের বলে। আর মু'তাযিলারা কুফর ও ঈমানের মধ্যবর্তী স্তর তথা ফাসেক মনে করে।

তাদের জবাব :

তাদের জবাবে আমরা বলবো, ইসলাম হচ্ছে কুরআন ও হাদীসের সমন্বয়। আর কুরআন ও হাদীস এ ধরনের গুনাহগারকে কাফের বা ঈমান থেকে বের হওয়ার কথা বলেনি। তাই তাদের বিশ্বাস ভ্রান্তই হবে।

দশম পাঠ

ঈমানের অর্থ

وَالْإِيْمَانُ هُوَ الْإِقْرَارُ بِاللِّسَانِ وَالتَّصْدِيْقُ بِالْجِنَانِ وَأَنَّ جَمِيْعَ مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِى الْقُرْاٰنِ وَجَمِيْعَ مَا صَحَّ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الشَّرْعِ وَالْبَيَانِ كُلُّهُ حَقٌّ.

অনুবাদ : ঈমান হলো মৌখিক স্বীকারোক্তি, আন্তরিক সত্যায়ন এবং একথা স্বীকার করার নাম যে, আল্লাহ তা'আলা কুরআনে যা কিছু অবতরণ করেছেন এবং রাসূল ﷺ থেকে যেসব বিধান ও বক্তব্য বিশুদ্ধভাবে বর্ণিত হয়েছে, তার সবগুলো চিরসত্য।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَالْإِيْمَانُ : গ্রন্থকার (র.) এখানে ঈমানের আলোচনা শুরু করেছেন। উক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় ঈমান সম্পর্কে সবিস্তার আলোচনা করা হয়েছে। প্রয়োজনবোধে সেখানে দেখে নেওয়া যেতে পারে। নিম্নে এ সম্পর্কে যৎসামান্য আলোচনা করা হলো–

ঈমান সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ :

* ইমাম আবূ হানীফা (র.) এবং মাতুরিদী (র.)-এর মতে, ঈমান বাছীত তথা অবিমিশ্র। অর্থাৎ ঈমানের মৌল তত্ত্ব শুধু আন্তরিক বিশ্বাসকে বলে। এক্ষেত্রে শরিয়তের বিধি বিধান প্রতিষ্ঠিত করার জন্য মৌখিক স্বীকার করা শর্ত।
* ইমাম শাফেয়ী, মালেক ও আহমদ (র.) বলেন, আমল ঈমানের পরিপূরক অংশ।
* কতিপয় আলেম বলেন, আন্তরিক বিশ্বাস ও মৌখিক স্বীকার এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারা দীনের কার্যসমূহ সম্পাদন করাকে ঈমান বলা হয়।
* গ্রন্থকার (র.) বলেন, মৌখিক স্বীকার, আন্তরিক বিশ্বাস এবং শরিয়তের ঐসব বিধি বিধানকে আন্তরিকভাবে সত্য মনে করা যা আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করেছেন এবং নবী ﷺ থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।
* মু'তাযিলা ও খারেজী সম্প্রদায়ের মতে, ঈমানের শক্তিশালী অংশ হিসেবে সুগঠিত অংশ তথা জুযয়ে মুকাওইমাকে বুঝায়।

  অতএব তাদের সংজ্ঞা অনুযায়ী গুনাহ করা এবং আমলে ত্রুটি বিচ্যুতির কারণে মু'মিন ঈমান হতে খারিজ হয়ে যাবে। যদি এ অবস্থায় উক্ত ব্যক্তি মারা যায় তবে সে চির জাহান্নামী বলে বিবেচিত হবে।

তাদের জবাব :

আমরা তাদের জবাবে বলবো, আল্লাহ তা'আলা হত্যার মতো কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তিকে মু'মিন এবং মু'মিনের ভাই বলে আখ্যা দিয়েছেন। যদি সে মু'মিন না হতো তবে তাকে এরূপ আখ্যা দেওয়া হতো না। কারণ মু'মিনই মু'মিন এর ভাই হয়। কাফের কখনো মু'মিনের ভাই হতে পারে না।

قَوْلُهُ وَاَنَّ جَمِيْعَ مَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ فِى الْقُرْاٰنِ الخ : অর্থাৎ সঠিক মু'মিন হতে হলে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক সকল বিধি বিধান মেনে নেওয়া ও সেই অনুপাতে জীবন চলা অত্যাবশ্যক। আর সকল বিধি বিধান অবতারিত হয়েছে হযরত রাসূল ﷺ-এর উপর। যা আমরা কুরআন রূপে জানি ও মানি। আর প্রকৃত মু'মিন হতে হলে অবশ্যই কুরআনকে আল্লাহর বাণী হিসেবে অবশ্যই মেনে নিতে হবে। এতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ করা যাবে না। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন- ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ. অর্থাৎ এটি এমন গ্রন্থ, যাতে সন্দেহের অবকাশ নেই এবং মুত্তাকীদের জন্য পথ প্রদর্শক।

-[সূরা বাকারা]

* অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন- لَا يَأْتِيْهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهٖ অর্থাৎ কুরআনের সামনে কিংবা পিছন হতে বাতিল এসে মিশতে পারবে না তথা কুরআনের সাথে একত্রিত হতে পারবে না। -[সূরা হামীম সেজদা]
* অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন- وَهٰذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ اَنْزَلْنٰهُ اَفَاَنْتُمْ لَهٗ مُنْكِرُوْنَ অর্থাৎ এই কুরআন পবিত্রময় যা আমি অবতরণ করেছি। তোমরা কি তা অস্বীকার করবে? -[সূরা আম্বিয়া]

অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহর অবতারিত বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করবে সে প্রকৃত মু'মিন নয়; বরং সে কাফের হয়ে যাবে। [আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে হেফাজত করুন!]

قَوْلُهُ وَجَمِيْعُ مَا صَحَّ عَنْ رَسُوْلِ الخ : অর্থাৎ শরিয়তের সকল বিধান দুইভাবে প্রমাণিত বা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এক. কুরআন, দুই. হাদীস। কুরআন হাদীস উভয়টিই ওহী। এতে কোনো সংশয় বা সন্দেহ নেই। পার্থক্য শুধু উভয়টির মাঝে এতটুকু যে, কুরআন হলো ওহীয়ে মাতলু এবং হাদীস হলো ওহীয়ে গায়রে মাতলু। কিন্তু উভয়টিই ওহী। আর সব বিধিবিধান বিশুদ্ধতম হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। সুতরাং আমরা উভয়টিকেই ওহী হিসেবে মান্য করি।

কেননা আল্লাহ তা'আলা এ সম্পর্কে বলেন- وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْىٌ يُّوْحٰى অর্থাৎ তিনি [মুহাম্মদ ﷺ] প্রবৃত্তির তাড়নায় কথা বলেন না। কুরআন ওহী, যা প্রত্যাদেশ হয়। -[সূরা নাজম]

যেহেতু তিনি প্রবৃত্তির তাড়নায় কথা বলেন না তাই তাঁর হাদীসও ওহী ছাড়া অন্য কিছু নয়। আর তাঁর হাদীসকে ওহী হিসেবে মান্য করাই আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আকিদা। উপরিউক্ত ইবারতটুকু গ্রন্থকার (র.) ঐ সকল ভ্রান্তদের মুখোশ উন্মোচনের উদ্দেশ্যে লিখেছেন,

যারা হযরত নবী ﷺ -এর হাদীসকে ওহী তথা অকাট্য দলিলরূপে মেনে নিতে নারাজ বা অপ্রস্তুত। এমনকি যারা কুরআনকেও পর্যন্ত ওহী ও দলিল হিসেবে মেনে নিতে অসম্মত। যেমন– জাহমিয়্যাহ, রাওয়াফেজ ও মু'তাযিলা সম্প্রদায়।

হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর হাদীস ওহী হওয়া সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেন– مَا اٰتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا. অর্থাৎ রাসূল ﷺ যা কিছু নিয়ে এসেছেন, তোমরা তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেছেন তা বর্জন কর। উপরিউক্ত আয়াত হতে দু'টি জিনিস বুঝা যায়। যথা– ১. আল্লাহ তা'আলার নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর হাদীস দ্বারা যে সকল বিধিবিধান সাব্যস্ত হয়েছে তা অকাট্য। ২. তিনি যা বলেছেন বা তাঁর যে হাদীস দ্বারা বিধান সাব্যস্ত হয়েছে তা ওহী। কারণ তা যদি ওহী না-ই হতো তাহলে তাঁর আনীত বিষয় বা তাঁর বলা বিষয়কে গ্রহণ করার আদেশ দিতেন না।

* এতদসম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেন– وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ অর্থাৎ আমি আপনার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি মানুষকে তাদের প্রতি অবতারিত বিষয় ব্যাখ্যা করতে পারেন। –[সূরা নাহল]

অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন– وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاٰمَنُوْا بِمَا نُزِّلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَاَصْلَحَ بَالَهُمْ. অর্থাৎ যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে এবং হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর উপর অবতারিত বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে। আর তা তাদের প্রভুর পক্ষ হতে চিরসত্য, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাদের সকল পাপ মোচন করে দেবেন এবং তাদের অবস্থা ভালো করে দেবেন। –[সূরা মুহাম্মদ]

সুতরাং রাসূল ﷺ -এর সকল আনীত বিষয় ও আদেশ-নিষেধ ওহী হিসেবে আমাদের বিশ্বাস করা জরুরি। অন্যথায় প্রকৃত মু'মিন হতে পারব না।

এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন– وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ কোনো কাজের আদেশ করল, কোনো ঈমানদার পুরুষ ও নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন ক্ষমতা নেই যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ অমান্য করবে। –[সূরা আহযাব]

* হযরত রাসূল ﷺ বলেন– لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهٖ অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি মু'মিন হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তার চাহিদা আমার আনীত বিষয়ের অনুগত না হবে।

ঈমান হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না

وَالْإِيْمَانُ وَاحِدٌ وَاَهْلُهُ فِيْ اَصْلِهِ سَوَاءٌ وَالتَّفَاضُلُ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِيْقَةِ بِالتُّقٰى وَمُخَالَفَةِ الْهَوٰى وَمُلَازَمَةِ الْاَوْلٰى.

অনুবাদ : ঈমান এক জিনিস। ঈমানদারগণ ঈমানের মৌলিক বিষয়ে সবাই সমান। তবে তাদের মাঝে প্রকৃত পার্থক্য তাকওয়া, কু-প্রবৃত্তির বিরোধিতা ও উত্তম বস্তু আঁকড়ে ধরার কারণে হয়ে থাকে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَالْاِيْمَانُ وَاحِدٌ الخ : এখানে ঈমানের মৌলিক বিষয় বলতে যেসব বিষয়ের উপর ঈমান আনা একজন মু'মিনের জন্য ফরজ, সেগুলোকে বুঝানো হয়েছে। যেমন- আল্লাহ এক, মুহাম্মদ ﷺ শেষ নবী, তাকদীর, হাশর-নশর, জান্নাত-জাহান্নাম ইত্যাদির প্রতি ঈমান আনা। ঈমান এবং ঈমানের মৌলিক বিষয়ের ক্ষেত্রে সকল মু'মিন এক সমান। কেউ কারো উপর মর্যাদায় ঈমানের ক্ষেত্রে উন্নত নয়। তবে হ্যাঁ যখন কোনো মু'মিনের মধ্যে তাকওয়া, খোদাভীতি, কু-প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ ও সৎকর্ম বেশি পাওয়া যাবে তখন সে অবশ্য অপর মু'মিন হতে মর্যাদায় উন্নত বলে পরিগণিত হবে।

* কেননা স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাই এ সম্পর্কে বলেছেন- ثُمَّ اَوْرَثْنَا الْكِتٰبَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌۢ بِالْخَيْرٰتِ بِاِذْنِ اللّٰهِ ذٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيْرُ. অর্থাৎ আমি ঐসব লোককে কিতাবের অধিকারী করেছি, যাদেরকে আমার বান্দাদের মধ্য হতে মনোনীত করেছি। তাদের কতেক নিজের উপর অত্যাচারী, কতক মধ্যপন্থা অবলম্বনকারী এবং কতক আল্লাহর আদেশে কল্যাণের পথে অগ্রগামী। এটাই সেরা অনুগ্রহ। -[সূরা ফাতির]
  উপরিউক্ত আয়াতে জালেম বলতে ঐ সকল ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে যে ফরজ ও ওয়াজিব কাজে ত্রুটি করে এবং অনেক ক্ষেত্রে হারাম কাজেও জড়িত হয়ে পড়ে।
* মধ্যপন্থাবলম্বনকারী বলতে ঐ ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে যে ব্যক্তি ফরজ ও ওয়াজিব সম্পাদন করে এবং নিষিদ্ধ সকল কাজ বর্জন করে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই মোস্তাহাব ও সুন্নত বর্জন করে এবং মাকরূহ কাজে জড়িত হয়ে পড়ে।
* আর সৎকর্মে অগ্রগামী বলতে বুঝানো হয়েছে ঐ ব্যক্তিকে, যে ফরজ ওয়াজিব সুন্নত ও মোস্তাহাব বিষয় আদায় করার সাথে সাথে হারাম, মাকরূহে তাহরীমী, তানযিহী হতে মুক্ত থাকে। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে মুবাহ (তথা অবৈধ সমান এমন) কাজ ছেড়ে দেয় উক্ত কাজ ব্যাপৃত ও হারাম হয় কিনা এই সন্দেহের কারণে। -[ইবনে কাছীর]
* অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন- قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ অর্থাৎ আপনি বলুন! যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি সমান হতে পারে। -[সূরা যুমার]
* অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন- وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ অর্থাৎ যারা জ্ঞানপ্রাপ্ত আল্লাহ তাদের উচ্চ মর্যাদা দান করবেন। -[সূরা মুজাদালা]

উপরিউক্ত আয়াতত্রয় প্রমাণ দিচ্ছে যে, ঈমান ও তার মৌলিক ক্ষেত্রে সকলে সমান। তবে তাকওয়া, জ্ঞান ও সৎকর্ম ইত্যাদির ক্ষেত্রে কম-বেশি হতে পারে। যেমন অস্তিত্ব এক বস্তু কিন্তু অস্তিত্বপ্রাপ্ত অনেক। আলো এক কিন্তু আলোপ্রাপ্ত অনেক। অনুরূপ ঈমান ও তার মৌলিক বিষয় একবস্তু, কিন্তু মু'মিন অনেক এবং এদের মধ্যে সৎকর্ম, জ্ঞান, কু-প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ ও তাকওয়া ইত্যাদির কারণে মর্যাদায় উন্নীত মু'মিন অনেক থাকতে পারে। এটাই আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আকিদা-বিশ্বাস।

মু'মিনরা আল্লাহ তা'আলার বন্ধু

وَالْمُؤْمِنُوْنَ كُلُّهُمْ أَوْلِيَاءُ الرَّحْمٰنِ وَأَكْرَمُهُمْ وَأَطْوَعُهُمْ بِالتَّقْوٰى وَالْمَعْرِفَةِ وَاتْبَعُهُمْ لِلْقُرْاٰنِ.

অনুবাদ : মু'মিনগণ প্রত্যেকেই আল্লাহ্ তা'আলার বন্ধু। তাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সর্বাধিক সম্মানিত সেই, যে তাকওয়া ও মা'রেফাতের মাধ্যমে তাঁর অধিকতর অনুগত এবং কুরআনের সর্বাধিক অনুসারী।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَالْمُؤْمِنُوْنَ كُلُّهُمْ الخ : অর্থাৎ মু'মিনগণ আল্লাহর ওলী বা বন্ধু। এ গুণের ক্ষেত্রে কেউ কম বেশি নন। নিম্নে ওলী-এর পরিচয় তুলে ধরা হলো–

ওলীর পরিচিতি :

وَلِيٌّ -এর আভিধানিক অর্থ : وَلِيٌّ শব্দটি فَعِيْلٌ -এর ওজনে أَوْلِيَاءُ -এর একবচন। অর্থ হলো– اَلْمُطِيْعُ (অনুসারী) اَلْخَلِيْلُ (বন্ধু) اَلصَّاحِبُ (মালিক) اَلْحَبِيْبُ (প্রিয়জন) اَلنَّاصِرُ (সাহায্যকারী) ইত্যাদি।

পারিভাষিক সংজ্ঞা :

১. আল্লামা তাফতাযানী (র.) বলেন– اَلْوَلِيُّ هُوَ الْعَارِفُ بِاللّٰهِ وَصِفَاتِهِ الْمُوَاظِبُ عَلَى الطَّاعَاتِ الْمُجْتَنِبُ عَنِ الْمَعْصِيَةِ الْمُعْرِضُ عَنِ الْاِنْهِمَاكِ فِي اللَّذَّاتِ وَالشَّهَوَاتِ ওলী বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে যিনি আল্লাহর অস্তিত্ব জাত ও সিফাত সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করে যথা সাধ্যানুযায়ী তাঁর আদেশ নিষেধ মান্য করে ইবাদত করে।

২. কেউ কেউ বলেন– اَلْوَلِيُّ هُوَ مَنْ يَسْتَغْرِقُ فِيْ بِحَارِ مَعْرِفَةٍ অর্থাৎ ওলী বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে যিনি রাসূল ﷺ -এর আনীত শরিয়তের পূর্ণ অনুসারী আল্লাহর ইবাদতে নিজেকে নিমগ্ন রাখেন।

৩. কেউ কেউ বলেন– ওলী বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে যিনি আল্লাহর অস্তিত্ব, সত্তা ও সিফাত সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করতঃ যথাসাধ্য তাঁর ইবাদত করেন। আর যাবতীয় গুনাহ্ ও কুপ্রবৃত্তি হতে স্বেচ্ছায় বিরত থাকেন।

এখানে বুঝার বিষয় হলো দুটি। যথা– ১. আল্লাহ্ তা'আলার ওলী হওয়া এগুলো সকলের ক্ষেত্রে সমান। ২. ওলী-এর স্তরের ক্ষেত্রে পার্থক্য রয়েছে।

* ওলী হওয়ার গুণের ক্ষেত্রে সকল মু'মিন এক। এর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলেন– اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَوْلِيَاءُ هُمُ الطَّاغُوْتُ. অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনগণের

বন্ধু। তাদেরকে তিনি অন্ধকার হতে আলোতে বের করেন। আর কাফেররা হলো শয়তানের বন্ধু। শয়তান তাদেরকে আলো হতে অন্ধকারে টেনে নেয়। -[সূরা বাকারা]

* অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন- إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ. অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল তোমাদের ও যারা ঈমান এনেছে, নামাজ কায়েম করেছে ও জাকাত প্রদান করেছে এমতাবস্থায় তারা রুকূ'কারী তাদের বন্ধু। -[সূরা মায়েদা]

* অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন- وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلّٰهِ অর্থাৎ যারা আল্লাহর প্রতি ঈমানদার তাদের ভালোবাসা (ওদের তুলনায়) বহুগুণ। -[সূরা বাকারা]

উপরিউক্ত আয়াতত্রয় এ কথার প্রমাণ দিচ্ছে যে, মু'মিনগণ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বন্ধু এবং আল্লাহও তাদের বন্ধু। এক্ষেত্রে সকলে সমান।

* কিন্তু তাদের ওয়ালায়াত-এর স্তরের ক্ষেত্রে পার্থক্য রয়েছে। অর্থাৎ মু'মিনগণের মধ্যে থেকে কেউ কেউ পরিপূর্ণ ওলী। আবার কেউ অসম্পূর্ণ ওলী। এর কারণ হলো মু'মিনদের মধ্যে কেউ পূর্ণ সৎকর্মশীল, কেউ অপূর্ণ। কেউ পূর্ণ তাকওয়া অবলম্বনকারী, আবার কেউ অপূর্ণ। কেউ মা'রেফাতের ক্ষেত্রে আল্লাহর পূর্ণ অনুগত, আবার কেউ অপূর্ণ। কেউ কুরআনের পূর্ণ অনুসারী, আবার কেউ অপূর্ণ। তাই এই সমস্ত পার্থক্য দেখা দিয়েছে।

সুতরাং যিনি সৎকর্ম, তাকওয়া, মারেফাত ও কুরআনের ক্ষেত্রে এবং আদেশ নিষেধ মান্য করার ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ সতর্ক। সে পরিপূর্ণ মু'মিন। যার কারণে আল্লাহর নিকট তাঁর সম্মানও পরিপূর্ণ।

* যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন- إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ أَتْقٰكُمْ অর্থাৎ আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত ঐ ব্যক্তি, যিনি সবচেয়ে বেশি তাকওয়া অবলম্বনকারী। -[সূরা হুজুরাত]

পক্ষান্তরে যারা উপরিউক্ত ক্ষেত্রে অপরিপূর্ণ তারাও মু'মিন। কিন্তু তাদের মর্যাদা আল্লাহ তা'আলার নিকট কম। পার্থক্যটি এখানেই প্রকাশ পায়।

ওলীদের সুসংবাদ :

আল্লাহর ওলী তথা বন্ধুগণ দুনিয়াতে যেমন কামিয়াব আখেরাতেও সফল। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন- أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ـ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرٰى فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللّٰهِ. অর্থাৎ জেনে রাখ! নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলার ওলীদের কোনো ভয় নেই এবং কোনো চিন্তাও নেই। যারা ঈমান এনেছে ও তাকওয়া অবলম্বন করেছে তাদের জন্য পার্থিব ও আখেরাতের জীবনে রয়েছে সুসংবাদ। আল্লাহর কালিমার কোনো পরিবর্তন নেই। -[সূরা ইউনুস]

সাতটি বিষয়ের প্রতি ঈমান

وَالْاِيْمَانُ هُوَ الْاِيْمَانُ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ وَحُلْوِهِ وَمُرِّهِ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَنَحْنُ مُؤْمِنُوْنَ بِذٰلِكَ كُلِّهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَنُصَدِّقُ كُلَّهُمْ عَلٰى مَا جَاءَ بِهِ.

অনুবাদ : আর ঈমান কয়েকটি জিনিসের প্রতি বিশ্বাস রাখার নাম। যথা– ১ আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি, ২. তাঁর ফেরেশতাকুলের প্রতি, ৩. তাঁর অবতারিত কিতাবসমূহের প্রতি, ৪. তাঁর রাসূলগণের প্রতি, ৫. কিয়ামত দিবসের প্রতি, ৬. মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করার প্রতি, ৭. ভালো-মন্দ ও মিষ্ট-তিক্ত তাকদীরের প্রতি। আমরা উপরিউক্ত সকল বিষয়ের প্রতি ঈমান রাখি। আমরা তাঁর রাসূলগণের মাঝে কোনো পার্থক্য করি না; বরং সকল নবী ও তাঁদের আনীত বিষয়কে স্বীকার করি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَالْاِيْمَانُ هُوَ الْاِيْمَانُ الخ : অর্থাৎ প্রত্যেক মু'মিনের জন্য সাতটি বিষয়ের উপর ঈমান রাখা ফরজ। এগুলোর প্রতি ঈমান না রাখলে কেউ মু'মিন হতে পারবে না; বরং সে কাফের বলে গণ্য হবে। কারণ এ সবগুলো হলো ঈমানের রোকন। আর রোকন ছাড়া কোনো বস্তুর অস্তিত্ব লাভ হয় না। নিম্নে পর্যায়ক্রমে দলিলসহ পেশ করা হলো–

১. আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি ঈমান আনা যে, তিনি এক। আর এ ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই বলেন– وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ অর্থাৎ তোমাদের প্রভু এক। شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা সাক্ষ্য দিয়েছেন তিনি ছাড়া কোনো প্রভু নেই।

২. তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান আনা। এদের প্রতি ঈমান আনার বিষয়টি পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে।

৩. তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান আনা।

৪. তাঁর প্রেরিত সকল রাসূলগণের উপর ঈমান আনা।

এই চারটি বিষয়ের প্রতি ঈমান আনা সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেন– اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْنَا مِنْ رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُوْنَ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ. অর্থাৎ রাসূল ও মু'মিনগণ ঈমান এনেছেন যা কিছু তাঁর প্রতি অবতারিত তাঁর প্রভুর পক্ষ হতে। প্রত্যেকেই আল্লাহর প্রতি এবং তাঁর ফেরেশতা, প্রেরিত রাসূলগণ ও অবতারিত কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান এনেছে। –[সূরা বাকারা]

৫. আখেরাতের প্রতি ঈমান আনা, যে দিবস হবে ৫০ হাজার বছরের দীর্ঘকাল, যেদিন আল্লাহ্ তা'আলা সৎকর্মশীলকে উত্তম প্রতিদান এবং পাপীকে শাস্তি দিবেন। সেদিন তিনি

কারো প্রতি কোনো প্রকার অত্যাচার করবেন না। যেমন এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন- وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ অর্থাৎ তারা আখেরাত দিবসের প্রতি বিশ্বাসী। -[সূরা বাকারা]

৬. ভালোমনন্দ তাকদীরের প্রতি ঈমান রাখা। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন- قُلْ لَنْ يُصِيْبَنَا اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا অর্থাৎ আপনি বলুন, আমাদের নিকট কোনো কিছুই পৌঁছবে না। তবে যা [পূর্ব থেকে] আল্লাহ্ তা'আলা লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন (শুধু তাই পৌঁছবে)। -[সূরা তাওবা]

উপরিউক্ত সবকয়টি বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। নিম্নে পুনরুত্থান সম্পর্কে আলোচনা হলো।

৭. সকল জীবন মৃত্যুবরণ করলে আল্লাহ্ তা'আলা পুনরায় তাদেরকে পূর্বের আকৃতিতে জীবন দান করে উঠাবেন। নিম্নে এর আলোচনা করা হলো-

بَعْثٌ -এর পরিচিতি :

بَعْثٌ -এর আভিধানিক অর্থ : بَعْثٌ -এর আভিধানিক অর্থ হলো- اَلْاَحْيَاءُ (জীবন দান করা) اَلْاِيْقَاظُ (জাগ্রত করা) اَلْاِرْسَالُ (পাঠানো, উত্তেজিত করা) এখানে তা পুনরায় জীবন দান করার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

পারিভাষিক সংজ্ঞা :

১. রায়েদুত্ তুল্লাব গ্রন্থপ্রণেতা (র.) বলেন- اَلْبَعْثُ اَىْ اَنْ يَبْعَثَ اللّٰهُ النَّاسَ بَعْدَ الْمَوْتِ অর্থাৎ اَلْبَعْثُ শব্দের অর্থ হলো মৃত্যুর পর আল্লাহ্ তা'আলা মানবকুলকে পুনরায় জীবিত করা।

২. আল্লাম তাফতাজানী (র.) বলেন- هُوَ اَنْ يَّبْعَثَ اللّٰهُ تَعَالٰى الْمَوْتٰى مِنَ الْمَقْبُوْرِ بِاَنْ يَجْمَعَ اَجْزَائَهُمُ الْاَصْلِيَّةَ وَيُعِيْدَ الْاَرْوَاحَ اِلَيْهَا. অর্থাৎ বা'ছ বলা হয় আল্লাহ্ তা'আলা মৃত ব্যক্তিকে কবর হতে তাদের মূল আকৃতি তথা তৎঅঙ্গ প্রত্যঙ্গসহ উত্থান করা ও তাদের মাঝে পুনরায় আত্মা প্রদান করাকে। পুনরুত্থানের সময় হলো কিয়ামতের দিন। অর্থাৎ পুনরুত্থান করেই কিয়ামত দিবস আরম্ভ হয়ে যাবে।

পুনরুত্থান অস্বীকারকারীর হুকুম :

আল্লামা লোকমান নাসাফী (র.) বলেন- اَلْبَعْثُ حَقٌّ যে ব্যক্তি তা অস্বীকার করবে সে কাফের এবং তাকে কাফের বলা যাবে।

পুনরুত্থান-এর সত্যতা :

পুনরুত্থান সম্পর্কে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত বলে এটি চির সত্য। এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

ক. এর স্বপক্ষে নকলী দলিল :

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন- اِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتٰى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوْا وَاٰثَارَهُمْ অর্থাৎ আমিই মৃতদেরকে জীবিত করি এবং তাদের কর্ম ও কীর্তিসমূহ লিখি। -[সূরা ইয়াসীন]

* مَنْ يُّحْيِ الْعِظَامَ وَهِىَ رَمِيْمٌ قُلْ يُحْيِيْهَا الَّذِىْ اَنْشَاَهَا اَوَّلَ مَرَّةٍ.

অর্থাৎ কে সৃষ্টি করবে অস্থিসমূহকে যখন সেগুলো পঁচে গলে যাবে? বলুন- যিনি প্রথমবার সেগুলোকে সৃষ্টি করেছেন তিনিই জীবিত করবেন। -[সূরা ইয়াসীন]

* قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ.

খ. যৌক্তিক দলিল :

১. আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিজীবকে মডেল তথা পূর্বদৃষ্ট আকৃতি ছাড়াই প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন। তাহলে পুনরায় হুবহু সৃষ্টি করা তাঁর জন্য অসম্ভবের কিছু নেই।

২. মালিক তার কর্মচারী হতে কর্মের শেষ হিসাব নিয়ে থাকেন। তদ্রূপ আল্লাহ তা'আলা হচ্ছেন মানুষের মালিক। তিনি মানুষের হেদায়েতের জন্য যুগে যুগে নবী রাসূল প্রেরণ করেছেন। অতএব তিনি তাঁর অধীনস্থ কর্মচারীদের হিসাব নিবেন। আর হিসাব হবে মৃত্যুর পর। আর হিসাব নেওয়ার জন্য পুনর্জাগরণ জরুরি।

৩. আল্লাহ তা'আলা হলেন অসীম ক্ষমতার অধিকারী। তিনি কোনো কিছু সৃষ্টি করতে চাইলে كُنْ বললেই তা হয়ে যায়। আর সৃষ্টির পুনঃজাগরণ হলো সসীম। সুতরাং অসীম শক্তিশালী সত্তার জন্য সসীম বস্তু সৃষ্টি করা অসম্ভবের কিছু নয়।

৪. সকল ধর্ম ও মতাদর্শের প্রত্যেক ব্যক্তি-ই পার্থিব কর্মের হিসাব নিকাশে বিশ্বাসী। আর হিসাব নিকাশের জন্য পুনর্জন্ম অত্যাবশ্যক।

দার্শনিকদের ভ্রান্ত মতবাদ

দার্শনিকদের মতে- إِعَادَةُ الْمَعْدُوْمِ بِعَيْنِهِ مُمْتَنِعٌ অর্থাৎ অনস্তিত্ব বস্তুর হুবহু পুনরুত্থান সম্ভব নয়।

তাদের দলিল :

১. পুনর্জন্ম হিন্দু ধর্মের মতবাদ। ইসলাম ধর্মে এরূপ আকিদা বিশ্বাসযোগ্য নয়।

২. অস্তিত্বহীন বস্তুর পুনর্জন্মের কল্পনাই করা যায় না। মানুষ মরে গেলে পঁচে যায়। যার কোনো অস্তিত্ব থাকে না। অতএব এর পুনর্জন্ম অসম্ভব।

৩. যদি কোনো ব্যক্তিকে বাঘে খেয়ে ফেলে তবে তার অস্তিত্ব কীভাবে সম্ভব? অতএব পুনর্জন্ম অবিশ্বাস্য।

তাদের জবাব :

১. তাদের প্রথম দলিলের জবাবে আমরা বলবো, হিন্দু ধর্মে পুনর্জন্ম কোনো ব্যক্তির মৃত্যুর পর সে আবার এ জড়জগতেই মানুষ কিংবা জীবজন্তুর বেশে পৃথিবীতে পুনরায় আগমন করবে। আর ইসলামের দৃষ্টিতে পরকালে ব্যক্তি হুবহু পার্থিব আকৃতি নিয়ে পুনর্জন্ম লাভ করবে। অতএব হিন্দু ধর্মের বিশ্বাস ও ইসলাম ধর্মের বিশ্বাসের মাঝে পার্থক্য হয়ে গেল।

২. তাদের দ্বিতীয় দলিলের প্রতিউত্তরে বলা হয়, অস্তিত্বহীন বস্তুকে অস্তিত্ব দান করা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার পক্ষেই সম্ভব। কেননা তিনি বলেছেন- كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيْدُهُ

৩. তৃতীয় দলিলের জবাবে বলা যায়, মূল অংশে পুনর্জীবন দেওয়া হবে, ভক্ষিত অংশে নয়। কারণ ভক্ষিত অংশ হলো অতিরিক্ত।

পুনরুত্থান সম্পর্কে বুদ্ধিজীবীদের মতামত :

বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায়ের কতক বলেন, পুনরুত্থান সত্য তবে ধ্বংসপ্রাপ্ত শরীরে তা ঘটবে না; বরং নতুন শরীরে পূর্বের রূহ দেওয়া হবে।

বুদ্ধিজীবীদের পক্ষের দলিল : তারা বলেন, হাদীসে উল্লেখ আছে জান্নাতীদের শরীর পশমহীন হবে এবং জাহান্নামীর দাঁতও ওহুদ পর্বতের ন্যায় হবে। যা দ্বারা বুঝা যায় পার্থিব দেহ ও পরকালীন দেহ ভিন্ন।

দলিলের জবাব :

এর ব্যাখ্যায় আহলে হক আলেমগণ বলেন, পরকালে ব্যক্তির শরীরে গুণগত পরিবর্তন হবে। কিন্তু মূল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঠিকই থাকবে।

قَوْلُهُ وَنَحْنُ مُؤْمِنُوْنَ بِذٰلِكَ كُلِّهِ : অর্থাৎ কেননা উপরিউক্ত ঈমানের আরকানের উপর ঈমান আনার জন্য আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন–

قُوْلُوْٓا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَآ اُنْزِلَ اِلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَا اُوْتِيَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَمَا اُوْتِيَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ.

অর্থাৎ তোমরা বল, আমরা আল্লাহ তা'আলার প্রতি এবং যা কিছু আমাদের প্রতি ও ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব, আসবাত, মূসা, ঈসা ও নবীদের প্রতি অবতারিত হয়েছে সেগুলোর প্রতি ঈমান আনলাম এবং তাঁদের কারো মাঝে আমরা পার্থক্য করি না। আর আমরা সকলেই তাঁর জন্য মুসলমান (অনুগত)। –[সূরা বাকারা]

قَوْلُهُ وَلَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ الخ : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে যত নবী রাসূল প্রেরিত হয়েছেন সকলের প্রতি আমরা বিশ্বাস রাখি এবং তাদের কারো মাঝে আমরা পার্থক্য করি না। সবাইকেই আমরা রাসূল হিসেবে মানি। তাঁরা আল্লাহর পক্ষ হতে যা নিয়ে এসেছেন তাও মানি। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন– لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ অর্থাৎ তাদের কারো মাঝে আমরা তারতম্য করি না। –[সূরা বাকারা]

একাদশ পাঠ

কোনো মু'মিন চিরস্থায়ী জাহান্নামী নয়

وَاَهْلُ الْكَبَائِرِ مِنْ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ فِى النَّارِ لَا يَخْلُدُوْنَ اِذَا مَاتُوا وَهُمْ مُوَحِّدُوْنَ وَاِنْ لَمْ يَكُوْنُوا تَائِبِيْنَ بَعْدَ اَنْ لَقُوا اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ عَارِفِيْنَ وَهُمْ فِيْ مَشِيَّتِهِ وَحُكْمِهِ اِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ وَعَفَا عَنْهُمْ بِفَضْلِهِ كَمَا ذَكَرَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيْ كِتَابِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَاِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ فِى النَّارِ بِقَدْرِ جِنَايَتِهِمْ بِعَدْلِهِ ثُمَّ يُخْرِجُهُمْ مِنْهَا بِرَحْمَتِهِ وَشَفَاعَةِ الشَّافِعِيْنَ مِنْ اَهْلِ طَاعَتِهِ ثُمَّ يَبْعَثُهُمْ اِلٰى جَنَّتِهِ.

অনুবাদ : আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর উম্মতের মধ্যে যারা কবীরা গুনাহ করবে তারা চিরকাল জাহান্নামে থাকবে না। যদি তারা একত্ববাদী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। আর যদি তারা আল্লাহ তা'আলার পরিচয় লাভ করা সত্ত্বেও তওবা না করে থাকে, তাহলে কবীরা গুনাহের পাপীরা আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার আওতাধীন। আল্লাহ তা'আলা চাইলে নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা তাঁর গ্রন্থে বলেছেন "তিনি কুফর শিরক অপরাধী ব্যতীত যাকে চান ক্ষমা করে দেন"। আর তিনি চাইলে ন্যায়বিচারের কারণে তাঁর অপরাধ অনুযায়ী শাস্তি দিতে পারেন। অতঃপর নিজ রহমত ও নেক বান্দাদের শাফায়াতক্রমে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে পাঠিয়ে দিবেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَاَهْلُ الْكَبَائِرِ الخ : অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর উম্মত যারা কবীরা গুনাহ করেছে তারা তাদের কবীরা গুনাহের পাপ পরিমাণ শাস্তি ভোগ করবে। এ ক্ষেত্রে শর্ত হলো সে মৃত্যুর সময় ঈমান অবস্থায় থাকতে হবে। এখানে প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে যে-

প্রশ্ন : আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে সকল নবীর উম্মতকে ক্ষমা করে দিতে পারেন। তা সত্ত্বেও গ্রন্থকার (র.) বিশেষ করে আমাদের নবী ﷺ-এর উম্মতের কথা উল্লেখ করা হলো কেন?

উত্তর : এখানে উম্মতে মুহাম্মদী-এর উম্মতের কথা বিশেষ করে উল্লেখ করে অন্যান্য নবীগণের উম্মতদেরকে বাদ দেওয়া উদ্দেশ্য নয়। এতে সব নবীর উম্মতই শামিল রয়েছে। আর বিশেষ করে উম্মতে মুহাম্মদী ﷺ -এর উল্লেখ করার কারণ হলো তারা সকল উম্মতদের সর্বশেষ তাই তাদের কথা বিশেষভাবে করে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে কোনো প্রশ্ন আর অবশিষ্ট রইল না।

কবীরা গুনাহ পরিচিতি :

আভিধানিক অর্থ : اَلْكَبِيْرَةُ শব্দটি فَعِيْلَةٌ -এর ওজনে كَبَائِرُ-এর একবচন। অর্থ হলো বড়, বৃহৎ, বিরাট, বিশাল, মহান।

পারিভাষিক সংজ্ঞা :

১. কাজী বায়যাবী (র.) ভাষ্য মতে, কবীরা ঐসব গুনাহকে বলা হয় যেগুলোর ব্যাপারে শরিয়তে নির্দিষ্ট শাস্তির বিধান রয়েছে। যেমন– হত্যার বদলে হত্যা হদ, দিয়ত ইত্যাদি।

২. হযরত ইবনে আব্বাস ও হাসান বসরী (র.) কবীরা গুনাহের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, কবীরা গুনাহ ঐসব গুনাহকে বলে, যার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা অগ্নি-অভিশাপ দ্বারা বান্দাকে ভীতি প্রদর্শন করেছেন।

৩. কতক আলেম বলেন, কবীরা গুনাহ বলা হয় যেসব পাপ নেক আমল তথা নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত ইত্যাদির বরকতে মাফ হয় না। অবশ্য গুনাহে ছগীরা এগুলোর বরকতে মাফ হয়ে যায়।

৪. ইমাম গাজালী (র.) বলেন, যেসব গুনাহ বান্দা ভয়হীনভাবে করে থাকে, তাকেই কবীরাগুনাহ বলা হয়।

৫. কেউ কেউ বলেন, কবীরা গুনাহ বলা হয় ঐসব পাপকে যার ক্ষেত্রে عَظِيْمٌ কিংবা كَبِيْرٌ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। অথবা বান্দা যেসব গুনাহের মাধ্যমে ধর্মের ইজ্জত হরণ করে ফেলে।

কবীরা গুনাহের হুকুম :

* কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি তওবা ছাড়া মারা গেলে জাহান্নাম তার জন্য অবধারিত। তবে গুনাহ পরিমাণ শাস্তি ভোগ করে জান্নাতে যাবে।
* কবীরা গুনাহ তওবা ছাড়া মাফ হয় না।
* কবীরা গুনাহকে হালাল মনে করে তাতে লিপ্ত হলে ঈমান নষ্ট হয়ে যায়।

কবীরা গুনাহের সংখ্যা :

হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর মতে, কবীরা গুনাহ নয়টি। কেউ কেউ বলেন সাতটি, কেউ বলেন সতেরটি ইত্যাদি ইত্যাদি।

১. আল্লাহ তা'আলার সাথে শরিক করা [অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার সাথে অন্য কাউকে প্রভু মনে করা বা তাঁর সমকক্ষ মনে করা। ২. অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা। ৩. ব্যভিচার করা। ৪. নির্দোষ নারীকে ব্যভিচারের অপবাদ দেওয়া। ৫. জিহাদ থেকে পলায়ন করা। ৬. পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া। ৭. হেরেম শরীফে ফেৎনা সৃষ্টি করা। ৮. এতিমের ধন আত্মসাৎ করা। ৯. জাদু করা।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর মতে, উপরিউক্ত নয়টিসহ আরো তিনটি কবীরা গুনা রয়েছে। যেমন– ১. মদ পান করা। ২. সুদ খাওয়া। ৩. চুরি করা। অবশ্য এছাড়াও আরো কবীরা গুনাহ রয়েছে। তার মধ্য এতে এগুলো শীর্ষে। তাই এগুলো উল্লেখ করা হয়েছে।

قَوْلُهُ لَا يَخْلُدُوْنَ الخ : খারেজী ও মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের মতে কবীরা গুনাহ করার কারণে মু'মিন ঈমান হতে বের হয়ে যায় এবং তারা চিরকাল জাহান্নামে থাকবে। কোনো দিন তারা জান্নাতে যাবে না এবং ক্ষমাও পাবে না। তাদের এ কথার জবাব হিসেবে গ্রন্থকার (র.) বলেন, আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদে বিশ্বাসী কোনো কবীরা গুনাহগার বান্দা চিরকাল জাহান্নামে থাকবে না। যদিও সে তওবা ছাড়াই মৃত্যুবরণ করে। আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে তাকে ক্ষমা করে দিবেন। যেমন– তিনি বলেন– إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তাঁর সাথে শিরক করাকে ক্ষমা করবেন না। আর এছাড়া অন্য যা কিছু আছে যাকে ইচ্ছা তাকে ক্ষমা করে দিবেন। –[সূরা নিসা]

قَوْلُهُ وَهُمْ فِيْ مَشِيَّتِهٖ الخ : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দিবেন নিজ দয়া ও অনুগ্রহ দ্বারা। আর এটা তার উপর ওয়াজিব নয় যে, তিনি ক্ষমা করতেই হবে। আবার যাকে ইচ্ছা তার গুনাহ সমপরিমাণ শাস্তিও দিতে পারেন। এটাই হলো প্রকৃত ঈমানদারদের বিশ্বাস। কিন্তু খারেজী ও মু'তাযিলা সম্প্রদায় বলে, আল্লাহর উপর ওয়াজিব হলো নেক বান্দাদেরকে জান্নাত দেওয়া। এ বক্তব্য দ্বারা তাদের ভ্রান্ত মতবাদ প্রকাশ পেল।

সকল মু'মিনের ইকতিদা বৈধ

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ جَلَّ جَلَالُهٗ مَوْلٰى لِاَهْلِ مَعْرِفَتِهٖ وَلَمْ يَجْعَلْهُمْ فِى الدَّارَيْنِ كَاَهْلِ نُكْرَتِهِ الَّذِيْنَ خَابُوْا مِنْ هِدَايَتِهٖ وَلَمْ يَنَالُوْا مِنْ وِلَايَتِهٖ اَللّٰهُمَّ يَا وَلِىَّ الْاِسْلَامِ وَاَهْلِهٖ مَسِّكْنَا بِالْاِسْلَامِ حَتّٰى نَلْقَاكَ بِهٖ وَنَرَى الصَّلٰوةَ خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ مِنْ اَهْلِ الْقِبْلَةِ عَلٰى مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ.

অনুবাদ : এর কারণ হলো, আল্লাহ তা'আলা তাঁর ঈমানদার বান্দাদের অভিভাবকত্ব বিশেষভাবে গ্রহণ করেছেন। তিনি তাদেরকে ইহকাল ও পরকালে ঐ কাফেরদের সমতুল্য করেননি। যারা তাঁর হেদায়েত তথা পথ প্রদর্শন থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে এবং তাঁর অভিভাবকত্ব ও বন্ধুত্ব লাভ করতে পারেনি। হে আল্লাহ! হে ইসলাম ও মুসলমানদের অভিভাবক! তোমার সাথে সাক্ষাৎ করা পর্যন্ত আমাদেরকে এই ইসলামের উপর অনড় ও অবিচল রেখ। আমরা মুসলমানদের মধ্যে যে কোনো সৎ ও অসৎ ব্যক্তির ইকতিদা করাকে জায়েজ মনে করি। মুসলমানদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করবে তাদের জানাজার নামাজ পড়াকে জায়েজ মনে করি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ جَلَّ جَلَالُهٗ مَوْلٰى الخ : আল্লাহ তা'আলা নিজ অনুগ্রহে গুনাহগার বান্দাদেরকে তাঁর আনুগত্যশীল বান্দাদের শাফায়াতের মাধ্যমে ক্ষমা করবেন এবং জান্নাত দান করবেন। এর কারণ হলো তিনি মু'মিনদের অভিভাবক ও বন্ধু। কিন্তু কাফের কখনো জাহান্নাম হতে মুক্তি পাবে না বা পাওয়ার যোগ্যতাও রাখে না। কারণ আল্লাহ তা'আলা তাদের বন্ধু বা অভিভাবক নন। যেমন আল্লাহ তা'আলা এ সম্পর্কে কুরআনে কারীমে উল্লেখ করে বলেন- ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ مَوْلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاَنَّ الْكٰفِرِيْنَ لَا مَوْلٰى لَهُمْ অর্থাৎ এটা এ কারণে যে, আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারদের অভিভাবক, আর কাফেরদের কোনো অভিভাবক নেই। -[সূরা মুহাম্মদ]

قَوْلُهٗ اَللّٰهُمَّ يَاوَلِىَّ الْاِسْلَامِ الخ : গ্রন্থকার (র.) এতক্ষণ পর্যন্ত পাপী মু'মিনদের ক্ষমা ও কাফেরদের ক্ষমা না হওয়ার কথা বর্ণনা করেছেন। এখন নিজ ও সকল মুসলমানদের জন্য দোয়া করে বলেন, হে আল্লাহ! হে ইসলামের অভিভাবক! তুমি আমাদের সকলকে ইসলামের উপর অটল রেখো। আর এই দোয়াই ছিল হযরত নবী করীম ﷺ -এর দোয়া। কারণ হেদায়েত তথা ইসলামের উপর অটল থাকা এবং এ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা জীবনের সবচেয়ে বড় সম্পদ বা নিয়ামত। এর চেয়ে বড় সম্পদ আর কিছুই নেই। তাই গ্রন্থকার (র.) এই দোয়া করেছেন। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকেও তাঁর দোয়ার আওতাভুক্ত করুক!

قَوْلُهٗ حَتّٰى نَلْقَاكَ بِهٖ الخ : অর্থাৎ ইসলামের উপর আমাদের অটল রেখো তোমার সাক্ষাৎ পাওয়া পর্যন্ত। এরূপই দোয়া করেছেন হযরত ইউসুফ (আ.)। যেমন আল্লাহ তা'আলা

أَنْتَ وَلِيِّ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَّاَلْحِقْنِي بِالصّٰلِحِيْنَ - বলেন- অর্থাৎ তুমিই আমার অভিভাবক দুনিয়া ও আখেরাতে। আমাকে মৃত্যু দান কর। মুসলমান অবস্থায় ও সৎকর্মশীলদের সাথে আমাকে মিলিয়ে দাও। -[সূরা ইউসুফ]

ফেরাউন কবলিত মু'মিনরা দোয়া করেছিল- رَبَّنَا اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّتَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ অর্থাৎ হে আমাদের প্রভু তুমি আমাদের উপর ধৈর্য বিস্তৃত করে দাও এবং আমাদেরকে মুসলমান অবস্থায় মৃত্যু দান কর। -[সূরা আ'রাফ]

অতএব আয়াতদ্বয় প্রমাণ দিচ্ছে যে, ঈমান অবস্থায় মৃত্যু কামনা করা বৈধ। সুতরাং গ্রন্থকার (র.) ভুল করেননি ঈমান অবস্থায় মৃত্যু কামনা করার কারণে।

قَوْلُهُ وَنَرَى الصَّلٰوةَ الخ : যদি কোনো ইমাম পাপী হয়, কিংবা ফাজের হয় তবে তার পেছনে নামাজ পড়া জায়েজ হবে কি-না? এর জবাবে গ্রন্থকার (র.) বলেন, যদি মু'মিন ব্যক্তি পাপী হয়, তাহলে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আকিদা মতে, তার পেছনে নামাজ আদায় করা জায়েজ। [তবে উক্ত ইমাম যদি প্রকাশ্যে কবীরা গুনাহ্ করে যেমন দাঁড়ি এক মুষ্টির ভিতরে কাটা ইত্যাদি এবং সে ব্যতীত অন্য কোনো যোগ্য ইমাম থাকে তবে তার পেছনে ইকতিদা জায়েজ নেই। সেটার কথা ভিন্ন] কিন্তু এতে আকিদা বর্ণনা করতে গিয়ে গ্রন্থকার (র.) বলেন, তার পেছনে নামাজ জায়েজ।

দলিল :

* আল্লাহ্ তা'আলা বলেন- وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ অর্থাৎ তোমরা রুকূ'কারীদের সাথে রুকূ' কর। -[সূরা বাকারা]

  উপরিউক্ত আয়াতে اَلرُّكُوْعُ শব্দ দ্বারা যদি নামাজ উদ্দেশ্য হয়, তাহলে এতে সৎ মু'মিন বা গুনাহগার মু'মিনের কোনো পার্থক্য নেই। সুতরাং আকিদাগতভাবে গুনাহগার বান্দা তথা ফাসেক মু'মিনের ইকতিদা জায়েজ।

* হযরত রাসূল ﷺ বলেন- صَلُّوْا خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَّفَاجِرٍ অর্থাৎ তোমরা প্রত্যেক সৎ ও ফাজের মু'মিনের পিছনে নামাজ আদায় কর।

* তাছাড়া সাহাবায়ে কেরাম (রা.) ফাজের তথা পাপিষ্ঠ মু'মিনের পেছনে নামাজ পড়েছেন। কিন্তু পরে তাঁরা উক্ত নামাজ পুনরায় আদায় করেননি। যেমন বুখারী শরীফে বর্ণিত রয়েছে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রা.) হাজ্জাজ বিন ইউসুফ -এর পেছনে নামাজ আদায় করেছেন। অথচ সে ছিল বড় জালেম ও ফাসেক বাদশাহ্।

* এমন কি হযরত আনাস ও ইবনে মাসউদ (রা.) ওয়ালীদ ইবনে আকাবা ইবনে মুঈত এর পেছনে নামাজ পড়েছেন। এরপর তারা নামাজ পুনরায় আদায় করেননি।

* হযরত রাসূল ﷺ বলেন- يُصَلُّوْنَ لَكُمْ مَا اَصَابُوْا فَلَكُمْ وَلَهُمْ وَاِنْ اَخْطَأُوْا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, ফাসেক এর পেছনে ইকতেদা সহীহ্।

قَوْلُهُ وَعَلٰى مَنْ مَاتَ الخ : ফাসেক মু'মিন যদি মৃত্যুবরণ করে তাহলে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আকিদা মতে তার জানাজা পড়া জায়েজ।

কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ অর্থাৎ আর তাদের মধ্য হতে কারো মৃত্যু হলে তার উপর কখনো নামাজ পড়ো না এবং তার কবরে দাঁড়িও না। তারা তো আল্লাহ তা'আলার প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে, রাসূলের প্রতিও; বস্তুত তারা নাফরমান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে। -[সূরা তাওবা]

উপরিউক্ত আয়াতে কাফেরের জানাজার নামাজ হতে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। আর যখন কোনো বস্তু হতে বারণ করা হয় তখন তার বিপরীত বস্তু বৈধ থাকে। সুতরাং কাফেরের নামাজ পড়া নিষেধ হলে ফাসেক নিষেধ নয়। অতএব ফাসেকের জানাজার নামাজ পড়া জায়েজ হবে।

তাছাড়া হযরত নবী করীম ﷺ বলেছেন, এক মুসলমানের উপর অপর মুসলমানের ৫টি হক বা পাওনা রয়েছে। তার মধ্য হতে একটি হলো তার জানাজায় শরিক হওয়া। এ ক্ষেত্রে রাসূল ﷺ উক্ত মু'মিন ফাসেক হওয়া এবং না হওয়ার কথা বলেননি। যদি ফাসেকের নামাজ নাজায়েজ হতো তবে তিনি স্পষ্টভাবে তা বলে দিতেন। সুতরাং ফাসেকের জানাজা পড়া জায়েজ।

তবে ইসলামি আইনজ্ঞদের অভিমত হলো, মু'মিনগণ যদি ডাকাত, ইসলামি রাষ্ট্রদ্রোহী কিংবা আত্মহত্যাকারী, আপন পিতা-মাতা হত্যাকারী হয় তাহলে তার জানাজা পড়া নিষেধ। যাতে তাদের থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে এসব অপরাধ থেকে অন্যান্য মুসলমান বিরত থাকে।

কাউকে নিঃসন্দেহে জান্নাতী বা জাহান্নামী বলা অবৈধ

وَلَا نُنَزِّلُ اَحَدًا مِنْهُمْ جَنَّةً وَلَا نَارًا وَلَا نَشْهَدُ عَلَيْهِمْ بِكُفْرٍ وَلَا بِشِرْكٍ وَلَا بِنِفَاقٍ مَالَمْ يَظْهَرْ مِنْهُمْ شَيْءٌ مِنْ ذٰلِكَ وَنَذَرُ سَرَائِرَهُمْ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى.

অনুবাদ : আমরা কোনো কিবলাপন্থি মু'মিনকে জান্নাতে বা জাহান্নামে অবতরণ করি না এবং তাদের কাউকে কুফর, শিরক এবং নিফাকের সাক্ষ্য প্রদান করি না। যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের থেকে এ ধরনের কোনো কিছু প্রকাশ না পাবে। আর আমরা তাদের আভ্যন্তরীণ বিষয়াদি আল্লাহর উপর ন্যস্ত করব।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَلَا نُنَزِّلُ اَحَدًا الخ : অর্থাৎ কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে "সে জান্নাতী বা জাহান্নামী" অকাট্যভাবে একথা আমরা বলব না। কারণ হতে পারে তার বাহ্যিক আমল, চরিত্র দেখে বুঝা যাবে সে জান্নাতী হবে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তার উপর অসন্তুষ্ট। অথবা বাহ্যিকভাবে দেখা যায়, সে খারাপ কাজ করছে কিংবা অচরিত্রবান, যার কারণে তাকে জাহান্নামী বলা যায়। কিন্তু আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট। তাই কাউকে অকাট্যভাবে জান্নাতী বা জাহান্নামী বলা আদৌ ঠিক নয়। কারণ রাসূল ﷺ বলেছেন- اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالْخَوَاتِمِ অর্থাৎ আমল শেষ পরিণামের উপর নির্ভরশীল।

অর্থাৎ যদি সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের সময় ঈমান অবস্থায় থাকে তবে সে জান্নাতী আর যদি ঈমান অবস্থায় না থাকে তাহলে জাহান্নামী। আর আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ একথা জানেনা যে, সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের সময় ঈমান অবস্থায় ছিল কিনা? তাই কাউকে অকাট্যভাবে জান্নাতী বা জাহান্নামী বলা যাবে না।

কোনো ব্যক্তিকে জান্নাতী হওয়ার ব্যাপারে সালফ (পূর্বপুরুষ)-এর পক্ষ থেকে তিন ধরনের কথা পাওয়া যায়; যথা- ১. একমাত্র নবী রাসূলগণ ছাড়া অন্য কারো ব্যাপারে জান্নাতী হওয়ার সাক্ষ্য না দেওয়া। এ কথা মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়া ও আওজায়ী থেকে বর্ণিত। ২. ঐ সকল মু'মিন যাদের ব্যাপারে নস সাব্যস্ত হয়েছে। এটা হলো, অধিকাংশ আলেম ও মুহাদ্দিসের ভাষ্য। ৩. যাদের জন্য নস সাব্যস্ত তাদের জন্য। আর যাদের জান্নাতী হওয়ার ব্যাপারে মু'মিনগণ সাক্ষ্য প্রদান করেছে। যেমন : আশারায়ে মুবাশশারাহ এবং তাঁর সকল সাহাবীর ক্ষেত্রে ভিন্ন কথা। কারণ তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- وَكُلًّا وَعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى

قَوْلُهٗ وَلَا نَشْهَدُ عَلَيْهِمْ : কোনো মুসলমান অপর কোনো মুসলমানকে কাফের, মুশরিক বা মুনাফিক বলা জায়েজ নয়। হ্যাঁ তার থেকে যদি এমন কোনো আচরণ, কথা বা কাজ প্রকাশ পায়, যা তাকে কাফের, মুনাফিক, মুশরিক বানিয়ে দেয়, তবে তাকে কাফের, মুনাফিক ও মুশরিক বলতে পারবে। কারণ আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ﷺ এসব থেকে বিরত থাকতে আদেশ করেছেন।

* যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন– وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلًا. অর্থাৎ যে সম্পর্কে তোমার জ্ঞান নেই তুমি তার পেছনে পড়ো না। কারণ কর্ণ, চক্ষু ও অন্তর প্রত্যেকটিই জিজ্ঞাসিত হবে। –[সূরা বনী ইসরাঈল]
* অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন– يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ তোমাদের কেউ যেন অপর কাউকে উপহাস না করে। হতে পারে সে উপহাসকারী হতে উত্তম। –[সূরা হুজুরাত]
* অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন– اِجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ অর্থাৎ তোমরা অধিক পরিমাণে ধারণা হতে বিরত থাক। –[সূরা হুজুরাত]
* হযরত রাসূল ﷺ বলেন– اَيُّمَا رَجُلٍ قَالَ لِاَخِيْهِ كَافِرٌ فَقَدْ بَاءَ بِهَا اَحَدُهُمَا অর্থাৎ যে ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইকে কাফের বলবে, তাহলে উভয়ের যে কোনো একজন কুফরি নিয়ে ফিরবে। –[বুখারী ও মুসলিম]

অর্থাৎ যাকে কাফের বলেছে সে যদি তার যোগ্য হয় তাহলে তো তার কথা ঠিকই। আর যদি উক্ত ব্যক্তি কাফেরের যোগ্য না হয়, তাহলে যে অন্যকে কাফের বলল, সে কাফের হয়ে যাবে। মোটকথা কাফের বলার কারণে যে কোনো একজন কাফের হবেই।

অতএব প্রত্যেক মুসলমানের জন্য উচিত হলো, কাউকে গালমন্দ বা কাফের, মুনাফিক বা মুশরিক বলতে খুব চিন্তা ভাবনা করে বলা। রাগ বা হিংসাবশত অথবা অন্য কোনো কারণে এভাবে গালমন্দ করা একেবারেই অনুচিত। কিন্তু দেখা যায় বর্তমান রেজভী সম্প্রদায় যে কোনো কথাবার্তায়, বক্তৃতায় ও লেখনিতে কাফের শব্দ ব্যবহার করছে, তাদের জন্য হুশিয়ার হওয়া দরকার উক্ত হাদীস ও আয়াতের প্রতি লক্ষ্য করে।

قَوْلُهُ وَنَذَرُ سَرَائِرَهُمْ الخ : অর্থাৎ যেহেতু কারো থেকে কুফরি ও শিরকের কোনো আলামত প্রকাশ ব্যতীত তাকে কাফের ও মুশরিক আখ্যা দেওয়া যাবে না, তাই যদি তার অন্তরে কোনো কুফরি, শিরক ও নিফাক থেকে থাকে তা একমাত্র আল্লাহই ভালো জানেন। সুতরাং তা আল্লাহর উপর ছেড়ে দিবে। এটাই হলো আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আকিদা। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেন– اِنَّهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলাই অন্তর্যামী।

মুসলিম হত্যা অবৈধ

وَلَا نَرَى السَّيْفَ عَلٰى اَحَدٍ مِّنْ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ اِلَّا مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ السَّيْفُ .

অনুবাদ : আমরা হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর উম্মতদের মধ্যে কারো উপর তরবারি উঠানোকে হালাল মনে করি না। হ্যাঁ, যার উপর তরবারি উঠানো ওয়াজিব তার উপর তরবারি উঠানোকে হালার মনে করি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَا نَرَى السَّيْفَ الخ : কোনো মু'মিন ব্যক্তি অপর কোনো মু'মিন ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে বা নির্বিচারে হত্যা করা হালাল নয়। আর এটাকে হালাল মনে করাও কুফরি। কারণ আল্লাহ তা'আলা এ সম্পর্কে বলেন- مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَّقْتُلَ مُؤْمِنًا اِلَّا خَطَأً অর্থাৎ কোনো মু'মিনের জন্য অপর মু'মিনকে হত্যা করা হালাল নয়, তবে ভুলবশত। -[সূরা নিসা]

* অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন- مَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهٗ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهٗ وَاَعَدَّ لَهٗ عَذَابًا عَظِيْمًا অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোনো মু'মিনকে ইচ্ছা করে হত্যা করবে, তার প্রতিদান হলো জাহান্নাম। যাতে সে চিরকাল থাকবে। আর আল্লাহ তা'আলা তার উপর রাগ করেছেন এবং তাকে অভিসম্পাত করেছেন এবং তার জন্য ভয়ঙ্কর শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন। -[সূরা নিসা]
* হযরত নবী করীম ﷺ বলেন- سِبَابُ الْمُؤْمِنِ فُسُوْقٌ وَقِتَالُهٗ كُفْرٌ অর্থাৎ মু'মিনকে গালমন্দ করা ফাসেকী এবং হত্যা করা কুফরি।
* অন্য হাদীসে বলেন- اِنَّ دِمَائَكُمْ وَاَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِيْ شَهْرِكُمْ هٰذَا অর্থাৎ নিশ্চয় তোমাদের একের জান মাল অপরের জন্য এভাবে হারাম, যেমন হারাম এ মাসের আজকের দিনে। -[বুখারী ও মুসলিম]

সুতরাং উপরিউক্ত আয়াত ও হাদীস প্রমাণ দিচ্ছে যে মুসলমানকে হত্যা করা হালাল নয়।

মুসলমান হত্যার বিধান :

১. যদি কোনো মু'মিন অপর মু'মিনকে ইচ্ছা করে এমন অস্ত্র দ্বারা হত্যা করে যা লৌহনির্মিত বা অঙ্গচ্ছেদের ব্যাপারে লৌহনির্মিত অস্ত্রের মতো। যেমন ধারালো বাঁশ, ধারালো পাথর ইত্যাদি তাহলে এই হত্যার কোনো কাফফারা নেই; বরং হত্যাকারী মনে প্রাণে আল্লাহ তা'আলার নিকট তওবা করবে।

২. যদি এক মুসলমান অপর মুসলমানকে ইচ্ছা ও ধারণার ভ্রমবশত হত্যা করে ফেলে। যেমন কোনো জন্তুকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়লো কিন্তু তা লক্ষচ্যুত হয়ে মানুষের গায়ে লেগে সে নিহত হলো তাহলে হত্যাকারী মু'মিন দাস মুক্ত করবে। তাতে সক্ষম না হলে ধারাবাহিক দু'মাস রোজা রাখবে। রোজা রাখতে সক্ষম না হলে সক্ষম হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তওবা করতে থাকবে। -[মা'আরিফুল কুরআন]

قَوْلُهُ اِلَّا مَنْ وَجَبَ الخ : কোনো মু'মিনকে হত্যা করা জায়েজ নেই। তবে শরিয়ত যদি কোনো ব্যক্তির উপর অস্ত্র ধারণ বা হত্যার নির্দেশ দিয়ে থাকে তবে তার উপর অস্ত্র ধারণ হালাল। এটাই আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আকিদা।

আর ঐ ধরনের হত্যার নির্দেশ শরিয়ত ঐ সময় দেয় যখন কোনো মু'মিন তিনটি কাজে লিপ্ত হবে। যথা– ১. বিবাহ সত্ত্বেও যদি কোনো ব্যক্তি ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। ২. ইসলাম গ্রহণের পর মুরতাদ হওয়া। ৩. অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা।

দলিল :

হযরত রাসূল ﷺ বলেছেন– لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَّا بِاِحْدٰى ثَلٰثٍ اَلنَّفْسُ بِالنَّفْسِ الثَّيِّبُ الزَّانِىْ التَّارِكُ لِدِيْنِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ. অর্থাৎ ঐ ব্যক্তিকে হত্যা করা হালাল নয় যে সাক্ষ্য প্রদান করে যে, আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কোনো প্রভু নেই এবং আমি আল্লাহ তা'আলার রাসূল। তবে তিনটি কাজ তার মধ্যে বিদ্যমান থাকলে তাকে হত্যা করা হালাল। কাজ তিনটি হলো– ১. শুদ্ধ বিবাহের পর ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া। ২. অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা। ৩. ইসলাম থেকে বের হয়ে মুসলমানদের জামাত ত্যাগ করলে।

তাছাড়া অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করলে হত্যাকারী মুসলমান হলেও তাকে হত্যা করা হালাল। যেমন– আল্লাহ তা'আলা বলেন– يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰى অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর নিহতদের বেলায় কেসাস নির্ধারণ করা হয়েছে। –[সূরা বাকারা]

উপরিউক্ত তিন প্রকার হত্যা ছাড়া অন্য কোনো প্রকার হত্যা শরিয়ত বৈধ করেনি।

ইসলামি নেতৃত্বের প্রতি বিদ্রোহ অবৈধ

وَنَرَى الْخُرُوْجَ عَلَى اَئِمَّتِنَا وَوُلَاةِ اُمُوْرِنَا وَاِنْ جَارُوْا وَلَا نَدْعُوْا عَلَيْهِمْ وَلَا نَنْزِعُ يَدًا مِنْ طَاعَتِهِمْ وَنَرَى طَاعَتَهُمْ مِنْ طَاعَةِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَرِيْضَةً مَا لَمْ يَأْمُرُوْا بِمَعْصِيَتِهِ وَنَدْعُوْا لَهُمْ بِالصَّلَاحِ وَالْمُعَافَاتِ.

অনুবাদ : আর আমরা আমাদের ইমাম ও শাসনকর্তাদের বিদ্রোহ করাকে বৈধ মনে করি না যদিও তারা অত্যাচার করে। আমরা তাদেরকে অভিশাপ দেই না এবং তাদের আনুগত্য পরিত্যাগ করি না। আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্যের কারণে আমরা তাদের আনুগত্যকে ফরজ মনে করি। যতক্ষণ পর্যন্ত তারা পাপকাজের আদেশ না করে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা তাদের জন্য সৎ এবং বিশুদ্ধতার দোয়া করি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَا نَرَى الْخُرُوْجَ الخ : অর্থাৎ যে রাষ্ট্র ইসলামি শরিয়াহ মোতাবেক পরিচালিত। সে রাষ্ট্রের পরিচালক তথা রাষ্ট্রপ্রধানের বিদ্রোহ করা আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত বৈধ মনে করে না। যদিও উক্ত রাষ্ট্রপ্রধান জুলুম অত্যাচার করে।

* এর কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে মহান আল্লাহ্ তা'আলা বলেন- يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ তা'আলার অনুসরণ কর এবং রাসূল ﷺ-এর অনুসরণ কর এবং তোমাদের মধ্য থেকে [কুরআন সুন্নাহ অনুসারী] শাসকের অনুসরণ কর। -[সূরা নিসা]
* তাছাড়া যদি কোনো রাষ্ট্রের মুসলমানগণ রাষ্ট্রপ্রধানকে মান্য না করে তাহলে সে দেশে সবচেয়ে বেশি দাঙ্গা হাঙ্গামা দেখা দিবে আর এ ধরনের ফেৎনা মারাত্মক। যে সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন- وَالْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ অর্থাৎ ফেৎনা হত্যার চেয়েও মারাত্মক। -[সূরা বাকারা] তবে হ্যাঁ যদি উক্ত রাষ্ট্রপ্রধান তার অধীনস্ত ব্যক্তিদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার নাফরমানি করতে বাধ্য করে বা আদেশ দেয় তাহলে তার বিদ্রোহ করা জায়েজ।
* যেমন রাসূল ﷺ বলেছেন- عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيْمَا اَحَبَّ وَكَرِهَ اِلَّا اَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَاِنْ اُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ অর্থাৎ মুসলমানদের উপর কর্তব্য হলো শরিয়ত সম্মত শাসকের পছন্দ ও অপছন্দ বিষয়ের ক্ষেত্রে তার কথা শুনা ও অনুসরণ করা। যতক্ষণ পর্যন্ত সে নাফরমানির আদেশ না দিবে। কিন্তু যদি কোনো পাপকাজের আদেশ করে তখন তার কথা শুনা ও আনুগত্য করা জরুরি নয়। -[বুখারী ও মুসলিম]
* অন্য হাদীসে রাসূল ﷺ আরো বলেন- لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِىْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার নাফরমানিতে কোনো মাখলুকের আনুগত্য হতে পারে না। মোটকথা কোনো মাখলুকের অনুসরণ করতে গিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা নাফরমানি করা যাবে না।

قَوْلُهُ وَاِنْ جَارُوْا : ইসলামি রাষ্ট্রের শাসনকর্তা যদি অত্যাচারও করে তারপরেও তার বিদ্রোহ করা জায়েজ নেই। কারণ তার বিদ্রোহ করা জুলুম নির্যাতন হতে মারাত্মক। কারণ যখন তার সাথে বিদ্রোহ করার কারণে সমাজে ফেৎনা-ফ্যাসাদ ও বিশৃঙ্খলা ভয়াবহভাবে দেখা দিবে, তখন দেশে অশান্তি বিরাজ করবে। সুতরাং ফেৎনা-ফ্যাসাদ নিরসনের জন্য বিদ্রোহ করার চেয়ে তার জুলুম নির্যাতন সহ্য করে ধৈর্যধারণ করবে। কারণ এতে শাসিত প্রজাদের গুনাহ মোচন হয়।

কেননা রাষ্ট্রের শাসককে আল্লাহ্ তা'আলা ঐ সময়ই অত্যাচারী করে দেয় যখন দেশে ও শাসিত লোকদের মাঝে গুনাহ ও অসৎ কার্যকলাপ সয়লাব হয়ে যায়। যেমন- وَكَذٰلِكَ نُوَلِّىْ بَعْضَ الظَّالِمِيْنَ بَعْضًا بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ অর্থাৎ এমনিভাবে আমি পাপীদেরকে একে অপরের শাসক হিসেবে চাপিয়ে দেব তাদের কৃতকর্মের কারণে। -[সূরা আন'আম]

অতএব বাদশাহের বিদ্রোহ না করে তার আনুগত্য করাই শ্রেয়।

قَوْلُهُ وَلَا نَدْعُوْ عَلَيْهِمْ : ইসলামি রাষ্ট্রের শাসক অত্যাচারী হওয়ার কারণে তাকে অভিসম্পাত করা ঠিক নয়; বরং নিজের আমল ইসলাহ্ করত আল্লাহ্ তা'আলার নিকট তওবা করে শাসকের জন্য নেক দোয়া করা। কেননা হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

اَنَا اللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اَنَا مَالِكُ الْمُلُوْكِ وَمَلِكُ الْقُلُوْبِ قُلُوْبُ الْمُلُوْكِ فِىْ يَدِىْ وَاِنَّ الْعِبَادَ اِذَا اَطَاعُوْانِىْ حَوَّلْتُ قُلُوْبَ مُلُوْكِهِمْ عَلَيْهِمْ بِالرَّحْمَةِ وَالرَّأْفَةِ وَاِنَّ الْعِبَادَ اِذَا عَصَوْنِىْ حَوَّلْتُ قُلُوْبَهُمْ بِالسَّخَطِ وَالنِّقْمَةِ فَسَامُوْهُمْ سُوْءَ الْعَذَابِ فَلَا تَشْغَلُوْا اَنْفُسَكُمْ بِالدُّعَاءِ عَلَى الْمُلُوْكِ وَلٰكِنِ اشْتَغِلُوْا اَنْفُسَكُمْ بِالذِّكْرِ وَالتَّضَرُّعِ كَىْ اَكْفِيَكُمْ.

অর্থাৎ আমিই আল্লাহ্! আমি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। আমি বাদশাদের মালিক ও অন্তরসমূহের মালিক। বাদশাদের অন্তরসমূহ আমার হাতে। বান্দারা যখন আমার অনুগত হয়, তখন নিশ্চয় আমি তাদের শাসকের অন্তর তাদের প্রতি নম্রতা ও শান্তির জন্য ফিরিয়ে দেই। আর যখন আবার বান্দারা নাফরমানিতে লিপ্ত হয় তখন আমি তাদের শাসকদের অন্তর তাদের প্রতি অসন্তুষ্টি ও ক্ষুব্ধতার মাধ্যমে পাল্টে দেই। অতঃপর শাসক তাদেরকে নির্মম নির্যাতন করতে থাকে। অতএব তোমরা তাদেরকে অভিশাপ দিতে নিমগ্ন হয়ো না; বরং তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার জিকির ও আহাজারিতে নিমগ্ন থাকো। তবেই আমি তোমাদের সমস্যার সমাধান করে দেব। -[মিশকাত]

এ সম্পর্কে হযরত আবূ জর (রা.) থেকে সহীহ্ মুসলিমে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন- اِنَّ خَلِيْلِىْ اَوْصَانِىْ اَنْ اَسْمَعَ وَاُطِيْعَ وَاِنْ كَانَ عَبْدًا حَبْشِيًّا مُجَدَّعَ الْاَطْرَافِ অর্থাৎ আমার বন্ধু আমাকে উপদেশ দেন যে, তোমার আমীরের হুকুম শোন, এবং মান। যদিও সে নাক, কান কাটা হাবশী গোলাম হয়।

উপরিউক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় অত্যাচারী বাদশাহের বিরুদ্ধে বদদোয়া না করে নিজে সংশোধন হয়ে এবং তওবা করে তাদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে তাদের ইসলাহ ও সংশোধনের দোয়া কর। এতে-ই সমস্যার সমাধান হবে। বদ দোয়ার মাধ্যমে সমাধান হবে না।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অনুসরণ

وَنَتَّبِعُ السُّنَّةَ وَالْجَمَاعَةَ وَنَجْتَنِبُ الشُّذُوْذَ وَالْخِلَافَ وَالْفُرْقَةَ.

অনুবাদ : আমরা সুন্নত ও জামাতের অনুসরণ করি। বিচ্ছিন্নতা, বিরোধ ও বিঘ্নতা সৃষ্টি করা থেকে বিরত থাকি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَنَتَّبِعُ السُّنَّةَ وَالْجَمَاعَةَ : অর্থাৎ আমরা সুন্নতে রাসূল ﷺ ও জামাতের অনুসরণ করি। সুন্নত হলো নবী করীম ﷺ -এর পথ, যা ওসওয়ায়ে হাসানা নামে খ্যাত।

জামাত : জামাত হলো হযরত রাসূল ﷺ -এর অনুগত ও ধর্মীয় জ্ঞানে জ্ঞানী সাহাবায়ে কেরাম (রা.) ও তাবেয়ীগণ। যেহেতু নবী করীম ﷺ -এর সুন্নত (তথা উত্তমাদর্শ) ও জামাত তথা সাহাবায়ে কেরাম তাবেঈন ও তাবেতাবেঈনের পথ অনুসরণে রয়েছে উভয় জাহানের শান্তি। তাই আমরা তাঁদের অনুসরণ করি। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেন- وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيْرًا. অর্থাৎ যে ব্যক্তি রাসূল ﷺ -এর বিরুদ্ধাচরণ করবে তার জন্য হেদায়েত প্রকাশিত হওয়ার পর এবং মু'মিনদের অনুসৃত পথ ব্যতীত অন্য পথের অনুসরণ করবে তাহলে তাকে আমি সে দিকেই ফিরিয়ে দেব যেদিকে সে ফিরেছে এবং তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাব। আর জাহান্নাম কতইনা নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল। -[সূরা নিসা]

এ সম্পর্কিত এক হাদীসে নবী ﷺ বলেছেন-

لَيَأْتِيَنَّ عَلٰى أُمَّتِيْ كَمَا أَتٰى عَلٰى بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ حَتّٰى إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتٰى أُمَّهُ عَلَانِيَةً لَكَانَ فِيْ أُمَّتِيْ مَنْ يَصْنَعُ ذٰلِكَ وَإِنَّ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ تَفَرَّقَتْ عَلٰى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً وَ سَتَفْتَرِقُ أُمَّتِيْ عَلٰى ثَلٰثٍ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً قَالُوْا مَنْ هِيَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِيْ.

অর্থাৎ নবী ইসরাঈলের যে দলাদলি তথা মত-বিমতের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছিল অবশ্যই তা আমার উম্মতের মধ্যে আসবে। যেরূপ একজুতো অপর জুতোর সমান হয়। এমনকি যদি তাদের মধ্যে এমন কোনো লোকের অস্তিত্ব থাকে যে তার মায়ের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছিল তাহলে অবশ্যই আমার উম্মতের মধ্যে এমন দুশ্চরিত্রের লোক জন্ম নেবে, যে এ ধরনের ব্যভিচারে লিপ্ত হবে। আর বনী ইসরাঈলের লোক ৭২ দলে বিভক্ত হয়েছিল। অনুরূপ আমার উম্মত অতিসত্তর ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। এদের সকলেই জাহান্নামে যাবে, একটি দল ব্যতীত। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে দলটি কারা? তিনি উত্তরে বললেন, যারা আমি এবং আমার সাহাবাদের পথ অনুযায়ী চলবে। -[তিরমিযী]

উপরিউক্ত হাদীসে বর্ণিত مَا أَنَا عَلَيْهِ দ্বারা রাসূল ﷺ -এর সুন্নাহ বুঝিয়েছেন এবং أَصْحَابِيْ দ্বারা সাহাবাগণের জামাত বুঝানো হয়েছে। হয়তোবা সুন্নহ ও সাহাবাদের রীতির অনুসারীদেরকে এর প্রতি লক্ষ্য করে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত নামে নামকরণ করা হয়েছে।

উপরিউক্ত আয়াত ও হাদীস এ কথাই প্রমাণ করে যে, মুহাম্মদ ﷺ তাঁর সাহাবাদের পথ অনুযায়ী চললেই দুনিয়া ও পরকালে মুক্তি পাওয়া যাবে। এর বিপরীত কোনো পথ ও মতে শান্তি নেই। তাই যে ব্যক্তি তাঁদের পথ মেনে না চলবে কিংবা এটাকে ভ্রুক্ষেপ না করবে সে অবশ্যই বিপথগামী হয়ে যাবে। এতে কোনো সন্দেহ নেই।

এ কারণে হযরত ইবনে মাসঊদ (রা.) বলেছেন–

مَنْ كَانَ مُسْتَنًّا فَلْيَسْتَنَّ بِمَنْ قَدْ مَاتَ فَاِنَّ الْحَىَّ لَا تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ اُولٰئِكَ اَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ كَانُوْا اَفْضَلَ هٰذِهِ الْاُمَّةِ اَبَرُّهَا قُلُوْبًا وَاَعْمَقُهَا عِلْمًا وَاَقَلُّهَا تَكَلُّفًا وَاخْتَارَهُمُ اللّٰهُ لِصُحْبَةِ نَبِيِّهٖ وَلِاِقَامَةِ دِيْنِهٖ فَاعْرِفُوْا لَهُمْ فَضْلَهُمْ وَاتَّبِعُوْهُمْ عَلٰى اٰثْرِهِمْ وَتَمَسَّكُوْا بِمَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ اَخْلَاقِهِمْ وَسِيَرِهِمْ فَاِنَّهُمْ كَانُوْا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيْمِ.

অর্থাৎ যদি কোনো ব্যক্তি কারো পথ অনুসরণ করতে চায় তাহলে সে যেন ঐ ব্যক্তির পথ অনুসরণ করে যে মৃত্যুবরণ করেছে। কারণ জীবিত ব্যক্তি ফেৎনা থেকে নিরাপদ নয়। আর ঐসব ব্যক্তিগণ হলেন, মুহাম্মদ ﷺ-এর সাহাবীগণ। তারা হলেন মুহাম্মদ ﷺ-এর উম্মতদের মধ্য হতে শ্রেষ্ঠতম উম্মত। তাঁরা অত্যন্ত পূত পবিত্র আত্মার অধিকারী, প্রগাঢ় জ্ঞানের অধিকারী। অতিস্বল্প পরিমাণ বাহ্যিক গ্রহীতা ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে আপন নবীর সাহচর্য এবং স্বীয় ধর্ম প্রতিষ্ঠায় মনোনীত করেছেন। অতএব তোমরা তাদের মর্যাদা উপলব্ধি কর, তাদের পথ অনুসরণ কর এবং সাধ্যনুযায়ী তাঁদের চরিত্রকে নিজের জীবনে প্রতিষ্ঠা কর। কারণ তাঁরাই ছিলেন সরল সঠিক পথ। –[মিশকাত]

উপরিউক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, সাহাবায়ে কেরামের পথ অনুসরণ ব্যতীত জাতির মুক্তি দুনিয়াতেও থাকবে না এবং আখেরাতেও থাকবে না। এ কারণে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত সাহাবাদের পথ অনুসরণ করে চলে।

قَوْلُهٗ وَنَجْتَنِبُ الشُّذُوْذَ الخ : এখানে شُذُوْذ শব্দের অর্থ হলো একাকীত্ব অবলম্বন করা। আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের একটি বৈশিষ্ট্য হলো নবীর সুন্নত ও সাহাবাদের জামাত হতে বিচ্ছিন্ন না হওয়া এবং একাকীত্বের পথ অবলম্বন না করা। কারণ এ থেকে আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে নিষেধ করেছেন। যেমন ইরশাদ হচ্ছে– اِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِىْ شَىْءٍ اِنَّمَا اَمْرُهُمْ اِلَى اللّٰهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ. অর্থাৎ নিশ্চয় যারা নিজেদের ধর্মকে খণ্ড-বিখণ্ড করেছে এবং অনেক দল হয়ে গেছে। আপনার কোনো সম্পর্ক তাদের সাথে নেই। তাদের ব্যাপার আল্লাহ তা'আলার নিকট সমর্পিত। অতঃপর তিনি তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত করবেন। –[সূরা আন'আম]

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন– وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَاخْتَلَفُوْا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ وَاُولٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ– অর্থাৎ তোমরা ঐ সকল লোকের মতো হয়ো না যারা প্রমাণাদি আসা সত্ত্বেও বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে এবং মতবিরোধ করছে। এসব লোকদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি। –[সূরা আলে ইমরান]

অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন– وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ তা'আলার রজ্জুকে শক্ত করে আকড়ে ধর এবং তোমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। –[সূরা আলে ইমরান]

উপরিউক্ত আয়াতত্রয়ে বিচ্ছিন্ন না হওয়া ও ঐক্যবদ্ধ থাকার জন্য আদেশ ও নিষেধসূচক ক্রিয়া ব্যবহার করা হয়েছে। যা অপরিহার্য কর্তব্য বিষয় এবং তাতে আজাব ও শাস্তির হুমকিও দেওয়া হয়েছে। তাই আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত হতে বের হওয়া ও তাতে ফাটল সৃষ্টি করা একেবারে গর্হিত কাজ। যাকে ইসলাম কখনই সমর্থন করে না। অতএব আমাদের কর্তব্য হলো রাসূল ﷺ -এর সুন্নাহ ও সাহাবাদের জামাতের উপর অটল ও অবিচল থাকা।

ইসলামি রাষ্ট্রের রাষ্ট্রনায়কের প্রতি ভালোবাসা

وَنُحِبُّ اَهْلَ الْعَدْلِ وَالْاَمَانَةِ وَنُبْغِضُ اَهْلَ الْجَوْرِ وَالْخِيَانَةِ وَنَقُوْلُ اللّٰهُ اَعْلَمُ فِيْمَا اشْتَبَهَ عَلَيْنَا عِلْمُهُ.

অনুবাদ : আমরা ন্যায়পরায়ণ ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে ভালোবাসি এবং অত্যাচারী ও অবিশ্বস্ত ব্যক্তির সাথে বিদ্বেষ পোষণ করি। আর আমরা বলি, যে বিষয়ের জ্ঞান আমাদের নিকট অস্পষ্ট তা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সর্বাধিক পরিজ্ঞাত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَنُحِبُّ الخ : অর্থাৎ ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার কাছে প্রিয়। তাই ন্যায়পরায়ণ ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে আমরা ভালোবাসি। কারণ তাদেরকে ভালোবাসা রাসূল ﷺ-এর সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত। তাই আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের বৈশিষ্ট্য হলো তাদেরকে ভালোবাসা। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন- وَاِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ. অর্থাৎ হে নবী! যদি আপনি ফয়সালা করেন, তাহলে ন্যায়পরায়ণ হয়ে ফয়সালা করেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা ন্যায়পরায়ণদের ভালোবাসেন। -[সূরা মায়েদা]

* অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলেন- وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُوْنَ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُوْنَ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلٰوتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ اُولٰئِكَ فِيْ جَنّٰتٍ مُّكْرَمُوْنَ. অর্থাৎ যারা তাদের আমানত ও অঙ্গীকার রক্ষা করে এবং যারা তাদের নিজেদেরকে সাক্ষ্য প্রদানে নিষ্ঠাবান রাখে এবং যারা নিজেদের নামাজ সংরক্ষণ করে। এরা সকলেই জান্নাতে সম্মানিত হয়ে থাকবে। -[সূরা মু'মিন]

  উপরিউক্ত আয়াদ্বয় হতে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি ও বিশ্বস্ত তথা আমানতদারগণকে পছন্দ করেন, ভালোবাসেন।

* তাছাড়া রাসূল ﷺ বলেন- لَمَّا خَلَقَ اللّٰهُ الرَّحْمَ وَالْاَمَانَةَ لَزِمَا خَاصِرَتَهُ تَعَالٰى وَقَالَا اَلَا مَنْ وَصَلَنَا وَصَلَهُ اللّٰهُ وَمَنْ قَطَعَنَا قَطَعَهُ اللّٰهُ. অর্থাৎ যখন আল্লাহ্ তা'আলা বন্ধন-ভালোবাসা ও আমানতকে সৃষ্টি করলেন তখন তারা আল্লাহ্ তা'আলার সাথে লেগে থাকলো এবং উভয়ে বলল, সাবধান! যে ব্যক্তি আমাদেরকে বজায় রাখবে আল্লাহ্ তার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখবেন। আর যে আমাদেরকে ছিন্ন করবে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে ছিন্ন করবেন।

  সুতরাং প্রকাশ হলো যে, যেভাবে বিচ্ছিন্ন হওয়া শত্রুতার কারণে হয়ে থাকে। তেমনি মহব্বত ও ভালোবাসাও সম্পর্ক বজায় রাখার কারণে হয়ে থাকে। সুতরাং ন্যায়পরায়ণ আমানতদারীকে ভালোবাসার কারণে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক বজায় থাকে। কিন্তু তাদের সাথে ভালোবাসা না রাখার কারণে আল্লাহর সাথে সম্পর্কচ্ছেদ হয়। সুতরাং আমরা ন্যায়পরায়ণ ও আমানতদারীকে ভালোবেসে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক বজায় রাখবো এটাই হলো আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

قَوْلُهُ وَنُبْغِضُ الخ : অর্থাৎ অত্যাচারী ও আমানতের খেয়ানতকারী ব্যক্তিকে মানুষ ভালোবাসে না। আল্লাহ তা'আলা ও ভালোবাসেন না। কারণ নবী করীম ﷺ বলেছেন- لَا إِيْمَانَ لَهُ لِمَنْ لَا اَمَانَةَ لَهُ অর্থাৎ যে ব্যক্তির আমানতদারী নেই তার ঈমানও নেই।

সুতরাং যে আমানতের খেয়ানতকারী ও অত্যাচারী সে আল্লাহর ভালোবাসা না পাওয়াই উচিত। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন- إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِيْنَ অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা জালেমদেরকে ভালোবাসেন না।

* অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন- إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِيْنَ অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা খেয়ানতকারীকে ভালোবাসেন না।

সুতরাং যে ব্যক্তি ন্যায়পরায়ণ ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে ভালোবাসবে অবশ্যই সে অত্যাচারী ও অবিশ্বস্ত ব্যক্তির সাথে শত্রুতা রাখবে। কারণ তারা তার শত্রু। আর এক্ষেত্রে প্রয়োজন বশত যুদ্ধও করবে।

* কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন- فَسَوْفَ يَأْتِى اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهُ اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ يُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لَائِمٍ. অর্থাৎ অচিরেই বা অতিসত্তর আল্লাহ তা'আলা এমন এক জাতি সৃষ্টি করবেন, যাদেরকে তিনি ভালোবাসবেন এবং তারাও তাঁকে ভালোবাসবে। তারা মুসলমানদের প্রতি বিনয় ও নম্র হবে এবং কাফেরদের প্রতি কঠোর হবে। তারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করবে এবং কোনো তিরস্কারকারীর তিরস্কারের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবে না। -[সূরা মায়েদা]

* রাসূল ﷺ এ সম্পর্কে বলেছেন- مَنْ اَحَبَّ لِلّٰهِ وَاَبْغَضَ لِلّٰهِ وَاَعْطٰى لِلّٰهِ وَمَنَعَ لِلّٰهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْاِيْمَانَ অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য ভালোবাসবে, আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য বিদ্বেষ রাখবে, আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য দান করবে এবং তাঁর সন্তুষ্টির জন্যই দান হতে বিরত থাকবে, সেই ব্যক্তিই নিজের ঈমান পরিপূর্ণ করেছে। -[আবূ দাঊদ]

উপরিউক্ত আয়াতদ্বয় প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তা'আলা অত্যাচারী এবং আমানতের খেয়ানতকারীকে পছন্দ করেন না। সুতরাং আমরাও তাদের পছন্দ করবো না; বরং তাদের সাথে বিদ্বেষ রাখবো। আর উক্ত বিদ্বেষ শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য রাখবো। তবেই আমাদের ঈমান পরিপূর্ণ হবে এবং সত্যিকারের মু'মিন হতে পারবো।

قَوْلُهُ وَنَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ الخ : শরিয়তে অজানা বস্তু সম্পর্কে জানা এবং অনিশ্চিত বস্তু সম্পর্কে ধারণা করার সুযোগ নেই। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন- وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ অর্থাৎ যে বিষয়ের জ্ঞান তোমার নেই তুমি তার পিছু নিও না।

* অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন- وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللّٰهِ অর্থাৎ তার চেয়ে বড় পথভ্রষ্ট কে যে আল্লাহ তা'আলার প্রদর্শন ছাড়া নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। -[সূরা কাসাস]

* অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন- اَلَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِىْ اٰيٰتِ اللّٰهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ اَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ وَعِنْدَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا অর্থাৎ যারা

আল্লাহ তা'আলার আয়াতসমূহের ক্ষেত্রে প্রমাণ ছাড়া বিবাদে লিপ্ত হয়, তাদের এ কাজ আল্লাহ ও ঈমানদারদের নিকট বড়ই জঘন্য। –[সূরা মু'মিন]

উপরিউক্ত আয়াতত্রয় প্রমাণ করে যে, পূর্ণ জানা ব্যতীত কোনো জিনিস সম্পর্কে অনুমান নির্ভর কোনো ধারণা করা ঠিক নয়। কেননা যদি ধারণা করা হয় এক রকম কিন্তু উক্ত ধারণার বাস্তবতা হলো সম্পূর্ণ বিপরীত। তবেই এ ধারণা পাপ বলে পরিগণিত হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন– اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ অর্থাৎ কতেক ধারণা পাপ বৈ কিছু নয়। –[সূরা হুজুরাত]

সুতরাং উক্ত বিষয় সম্পর্কে ধারণা না করে আল্লাহর উপর ছেড়ে দিবে। আল্লাহর রাসূল এমনই আদেশ দিয়েছেন। যেমন রাসূল ﷺ বলেছেন– يٰاَيُّهَا النَّاسُ مَنْ عَلِمَ شَيْئًا فَلْيَقُلْ بِهٖ وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلْيَقُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ فَاِنَّ مِنَ الْعِلْمِ اَنْ تَقُوْلَ لِمَا لَا تَعْلَمُ اَللّٰهُ اَعْلَمُ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى لِنَبِيِّهٖ قُلْ مَآ اَسْئَلُكُمْ مِنْ اَجْرٍ وَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ. অর্থাৎ হে মানুষ সকল! তোমাদের যে বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান রাখবে, সে ঐ বিষয় অন্যের কাছে বলবে। আর যে জানবে না সে অন্যের কাছে বর্ণনা করবে না; বরং বলবে আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত। কেননা জ্ঞানের পরিচয় হলো যে বিষয়ে জ্ঞান না রাখ সে বিষয়ে এই কথা বলা যে "আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞান।"

কেননা আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীকে বলেছেন, "বলুন আপনি! আমি তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান চাই না এবং আমি লৌকিকতাশ্রয়ী নই।

মোজার উপর মাসহ সম্পর্কে আকিদা

وَنَرَى الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ كَمَا جَاءَ فِي الْأَثَرِ.

অনুবাদ : আমরা ভ্রমণে ও নিজ লোকালয়ে থাকাবস্থায় মোজার উপর মাসাহ্ বৈধ মনে করি। যেমন হাদীসে এর উল্লেখ রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَنَرَى الْمَسْحَ الخ : অনেক পূর্ব থেকেই মোজার উপর মাসহ নিয়ে দ্বন্দ্ব হয়ে আসছে। কেউ কেউ এটাকে বৈধ মনে করেন। আবার কেউ এটাকে অবৈধ মনে করেন। কিন্তু যারা মোজার উপর মাসেহ করাকে অবৈধ মনে করে তাদের এটা গোঁড়ামী চামচিকার সূর্য দেখা ছাড়া আর কিছু নয়।

মোজার উপর মাসহের সত্যতা :

মোজার উপর মাসহ করা আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের নিকট বৈধ। কারণ এ ব্যাপারে যে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে তা হলো হাদীসে মুতাওয়াতির। যার বর্ণনাকারী প্রায় সত্তর জন। শুধু তাই না বরং যার বর্ণনাকারীকে কোনোক্রমেই মিথ্যাবাদী বলা যায় না।

যৌক্তিক দলিল : যে হাদীস প্রায় সত্তর জন সাহাবী বর্ণনা করেছেন সে হাদীস মিথ্যা হতে পারে না। কারণ হযরত নবী করীম ﷺ বলেছেন أَصْحَابِىْ كَالنُّجُوْمِ অর্থাৎ আমার মোজা সম্পর্কিত হাদীস যে সত্তরজন সাহাবী বর্ণনা করেছেন তারাও أَصْحَابِىْ كَالنُّجُوْمِ -এর অন্তর্ভুক্ত। অতএব উক্ত হাদীসকে গ্রাহ্য না করে চলা ভ্রষ্টতা ভিন্ন অন্ন কিছুই নয়।

মোজার উপর মাসহের ব্যাপারে মনীষীদের অভিমত :

১. হযরত ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত মোজার উপর মাসহের হাদীস আমার নিকট দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট হয়ে উঠেনি ততক্ষণ পর্যন্ত আমি মোজার উপর মাসেহ করাকে বৈধ মনে করিনি। কারণ এর হাদীস অস্বীকারের কোনো যুক্তি প্রমাণ নেই।

২. ইমাম কারখী (র.) বলেছেন, যে ব্যক্তি মোজার উপর মাসহ করাকে অবৈধ মনে করবে আমি তার সম্পর্কে কুফরির আশঙ্কা করি। কারণ এ ব্যাপারের হাদীসসমূহ তাওয়াতুরের পর্যায়ে চলে গেছে। এ কারণেই ফকীহগণ মোজার উপর মাসেহের বৈধতাকে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের বৈশিষ্ট্য মনে করা হয়।

মোজার উপর মাসহের সময়সীমা :

যদি মোজার উপর মাসেহকারী ব্যক্তি মুসাফির হয়, তবে তিন দিন তিন রাত মাসহ করতে পারবে। আর যদি মুকীম তথা স্থায়ী বাসস্থানে অবস্থানকারী ব্যক্তি হয় তবে একদিন একরাত মাসহ করতে পারবে।

একটি প্রশ্ন ও জবাব :

প্রশ্ন : মোজার উপর মাসহ্ করা ধর্মের একটি প্রাসঙ্গিক বিষয় তা সত্ত্বেও গ্রন্থকার (র.) এটাকে বুনিয়াদী বিষয় হিসেবে উল্লেখ করলেন কেন?

উত্তর :

১. মোজার উপর মাসহের হাদীসটি তাওয়াতুরের পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। আর হাদীসে তাওয়াতুরের হুকুম হলো তা অস্বীকারকারী কাফের অথচ উক্ত হাদীসকে অস্বীকার করতঃ রাফেজী ও শীয়া সম্প্রদায় মোজার উপর মাসহ্কে অবৈধ মনে করে। তাই এটি প্রয়োজনের তাকিদে বুনিয়াদী আকিদায় পরিণত হয়েছে।

২. অজুর ক্ষেত্রে উভয় পা টাখনুসহ ধৌত করা ফরজ। মোজার উপর মাসেহের কারণে পা টাখনুসহ ধৌত করার প্রয়োজন পড়ে না।

   কিন্তু শীয়া ও রাফেজী সম্প্রদায় মোজার উপর মাসহ্ অবৈধ ঘোষণা দিয়ে উভয় পা টাখনুসহ ধৌত করাকে ফরজ বলেছে এবং এটি আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের বিরুদ্ধে একটি স্থায়ী আলোচ্য বিষয় হিসেবে গণ্য করেছে। তাই এটি আকিদার রূপ ধারণ করেছে। যেহেতু এটিকে মান্য করা সকল মু'মিনের জন্য অপরিহার্য। তাই গ্রন্থকার (র.) এটিকে বুনিয়াদী আকিদা হিসেবে এখানে উল্লেখ করেছেন।

দ্বাদশ পাঠ

হজ ও জিহাদ সম্পর্কে আকিদা

وَالْحَجُّ وَالْجِهَادُ فَرْضَانِ مَاضِيَانِ مَعَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ بِرِّهِمْ وَفَاجِرِهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يُبْطِلُهُمَا شَيْءٌ وَلَا يَنْقُضُهُمَا.

অনুবাদ : হজ ও জিহাদ দু'টিই ফরজ। যা মুসলিম শাসকের অধীনে কিয়ামত পর্যন্ত জারি থাকবে। চাই সে সৎকর্মশীল হোক বা অসৎকর্মশীল। কোনো কিছুই এদু'টোকে বাতিল বা রহিত করতে পারবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَالْحَجُّ : এখান থেকে গ্রন্থকার (র.) হজ ও জিহাদ সম্পর্কে কি কি আকিদা পোষণ করতে হবে তার বর্ণনা শুরু করেছেন।

হজ ফরজ :

হজ হলো ইসলামের পঞ্চম রোকন। যে ব্যক্তি স্বীয় অবস্থান স্থল থেকে কা'বা শরীফে গমনাগমনের খরচ বহনের সামর্থ্যবান হবে, তার জন্য হজ করা ফরজ।

* **নকলী দলিল :** আল্লাহ তা'আলা বলেন– وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلًا অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার জন্য কা'বার হজ করা মানুষের জন্য ফরজ। যে তাতে সক্ষম হয়েছে। –[সূরা আলে ইমরান]
* অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন– وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ তা'আলার জন্য হজ ও ওমরা সম্পূর্ণ করা। –[সূরা বাকারা]
* রাসূল ﷺ বলেছেন– مَنْ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنَ الْحَجِّ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ أَوْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ أَوْ مَرَضٌ حَابِسٌ فَمَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُوْدِيًّا وَإِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا. অর্থাৎ যে যাকে বাহ্যিক কোনো প্রয়োজন কিংবা অত্যাচারী বাদশাহ অথবা রুদ্ধকারী কোনো রোগ হজ থেকে বাধা দিল না এবং সে হজ না করা অবস্থায় মারা গেল তাহলে সে মৃত্যুবরণ করুক চাই ইহুদি হয়ে কিংবা নাসারা হয়ে। –[মিশকাত]

ইজমার দলিল : হজ ফরজ হওয়ার ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরাম থেকে শুরু করে সর্বস্তরে উলামা মাশায়েখগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

হজ কিয়ামত পর্যন্ত চলবে :

বায়তুল্লাহর হজ কিয়ামত পর্যন্ত বিরামহীনভাবে চলতেই থাকবে এতে কোনো ধরনের সন্দেহের অবকাশ নেই। এমনকি একটি পলকের জন্যও বায়তুল্লাহর হজ আল্লাহ তা'আলা বন্ধ রাখেননি এবং রাখবেনও না। আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আকিদা এটিই। এর বিপরীত আকিদা পোষণকারী বিপথগামী।

قَوْلُهُ وَالْجِهَادُ الخ : শস্যক্ষেতে যখন আগাছা-পরগাছা ভরপুর হয়ে মানুষের শরীরে যখন ক্যান্সার হয়, যা জীবনের জন্য বিনাশ স্বরূপ তখন ডাক্তার ও অনিচ্ছা সত্ত্বেও ক্যান্সার থেকে আরোগ্য দানের জন্য তার শরীরে অস্ত্র পাচারে বাধ্য হয়। ঠিক তদ্রূপ শস্য ও শরীর নামক ইসলামে যখন আগাছা ও ক্যান্সার নামক ইসলামের দুশমন কাফেররা ইসলামের বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লেগে যায়। আর এর জন্য হরেক রকমে পন্থা অবলম্বন করে যা ইসলাম নাশের জন্য যথেষ্ট, ঠিক সেই মুহূর্তে নিরুপায় হয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও এই আগাছা ও ক্যান্সার নামক কাফেরদেরকে দূরীভূত করার জন্য ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে আল্লাহ তা'আলা অস্ত্রপাচার ও কাস্তে নামক জিহাদকে ফরজ করেছেন মুসলমানদের উপর। নিম্নে জিহাদ ফরজ হওয়ার স্বপক্ষে দলিল পেশ করা হলো।

* **নকলী দলিল :** আল্লাহ তা'আলা বলেন- كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ অর্থাৎ তোমাদের উপর জিহাদকে ফরজ করা হয়েছে। অথচ তা তোমাদের নিকট অপছন্দ।
* অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন- يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوٰهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ. অর্থাৎ হে নবী! আপনি কাফের ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করুন এবং তাদের সাথে কঠোরতা অবলম্বন করুন। তাদের ঠিকানা হলো জাহান্নাম। তাদের প্রত্যাবর্তনস্থল কতইনা নিকৃষ্ট। -[সূরা তাওবা]

জিহাদের উদ্দেশ্য :

জিহাদের একমাত্র আর উদ্দেশ্য হলো ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা আর ফেৎনা নিঃশেষ করা। এছাড়া জিহাদে অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন- وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ فَاِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ اِلَّا عَلَى الظَّالِمِيْنَ অর্থাৎ তোমরা কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর ফেৎনা নির্মূল না হওয়া এবং সমস্ত দীন আল্লাহর জন্য না হওয়া পর্যন্ত। অতঃপর তারা যদি বিরত থাকে তবে জালেমদের ব্যতীত কারো প্রতি বিদ্বেষ নেই। -[সূরা বাকারা]

কুরআন মাজীদে মহান আল্লাহ তা'আলা জিহাদ সম্পর্কে বেশি আয়াত নাজিল করেছেন। যার বর্ণনা এখানে দেওয়া সম্ভব নয়।

জিহাদ কিয়ামত পর্যন্ত চলবে :

জিহাদ তথা ইসলাম ধর্মকে প্রতিষ্ঠাদানের জন্য যুদ্ধ কিয়ামত পর্যন্ত দুনিয়াতে চলবে। এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। কারণ রাসূল ﷺ বলেছেন- اَلْجِهَادُ مَاضٍ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ অর্থাৎ জিহাদ কিয়ামত পর্যন্ত চলবে।

* অন্য হাদীসে রাসূল ﷺ বলেন– ثَلٰثٌ مِنْ أَصْلِ الْاِيْمَانِ اَلْكَفُّ عَمَّنْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ لَا نُكَفِّرُهُ بِذَنْبٍ وَالْجِهَادُ مَاضٍ مُذْ بَعَثَنِىَ اللّٰهُ اِلٰى اَنْ يُقَاتِلَ اٰخِرُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ الدَّجَّالَ لَا يُبْطِلُهُ جَوْرُ جَائِرٍ وَلَا عَدْلُ عَادِلٍ وَالْاِيْمَانُ بِالْاَقْدَارِ অর্থাৎ তিনটি বস্তু হলো ঈমানের মৌলিক বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। যথা– ১. যে ব্যক্তি لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ পড়েছে। তাকে গুনাহের কারণে কাফের না বলা। ২. জিহাদ চলতে থাকবে যেদিন থেকে আমার নিকট জিহাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পরিশেষে এই উম্মতের শেষ ব্যক্তি দাজ্জালকে হত্যা করবে। একে কোনো অত্যাচারীর অত্যাচার এবং ন্যায়বিচারকের ন্যায়বিচার ব্যহত করতে পারবে না। ৩. তাকদীরের প্রতি বিশ্বাস রাখা। –[আবূ দাঊদ]

একটি প্রশ্ন ও তার জবাব :

প্রশ্ন : গ্রন্থকার (র.) হজ ও জিহাদ উভয়টিকে অন্যান্য ইবাদত হতে পৃথক করতঃ একত্রে উল্লেখ করার কারণ কি?

উত্তর : সকল ইবাদতকে সাধারণত তিনভাগে ভাগ করা যায়। যথা– ১. শারীরিক ইবাদত। যেমন– নামাজ ও রোজা। ২. আর্থিক ইবাদত। যেমন– জাকাত ও সদকা। ৩. শারীরিক ও আর্থিক উভয়ের সমন্বয়ে ইবাদত। যেমন– হজ ও জিহাদ। হজের ক্ষেত্রে যেমন অর্থ ব্যয় হয় তেমন শরীরের খাটুনিও প্রয়োজন। তেমন হজের ক্ষেত্রে সফর করতে হয় আর সাফা মারওয়ায় দৌড়াতে হয়। অনুরূপ জিহাদের ক্ষেত্রেও সফর করতে হয়, দৌড়াতে মেহনত করতে হয় এমনকি প্রচুর পরিমাণ অর্থও ব্যয় হয়। আর হজের মওসুমে সকল লোক একত্রে সমবেত হওয়ার মাধ্যমে সাক্ষাৎ সংঘটিত হয় জিহাদের ক্ষেত্রেও তা হয়। মোটকথা হজ শারীরিক ও আর্থিক ইবাদত অনুরূপ জিহাদও শারীরিক ও আর্থিক ইবাদত তাই উভয়টিকে একত্রে এবং অন্যান্য ইবাদত হতে ভিন্নভাবে উল্লেখ করেছেন।

قَوْلُهُ مَعَ اُولِى الْاَمْرِ الخ : জিহাদ করা প্রেক্ষাপট অনুযায়ী ফরজ। যখন তখন তা যার তার উপর ফরজ হয় না। তবে উক্ত জিহাদ ও হজ কোনো মুসলিম নেতৃবৃন্দের অধীনে করতে হবে। চাইলেই একা একা জিহাদে বের হয়ে যাওয়া যাবে না। এটাকে শরিয়ত সমর্থন করে না। কারণ যদি নেতৃবৃন্দের অধীন ছাড়া জিহাদে বের হয়, তবে সে অবশ্যই বিজয় বেশে আসতে সক্ষম হবে না; বরং পরাস্তই হবে। আর বিজয় অর্জন করলেও তা শরিয়ত সমর্থন করে না। কেননা হযরত রাসূল ﷺ কখনো সাহাবাগণকে নেতৃত্ব ব্যতীত কখনো একাকী জিহাদে পাঠাননি। তাই তো তিনি নিজেই একাধিক জিহাদের নেতৃত্ব দান করেছেন এবং সাহাবাদের কোনো যুদ্ধে পাঠালে নেতা ঠিক করে পাঠাতেন। আর নেতৃত্ব যাকেই দেওয়া হোক না কেন তাকে মেনে চলা সকলের কর্তব্য রাসূল ﷺ বলেছেন– তুমি নেতার নির্দেশ মান্য কর যদিও সে হাবশী কালো গোলাম হয়। তাই আমরা নেতার নেতৃত্ব মেনে জিহাদে অংশগ্রহণ করবো এবং এমন ব্যক্তি নেতৃত্ব দান করবে যে নেতৃত্ব দানে সক্ষম ও যোগ্য।

قَوْلُهُ بِرِّهِمْ فَاجِرِهِمْ الخ : হজ ও জিহাদ করতে হলে নেতৃত্বের অধীনে তা সম্পাদন করতে হবে এবং মুজাহিদের দলে শরিক হতে হবে। এতে নেতা নিষ্পাপ হওয়া শর্ত নয়; বরং সে যদি ফাসেক, পাপী ও গুনাহগার হয় তবুও তার নেতৃত্ব মেনে নিতে কোনো আপত্তি উত্থাপন করবো না। এটাই হলো আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আকিদা।

কারণ রাসূল ﷺ বলেছেন- يَكُوْنُوا عَلَيْكُمْ اُمَرَاءُ تَعْرِفُوْنَ وَتُنْكِرُوْنَ فَمَنْ اَنْكَرَ فَقَدْ بَرِئَ وَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ سَلِمَ وَلٰكِنْ مَنْ رَضِىَ وَتَابَعَ قَالُوْا اَفَلَا تُقَاتِلُهُمْ قَالَ لَا مَا صَلُّوْا لَا مَا صَلُّوْا اَىْ مَنْ كَرِهَ وَاَنْكَرَ بِقَلْبِهِ. অর্থাৎ তোমাদের উপর এমন রাষ্ট্রনায়ক নিযুক্ত হবে। তোমাদের কেউ তাদেরকে ভালোবাসবে এবং কেউ অপছন্দ করবে। অতএব যে অপছন্দ করবে সে মুক্তি পাবে। আর যে ঘৃণা করবে সে নিরাপদ থাকবে। কিন্তু যারা পছন্দ করবে এবং অনুসরণ করবে তারা ধ্বংস হয়ে যাবে। সাহাবাগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ আমরা কি তাদেরকে কতল করবো? তিনি বললেন না তাদেরকে হত্যা করো না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নামাজ পড়বে। না তাদেরকে হত্যা করো না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নামাজ পড়বে। -[মুসলিম]

অপর হাদীসে রাসূল ﷺ বলেন-

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْاَشْجَعِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ خِيَارُ اَئِمَّتِكُمُ الَّذِيْنَ تُحِبُّوْنَهُمْ وَيُحِبُّوْنَكُمْ وَتُصَلُّوْنَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّوْنَ عَلَيْكُمْ وَشِرَارُ اَئِمَّتِكُمُ الَّذِيْنَ تُبْغِضُوْنَهُمْ وَيُبْغِضُوْنَكُمْ وَتَلْعَنُوْنَهُمْ وَيَلْعَنُوْنَكُمْ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَفَلَا تُنَابِذُهُمْ عِنْدَ ذٰلِكَ قَالَ لَا مَا قَامُوْا فِيْكُمُ الصَّلَاةَ اَلَا مَنْ وُلِّىَ عَلَيْهِ.

উপরিউক্ত হাদীসদ্বয় দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, মুসলমানদের নেতৃত্বদানকারী সৎকর্মশীল হওয়া শর্ত নয়; বরং সৎকর্মশীলও হতে পারবে। আবার অসৎকর্মশীলও হতে পারবে। কিন্তু রাফেজী ও শিয়া সম্প্রদায়ের আকিদা হলো জিহাদ ও হজের নেতৃত্ব দানকারী ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ অবশ্য নিষ্পাপ হতে হবে। তাদের এই অভিমতটি কুরআন সুন্নাহ বিরোধী, তাই তাদের অভিমতটি গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ নবী রাসূলগণ ছাড়া কেউ নিষ্পাপ নয়। অতএব তাদের মতে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, সকল মুসলমানকেই নেতৃত্বহীন থাকতে হবে। অথচ এমনটি কখনো সম্ভব হতে পারে না।

মালাকুল মাউত ও কিরামান কাতেবীন-এর প্রতি ঈমান

وَنُؤْمِنُ بِالْكِرَامِ الْكَاتِبِيْنَ وَاِنَّ اللّٰهَ قَدْ جَعَلَهُمْ عَلَيْنَا حَافِظِيْنَ وَنُؤْمِنُ بِمَلَكِ الْمَوْتِ الْمُوَكَّلِ بِقَبْضِ اَرْوَاحِ الْعَالَمِيْنَ.

অনুবাদ : আমরা কিরামান কাতেবীন নামক সম্মানিত দুই ফেরেশতার প্রতি ঈমান রাখি। আর নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে আমাদের রক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করেছেন এবং আমরা মালাকুল মাউত। [আজরাঈল (আ.)] ফেরেশতার প্রতি ঈমান রাখি। যাঁকে জগৎবাসীর রূহসমূহ কবজ করার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَنُؤْمِنُ بِالْكِرَامِ الْكَاتِبِيْنَ الخ : অর্থাৎ মানুষ দৈনিক ভালো-মন্দ যে কাজ বা কর্ম সম্পাদন করে তা লিপিবদ্ধ করার জন্য আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মানুষের দুকাঁধে দু'জন সম্মানিত ফেরেশতা নিযুক্ত করে রেখেছেন। যাদেরকে কিরামান কাতেবীন নামে অবিহিত করা হয়। এই দুই সম্মানিত ফেরেশতার প্রতি ঈমান রাখা আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের বৈশিষ্ট্য। এদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন- وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِيْنَ كِرَامًا كَاتِبِيْنَ يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ অর্থাৎ হে দুনিয়ার মানুষেরা নিশ্চয় তোমাদের উপর তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত রয়েছে। তারা হলো কিরামান কাতেবীন। তারা ঐ সব বিষয়ে জানে যা তোমরা করে থাকো। -[সূরা ইনফিতার]

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيْدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ- অর্থাৎ যখন দুজন ফেরেশতা ডানে ও বামে বসে তার কার্যাবলি গ্রহণ করেন। সে যে কথাই উচ্চারণ করে তাই গ্রহণ করার জন্য তার কাছে সদা-সর্বদা প্রহরী প্রস্তুত রয়েছে। -[সূরা ক্বাফ]

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন- لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُوْنَهُ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ অর্থাৎ তাঁর পক্ষ হতে তথা মহান আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে অনুসরণকারী রয়েছে তার অগ্রে ও পশ্চাতে। তারা আল্লাহ তা'আলার হুকুমে তাকে পাহারা দেয়। -[সূরা রা'দ]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন- اِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُوْنَ مَا تَمْكُرُوْنَ অর্থাৎ নিশ্চয় আমার আল্লাহ প্রেরিত দূতরাই লিখে রাখি যা তোমরা কৌশল কর। -[সূরা ইউনুস]

এছাড়াও রাসূল ﷺ কিরামান কাতেবীন ফেরেশতার কথা বহু হাদীসে বলেছেন। উক্ত দু'ফেরেশতার একজন বান্দার ডান কাধে থাকে এবং তার সৎকর্মসমূহ লিখেন। আর অপরজন বাম কাঁধে থাকেন এবং তার পাপসমূহ লিখেন। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা বান্দার নিকট উক্ত আমলনামা প্রকাশ করবেন।

قَوْلُهٗ وَنُؤْمِنُ بِمَلَكِ الْمَوْتِ الخ : আল্লাহ তা'আলা এই বিশ্বজগতে যত সৃষ্টজীব রেখেছেন। সকলকেই একদিন মৃত্যুর স্বাদ করাবেন। আর যার মাধ্যমে করাবেন তিনি মালাকুল মাউত [হযরত আজরাঈল (আ.)] নামে পরিচিত। আল্লাহ তা'আলা তাকে সৃষ্টিজীবের মৃত্যু দেওয়ার মহান দায়িত্ব দিয়েছেন। এর প্রতি ঈমান রাখা সকল মু'মিনের জন্য জরুরি। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন- قُلْ يَتَوَفّٰكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِىْ وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلٰى رَبِّكُمْ تُرْجَعُوْنَ অর্থাৎ বলুন! তোমাদেরকে মৃত্যুদান করবেন ঐ ফেরেশতা যাকে তোমাদের প্রাণ হরণের গুরু দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। অতঃপর তোমরা তোমাদের প্রভুর দিকেই প্রত্যাবর্তন করবে। -[সূরা সিজদা]

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন- حَتّٰى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُوْنَ অর্থাৎ এমনকি যখন তোমাদের কারো নিকট মৃত্যু চলে আসে তখন তাকে আমার দূতগণই মৃত্যুদান করেন। এতে তারা শিথিলতা করে না বা অন্য মনস্কতা প্রদর্শন করে না। -[সূরা আন'আম]

উপরিউক্ত আয়াত দ্বারা মালাকুল মাউত এর সত্যতা প্রমাণিত হলো। তিনি সকল সৃষ্টজীবের মৃত্যু দান করেন। তাকে এ দায়িত্ব দেওয়া হয়।

একটি প্রশ্ন ও তার জবাব :

প্রশ্ন : এ কথাটা তো চির সত্য যে, মালাকুল মাউত [আজরাঈল] ফেরেশতা হলেন একজন। আর একই সময়ে দেখা যায় অনেক প্রাণী মৃত্যুবরণ করে। তাহলে তাঁর একার পক্ষে এতজনের মৃত্যু দান কিভাবে সম্ভব হয়?

জবাব : এ প্রশ্নের জবাবে প্রখ্যাত মুফাসসির হযরত মুজাহিদ (র.) বলেন, কোনো ব্যক্তি যখন খাবার খেতে বসে তখন তার থালায় বিভিন্ন প্রকার খাবার থাকে। যেমন, থালার মধ্যে কমলা, আপেল, বেদানা, আঙ্গুর, পেঁপে ও আম ইত্যাদি। এমতাবস্থায় তার থালা হতে যে কোনো ফল খেতে তার বেগ পেতে হয় না। ইচ্ছা করলে সে এক সাথে কয়েকটি ফল খেতে পারে। ঠিক হযরত আজরাঈল (আ.)-এর সামনে গোটা বিশ্বকেই আল্লাহ তা'আলা থালার মতো করে রেখেছেন। হুকুম হলেই হযরত আজরাঈল (আ.) একজনকে মৃত্যুদান করেন এবং হুকুম হলে একই সময় একাধিক মানুষকে মৃত্যুদান করেন। এতে তাঁর একটুও বেগ পেতে হয় না। একটু কষ্টও হয় না। সুতরাং এখন আর এ ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন অবশিষ্ট রইল না।

কবরের সুখ শান্তি সত্য

وَنُؤْمِنُ بِعَذَابِ الْقَبْرِ وَنَعِيْمِهِ لِمَنْ كَانَ لِذٰلِكَ اَهْلًا وَبِسُؤَالِ الْمُنْكَرِ وَالنَّكِيْرِ لِلْمَيِّتِ فِيْ قَبْرِهِ عَنْ رَبِّهِ وَنَبِيِّهِ وَ دِيْنِهِ عَلٰى مَا جَاءَتْ بِهِ الْاَخْبَارُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَعَنْ اَصْحَابِهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ اَجْمَعِيْنَ وَالْقَبْرُ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ اَوْ حُفْرَةٌ مِنْ حُفَرِ النَّارِ.

অনুবাদ : আমরা কবরের আজাবও তার শাস্তির উপর ঈমান রাখি। যা প্রদত্ত হবে তার উপযুক্ত লোকদের উপর এবং আমরা মৃত ব্যক্তিকে কবরে তার রব বা প্রতিপালক, তার রাসূল ও ধর্ম সম্পর্কিত মুনকার নাকীর ফেরেশতাদ্বয়ের প্রশ্ন করার উপর ঈমান রাখি। রাসূল ﷺ ও তাঁর সাহাবায়ে কেরাম (রা.) থেকে যে হাদীস এ সম্পর্কে বর্ণিত হয়ে আসছে তার উপর ভিত্তি করে। আর কবর হয়তো জান্নাতের উদ্যানসমূহ হতে একটি উদ্যান হবে অথবা জাহান্নামের গর্তসমূহ থেকে একটি গর্ত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَنُؤْمِنُ بِعَذَابِ الْقَبْرِ الخ : অর্থাৎ আমরা কবরের আজাবের উপর ঈমান রাখি। নিম্নে এর স্বরূপ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

কবরের আজাব :

কুরআন ও হাদীসের আলোকে আমরা পরকালীন জীবনের অনেক দিক সম্পর্কে জানতে পারি। এগুলো আমাদের ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এর মধ্যে রয়েছে মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের আগের অবস্থা। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন- يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ وَيُضِلُّ اللّٰهُ الظّٰلِمِيْنَ وَيَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ অর্থাৎ যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে আল্লাহ শাশ্বত বাণীতে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন ইহ ও পরজীবনে। আর আল্লাহ তা'আলা জালেমদেরকে বিভ্রান্তিতে রাখবেন এবং তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই করেন। -[সূরা ইবরাহীম]

এ আয়াত থেকে স্পষ্ট জানা যায় যে, ইহ জীবনের মতো পরজীবনেও শ্বাশ্বত বাণীর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার প্রয়োজন রয়েছে। বিভিন্ন হাদীস দ্বারা জানা যায় পরকালীন জীবনের শুরুতেই মুনকার নাকীর ফেরেশতাদ্বয়ের প্রশ্নের মাধ্যমে এ প্রতিষ্ঠা প্রমাণিত হবে।

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন-

وَلَوْ تَرٰى اِذِ الظّٰلِمُوْنَ فِىْ غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوْا اَيْدِيْهِمْ اَخْرِجُوْا اَنْفُسَكُمْ اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ اٰيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُوْنَ.

অর্থাৎ যদি তুমি দেখতে, যখন জালিমরা মৃত্যু যন্ত্রণায় থাকবে। আর ফেরেশতারা হাত বাড়িয়ে বলবে, তোমাদের প্রাণ বের কর। তোমরা আল্লাহ তা'আলা সম্বন্ধে অন্যায় কথা বলতে এবং তাঁর নির্দেশ সম্পর্কে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে। সে জন্য তোমাদেরকে অবমাননাকর শাস্তি প্রদান করা হবে। -[সূরা আন'আম]

এ আয়াতে মৃত্যুকালীন ও মৃত্যুর পরবর্তীকালীন আজাবের কথা জানা যায়।

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন- وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوْءُ الْعَذَابِ النَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَّعَشِيًّا وَّيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ اَدْخِلُوْا آلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ. অর্থাৎ অত্যন্ত কঠিন শাস্তি পরিবেষ্টন করল ফেরাউন সম্প্রদায়কে। সকাল-সন্ধ্যায় তাদেরকে উপস্থিত করা হয় অগ্নির সামনে এবং যেদিন কিয়ামত ঘটবে সে দিন বলা হবে, ফেরাউন সম্প্রদায়কে প্রবেশ করাও কঠোর শাস্তিতে। -[সূরা সাবা]

অসংখ্য হাদীসে মৃত্যুকালীন ও মৃত্যু পরবর্তীকালীন শাস্তি ও পুনরুত্থানের কথা বলা হয়েছে। সামগ্রিকভাবে কবরের প্রশ্ন আজাব ও শাস্তি সম্পর্কিত হাদীসগুলো মুতাওয়াতির বলে গণ্য। এসব হাদীস থেকে জানা যায়, মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখার পর মুনকার নাকীর দুজন ফেরেশতা তার প্রভু, নবী ও ধর্ম সম্পর্কে প্রশ্ন করবে। মু'মিন ব্যক্তি এসব প্রশ্নের জবাব দিতে সক্ষম হবে। কাফের বা মুনাফিক উত্তর দিতে পারবে না। পাপী ও অবিশ্বাসীরা কবরে শাস্তি ভোগ করবে। কিন্তু মু'মিনরা সেখানে শান্তি ভোগ করবে। এসবই মু'মিনরা বিশ্বাস করে। সাধারণত এ অবস্থাকে কবর বলা হয়। তবে কবর বলতে ইহকালের মধ্যকালীন সময়কে বলা হবে। কোনো ব্যক্তি কারণ বশতঃ কবরস্থ না হলেও সে শাস্তি বা পুরস্কার লাভ করবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল কারীমে ইরশাদ করেন-

حَتّٰى اِذَا جَاءَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُوْنِ لَعَلِّىْ اَعْمَلُ صَالِحًا فِيْمَا تَرَكْتُ كَلَّا اِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَّرَائِهِمْ بَرْزَخٌ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ.

অর্থাৎ যখন তাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন সে বলে! হে আমার প্রতিপালক! আমাকে পুনরায় প্রেরণ কর। যাতে আমি সৎকর্ম করতে পারি যা আমি পূর্বে করিনি। না এটা হবার নয়। এতো তার একটি উক্তি মাত্র। আর তাদের সম্মুখে বরজখ থাকবে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত।

হযরত আবূ হানীফা (র.) বলেন- মুনকার নাকীরের প্রশ্ন চির সত্য। যা কবরের মধ্যে হবে। কবরের মধ্যে বান্দার রূহকে ফিরিয়ে দেওয়াও সত্য। কবরের চাপ ও কবরের আজাব সত্য। কাফেররা সবাই এ শাস্তি ভোগ করবে। কোনো কোনো পাপী মু'মিনও তা ভোগ করবে।

মৃতকে কবরে জীবিতকরণ :

মৃত ব্যক্তিদেরকে তাদের কবরে জীবিতকরণ, তাদেরকে কবরে মুনকার নাকীরের জিজ্ঞাসাবাদ, কাফের, ফাসেকের জন্য কবরের আজাব প্রসঙ্গে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত ও মুতাযিলা সম্প্রদায়ের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে।

আহলে সুন্নত-এর মতামত :

আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের মতে মৃত ব্যক্তিদেরকে তাদের কবরে জীবিত করা হবে ও তাদেরকে মুনকার নাকীরের জিজ্ঞাসাবাদ এবং কাফের ও ফাসেকের জন্য কবরের আজাব সংঘটিত হওয়া এসব চির সত্য। এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

মু'তাযিলাদের মতামত :

মু'তাযিলাদের অধিকাংশ মু'তাআখখীরিন বিশেষ করে যাবান ইবনে ওমর এবং বিশর আল মুবাইসী এর অভিমত হলো মৃতকে কবরে জীবিতকরণ, মুনকার নাকীরের জিজ্ঞাসাবাদ, কাফের ও ফাসেক এর কবরে আজাব সত্য নয়।

জুবাঈ ও তার পুত্রের মতামত :

আবূ আলী আল জুবাঈ ও তার পুত্র ও বলখী মুনকার নাকীর ফেরেশতাদের নামকে অস্বীকার করেন। তারা বলেন, জিজ্ঞাসাবাদের সময় কাফের হতে যা প্রকাশ পায় তাই মুনকার। আর নাকীর হচ্ছে ফেরেশতাদ্বয়ের উত্যক্ত করা।

সালেহী ও অন্যান্যদের মতামত :

সালেহী, ইবনে জারীর তাবারী ও একদল কাররামিয়া বলেন যে, কবরে মৃতকে জীবিত করা ছাড়াই আজাব দেওয়া হবে।

কালাম শাস্ত্রবিদদের মতামত :

দার্শনিক বা কালাম শাস্ত্রবিদগণ বলেন, কাফের ও ফাসেকের শরীরে অনুভূতি ছাড়াই শাস্তি দেওয়া হবে। অতঃপর যখন হাশরের ময়দানে উঠানো হবে তখন একবার শাস্তি অনুভব হবে।

আবূ হুযাইল ও অন্যান্যদের মতামত :

আবূল হুযাই আল আল্লাফ ও বিশর ইবনে মু'তামার এর এ ব্যাপারে অভিমত হলো- কাফেরদেরকে দু ফুৎকারের মধ্যবর্তী সময়ে শাস্তি দেওয়া হবে।

আহলে সুন্নত-এর দলিল :

নকলী দলিল :

উপরে উল্লিখিত সকল ভ্রান্ত মতবাদের বিপরীতে আহলে সুন্নাহ এর অভিমত দলিল সহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো- যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- اَلنَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَّعَشِيًّا وَّيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ اَدْخِلُوْا اٰلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ এখানে عَذَابٌ শব্দটিকে سَاعَةُ الْمَوْتِ-এর সাথে সম্পৃক্ত করে সকাল-সন্ধ্যায় শাস্তি দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। আর তা হবে কবরে।

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন- اُغْرِقُوْا فَاُدْخِلُوْا نَارًا এ আয়াতে نَارًا দ্বারা কবরের শাস্তি বুঝানো হয়েছে।

* অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন- يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ এ আয়াতটি নাজিলই হয়েছে কবরের আজাব সম্পর্কে।
* মহানবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ বলেন- اِسْتَنْزِهُوْا مِنَ الْبَوْلِ فَاِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ
* অন্য হাদীসে রাসূল ﷺ বলেন- اَلْقَبْرُ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ اَوْ حُفْرَةٌ مِنْ حُفَرِ النَّارِ
* অন্য হাদীসে রাসূল ﷺ আরো বলেন- يُسَلَّطُ عَلَى الْكَافِرِ فِيْ قَبْرِهِ تِسْعَةٌ وَّتِسْعِيْنَ تِنِّيْنًا
* হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত سَاَلَتْ عَائِشَةُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَذَابَ الْقَبْرِ فَقَالَ نَعَمْ عَذَابُ الْقَبْرِ حَقٌّ

উপরিউক্ত আয়াত ও হাদীস দ্বারা যখন কবরের শাস্তি সাব্যস্ত হলো তখন কবরে মৃতকে জীবিত করা ও জিজ্ঞাসাবাদ করা সাব্যস্ত করার বিষয়াদি প্রমাণিত হলো। এতক্ষণ পর্যন্ত কুরআন ও হাদীসের দলিল দ্বারা ভ্রান্তদের অভিমতকে প্রতিহত করা হয়েছে, আর এখন যৌক্তিক দলিল প্রদান করা হচ্ছে। কারণ যারা কবরের আজাব স্বীকার করে তারা মৃতকে জীবিতকরণ ও জিজ্ঞাসাবাদও স্বীকার করে। আর রাসূল ﷺ এ সম্পর্কে বলেছেন- اِذَا اُقْبِرَ الْمَيِّتُ اَتَاهُ مَلَكَانِ اَسْوَدَانِ اَزْرَقَانِ يُقَالُ لِاَحَدِهِمَا الْمُنْكَرُ وَالْاٰخَرِ النَّكِيْرُ.

যৌক্তিক দলিল :

আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতগণ বলেন, কবরে আজাব দেওয়া আল্লাহ তা'আলার জন্য সম্ভব। কারণ তিনি সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান। তাছাড়া এ সম্পর্কে যখন কুরআন ও হাদীসে বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে তখন তা মেনে নিতেই হবে। আর মৃতকে কবরে জীবিত করা হবে। কারণ জীবিত করা ব্যতীত মৃত লাশ জড় পদার্থের মতো। ফলে তাকে শাস্তি দেওয়া না দেওয়া সব সমান।

মু'তাযিলাদের দলিল :

দলিলে নকলী :

মুতাযিলা সম্প্রদায় তাদের নিজেদের স্বপক্ষে দলিল পেশ করে বলেন- আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى এই আয়াত দ্বারা কেবল একবার মৃত হওয়ার কথা প্রমাণ হয়। কিন্তু যদি কবরে ব্যক্তিকে জীবিত করা হয় তাহলে দু'বার মৃত হওয়া আবশ্যক হয়। যা আয়াতের মর্মার্থের বিপরীত। অথচ আয়াতের বিপরীত কোনো বিষয় সংঘটিত হওয়া অসম্ভব।

যৌক্তিক দলিল :

যদি কাউকে গুলি করে হত্যা করা হয় এবং তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আর এমতাবস্থায় মৃতকে কোনোভাবেই শাস্তি দেওয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া কাউকে বাঘে খেয়ে ফেললে বা অগ্নিতে পুড়ে ছাই হয়ে গেলে তাকেও শাস্তি দেওয়া সম্ভব নয়। কেননা যে বস্তুর প্রাণ নেই তাকে শাস্তি দেওয়া অর্থহীন; বরং বোকামীও। এজন্য যে, যে দেহে প্রাণ নাই সেই দেহ জড় পদার্থের ন্যায় আর জড় পদার্থের অনুভব ক্ষমতা নেই। অতএব অনুভবহীন দেহে শাস্তি দেওয়া শুধু অনর্থকই নয় বরং বোকামীরও বহিঃপ্রকাশ।

মু'তাযিলাদের দলিলের জবাব :

তারা যে আয়াত দ্বারা দলিল উত্থাপন করেছে সে আয়াতে জান্নাতীদের গুণ বর্ণনা করা হয়েছে। فِيهَا -এর মধ্যে هَا যমীর জান্নাত-এর দিকে প্রত্যাবর্তন হয়েছে। আয়াতে অর্থ হবে- لَا يَذُوقُونَ أَهْلُ الْجَنَّةِ فِي الْجَنَّةِ। অর্থাৎ জান্নাতীরা আর কখনো জান্নাতে মরবে না। ফলে তাদের থেকে নিয়ামত কখনো বিচ্ছিন্ন হবে না। যেমনিভাবে পৃথিবীতে মৃত্যুর কারণে নিয়ামত বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

দ্বিতীয় দলিলের জবাব এভাবে দেওয়া যায় যে, যে সকল মানুষ বুলেট বিদ্ধ বা আগুনে পুড়ে মরেছে তাদের শরীরের কিছু অংশে আল্লাহ এমন অনুভূতি দিবেন। যা শাস্তি ও শান্তি অনুভব করতে পারে। কিংবা তার রূহকে শাস্তি দিবেন। আর এভাবে শাস্তি প্রদান তাঁর পক্ষে মোটেও অসম্ভব নয়।

আল জুবাঈ ও তার পুত্রের জবাব :

আল জুবাঈ ও তার পুত্র যে মতামত ব্যক্ত করেছে তা সকল আলেমের ঐকমত্যের বিপরীত। অতএব তাঁদের মতামত পরিত্যক্ত বলে সাব্যস্ত হলো। কারণ সকল আলেমই মুনকার নাকীর ফেরেশতাদ্বয়কে স্বীকার করে নিয়েছেন।

সালেহীদের প্রতিউত্তর :

জীবিত করা ব্যতীত শাস্তি দেওয়া বিবেক বিরোধী। শরয়ী সকল বিধি বিধান বিবেক সম্মত। মৃত লাশকে শাস্তি দেওয়া জড় পদার্থকে শাস্তি দেওয়ার মতো। তাই তা বিবেক বিরোধী বলে পরিগণিত।

কবরের আজাবের পদ্ধতি :

মৃতকে কবরে রাখার পর আল্লাহ তা'আলা তার শরীরে এই পরিমাণ অনুভূতি শক্তি দান করবেন যার দ্বারা সে কবরের শাস্তি বা শান্তি অনুভব করতে পারে। অতঃপর সে অনুভূতির উপর আজাব বা শান্তি দেওয়া হবে।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে মৃতকে যখন কবরস্থ করা হয় তখন তার নিকট কালো ও নীল বর্ণের দুজন ফেরেশতা আসে এবং তাকে তার প্রভু, নবী ও ধর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। যদি জবাব দিতে সক্ষম হয় তবে তার জন্য নিয়ামত দেওয়া শুরু হয়। আর যদি জবাব দিতে অক্ষম হয় তাহলে শাস্তি দেওয়া শুরু হয়। নিশ্চয় কবর জান্নাতের বাগানসমূহের একটি বাগান অথবা জাহান্নামের গর্তসমূহ হতে একটি গর্ত। -[তিরমীযী]

পুনরুত্থান, আমলের প্রতিদান ও হিসাব সত্য

وَنُؤْمِنُ بِالْبَعْثِ وَجَزَاءِ الْاَعْمَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْعَرْضِ وَالْحِسَابِ وَقِرَاءَةِ الْكِتَابِ.

অনুবাদ : আর আমরা পুনরুত্থান, হাশরের দিন, প্রতিদান, আমলনামা পেশ, হিসাব নিকাশ এবং আমলানামা পাঠ করার প্রতি ঈমান রাখি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَنُؤْمِنُ بِالْبَعْثِ الخ : অর্থাৎ মানুষ মরে গেলে পুনরায় আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে কিয়ামতের পূর্ব মুহূর্তে জীবন দান করবেন এবং তাদের বিচারকার্য সম্পাদন করবেন। এর উপর সকলের ঈমান রাখা ফরজ। কারণ এটি ঈমানের সপ্তম রোকন। যারা তা অস্বীকার করবে তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা ভয়ঙ্কর শাস্তি দিবেন বলে উল্লেখ করেছেন।

যেমন আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন- زَعَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ يُّبْعَثُوْا قُلْ بَلٰى وَرَبِّىْ لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ অর্থাৎ মুশরিকরা ধারণা করে যে, তারা কখনো পুনরুত্থিত হবে না। আপনি বলুন! অবশ্যই (তোমরা পুনরুত্থিত হবে) আমার প্রতিপালকের শপথ! নিশ্চয় তোমরা আবার জীবিত হবে। অতঃপর তোমাদেরকে অবহিত করা হবে তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে। আর এটা আল্লাহর জন্য একেবারেই সহজ। -[সূরা তাগাবুন]

উপরিউক্ত আয়াত একথাই প্রমাণ করে যে, পুনরুত্থান চিরসত্য। অতীতে পুনরুত্থান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। প্রয়োজন বোধে সেখানে দেখা যেতে পারে।

قوله وَجَزَاءُ الْاَعْمَالِ الخ : অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামত দিবস সংঘটিত করবেন এবং সকল মানুষকে সমবেত করবেন যার যার আমলের প্রতিদান দেওয়ার জন্য। যদি সে সৎকর্মশীল ও ন্যায়পরায়ণ হয়, তবে তাকে প্রতিদান স্বরূপ জান্নাত ও আল্লাহর রেজামন্দি বা সন্তুষ্টি দান করবেন। আর যদি সে অসৎ কর্ম সম্পাদনকারী হয় তাহলে তাকে প্রতিদান হিসেবে জাহান্নাম ও শাস্তি দিবেন। উক্ত দিবসে বান্দা ছোট বড়, প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য যত কর্ম সম্পাদন করেছে সবই প্রকাশ হয়ে যাবে। চাই উক্ত কর্ম ভালো হোক কিংবা মন্দ। আর সেদিনের মালিক একমাত্র আল্লাহই থাকবেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন- مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ তিনি কিয়ামত দিবসের মালিক।

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন- وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ إِلَى اللّٰهِ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ অর্থাৎ তোমরা ঐ দিনকে ভয় কর যেদিন তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে আল্লাহর দিকে। অতঃপর প্রত্যেককেই তার কৃতকর্মের ফল পুরোপুরিভাবে দেওয়া হবে। আর তারা অত্যাচারিত হবে না। -[সূরা বাকারা]

অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন- وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلَى اللّٰهِ وُجُوْهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ اَلَيْسَ فِىْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِيْنَ - وَيُنَجِّى اللّٰهُ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوْءُ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ. অর্থাৎ কিয়ামত

দিবসে যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করেছে তাদেরকে দেখবেন তাদের চেহারা কালো। অহংকারীদের জন্য জাহান্নাম ঠিকানা হিসেবে নয়? আর যারা আল্লাহকে ভয় করে চলেছে তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা তাদের সফলতার সাথে মুক্তি দিবেন। তাদেরকে কোনো অমঙ্গল স্পর্শ করবে না এবং তারা না কোনো কারণে চিন্তিত হবে। –[সূরা যুমার]

উপরিউক্ত আয়াতসমূহ প্রমাণ দিচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই বান্দাদেরকে তাদের স্বীয় ভালোমন্দ আমলের প্রতিদান দিবেন। এটা আমরা বিশ্বাস করি।

قوله اَلْعَرْضِ وَالْحِسَابِ الخ : আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো, তারা বিশ্বাস করে যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা বান্দার আমলনামা তাদের সামনে পেশ করবেন এবং জীবনের সকল কর্মের হিসাব নিবেন। এতে সে দুনিয়াতে যে সকল কার্য সম্পাদন করেছে তার সবকিছুই সে দেখতে পাবে। এর প্রতি বিশ্বাস করা। এ সম্পর্কে অসংখ্য হাদীস ও আয়াত উল্লেখ রয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– وَ وَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا অর্থাৎ তারা যেসব কর্ম সম্পাদন করেছে তা তারা স্পষ্টই দেখতে পাবে। –[সূরা কাহাফ]

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন–

وَكُلَّ اِنْسَانٍ اَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِىْ عُنُقِهٖ وَنُخْرِجُ لَهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَّلْقَاهُ مَنْشُوْرًا.

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন– يَوْمَئِذٍ يَّصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا لِّيُرَوْا اَعْمَالَهُمْ فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ. অর্থাৎ যেদিন মানুষ বিভিন্ন দলে প্রকাশ হবে। যাতে তাদের কৃতকর্ম তথা (আমল নামা) দেখানো হবে। সুতরাং কেউ অনুপরিমাণ ভালো কর্ম করলে তা দেখতে পাবে এবং যে মন্দ কর্ম করবে সে তাও দেখতে পাবে।

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন– لَيْسَ اَحَدٌ يُحَاسَبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِلَّا هَلَكَ قُلْتُ اَوَ لَيْسَ يَقُوْلُ اللّٰهُ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا فَقَالَ اِنَّمَا ذٰلِكَ الْعَرْضُ وَلٰكِنْ مَنْ نُوْقِشَ فِى الْحِسَابِ يَهْلِكُ. অর্থাৎ কিয়ামত দিবসে যার পুরোপুরি হিসাব গ্রহণ করা হবে সে ধ্বংস হবে। তখন আমি বললাম, আল্লাহ তা'আলা কি বলেননি যে, অতিসত্বর হিসাব নেওয়া হবে, সহজ হিসাব"। নবী করীম ﷺ উত্তরে বললেন, এটা তোমার আমল পেশ করা মাত্র। কিন্তু যার হিসাব নেওয়া হবে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সে অবশ্যই ধ্বংস হবে। –[বুখারী ও মুসলিম]

উপরিউক্ত আয়াত ও হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, প্রত্যেক ব্যক্তি থেকে তার কৃতকর্মের হিসাব নেওয়া হবে এবং আমলনামা তার সামনে পেশ করা হবে। এ ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ নেই। এতে সন্দেহ পোষণকারী প্রকৃত মু'মিনই নয়।

قوله قِرَاءَةِ الْكِتَابِ : অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মানুষের কাছে তার আমলনামা পৌঁছে দিবেন এবং তা প্রত্যেককে পাঠের নির্দেশ দিবেন। আর সে তার আমলনামা পড়তে পারবে। এতে কোনো অসুবিধা হবে না। নিম্নে আমলনামার সত্যতা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

কিতাব (আমলনামা) সত্য :

পরকালে মানুষের আমলনামা যার যার হাতে দেওয়ার ব্যাপারে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত ও মু'তাযিলাদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। তা নিম্নে প্রদত্ত হলো।

আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের মতামত :

কিতাব তথা আমলনামা সম্পর্কে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের অভিমত হলো রোজনামচা, আমলনামা বা কৃতকর্ম এটা চির সত্য। এতে মানুষের ভালোমন্দ কর্ম লিপিবদ্ধ থাকবে। আর এ আমলনামা মু'মিনদেরকে ডান হাতে এবং কাফেরদেরকে বাম হাতে দেওয়া হবে।

দলিল : মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন- وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا অর্থাৎ আমরা তার জন্য কিয়ামত দিবসে কিতাব (আমলনামা) বের করব। যা তার সাথে প্রকাশিত হবে বিস্তৃত অবস্থায়। -[সূরা বনী ইসরাঈল]

* অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন- فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا অর্থাৎ আর যাকে আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হবে, অবশ্যই তার হিসাব হবে সহজ হিসাব। -[সূরা হাক্বাহ]
* অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন- اِقْرَأْ كِتَابَكَ كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا অর্থাৎ আজ তুমি তোমার আমলনামা পাঠ কর। আজ তুমিই তোমার হিসাবের জন্য যথেষ্ঠ। -[সূরা বনী ইসরাঈল]

সুতরাং বুঝা গেল আমলনামা দেওয়ার পর তা পাঠ করানো হবে।

মু'তাযিলাদের মতামত :

মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের আকিদা হলো পরকালে আমলনামা দেওয়ার ব্যাপারে যে সকল কথা প্রচলিত রয়েছে তা একেবারেই নিরর্থক।

দলিল : তারা তাদের স্বপক্ষে দলিল হিসেবে বলে, মানুষের আমলের বা কৃতকর্মের কোনো দেহাবয়ব বলতে কোনো কিছু নেই। তাই এগুলো লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষণ করা নিরর্থক। অতএব আমলনামা বলতে কোনো কিছুই নেই।

মু'তাযিলাদের জবাব :

তাদের জবাবে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতগণ বলেন, মহান আল্লাহর কার্যাবলি কোনো উদ্দেশ্য ভিত্তিক হয় না। তবে যদি এটা মেনে নেওয়া হয় যে তাঁর কার্যাবলি বিশেষ উদ্দেশ্য ভিত্তিক হয়। তাহলে একথা মেনে নিতে হবে যে, কিতাব তথা আমলনামা প্রদানের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার মহা কৌশল বিদ্যমান। যা আমাদের চিন্তার বহির্ভূত। কিতাব সত্য হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করা সমীচীন নয়।

কিতাব পাঠ :

হযরত কাতাদা (রা.) বলেন, প্রতিদান দিবসে লেখা পড়া না জানা ব্যক্তিও স্বীয় আমলনামা পড়তে পারবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা এর সত্যতার ঘোষণা দিয়ে বলেন- فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولٰئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا. অর্থাৎ যাদেরকে ডান হাতে কিতাব দেওয়া হবে তারা নিজেদের কিতাব পাঠ করবে। আর তারা সলিতা পরিমাণও অত্যাচারিত হবে না। -[সূরা নিসা]

অতএব, কিতাব পাঠ সত্য। তা অস্বীকারকারী বিপথগামী।

ছওয়াব, শাস্তি, পুলসিরাত ও মিজান সত্য

وَالثَّوَابِ وَالْعِقَابِ وَالصِّرَاطِ وَالْمِيْزَانِ.

অনুবাদ : আমরা ছওয়াব, শাস্তি, পুলসিরাত ও মিযান-এর প্রতি ঈমান রাখি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قوله وَالثَّوَابِ : মানুষ যদি সৎকর্মের সাথে জড়িত থাকে, সৎকর্ম সম্পাদন করে তবে আল্লাহ তা'আলা তাকে প্রতিদান তথা ছওয়াব প্রদান করবেন। এর প্রতি আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে। কুরআন সুন্নাহর পরিভাষায় একে আজর বা প্রতিদান বলে। নিম্নে এর সত্যতা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো-

ছওয়াব-এর সত্যতা :

নকলী দলিল :

* আল্লাহ তা'আলা বলেন- وَاِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اُجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ অর্থাৎ তোমাদের কর্মের প্রতিদান প্রদান করা হবে কিয়ামতের দিন। -[সূরা আলে ইমরান]
* বান্দার ভালো প্রতিদান প্রদর্শনের মাধ্যমে দেওয়া হবে। যেমন- فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ অর্থাৎ যে ব্যক্তি অনু পরিমাণ ভালো কর্ম করবে সে তা দেখতে পাবে। -[সূরা যিলাযল]
* কিয়ামতের দিন বান্দাকে সুফল সম্মান প্রদর্শন করে দেওয়া হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন- يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ وَّتَسْوَدُّ وُجُوْهٌ - وَاَمَّا الَّذِيْنَ ابْيَضَّتْ وُجُوْهُهُمْ فَفِيْ رَحْمَةِ اللّٰهِ অর্থাৎ সেদিন অনেক মুখমণ্ডল আলোকময় হবে এবং অনেক চেহারা হবে কালো বিশ্রিত। যাদের মুখমণ্ডল আলোকময় হবে তারা আল্লাহর রহমতে থাকবে। -[সূরা হূদ]
* অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন- ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْاَوْفٰى অতঃপর তাকে প্রতিদান দেওয়া হবে পরিপূর্ণ প্রতিদান। -[সূরা নাজম]
* অন্য আরেক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন- مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ عَشْرُ اَمْثَالِهَا অর্থাৎ যে ব্যক্তি একটি সৎকর্ম সম্পাদন করবে তার জন্য এর দশগুণ ছওয়াব থাকবে। -[সূরা আন'আম]
* অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন- وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهٗ وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ অর্থাৎ আপনি যাকে সেদিন অমঙ্গল থেকে বাঁচাবেন। নিশ্চয় আপনি তাকে অনুগ্রহ করবেন। আর এটাই মহা সফলতা।
* মু'মিনগণকে আল্লাহ তা'আলা চিরস্থায়ী জান্নাত প্রতিদান হিসেবে দান করবেন। যেমন ইরশাদ হচ্ছে وَاَمَّا الَّذِيْنَ سُعِدُوْا فَفِى الْجَنَّةِ خَالِدِيْنَ فِيْهَا. অর্থাৎ আর যারা হবে ভাগ্যবান তারা চিরকাল জান্নাতে থাকবে। -[সূরা হূদ]

  এছাড়া হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর অসংখ্য হাদীসে সৎকর্মশীলদেরকে আল্লাহ তা'আলা ছওয়াব হিসেবে প্রতিদান দেওয়ার কথা রয়েছে।

যৌক্তিক দলিল :

পৃথিবীর রীতি অনুযায়ী যদি কেউ মালিকের কাজ করে তাহলে মালিক তাকে নিয়মানুযায়ী প্রতিদান দিয়ে থাকে। অনেক সময় তার কাজে মালিকের মন সন্তুষ্ট হয়ে গেলে অতিরিক্ত

প্রতিদানও দিয়ে থাকে। অনুরূপ সকল মানুষ আল্লাহ তা'আলার অধীন। যদি অধীনস্ত তার কার্যাবলি ঠিকভাবে আদায় করে তবে তিনিও বান্দাকে প্রতিদান দিবেন। যদি তিনি বান্দার উপরে সন্তুষ্ট হয়ে যান। তবে প্রতিদান আরো বেশি দিবেন। আর উক্ত প্রতিদানই হলো ছওয়াব।

قوله وَالْعِقَابِ : বান্দা আল্লাহ তা'আলার নাফরমানি করলে কিংবা তার আদেশ অনুযায়ী না চলার কারণে আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে শাস্তি প্রদান করবেন। এই কথার উপর মু'মিন বিশ্বাস রাখে।

শাস্তি প্রদানের সত্যতা :

নকলী দলিল :

* মহান আল্লাহ তা'আলা এতদসম্পর্কে ইরশাদ করেন- وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْهُ فَاِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا. অর্থাৎ যে আল্লাহর স্মরণ হতে বিমুখ থাকবে সে কিয়ামতের দিন পাপের বোঝা উঠাবে। -[সূরা ত্বাহা]
* অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন- وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ অর্থাৎ যে অণু পরিমাণ মন্দ আমল করবে সে তা দেখতে পাবে। -[সূরা যিলযাল]
* অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন- وَاَمَّا الَّذِيْنَ اسْوَدَّتْ وُجُوْهُهُمْ اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ অর্থাৎ আর যাদের মুখমণ্ডল কালো হবে, তাদেরকে বলা হবে তোমরা কি ঈমান আনার পর কাফের হয়ে গিয়েছিলে? অতএব তোমাদের কুফরির কারণে শাস্তির স্বাদ গ্রহণ কর। -[সূরা হূদ]
* পাপকর্ম করার কারণে পরিপূর্ণ আজাব তথা প্রতিদান দেওয়া হবে। এতে সামান্যতমও হ্রাস করা হবে না এবং বৃদ্ধিও করা হবে না। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন- ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْاَوْفٰى অতঃপর পরিপূর্ণ [মন্দের] প্রতিদান দেওয়া হবে।
  অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন- وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزٰى اِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ অর্থাৎ আর যে ব্যক্তি মন্দ কর্ম নিয়ে আসবে তাকে তার সমপরিমাণ প্রতিদানই দেওয়া হবে। তারা এতে কোনো ধরনের অত্যাচারিত হবে না। -[সূরা আন'আম]
* অপর আয়াতে আল্লাহ বলেন- فَاِذَا جَاءَ اَمْرُ اللّٰهِ قُضِىَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُوْنَ। অর্থাৎ যখন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আদেশ আসবে তখন ন্যায় সঙ্গত ফয়সালা হয়ে যাবে। আর এতে সকল প্রকার বাতিল ধ্বংস প্রাপ্ত হবে। -[সূরা মু'মিন]
  অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন- فَاَمَّا الَّذِيْنَ شَقُوْا فَفِى النَّارِ لَهُمْ فِيْهَا زَفِيْرٌ وَّشَهِيْقٌ خَالِدِيْنَ فِيْهَا অর্থাৎ যারা হতভাগা তারা জাহান্নামে যাবে। সেখানে তারা আর্তনাদ ও চিৎকার করতে থাকবে এবং সেখানে তারা চিরকালের জন্য স্থায়ী হবে। -[সূরা হূদ]
  এছাড়াও আরো অনেক আয়াতে ইকাব-এর কথা বলেছেন। রাসূল ﷺ অনেক হাদীসে তা বর্ণনা করেছেন।

যৌক্তিক দলিল :

পৃথিবীর নিয়মানুযায়ী গোলাম তার মালিকের কার্যাবলি ঠিকমতো আদায় না করলে তাকে বেধরক মারপিঠ করে। আর আল্লাহ তা'আলা সকল মানুষের মালিক। যদি তাঁর কোনো আদেশ অমান্য করা হয় তবে তো তিনিও তাদেরকে তাঁর আদেশ অমান্য করার কারণে শাস্তি দিতে পারেন। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা অসৎ কর্ম সম্পাদনকারীকে শাস্তি দিবেন। এতে বিচলিত বা সন্দেহ করার তো কিছু নেই।

قوله والصراط : জাহান্নামের দাবানল জ্বলছে। এর উপরই রয়েছে দীর্ঘ সেতু। এরই নাম اَلصِّرَاطْ যা অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও সূক্ষ্ম। এর উপর দিয়ে মু'মিন ব্যক্তি বিজলীর ন্যায় পার হয়ে যাবে। কিন্তু কাফের ব্যক্তি পার পাবে না। আর এই সেতুর অস্তিত্ব সত্য হওয়া না হওয়া নিয়ে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত ও মু'তাযিলাদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। নিম্নে তার আলোচনা করা হলো।

আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের মতামত :

আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত বলে পুলসিরাত চির সত্য। দোজখের আগুনের উপর সুদীর্ঘ পথ আর সুতীক্ষ্ণ একটি পুল। যা চুলের চেয়ে চিকন এবং তরবারীর চেয়েও ধারালো। আর তা পাড়ি দিয়েই যেতে হবে স্বর্গে না হয় নরকে।

দলিল : তারা নিজেদের স্বপক্ষে আল্লাহ্ তা'আলার বাণী উল্লেখ করেন, وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلٰى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا অর্থাৎ তোমাদের সকলকেই তা পাড়ি দিতে হবে। -[সূরা মারইয়াম]

এই আয়াতে ঘোষণা হয়েছে যে, পুণ্যবান হোক বা পাপী হোক সকলকেই উক্ত পুলসিরাত পাড়ি দিয়ে জাহান্নামে বা জান্নাতে যেতে হবে। পুণ্যবানরা সহজেই পাড়ি দিবে। পাপীরা নিমজ্জিত হবে নরকের প্রজ্জ্বলিত দাবানলে।

* রাসূল ﷺ বলেছেন- يُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَانَىْ جَهَنَّمَ فَاَكُوْنُ اَوَّلَ مَنْ يَّجُوْزُ مِنَ الرُّسُلِ بِاُمَّتِهٖ وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ اِلَّا الرُّسُلُ وَكَلَامُ الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ الخ অর্থাৎ জাহান্নামের উপর পুলসিরাত নির্মাণ করা হবে। অতঃপর রাসূলগণের মধ্যে স্বীয় উম্মত নিয়ে সর্বপ্রথম আমিই তা পাড়ি দিব। ঐদিন রাসূল ব্যতীত কেউ কোনো কথা বলবে না ....। -[বুখারী ও মুসলিম]
* অন্য এক হাদীসে রাসূল ﷺ বলেছেন যে, পুলসিরাত চুল থেকে তীক্ষ্ণ এবং তরবারি থেকে বেশি ধারালো। সুতরাং صِرَاطٌ চির সত্য এতে কোনো সন্দেহ নেই।

মু'তাযিলাদের অভিমত :

মু'তাযিলা সম্প্রদায় তাদের চিরাচরিত নিয়ম অনুযায়ী বলে পুলসিরাত বলতে কোনো কিছু নেই। পুলসিরাতের অস্তিত্বই নেই।

দলিল :

* তারা তাদের অভিমতের স্বপক্ষে দলিল প্রদান করতে গিয়ে বলেন- لَا يُمْكِنُ الْعُبُوْرُ عَلَيْهَا অর্থাৎ এ পুলের উপর দিয়ে পার হওয়া সম্ভব নয়।
* وَاِنْ اَمْكَنَ فَهُوَ تَعْذِيْبٌ لِلْمُؤْمِنِيْنَ অর্থাৎ যদি তা পার হওয়া সম্ভবও হয়, তবু তা মু'মিনের জন্য কষ্টকর হবে। আর আল্লাহ মু'মিনকে কষ্ট দিতে চান না। সুতরাং তা পার হওয়া যুক্তিযুক্ত নয়।

তাদের জবাব :

মুতাযিলাদের এই ভ্রান্তির জবাবে আহলে হক বলেন, আল্লাহ তা'আলা হলেন সর্ববিষয়ে শক্তিমান। তিনি মু'মিনদের পুলসিরাত পাড়ি দেওয়ার সামর্থ্য দান করবেন। মূলত তা পার হওয়া মু'মিনদের জন্য হবে একেবারেই সহজ।

এমনকি হাদীসের মধ্যে রয়েছে কোনো মু'মিন তা বিদ্যুতের ন্যায়, কেউ প্রবল বাতাসের ন্যায়, আবার কেউ দ্রুত অশ্বের ন্যায় পার হবে। অতএব তা চির সত্য প্রমাণিত হলো।

قوله والميزان : কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তা'আলা বান্দার আমল পরিমাপ করার জন্য মিজান স্থাপন করবেন। যার নেক পুণ্যের পাল্লা ভারি হবে সে মুক্তি পাবে। আর যার বদ বা পাপের পাল্লা ভারি হবে সে মুক্তি পাবে না; বরং জাহান্নামে যাবে।" কিয়ামতের দিন "মিজান" স্থাপন করা হবে তা সত্য। কিন্তু মু'তাযিলা সম্প্রদায় এতে দ্বিমত পোষণ করেন। নিম্নে এর আলোচনা করা হলো।

আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের অভিমত :

আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত বলেন, "মিযান" চির সত্য। আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন "মিযান" স্থাপন করবেন। বান্দাদের নেক পরিমাপ করবেন। "মিযান" বলা হয় عَمَّا يُعْرَفُ بِهِ مَقَادِيْرُ الْاَعْمَالِ অর্থাৎ এমন যন্ত্র যা দ্বারা আমলের পরিমাণ জানা যায়।

দলিল :

* আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- اَلْوَزْنُ يَوْمَئِذِ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ অর্থাৎ ওজন করা হবে সেদিন চির সত্য। অতএব যাদের পাল্লা ভারি হবে তারা সফলকাম হবে।
* অন্যত্র বলেন- فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهُ فَهُوَ فِيْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ অর্থাৎ সেদিন যার পাল্লা ভারি হবে সে সুখী জীবন যাপন করবে। -[সূরা কারিয়া]
* কালামে পাকে আরো ইরশাদ হয়েছে- وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا অর্থাৎ আমি কিয়ামতের দিন ন্যায়বিচারের মানদণ্ড প্রতিস্থাপন করবো। অতএব কারো প্রতি কোনো প্রকার অত্যাচার করা হবে না। -[সূরা আম্বিয়া]
* হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রাসূল ﷺ-এর দরবারে এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল আমার দুটি দাস আমাকে মিথ্যাবাদী বলে। কাজে ফাঁকি দেয়। আমার নির্দেশ অমান্য করে। এর ফলে আমি তাদেরকে গালমন্দ করি এবং মারধরও করি। আমার ও এই গোলামদ্বয়ের মাঝে ইনসাফ কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে?

  রাসূল ﷺ বললেন, তাদের নাফরমানি আর ফাঁকিবাজী ওজন করা হবে। এরপর তোমার গালমন্দ ও মারধর ওজন করা হবে। তুমি তাদেরকে যে শাস্তি দাও তা যদি তাদের অপরাধের কম হয়, তবে অবশিষ্ট অংশ অনুগ্রহ বলে গণ্য হবে। আর যদি বেশি হয় তবে তোমার বাড়াবাড়ির প্রতিশোধ গ্রহণ করা হবে।

  লোকটি একথা শুনে অন্যত্র গিয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। তখন রাসূল ﷺ তাকে বললেন, তুমি কি এ আয়াত পাঠ করনি? وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الخ লোকটি আরজ করল! ওগো আল্লাহর রাসূল! এখন তো তাদেরকে মুক্ত করা ছাড়া এই হিসাব থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়। অতএব আমি এখনই তাদেরকে মুক্ত করে দিলাম। -[তিরমীযী]

মু'তাযিলাদের অভিমত :

মু'তাযিলা সম্প্রদায় বলে যে, পরকালে আমল ওজন করা হবে এটি অসম্ভব এবং অবাস্তব।

দলিল :

* মু'তাযিলাদের দলিল হলো আমলসমূহ কায়া বা আকৃতিবিহীন বস্তু। আর যার কায়া তথা শরীর নেই তা কিভাবে ওজন করা হবে?
* সমস্ত আমল আল্লাহ্ তা'আলার পরিজ্ঞাত। আর আল্লাহ্ তা'আলার পরিজ্ঞাত বস্তুর ওজন দেওয়া নিরর্থক।

তাদের জবাব :

اِنَّ كِتَابَ الْاَعْمَالِ تُوْزَنُ অর্থাৎ নিশ্চয় আমলসমূহের কিতাব ওজন করা হবে। আর এ হাদীসের আলোকে বলা যায় যে, অবশ্যই আমলনামা ওজন করা হবে এতে কোনো ধরনের সংশয়, সন্দেহ বা দ্বন্দ্ব নেই। আমল পরিমাপ করার মধ্যে মহান আল্লাহর কৌশল নিহিত রয়েছে। আর এটা আমাদের বোধগম্য নয়। সুতরাং এটা আমাদের অজানা থাকলেই অসম্ভব বলা অনুচিত।

স্বশরীরে পুনরুত্থান

وَالْبَعْثُ هُوَ حَشْرُ الْاَجْسَادِ وَاِحْيَاءُهَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ.

অনুবাদ : বা'ছ বলতে কিয়ামত দিবসে শরীরসমূহ একত্রিত করা ও তা পুনর্জীবিত করাকে বুঝানো হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قوله وَالْبَعْثُ هُوَ الْحَشْرُ الخ : পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা সকল মানুষকে কিয়ামতের দিন পুনরুত্থিত করবেন। আর এই পুনরুত্থানের পদ্ধতি হবে মানুষের শরীর পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুক না কেন, সকল শরীরকে তিনি একত্রিত করবেন। আর উক্ত শরীর হবে দুনিয়াতে জীবিত থাকাবস্থায় যেরূপ ছিল তদ্রূপ। অতঃপর সকল শরীরে রূহ দিয়ে পুনর্জীবন দান করবেন। সকল মু'মিনকে এ কথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে হবে। এটাই হলো আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আকিদা বা বিশ্বাস।

দলিল :

* আল্লাহ তা'আলা এ সম্পর্কে বলেন– وَاَنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ مَنْ فِى الْقُبُوْرِ অর্থাৎ নিশ্চয় যারা কবরস্থ রয়েছে তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা পুনরুত্থিত করবেন।
* অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন– وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ عُمْيًا وَّبُكْمًا وَّصُمًّا وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيْرًا অর্থাৎ আমি তাদেরকে কিয়ামতের দিন অন্ধ, মুখে ভর দেওয়া, মুক ও বধির অবস্থায় একত্রিত করবো। তাদের ঠিকানা জাহান্নাম। যখনই তা নির্বাপিত হবে আমি তা বৃদ্ধি করে দেব। –[সূরা বনী ইসরাঈল]
* অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন– مَنْ يُّحْىِ الْعِظَامَ وَهِىَ رَمِيْمٌ قُلْ يُحْيِيْهَا الَّذِىْ اَنْشَأَهَا اَوَّلَ مَرَّةٍ অর্থাৎ সে সৃষ্টি করবে অস্থিসমূহকে যখন তা পঁচে গলে যাবে? আপনি বলুন, তিনি সৃষ্টি করবেন যিনি প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন। –[সূরা ইয়াসীন]
* অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন– وَقَالُوْا اَاِذَا كُنَّا عِظَامًا وَّرُفَاتًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ خَلْقًا جَدِيْدًا قُلْ كُوْنُوْا حِجَارَةً اَوْ حَدِيْدًا ـ اَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِىْ صُدُوْرِكُمْ فَسَيَقُوْلُوْنَ مَنْ يُّعِيْدُنَا قُلِ الَّذِىْ فَطَرَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ. অর্থাৎ আর তারা বলে, যখন আমরা অস্থিতে পরিণত হবো এবং চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাব তখনও কি আমরা নতুন করে সৃজিত হয়ে পুনরুত্থিত হবো? আপনি বলুন! তোমরা পাথর হয়ে যাও কিংবা লোহা কিংবা এমন বস্তু যা তোমাদের ধারণায় খুবই কঠিন। তথাপি তারা বলবে, আমাদেরকে কে সৃষ্টি করবে পুনর্বার? বলুন, যিনি তোমাদের প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন তিনিই তোমাদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করবেন। –[সূরা বনী ইসরাঈল]

* রাসূল ﷺ বলেছেন- يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ جَمِيْعًا يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ ـ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ الْاَمْرُ اَشَدُّ مِنْ اَنْ يَّنْظُرَ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ. অর্থাৎ হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, কিয়ামতের দিন মানুষকে নগ্নপদ ও নগ্ন শরীর এবং খৎনাহীন অবস্থায় উঠানো হবে। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, এ কথা শুনে আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেখানে তো পুরুষ ও মহিলা একত্রে থাকবে এবং একে অপরের দিকে তাকাবে। নবী করীম ﷺ ইরশাদ করলেন, ওহে আয়েশা! সেদিন একে অপরের দিকে তাকানোর চেয়ে অধিক অবস্থা ভয়াবহ হবে। −[বুখারী ও মুসলিম]

উপরিউক্ত আয়াতসমূহ ও হাদীস এ কথারই প্রমাণ দিচ্ছে যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা সকল শরীর একত্রিত করবেন এবং সেগুলোর মধ্যে রূহ ফুঁকবেন। অর্থাৎ পুনর্জীবন দান করবেন। এতে আল্লাহ তা'আলার কোনো কষ্ট হবে না। কারণ এটা বুঝাই যায় যে, কোনো কারিগর যদি কোনো কিছু তৈরি করে তবে সে প্রথমে মডেল দেখে তৈরি করে। এছাড়া তার পক্ষে কোনো জিনিস তৈরি করা সম্ভব নয়।

কিন্তু আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন মডেল ছাড়া আর যেখানে আল্লাহ তা'আলা মডেল ছাড়াই সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন সেখানে তো তৈরিকৃত মডেল দেখে পুনরায় মানুষকে সৃষ্টি করা একেবারেই সহজ। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা মানুষকে স্বশরীরে পুনরুত্থান করবেন। এতে কোনো সন্দেহ নেই।

দার্শনিকদের অভিমত :

কিছু সংখ্যক দার্শনিক তাদের নিজস্ব অভিমত ব্যক্ত করে বলে যে, আল্লাহ তা'আলা পুনরুত্থান করবেন ঠিকই। কিন্তু এই পুনরুত্থান স্বশরীরে হবে না; বরং শরীর ছাড়াই পুনরুত্থান করবেন।

দলিল : তারা নিজেদের স্বপক্ষে দলিল পেশ করেন যে, আল্লাহ তা'আলা যদি স্বশরীরে পুনরুত্থান করতেন তাহলে অবশ্যই তিনি পূর্বেকার নবী-রাসূলগণকে এ সম্পর্কে অবহিত করতেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এ সম্পর্কে পূর্বেকার কোনো নবী-রাসূলকে জানাননি। যার কারণে বুঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা পুনরুত্থান স্বশরীরে করবেন না।

দার্শনিকদের দলিলের জবাব :

আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত দার্শনিকদের এ প্রশ্নের জবাবে বলেন, তাদের এ কথাটি একেবারেই ভিত্তিহীন, বিভ্রান্তিকর ও বানোয়াট। কারণ পূর্বেকার সকল নবী রাসূলগণই তাদের স্বীয় উম্মতদেরকে এ সম্পর্কে অবহিত করে গেছেন এবং উম্মতদেরকে জান্নাতের সামান বা উপকরণ প্রস্তুত করার জন্য তাগিদ দিয়ে গেছেন। পবিত্র কুরআনে এ সম্পর্কে বহু আয়াত রয়েছে।

দলিল : যেমন আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ.) কে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে− اِهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَّلَكُمْ فِى الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ قَالَ فِيْهَا تَحْيَوْنَ وَ فِيْهَا تَمُوْتُوْنَ وَمِنْهَا تُخْرَجُوْنَ. অর্থাৎ তোমরা নেমে যাও। তোমরা একে অপরের শত্রু। আর তোমাদের জন্য পৃথিবীতে বাসস্থান রয়েছে এবং এক নির্দিষ্ট সময়

পর্যন্ত ফল ভোগ করার সুযোগ রয়েছে। তিনি বললেন, তোমরা সেথায় জীবিত থাকবে এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করবে এবং সেখান থেকেই তোমাদের বের করা হবে। –[সূরা আ'রাফ]

* হযরত নূহ (আ.) নিজ জাতিকে বলেছেন– وَاللّٰهُ اَنْبَتَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيْدُكُمْ فِيْهَا وَيُخْرِجُكُمْ اِخْرَاجًا– অর্থাৎ আর আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে ভূ-পৃষ্ঠ হতে উদ্‌গত করেছেন। অতঃপর তাতে তোমাদেরকে ফিরিয়ে নিবেন এবং তোমাদেরকে সেখান থেকে পুনরুত্থান করবেন। –[সূরা নূহ]
* হযরত মূসা (আ.) নিজ সম্প্রদায়কে বলেছিলেন– يَا قَوْمِ اِنَّمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَاِنَّ الْاٰخِرَةَ هِىَ دَارُ الْقَرَارِ অর্থাৎ হে আমার জাতি! এই পার্থিব জীবন তো কেবল উপভোগের বস্তু। আর পরজীবন হচ্ছে স্থায়ী বাসস্থান। –[সূরা মু'মিন]
* হযরত ইবরাহীম (আ.) আল্লাহ তা'আলা নিকট দোয়া করে বলেছেন– وَلَا تُخْزِنِىْ يَوْمَ يُبْعَثُوْنَ অর্থাৎ হে আমার প্রতিপালক পুনরুত্থানের দিন তুমি আমাকে লাঞ্ছিত করো না। –[সূরা শু'আরা]

উপরিউক্ত বর্ণিত দলিলসমূহ দ্বারা বুঝা গেল যে, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক নবী রাসূল-এর নিকট পুনরুত্থানের সংবাদ দিচ্ছেন। যেমন এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন– وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَاۤ اَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَاۤءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا – قَالُوْا بَلٰى وَلٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ– অর্থাৎ তাদেরকে জাহান্নামের দায়িত্বশীল ফেরেশতাগণ বলবেন, তোমাদের নিকট কি তোমাদের রাসূলগণ যাননি? যারা তোমাদের প্রভুর আয়াতসমূহ তোমাদেরকে তেলাওয়াত করে শুনিয়েছেন এবং তোমাদেরকে এই দিনের অবস্থা ও ভয়ভীতি প্রদর্শন করে সতর্ক করছেন। তারা বলবে হ্যাঁ অবশ্যই এসেছিলেন। কিন্তু কাফেরদের বেলায় শাস্তির হুকুমই নির্ধারিত হয়েছে। –[সূরা যুমার]

বর্ণিত আয়াতসমূহ থেকে একথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে গেল যে, আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে হযরত মুহাম্মদ ﷺ পর্যন্ত সকল নবীকে পুনরুত্থান সম্পর্কে অবহিত করেছেন এবং সকল নবী নিজ নিজ সম্প্রদায়কেও সে সম্পর্কে যথাযথভাবে অবহিত করেছেন। পরকাল ও পুনরুত্থান সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শনও করেছেন। তাঁদের মতো আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মদ ﷺ কেও অসংখ্য আয়াত দ্বারা পুনরুত্থান সম্পর্কে অবহিত করেছেন। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে মুহাম্মদ ﷺ -এর পর কোনো নবী রাসূল কিয়ামত পর্যন্ত আগমন করবেন না। এ কারণে আল্লাহ তা'আলা অসংখ্য আয়াতে পুনরুত্থান সম্পর্কে আলোচনা করেছেন এবং রাসূল ﷺ তাঁর হাদীসে বিস্তারিত ভাবে তা আলোচনা করেছেন। কিন্তু যে সকল দার্শনিক পূর্বেকার নবী রাসূলগণ পুনরুত্থান সম্পর্কে কিছু বলেন নি বলেছেন, সে সকল দার্শনিকদের এটি ভ্রান্তি ও আল্লাহর রাসূলদের প্রতি অপবাদ দেওয়া ছাড়া আর কিছু নয়। (আল্লাহ তা'আলা আমাদের হেফাজত করুন)

জান্নাত-জাহান্নাম আল্লাহ তা'আলার সৃষ্ট

وَالْجَنَّةُ وَالنَّارُ مَخْلُوقَتَانِ لَا يَفْنَيَانِ اَبَدًا وَلَا يَبِيْدَانِ.

অনুবাদ : জান্নাত ও জাহান্নাম উভয়টিই সৃষ্ট। এ দুটো নশ্বর হবে না এবং কখনো ধ্বংসও হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قوله وَالْجَنَّةُ : গ্রন্থকার ইমাম ত্বহাবী (র.) জান্নাত ও জাহান্নাম সম্পর্কে আমাদের যে আকিদা থাকা দরকার তার আলোচনা শুরু করেছেন। নিম্নে এর আলোচনা সবিস্তার করা হলো–

জান্নাত পরিচিতি :

جَنَّةٌ শব্দের আভিধানিক অর্থ :

جَنَّةٌ -এর আভিধানিক অর্থ হলো– বাগান, উদ্যান, বাগিচা ইত্যাদি।

পারিভাষিক অর্থ– পরিভাষায় জান্নাত বলা হয় পরকালীন জীবনে আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে তাঁর হুকুম মান্য করার কারণে প্রতিদান স্বরূপ যে বাগিচা দান করবেন এবং যাতে তারা চিরকাল অবস্থান করবে।

জান্নাত সম্পর্কে আকিদা :

জান্নাত আল্লাহ তা'আলার সৃষ্ট। তিনি এটাকে সৃষ্টি করেছেন একমাত্র বান্দাদের নেক কাজের প্রতিদান হিসেবে দেওয়ার জন্য। যেমন– আল্লাহ তা'আলা জান্নাত সম্পর্কে বলেন– وَقُلْنَا يَاۤ اٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. অর্থাৎ আমি বললাম হে আদম! তুমি এবং তোমার স্ত্রী জান্নাতে অবস্থান কর এবং সেখানে যা পাও পরিতৃপ্তি সহকারে খাও। –[সূরা বাকারা]

* অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন– هٰذَا ذِكْرٌ وَاِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ لَحُسْنَ مَاٰبٍ جَنّٰتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْاَبْوَابُ অর্থাৎ এটা এক মহৎ আলোচনা। খোদাভীরুদের জন্য রয়েছে উত্তম ঠিকানা। তথা স্থায়ী বসবাসের জন্য জান্নাত। তাদের জন্য তার দ্বার উন্মুক্ত। –[সূরা ছোয়াদ]
* অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন– اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنّٰتُ الْفِرْدَوْسِ অর্থাৎ যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে তাদের জন্য ফেরদাউস নামক জান্নাত প্রস্তুত রয়েছে। –[সূরা কাহাফ]
* একটি হাদীসে রাসূল ﷺ বলেছেন– اِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهٗ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ وَاِنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ ... الخ অর্থাৎ নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে যখন কেউ মৃত্যুবরণ করে তখন কবরে প্রতি সকাল ও সন্ধ্যায় তার ভবিষ্যৎ স্থান তার নিকট হাজির করা হয়। সে যদি জান্নাতীদের অন্তর্ভুক্ত হয় তাহলে জান্নাতীদের স্থান। –[বুখারী ও মুসলিম]

* রাসূল ﷺ মে'রাজের তথা উর্ধ্বগমনের রাতে [যে রাতে নবী মুহাম্মদ ﷺ সরাসরি আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভে ধন্য হন] নিজ চক্ষুতে জান্নাত দেখেছেন বলে বর্ণিত আছে।

উপরিউক্ত আয়াত ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের জন্য জান্নাত নির্মাণ করেছেন এবং কিয়ামতের দিন বান্দাকে তা প্রদান করবেন। এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। এছাড়াও আরো বহু আয়াত ও হাদীসে আল্লাহ তা'আলা ও রাসূল ﷺ জান্নাতের বিবরণ দিয়েছেন। যার বর্ণনা এই সংক্ষিপ্ত গ্রন্থে প্রদান করা সম্ভব নয়।

قوله اَلنَّارُ : মু'মিনদের জন্য আল্লাহ তা'আলা যেরূপ জান্নাত রেখেছেন অনুরূপভাবে কাফের ও পাপীদের জন্য জাহান্নাম ও রেখেছেন। নিম্নে এর আলোচনা তুলে ধরা হলো।

নার পরিচিত :

اَلنَّارُ -এর আভিধানিক অর্থ : اَلنَّارُ-এর আভিধানিক অর্থ হলো অগ্নি, আগুন।

শরিয়তের পরিভাষায় اَلنَّارُ বলা হয়, আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত আইন-কানুন অমান্য ও অস্বীকার করার কারণে আল্লাহ যে বস্তুর মাধ্যমে শাস্তি প্রদান করবেন।

নার বা জাহান্নাম সম্পর্কে আকিদা :

আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামকে সৃষ্টি করেছেন যারা তাঁর আদেশ ও নিষেধ অমান্য করে চলবে তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার জন্য। এ আকিদাই আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত পোষণ করেন।

দলিল :

* আল্লাহ তা'আলা বলেন- جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمِهَادُ অর্থাৎ জাহান্নামেই তারা পৌঁছবে। আর জাহান্নাম কতইনা নিকৃষ্ট আবাসস্থল। -[সূরা ছোয়াদ]

* অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন- وَاَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِيْنَ نُزُلًا অর্থাৎ আমি কাফেরদেরকে অভ্যর্থনা দেওয়ার জন্য জাহান্নামকে প্রস্তুত করে রেখেছি। -[সূরা কাহাফ]

* অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন- اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِيْنَ سَلَاسِلَ وَاَغْلَالًا وَّسَعِيْرًا অর্থাৎ আমি কাফেরদের জন্য শিকল, বেড়ি ও প্রজ্বলিত অগ্নি প্রস্তুত করে রেখেছি।

উপরিউক্ত সবগুলো আয়াতই একথা প্রমাণ করেছে যে, আল্লাহ তা'আলা জাহান্নাম সৃষ্টি করেছেন। এটি বর্তমানেও বিদ্যমান রয়েছে। এ সম্পর্কে অনেক হাদীস রাসূল ﷺ থেকে বর্ণিত আছে।

যেমন এক হাদীসে রাসূল ﷺ বলেন- اِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِىِّ .... وَاِنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ النَّارِ فَمِنْ اَهْلِ النَّارِ فَيُقَالُ هٰذَا مَقْعَدُكَ حَتّٰى يَبْعَثَكَ اللّٰهُ اِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. অর্থাৎ যদি তোমাদের কেউ মারা যায় তাহলে তার নিকট সকাল-সন্ধ্যা তার আবাসস্থল উপস্থিত করা হয়। .... আর যদি জাহান্নামের অধিবাসী হয় তাহলে তার নিকট জাহান্নাম হাজির করা হয়। আর যে ব্যক্তি জাহান্নামী হবে তাকে বলা হবে এটি তোমার আবাসস্থল। অতঃপর কিয়ামতের দিন তোমাকে তথায় পাঠাবেন। -[বুখারী ও মুসলিম]

এই হাদীস দ্বারা পূর্ণভাবেই বুঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা জাহান্নাম সৃষ্টি করেছেন এবং তা এখনো বর্তমান রয়েছে। এছাড়াও হযরত রাসূল ﷺ মে'রাজের রাতে জাহান্নামের ভয়াবহ দৃশ্য দেখার কথা বলেছেন। এছাড়াও তিনি বহু হাদীসে জাহান্নামের কথা বলেছেন।

মু'তাযিলাদের অভিমত :

তারা বলে যে জান্নাত-জাহান্নাম আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন সৃষ্টি করবেন। এখনো পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাত জাহান্নাম সৃষ্টি করেন নি।

তাদের জবাব :

মু'তাযিলাদের উক্তির জবাবের আমরা বলবো, উপরে জাহান্নাম ও জান্নাত সৃষ্টির স্বপক্ষে আমাদের পক্ষ থেকে যে দলিল দেওয়া হয়েছে তা-ই তাদের জবাবের জন্য যথেষ্ট। যেহেতু তাদের মতামত কুরআন ও হাদীসের বিরুদ্ধে তাই তারা ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হলো।

قوله لَايَنْفِيَانِ اَبَدًا وَلَا يَبِيْدَانِ : আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্টি করেছেন তা চিরকাল থাকবে। এগুলো নশ্বর হবে না এবং ধ্বংসও হবে না।

দলিল : আল্লাহ্ তা'আলা বলেন- اَمَّا الَّذِيْنَ سُعِدُوْا فَفِى الْجَنَّةِ خَالِدِيْنَ فِيْهَا وَاَمَّا الَّذِيْنَ شَقُوْا فَفِى النَّارِ لَهُمْ فِيْهَا زَفِيْرٌ وَّشَهِيْقٌ خَالِدِيْنَ فِيْهَا. অর্থাৎ যারা ভাগ্যবান। তারা জান্নাতে যাবে আর তথায় তারা চিরকাল থাকবে। আর যারা হতভাগা তারা যাবে জাহান্নামে। তথায় তারা চিরকাল থাকবে। এই আয়াতে জান্নাতে ও জাহান্নামে তার অধিবাসীরা চিরকাল থাকার অর্থ হলো জান্নাত ও জাহান্নাম চিরকাল থাকা। সুতরাং তা ধ্বংস হবে না।

* অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন- عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوْذٍ অর্থাৎ জান্নাত অবিচ্ছিন্ন মহা দান।
* অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন- اِنَّ هٰذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهٗ مِنْ نَّفَادٍ অর্থাৎ এটি আমার প্রদত্ত রিজিক যার কোনো শেষ নেই।
* অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন- لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا الْمَوْتَ اِلَّا الْمَوْتَةَ الْاُوْلٰى অর্থাৎ তারা জান্নাত-জাহান্নামে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে না। একমাত্র [পৃথিবীর] প্রথম মৃত্যু ছাড়া।
* অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন- اُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا
* অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন- وَمَا هُمْ بِخَارِجِيْنَ مِنَ النَّارِ
* অপর আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন- اَلنَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِيْنَ فِيْهَا اِلَّا مَاشَاءَ اللّٰهُ
* এ সম্পর্কে হযরত রাসূল ﷺ বলেন- اِذَا صَارَ اَهْلُ الْجَنَّةِ اِلَى الْجَنَّةِ وَاَهْلُ النَّارِ اِلَي النَّارِ بِالْمَوْتِ حَتّٰى يَجْعَلَ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ثُمَّ يُذْبَحُ ثُمَّ يُنَادِى الْمُنَادِىْ يَا اَهْلَ الْجَنَّةِ لَامَوْتَ وَيَا اَهْلَ النَّارِ لَا مَوْتَ فَيَزْدَادُ اَهْلُ الْجَنَّةِ فَرْحًا اِلٰى فَرْحِهِمْ وَاَهْلُ النَّارِ حُزْنًا اِلٰى حُزْنِهِمْ. অর্থাৎ যখন জান্নাতিরা জান্নাতে এবং জাহান্নামিরা জাহান্নামে চলে যাবে, তখন মৃত্যুকে জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝে দাড় করানো হবে। অতঃপর মওতকে জবাই করা হবে। অতঃপর এক আহ্বানকারী জান্নাতীদেরকে আহ্বান করে বলবে হে জান্নাতবাসী! মৃত্যু নেই এবং জাহান্নামীদেরকে ডেকে বলবে হে জাহান্নামবাসী! মৃত্যু নেই। তখন জান্নাতীদের আনন্দ বৃদ্ধি পেতে থাকবে এবং জাহান্নামীদের দুশ্চিন্তার উপর দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি পেতে থাকবে। -[বুখারী ও মুসলিম]

উপরিউক্ত আয়াতসমূহ ও হাদীস দ্বারা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হলো যে, জান্নাত ও জাহান্নাম কখনো ধ্বংস হবে না। এটাই আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আকিদা। এর বিপরীত আকিদা পোষণ করা ভ্রান্ত।

জান্নাতী ও জাহান্নামী পূর্ব হতে নির্ধারিত

وَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى خَلَقَ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ قَبْلَ الْخَلْقِ وَخَلَقَ لَهُمَا اَهْلًا فَمَنْ شَاءَ مِنْهُمْ لِلْجَنَّةِ فَضْلًا مِنْهُ وَمَنْ شَاءَ مِنْهُمْ لِلنَّارِ عَدْلًا مِنْهُ وَكُلٌّ يَعْمَلُ لِمَا فَرَغَ مِنْهُ وَصَارَ اِلٰى مَا خُلِقَ لَهُ وَالْخَيْرُ وَالشَّرُّ مُقَدَّرَانِ عَلَى الْعِبَادِ.

অনুবাদ : আল্লাহ তা'আলা মানুষ সৃষ্টির পূর্বেই জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্টি করেছেন এবং জান্নাত ও জাহান্নামের অধিবাসীদেরকে সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং তাদের মধ্য হতে যাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ করে জান্নাতে পাঠাবেন এবং তাদের মধ্য হতে যাকে ইচ্ছা ন্যায়বিচার অনুযায়ী জাহান্নামে পাঠাবেন। প্রত্যেক ব্যক্তি ঐ কাজই সম্পাদন করে যা তার জন্য পূর্ব হতেই নির্ধারণ করা হয়েছে। যার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সে দিকেই সে ফিরে। চিরকাল ভালো ও মন্দ সবই বান্দার ভাগ্যে নির্ধারিত হয়ে আছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قوله خَلَقَ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ الخ : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা মানুষ সৃষ্টির পূর্বে সমস্ত কায়েনাত আসমান, জমিন ও তার মধ্যে সকল বস্তু যেমন- আলো, অন্ধকার, রাত, দিন, ছায়া, রৌদ্র, মাটি, মরীচিকা, নক্ষত্র, তারকা, জীবন, মরণ, ভালো, মন্দ এবং জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্টি করেছেন ছয়দিনে। আর এই ছয় দিনের পর জুমা রাতের দিন হযরত আদম (আ.) কে সৃষ্টি করেছেন। কারণ সকল কিছুই হযরত আদম (আ.)-এর জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। আদমকে সেগুলোর জন্য সৃষ্টি করা হয়নি।

যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন- وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا مِنْهُ অর্থাৎ আসমান ও জমিনে যা কিছু রয়েছে সব কিছুই তোমাদের অধীনস্থ হয়েছে। -[সূরা জাছিয়া]

অতএব বুঝা গেল যে, আল্লাহ তা'আলা জান্নাত ও জাহান্নাম মানুষ সৃষ্টির আগেই সৃষ্টি করেছেন এতে কোনো প্রকার সন্দেহ নেই।

قوله وَخَلَقَ لَهُمَا اَهْلًا : আল্লাহ তা'আলা জান্নাত তথা পুণ্যবানদের জন্য উদ্যান বা স্বর্গ সৃষ্টি করেছেন এবং তার অধিবাসীও সৃষ্টি করেছেন। অনুরূপ জাহান্নাম সৃষ্টি করেছেন এবং তার অধিবাসীও সৃষ্টি করেছেন।

* যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন- وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيْرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ
  অর্থাৎ অনেক জিন ও মানুষ আমি জাহান্নামের জন্য রেখেছি। -[সূরা আ'রাফ]
* হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ لِلْجَنَّةِ اَهْلًا خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِىْ اَصْلَابِ اٰبَائِهِمْ وَخَلَقَ لِلنَّارِ اَهْلًا خَلَقَهُمْ

لَهَا وَهُمْ فِىْ اَصْلَابِ اٰبَائِهِمْ. অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা জান্নাতের অধিবাসী সৃষ্টি করেছেন, তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তারা তাদের পিতাগণের মেরুদণ্ডে থাকাবস্থায় এবং আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামের অধিবাসী সৃষ্টি করেছেন। তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তারা তাদের পিতাদের মেরুদণ্ডে থাকাবস্থায়। -[মুসলিম]

অতএব প্রমাণিত হলো যে, জান্নাত ও জাহান্নামের অধিবাসী পূর্ব থেকেই নির্ধারিত।

قوله فَمَنْ شَاءَ مِنْهُمْ الخ : অর্থাৎ যে কোনো জনই যে ইবাদত বন্দেগি দ্বারা জান্নাতে যাবে এমনটি নয়; বরং তিনি যাকে অনুগ্রহ করে জান্নাতে নিবেন সেই যেতে পারবে।

এ সম্পর্কে আমাদের প্রিয়নবী ﷺ বলেন- مَا اَحَدٌ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ اِلاَّ بِرَحْمَةِ اللّٰهِ অর্থাৎ এমন কোনো ব্যক্তি নেই যে আল্লাহ তা'আলার রহমত ছাড়া জান্নাতে যেতে পারবে।

قوله وَمَنْ شَاءَ مِنْهُمْ الخ : আর আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা তাকে জাহান্নামে দিবেন। আর তার এই দেওয়া হবে তাঁর ন্যায়বিচার অনুযায়ী। কাউকে তিনি পাপের অধিক শাস্তি দিবেন না। যেমন আল্লাহ তা'আলা কুরআনে ইরশাদ করেন- وَلَا يُظْلَمُوْنَ فَتِيْلاً অর্থাৎ সলিতা পরিমাণও তারা অত্যাচারিত হবে না। -[সূরা বনী ইসরাঈল]

قوله وَكُلٌّ يَعْمَلُ لِمَا فَرَغَ مِنْهُ الخ : বান্দা যে সব কাজ কর্ম সম্পাদন করেছে এতে ঐ সব ফলাফল অর্জন হবে যা তার জন্য নির্ধারিত হয়ে গেছে। আর যার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সে ঐ দিকেই অগ্রসর হচ্ছে। সে তার চেষ্টা ও সাধনার মাধ্যমে কোনো পরিবর্তন ঘটাতে পারবে না। কারণ রাসূল ﷺ বলেছেন- كُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ

আল্লাহ তা'আলা এ সম্পর্কে বলেন- فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرٰى - وَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرٰى

قوله وَالْخَيْرُ وَالشَّرُّ الخ : অর্থাৎ ভালো মন্দ দুটোই আল্লাহ তা'আলা পূর্বেই নির্ধারণ করে রেখেছেন। যা কিছুই দুনিয়াতে অর্জন করবে কিয়ামতের দিন বান্দা সে অনুযায়ী ফলাফল পাবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা জান্নাতীদেরকে সম্বোধন করে বলবেন- وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِىْ اُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ অর্থাৎ এই জান্নাত যার উত্তরাধিকারী তোমরা হয়েছো। তোমাদের ঐ আমলের কারণে যা তোমরা দুনিয়ার জীবনে সমাপন করেছিলে।

আর জাহান্নামীদেরকে তিনি বলবেন- فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ অর্থাৎ তোমরা তোমাদের উপার্জিত আজাবের স্বাদ আস্বাধন কর।

উপরিউক্ত আয়াতদ্বয় দ্বারা বুঝা গেল যে, আল্লাহ তা'আলা মানুষকে কিয়ামতের দিন মানুষের আমলের ভিত্তিতে জান্নাত ও জাহান্নামের ফয়সালা দিবেন। তাকদীর অনুযায়ী নয়। কারণ আল্লাহ তা'আলার ইলম অনাদি হওয়ার কারণে তিনি প্রত্যেক মানুষের পূর্ণ জীবনের আমল কার্যাবলি সম্পর্কে অবগত। কোন সময় কি আমল করবে এবং কোথায় সে যাবে এবং কোথায় সে মারা যাবে। এসব তিনি জানতেন। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। প্রয়োজন হলে সেখান থেকেই দেখে নেওয়া যেতে পারে।

ত্রয়োদশ পাঠ

বান্দার সামর্থ্য দু'প্রকার

وَالْاِسْتِطَاعَةُ ضَرْبَانِ اَحَدُهُمَا الْاِسْتِطَاعَةُ الَّتِىْ يُوْجَدُ بِهَا الْفِعْلُ نَحْوُ التَّوْفِيْقِ الَّذِىْ لَا يَجُوْزُ اَنْ يُوْصَفَ الْمَخْلُوْقُ بِهٖ فَهِىَ مَعَ الْفِعْلِ وَاَمَّا الْاِسْتِطَاعَةُ الَّتِىْ مِنْ جِهَةِ الصِّحَّةِ وَالْوُسْعِ وَالتَّمَكُّنِ وَسَلَامَةِ الْاٰلَاتِ فَهِىَ قَبْلَ الْفِعْلِ وَهُوَ كَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا.

অনুবাদ : আর (اَلْاِسْتِطَاعَةُ) সামর্থ্য দু'প্রকার, একটি হলো এমন সামর্থ্য যার সাথে কর্ম পাওয়া যায়। যেমন- এমন তাওফীক যার সাথে বান্দা বা মাখলুক গুণান্বিত হওয়া জায়েজ নেই। আর এই সামর্থ্যটি কর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে থাকে। দ্বিতীয়টি হলো, ঐ সামর্থ্য যা সুস্থতা, সক্ষমতা এবং উপায় উপকরণের নিরাপত্তার দিক থেকে হয়ে থাকে। আর তা কর্মের পূর্বে পাওয়া যায়। আর এ সামর্থ্যের সাথে আল্লাহ তা'আলার আদেশ নিষেধ সম্পৃক্ত থাকে। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন, আল্লাহ তা'আলা সামর্থ্যের অধিক কাজের জিম্মাদারী দেন না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قوله والاستطاعة الخ : গ্রন্থকার (র.) এখান থেকে اَلْاِسْتِطَاعَةُ -এর সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ বর্ণনা শুরু করেছেন। নিম্নে এর আলোচনা করা হলো-

اَلْاِسْتِطَاعَةُ-এর আভিধানিক অর্থ :

اَلْاِسْتِطَاعَةُ-এর শাব্দিক অর্থ হলো- সাধ্য, সামর্থ্য, ক্ষমতা, সক্ষমতা, যোগ্যতা। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী- مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا

পারিভাষিক সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ :

اَلْاِسْتِطَاعَةُ সাধারণত দুই প্রকার : যথা-

১. বান্দার মধ্যে এমন সামর্থ্য থাকা যাকে উপায় উপকরণ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ইত্যাদির নিরাপত্তা ও সুস্থতা দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয় আর ঐ সকল গুণাবলি বান্দার মধ্যে পাওয়া যায় আর এই সমর্থনটি কর্মের পূর্বেই বিদ্যমান থাকে। এর উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ঐ বান্দা হজের জিম্মাদার যে এর জন্য প্রথম থেকেই উপায় উপকরণ ব্যবস্থা করে রেখেছে এবং সুস্থ ও নিরাপদ। যখন এগুলো বান্দার মধ্যে বিদ্যমান থাকবে তখনই তার জন্য হজ পালন সম্ভব হবে। আর যদি এগুলো বান্দার মধ্যে বিদ্যমান না থাকে তাহলে তার জন্য হজ পালন অসম্ভব। মোটকথা এই সামর্থ্য কর্ম সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই পাওয়া যায়।

২. বান্দার এমন সামর্থ্য থাকা, যা কোনো কাজ সংঘটিত হওয়ার উপায় উপকরণ পাওয়া যাওয়ার পর কর্মের সাথে সাথেই বিদ্যমান থাকে। একে ভিন্ন শব্দে খালক বলা হয়। এর

উদাহরণ এ ভাবে দেওয়া যায় যে, বান্দা যখন হজ করার ইচ্ছা করে অতঃপর সে হজের উপায় উপকরণ অবলম্বন করায় আল্লাহ তা'আলা উক্ত হজ বান্দার জন্য সহজ ও আসান করে দেন। (আল্লাহ তা'আলা সহজ করার কারণে যখন বান্দা কাজটি সম্পাদন করে তখন এ সম্পাদন করার শক্তিই হলো দ্বিতীয় প্রকার সামর্থ্য বা ইস্তিতায়াত)

* প্রথম প্রকার সামর্থ্য ব্যতীত কোনো কাজই সংঘটিত হয় না। এদিকে ইশারা করেই আল্লাহ তা'আলা বলেন- وَمَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ. অর্থাৎ এ সব লোক শুনার সামর্থ্য রাখে না এবং তারা দেখারও সামর্থ্য রাখে না। -[সূরা হূদ] উপরিউক্ত আয়াত শ্রবণ ও দেখার অঙ্গের অস্বীকার করা হয়নি বরং বাস্তব দেখা ও শ্রবণকে অস্বীকার করা হয়েছে।

* যখনই বান্দার উপর প্রথম প্রকার সামর্থ্য পূর্ণভাবে পাওয়া যাবে তখনই তার উপর আল্লাহ তা'আলার আদেশ, নিষেধ এর হুকুম বর্তাবে অন্যথায় তার উপর এই হুকুম কার্যকর হবে না। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন- وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি কামনার্থে এসব লোকের জন্য বায়তুল্লাহর হজ করা কর্তব্য। যারা এই পর্যন্ত পৌঁছার সামর্থ্য রাখে। -[সূরা আলে ইমরান]

* দ্বিতীয় প্রকার যেহেতু আল্লাহ তা'আলার তাওফীক, তাই এটি ব্যতীত ঐ কাজটি কখনো সংঘটিত হবে না। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন- وَلٰكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيْمَانَ وَ زَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ وَ أُولٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَ نِعْمَةً. অর্থাৎ তবে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের অন্তরে ঈমানের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। এবং তা তোমাদের হৃদয়গ্রাহী করে দিয়েছেন এবং কুফর, পাপাচার, অবাধ্যতার প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। তারাই সৎপথ অবলম্বনকারী। এটা আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ ও নিয়ামত। -[সূরা মুহাম্মদ]

উপরিউক্ত আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, তাওফীক ছাড়া কাজ সম্পাদন হয় না।

قوله وَالتَّوْفِيقُ الَّذِيْنَ الخ : অর্থাৎ তাওফীক [যার সাথে কোনো মাখলুক সম্পৃক্ত নয়] হলো কোনো কার্য সম্পাদন করার ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার বিশেষ রহমত অনুগ্রহ ও ইহসান। এটি ছাড়া কোনো কাজই সম্পাদন হয় না। এর সাথে কোনো মাখলুক সম্পৃক্ত নয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন- وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللّٰهِ

কিন্তু মু'তাযিলা সম্প্রদায় মনে করে তাওফীক এটি সমগ্র মাখলুকের সাথে সম্পৃক্ত। এটি আল্লাহ ও মু'মিনদের মাঝে সীমাবদ্ধ নয়।

তাদের এই আকিদার প্রতি উত্তরে আমরা আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত বলব কুরআন ও হাদীসের বিপরীত আপনাদের এই অভিমত গ্রহণযোগ্য নয়।

সারাংশ :

১. কাজের পূর্বে সামর্থ্য মানে উপায় উপকরণ, সরঞ্জাম প্রস্তুতি, সুস্থ ও নিরাপদ থাকা।

২. সামর্থ্য কাজের সাথে থাকা। এটি কাজের বাস্তব রূপ।

৩. সামর্থ্য, এটি হলো তাওফীক। এর সাথে কোনো মাখলুক সম্পৃক্ত নয়।

কর্ম আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি, বান্দার উপার্জন

وَاَفْعَالُ الْعِبَادِ هِيَ خَلْقُ اللّٰهِ وَكَسْبٌ مِنَ الْعِبَادِ. وَلَمْ يُكَلِّفْهُمُ اللّٰهُ اِلَّا مَا يُطِيْقُوْنَ وَلَا يُطِيْقُوْنَ اِلَّا مَا كَلَّفَهُمْ وَهُوَ تَفْسِيْرُ لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ نَقُوْلُ لَا حِيْلَةَ لِاَحَدٍ وَلَا حَوْلَ لِاَحَدٍ وَلَا حَرَكَةَ لِاَحَدٍ عَنْ مَعْصِيَةِ اللّٰهِ اِلَّا بِمَعُوْنَةِ اللّٰهِ وَلَا قُوَّةَ لِاَحَدٍ عَلٰى اِقَامَةِ طَاعَةِ اللّٰهِ وَالثُّبَاتِ عَلَيْهَا اِلَّا بِتَوْفِيْقِ اللّٰهِ.

অনুবাদ : বান্দার সকল কর্মকাণ্ড আল্লাহ তা'আলার সৃষ্ট এবং বান্দার উপার্জন। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এমন কাজের জিম্মাদার বানিয়েছেন যা করতে তারা সক্ষম। আর তারা শুধু ঐ সব কাজ করতে সক্ষম, যেগুলোর জিম্মাদার তাদেরকে বানানো হয়েছে। এটিই হলো لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ-এর ব্যাখ্যা।
আমরা বলি আল্লাহ তা'আলার সাহায্য ছাড়া তাঁর অবাধ্যতা থেকে বেঁচে থাকার কারো কোনো কৌশল, কোনো শক্তি, কোনো ক্রিয়া, ফলপ্রসু হয় না। অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলার তাওফীক ছাড়া তাঁর ইবাদত এবং ইবাদতে অটল থাকার কারো কোনো সামর্থ্য নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قوله وَاَفْعَالُ الْعِبَادِ ...... الخ : অর্থাৎ বান্দা যত সব কার্যাবলি দুনিয়াতে সম্পাদন করে সবগুলোর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলা, চাই উক্ত কার্যাবলি ভালো হোক বা মন্দ। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন- وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ অর্থাৎ তোমরা যতসব কাজ কর সবই আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। -[সূরা সাফফাত]
অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন- وَاللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সকল বস্তুর স্রষ্টা। -[সূরা যুমার] আল্লাহ তা'আলা মানুষ ও সকল কর্ম ও কর্ম প্রণালী সৃষ্টি করেছেন। এখন যার ইচ্ছা সে ভালো কাজ করে ছওয়াব অর্জন করে কিয়ামতের দিন জান্নাতে যাক। কিংবা মন্দ কর্ম সম্পাদন করে কবরের আজাব ও জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করার উপযুক্ত হোক।

قوله وَكَسْبٌ مِنَ الْعِبَادِ : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ভালোমন্দ সকল কর্ম ও কর্মপ্রাণালী সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু কাউকে বিশেষভাবে নির্দেশ করেননি যে তুমিই ভালোকর্ম সম্পাদন কর এবং তুমিই মন্দ কাজ সম্পাদন কর; বরং তিনি ব্যাপকভাবে সৎকাজ করতে এবং তার আদেশ করতে এবং মন্দ কাজ পরিহার করতে ও মন্দ কাজ থেকে বারণ করার জন্য হুকুম করেছেন।

এখন যে মন্দ কাজ সম্পাদন করে আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করবে তা তারই অর্জন এবং যে ভালো কাজ সম্পাদন করে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করবে তাও তার অর্জন। সেটা অন্য কারো জন্য হবে না; বরং তা নিজের জন্যই হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন- لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ অর্থাৎ মানুষ ভালো কাজের প্রতিদান পাবে, আর মন্দ কাজের শাস্তি পাবে।
-[সূরা বাকারা]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন- مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ اَسَاءَ فَعَلَيْهَا অর্থাৎ যে সৎকর্ম করে তা সে নিজের মঙ্গলের জন্যই করে। আর যে মন্দ কাজ করে সে তার অমঙ্গলের জন্যই করে।

উপরিউক্ত আয়াতদ্বয় সুস্পষ্ট প্রমাণ করে যে, মানুষ নিজ ইচ্ছায় যে সৎকর্ম সম্পাদন করবে তা তার জন্যই সে করবে। আর যে ব্যক্তি নিজ ইচ্ছায় অসৎ কর্ম করবে তার জন্য তাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে। এটাই হলো আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আকিদা। এর বিপরীত আকিদা পোষণকারীরা বিপথগামী বলে গণ্য হবে।

জাবরিয়াদের মতামত :

ভ্রান্ত মতবাদী জাবরিয়া সম্প্রদায় বলে যে, মাখলুক যেসব কাজকর্ম করবে সবই আল্লাহ তা'আলার উপর বর্তাবে। মানুষ যা কিছু করে সবই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে হয় এবং তার ইচ্ছাই সম্পন্ন হয়। মানুষের এতে কোনো হস্তক্ষেপ বা কর্তৃত্ব নেই। এজন্য মানুষকে কোনো জবাবদিহিতাও করতে হবে না।

দলিল : তারা তাদের মতের স্বপক্ষে যুক্তি উত্থাপন করে বলেন-এর কারণ মানুষ হলো পাথর তথা জড়বস্তুর ন্যায় অকেজো। আর পাথরের কর্ম অগ্রহণীয়। তাই মানুষের কর্মও অগ্রহণযোগ্য।

মু'তাযিলাদের মতামত :

মু'তাযিলারা জাবরিয়াদের সম্পূর্ণ বিপরীত মতপোষণ করে বলে যে, বান্দার ইচ্ছাধীন কাজ বা কর্মসমূহ বান্দার সৃষ্টির মাধ্যমে সৃষ্টি হয়। আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির মাধ্যমে নয়। আল্লাহ তা'আলার এতে কোনো হস্তক্ষেপ নেই।

দলিল : বান্দার কাজ-কর্মের ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা অকেজো। তিনি সর্বপ্রকার কর্ম সম্পাদন থেকে অব্যাহতি নিয়েছেন। তাই সকল কর্ম এখন বান্দার থেকেই সৃষ্টি হয়। আল্লাহ কর্ম সমাপনের ব্যাপারে বেকার।

জাবরিয়াদের জবাব :

তাদের জবাবে আমরা আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত বলব আল্লাহ তা'আলা বলেন- ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ অর্থাৎ স্থলে ও জলে বিপর্যয় প্রকাশ হয়েছে। যা কিছু মানুষের হাত উপার্জন করেছে এরই কারণে। -[সূরা রা'দ]

উক্ত আয়াত দ্বারা প্রমাণ হয় যে, অসৎকর্ম ও সৎকর্মের ক্ষেত্রে মানুষের হস্তক্ষেপ বিদ্যমান। সুতরাং কিয়ামতের দিন তাদেরকে এর কারণে জবাবদিহিতার সম্মুখীন হতে হবে।

মু'তাযিলাদের জবাব :

তাদের জবাবে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত বলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলাই সকল কাজকর্ম সৃষ্টি করেন। তবে ভালোমন্দ গ্রহণের ইচ্ছা তাদেরকে দেওয়া হয়। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন- وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ

قوله وَلَمْ يُكَلِّفْهُمُ اللّٰهُ .... الخ : অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার সাধ্যের অতিরিক্ত কোনো হুকুম আহকামের জিম্মাদারী বান্দার উপর চাপিয়ে দেন না। যা মানুষের সাধ্যে রয়েছে তাই তিনি আদেশ করে। যেমন- আল্লাহ্ তা'আলা বলেন- لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا অর্থাৎ কাউকে তার সামর্থ্যের অতিরিক্ত জিম্মাদারী দেন না।

* মু'মিনদের দোয়ার ক্ষেত্রে বলা হয়েছে رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ অর্থাৎ হে প্রভু! যার সামর্থ্য রাখি না তা আমাদেরকে চাপিয়ে দিওনা। -[সূরা বাকারা]

মূলত এটাই হলো لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ -এর তাফসীর। কারণ মানুষ অনিচ্ছাকৃত অনেক জল্পনা কল্পনা করে, যা বাস্তবে রূপ নিলে মারাত্মক গুনাহ হবে। কিন্তু এগুলো থেকে বেঁচে থাকা বা মুক্ত থাকতে পারা মানুষের জন্য একেবারেই অসম্ভব। তাই এগুলো আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমা করে দিয়েছেন। কিন্তু এসব কল্পনা বাস্তবে রূপ দান করা থেকে বিরত থাকা মানুষের জন্য সম্ভব ও সহজ। তাই এগুলো থেকে বেঁচে থাকার হুকুম মানুষের উপর ধার্য করা হয়েছে।

قوله تَقُوْلُ لَا حِيْلَةَ .... الخ : অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্য ব্যতীত কোনো মানুষই শয়তানের ধোকা ও তার প্ররোচনার গুনাহ থেকে বাঁচতে পারবে না; এমন কোনো কৌশল বা চালাকী মানুষের জানা নেই যা দ্বারা সে গুনাহ থেকে বাঁচবে। এটাই আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের একনিষ্ঠ আকিদা।

قوله وَلَا قُوَّةَ لِأَحَدٍ .... الخ : অর্থাৎ আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত এই আকিদায় পূর্ণ বিশ্বাসী যে, কোনো মানুষ আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্য করা, ইবাদত করা ও এর উপর মৃত্যু পর্যন্ত অটল ও অবিচল থাকার কোনো ক্ষমতা রাখে না। হ্যাঁ, যদি আল্লাহ্ তা'আলা তাকে তাওফীক দেয়, দয়া ও অনুগ্রহ করে তাহলে সে এক্ষেত্রে সক্ষম হবে। এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করেই গ্রন্থকার (র.) বলেন- لَا حِيْلَةَ لِأَحَدٍ وَلَا حَوْلَ .... الخ

কাদরিয়াদের মতামত :

ভ্রান্ত মতবাদে বিশ্বাসী কাদরিয়ারা বলে যে কোনো কর্মের ক্ষেত্রে বান্দা পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী। তারা আল্লাহ্ তা'আলার তাওফীক ব্যতীতই কাজ করতে সক্ষম।

তাদের জবাব :

আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত তাদের জবাবে বলেন যে, তাদের এই আকিদা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন- كُلًّا نُمِدُّ هٰؤُلَاءِ وَهٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُوْرًا অর্থাৎ আমি এদেরকে ও ওদের সবাইকে আল্লাহর দানে পৌঁছে দেই। আর আপনার রবের দান বিরত রাখা যাবে না। -[সূরা বনী ইসরাঈল]

উপরিউক্ত আয়াত দ্বারা বুঝা যায় আল্লহ তা'আলার দান ও সাহায্য ছাড়া কোনো কাজই সম্পূর্ণ হয় না।

সবকিছু আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছানুসারে হয়

وَكُلُّ شَيْءٍ يَجْرِىْ بِمَشِيَّةِ اللّٰهِ وَعِلْمِهٖ وَقَضَائِهٖ فَغَلَبَتْ مَشِيَّتُهُ الْمَشِيْئَاتِ كُلَّهَا وَغَلَبَ قَضَائُهُ الْحِيَلَ كُلَّهَا يَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ اَحَدًا لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُوْنَ.

অনুবাদ : প্রত্যেক জিনিস আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ও জ্ঞান অনুসারে বাস্তবায়িত হয়। সুতরাং তার ইচ্ছা সকল ইচ্ছা ও তার ফয়সালা সকল কৌশলের উপর প্রাধান্য লাভ করে। আল্লাহ তা'আলা যা চান তাই করেন। তিনি কারো উপর অত্যাচারী নন। তিনি যা করবেন সে সম্পর্কে তিনি জিজ্ঞাসিত হবেন না। কিন্তু সকল সৃষ্টি তার কৃতকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قوله وَكُلُّ شَيْءٍ يَجْرِىْ ..... الخ : ভূ-মণ্ডল ও নভো-মণ্ডলে যা কিছু রয়েছে সব কিছুই আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ও জ্ঞানানুসারে পরিচালিত হয়। কোনো কিছুই তার ফয়সালার বিপরীত বা তাঁর অজানায় পরিচালিত হয় না এবং হওয়া সম্ভবও নয়। আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত এমনই আকিদা রাখেন।

قوله وَقَضَائِهٖ : গ্রন্থকার (র.) এখানে قَضَاءٌ বলতে اَلْقَضَاءُ الْكَوْنِىْ উদ্দেশ্য নিয়েছেন। আর قَضَاءٌ হলো দু' প্রকার। যথা–

১. اَلْقَضَاءُ الْكَوْنِىْ [তথা প্রকৃতিগত সিদ্ধান্ত] যেমন– আল্লাহ তা'আলা বলেন–
فَقَضٰهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ فِىْ يَوْمَيْنِ –[সূরা হা-মীম সেজদা]
২. اَلْقَضَاءُ الشَّرْعِىْ [তথা ধর্মীয় সিদ্ধান্ত] যেমন– আল্লাহ তা'আলা বলেন– وَقَضٰى رَبُّكَ اَنْ لَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ –[সূরা বনী ইসরাঈল]

অনুরূপভাবে اَمْرُ اللّٰهِ অর্থাৎ আল্লাহর আদেশ দু'প্রকার। যথা–

১. اَلْاَمْرُ الْكَوْنِىْ [তথা প্রকৃতিগত আদেশ] যেমন– আল্লাহ তা'আলা বলেন–
اِنَّمَا اَمْرُهٗ اِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ –[সূরা ইয়াসীন]
২. اَلْاَمْرُ الشَّرْعِىُّ [তথা শরয়ি বিধানগত আদেশ] যেমন– আল্লাহ তা'আলা বলেন–
اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ –[সূরা নাহল]

অনুরূপভাবে اِذْنُ اللّٰهِ [অর্থাৎ আল্লাহর অনুমতি] দু'প্রকার। যথা–

১. اَلْاِذْنُ الْكَوْنِىُّ [তথা প্রকৃতিগত অনুমতি] যেমন– আল্লাহ তা'আলা বলেন–
وَمَا هُمْ بِضَآرِّيْنَ بِهٖ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ.
২. اَلْاِذْنُ الشَّرْعِىُّ [তথা শরয়ি বিধনগত অনুমতি] যেমন– আল্লাহ তা'আলা বলেন–
مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِيْنَةٍ اَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَائِمَةً عَلٰى اُصُوْلِهَا فَبِاِذْنِ اللّٰهِ.

অনুরূপভাবে كِتَابُ اللّٰهِ [অর্থাৎ আল্লাহর কিতাব] দু'প্রকার। যথা-

১. اَلْكِتَابُ الْكَوْنِىْ [তথা প্রকৃতিগত কিতাব] যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন-
وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ اِلَّا فِىْ كِتَابٍ.

২. اَلْكِتَابُ الشَّرْعِىُّ [অর্থাৎ ধর্মীয় বা শরয়ি কিতাব] যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন-
وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَا اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ.

অনুরূপভাবে حُكْمُ اللّٰهِ [অর্থাৎ আল্লাহর নির্দেশ] দু'প্রকার। যথা-

১. اَلْحُكْمُ الْكَوْنِىْ [অর্থাৎ প্রকৃতিগত নির্দেশ] যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন-
حَتّٰى يَأْذَنَ لِىْ اَبِىْ اَوْ يَحْكُمَ اللّٰهُ لِىْ وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ.

২. اَلْحُكْمُ الشَّرْعِىُّ [অর্থাৎ শরয়ি নির্দেশ] যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন-
اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ ـ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ.

অনুরূপভাবে تَحْرِيْمُ اللّٰهِ [অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক হারাম করা] ও দু'প্রকার। যথা-

১. اَلتَّحْرِيْمُ الْكَوْنِىْ [অর্থাৎ প্রকৃতিগত হারাম] যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন-
فَاِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً يَتِيْهُوْنَ فِى الْاَرْضِ.

২. اَلتَّحْرِيْمُ الشَّرْعِىُّ [অর্থাৎ শরয়ি বিধান অনুসারে হারাম] যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন-
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ.

উপরিউক্ত আলোচনানুযায়ী একথা বলা যায় যে, বান্দার কার্যাবলি আল্লাহর ইলম, ইচ্ছা এবং তাঁর সিদ্ধান্ত ও হুকুম সবই প্রকৃতিগত এবং ধর্মীয় বিধি বিধান অনুযায়ী হয়ে থাকে।

قوله فَغَلَبَتْ مَشِيَّتُهُ الْمَشِيْئَاتُ : বান্দা ও মাখলুকের ইচ্ছার উপর মহান আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ও ফয়সালা প্রভাবশীল। কারণ বান্দা যখন ভালো মন্দ কিছু ইচ্ছা করে তখন ইচ্ছা করার কারণেই তা বাস্তবায়িত হবে না; বরং তা বাস্তবায়িত হতে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা হতে হবে। তবেই তা বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করবে। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা মাখলুকের ইচ্ছার উপর প্রভাব বিস্তারকারী। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন- وَمَا تَشَاءُوْنَ اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ অর্থাৎ তোমরা কোনো কিছুই ইচ্ছা করতে পারবে না, জগতের প্রভু আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা করা ছাড়া। -[তাকবীর]

এই আয়াত দ্বারা বুঝা যায় বন্দার ইচ্ছার উপর আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা প্রভাবশীল। তবে এমনটি নয় যে, আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা বান্দার ইচ্ছা ও চাওয়ার অনুগত হয়। আর তখনই কাজ বাস্তবায়িত হয়।

قوله غَلَبَ قَضَاءُ : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যে ফয়সালা বা সিদ্ধান্ত দেন কোনো বান্দা বা মাখলুক উক্ত ফয়সালাকে কোনো কলাকৌশল, বুদ্ধি বা চালাকি দ্বারা রদ করতে পারবে না; বরং তার ফয়সালাই বিজয়ী থাকবে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন- وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلٰى اَمْرِهِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা নিজ হুকুমের উপর প্রভাবশীল কিন্তু অধিকাংশ মানুষ বুঝে না। -[সূরা ইউসুফ]

قوله يَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ : আল্লাহ তা'আলা যা ইচ্ছা তাই করেন এতে কেউ বাধা দেওয়ার মতো শক্তি বা সাহস রাখেনা। যেমন- তিনি বলেন- فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ অর্থাৎ তিনি যা ইচ্ছা তাই করেন। -[সূরা বুরূজ]

قوله وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ : অর্থাৎ প্রকৃত অর্থে বিষয়টা এমন নয় যে, আল্লাহ তা'আলা যা ইচ্ছা তা-ই করেন এবং বান্দাদের উপর অত্যাচারও করেন। অবশ্যই তা নয়; বরং তিনি কারো উপর

বিন্দুমাত্রও অত্যাচার করেন না এবং এর চিন্তাও করা যাবে না। যেমন– আল্লাহ তা'আলা বলেন– إِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা মানুষের উপর অত্যাচার করেন না। অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন– وَمَآ أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ অর্থাৎ আমি আমার বান্দাদের উপর অত্যাচারী নই। –[সূরা বাকারা]

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর :

প্রশ্ন : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন যে, وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কোনো বান্দার উপর অত্যাচার করেন না। কিন্তু দেখা যায় মানুষের মধ্যে কতক মানুষ এমন রয়েছে যারা অপর মানুষের উপর জুলুম অত্যাচার করে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে এবং তোমাদের কর্মকে সৃষ্টি করেছেন। যার দ্বারা বুঝা যায়, জুলুমটাও একটা কাজ হওয়ার কারণে তার স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলাই হন। আর যেহেতু তিনি জুলুম সৃষ্টি করেছেন তাই তিনি জুলুম করা থেকেও মুক্ত নন; বরং তার সাথে তিনিও জড়িত (নাউযুবিল্লাহ) অতএব তার বাণী وَأَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ -এর মর্মার্থ ঠিক থাকে না।

উত্তর : এর উত্তর দুভাবে দেওয়া যায়। যথা–

১. কোনো পরীক্ষক যদি তার প্রশ্ন পত্রে ভুল শুদ্ধ নির্ণয়ের কলামে ভুল ও শুদ্ধ উভয়টি উল্লেখ করেন তবে কারো দৃষ্টিতে উক্ত পরীক্ষক দোষী বলে বিবেচিত হন না। অনুরূপ আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াকে মানুষের জন্য পরীক্ষার কেন্দ্র স্বরূপ করেছেন এবং এতে ভুল ও শুদ্ধ তথা ভালো কাজ ও মন্দ কাজ পরীক্ষা স্বরূপ রেখেছেন। এতে আল্লাহ তা'আলা দোষী হতে পারেন না এবং যদি কোনো ব্যক্তি ভালো মন্দ হতে মন্দ কাজ করে তাতেও আল্লাহ তা'আলা দোষী হন না। কারণ প্রশ্ন পত্রের ভুল শুদ্ধ কলম হতে কেউ ভুলগুলোকে শুদ্ধের স্থানে লিখে দিলে পরীক্ষক দোষী হন না; বরং পরীক্ষার্থী দোষী হয়। অনুরূপভাবে বান্দাও মন্দ কাজ করার কারণে মহান পরীক্ষক আল্লাহ তা'আলা দোষী হতে পারেন না; বরং যে মন্দ কাজ সম্পাদন করেছে সেই দোষী হবে।

   সুতরাং দুনিয়াতে কোনো বান্দা অপর বান্দার উপর জুলুম করলে আল্লাহ তা'আলা জালেম সাব্যস্ত হবেন না; বরং অত্যাচার যে করেছে সেই জালেম বলে গণ্য হবে।

২. আসমান, জমিন, গ্রহ, নক্ষত্র এক কথায় সমগ্র জাহানের মালিক একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। এতে কারো কোনো অংশীদারিত্ব নেই। আর জুলুম বলা হয় অন্যের মালিকানায় অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করাকে। আর যেহেতু সমগ্র জাহানই তার তাই তার জন্য এটা জুলুম হবে না। তিনি যা করেন সবই তার মালিকানায় করেন। এতে কারো মালিকানায় হস্তক্ষেপ হয় না।

তাই তাঁকে অত্যাচারী বা জালেম বলা কারো জন্যই বৈধ হবে না; বরং এমন কথা বলাটাই হবে মারাত্মক জুলুম।

قوله لَا يُسْئَلُ عَمَّا ...... الخ : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যত সব কাজ করেন সবই তার ইচ্ছানুযায়ী করেন। এতে কারো হস্তক্ষেপ করার অধিকার নেই এবং তাকে কেউ তাঁর কাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার অধিকারও সংরক্ষণ করেনা। কারণ তাঁর প্রত্যেকটা কাজই ন্যায় সত্য ও সঠিক হয়ে থাকে এবং এতে কোনো বিচ্যুতির অবকাশ নেই।

কিন্তু মানুষ কাজ করতে ভুল করে ও ন্যায় সঙ্গতভাবে করতে পারে না। তাই তারা কিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসিত হবে। যেমন– আল্লাহ তা'আলা বলেন– لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُوْنَ অর্থাৎ তিনি যা করেন সে সম্পর্কে তিনি জিজ্ঞাসিত হবেন না। আর তারা জিজ্ঞাসিত হবে।

দোয়া মৃতের জন্য উপকারী

وَفِيْ دُعَاءِ الْاَحْيَاءِ وَصَدَقَتِهِمْ مَنْفَعَةٌ لِلْاَمْوَاتِ.

অনুবাদ : জীবিতদের দোয়া ও সদকা করার মধ্যে মৃতদের জন্য উপকার রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قوله : وَفِيْ دُعَاءِ الْاَحْيَاءِ অর্থাৎ আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত এ ব্যাপারে ঐকমত্য হয়েছেন যে, জীবিত ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির জন্য যে কোনো পন্থায় মুক্তি কামনা করার কারণে তার উপকার সাধিত হয়। উক্ত পন্থা হতে হবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশানুযায়ী। এর অনেকগুলো পন্থা রয়েছে গ্রন্থকার (র.) দু'টি পন্থা উল্লেখ করেছেন। নিম্নে তা প্রদত্ত হলো–

১. মৃত ব্যক্তির জন্য জীবিত ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার দরবারে দোয়া করবে ও ক্ষমা প্রার্থনা করবে। যেমন জানাজার সময় দোয়া করা। দাফন করার সময় দোয়া করা এবং কবর জিয়ারতের সময় দোয়া করা। এ সম্পর্কে মহান স্রষ্টা পবিত্র কালামে ঘোষণা করেন– وَالَّذِيْنَ جَاءُوْا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَآ اِنَّكَ رَؤُوْفٌ رَّحِيْمٌ অর্থাৎ আর যারা তাদের পরে এসেছে তারা বলে হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে এবং আমাদের অতীত হওয়া ভাইদেরকে আপনি ক্ষমা করুন এবং ঈমানদারদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোনো বিদ্বেষ রাখবেন না। হে আমাদের প্রভু! আপনি খুবই প্রেমময় বড় দয়াবান।

* হযরত রাসূল ﷺ বলেছেন– مَا مِنْ مَيِّتٍ تُصَلِّيْ عَلَيْهِ اُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ يَبْلُغُوْنَ مِائَةً كُلُّهُمْ يَشْفَعُوْنَ لَهُ اِلَّا شُفِّعُوْا فِيْهِ অর্থাৎ যে মৃত ব্যক্তির জানাযার নামাজ এক দল মুসলমান পড়েছে এবং তাদের সংখ্যা একশতে পৌঁছেছে এবং তারা সবাই তার জন্য শাফা'আত করতে থাকে। তাহলে তাদের সুপারিশ কবুল করা হয়। –[মুসলিম]

২. জীবিত ব্যক্তি মৃতদের জন্য আর্থিক ইবাদতের ছওয়াব দান করবে। যেমন– ওমরা, সদকা, দান ইত্যাদি করা। যেমন– হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে যে, عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ اِنَّ اُمِّيْ اُفْتُتِلَتْ وَاَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ فَهَلْ لَهَا اَجْرٌ اِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ অর্থাৎ হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন যে, নিশ্চয় এক ব্যক্তি রাসূল ﷺ-এর নিকট এসে বলল, আমার মা হঠাৎ মৃত্যুবরণ করেছেন। আমার ধারণা হয় যে, যদি তিনি কথা বলতে পারতেন তাহলে তিনি আল্লাহর পথে সদকা করতেন। অতএব আমি যদি তাঁর পক্ষ থেকে সদকা করি তাহলে তিনি নেকী পাবেন কি? রাসূল ﷺ বললেন হ্যাঁ, তিনি ছওয়াব পাবেন। –[বুখারী ও মুসলিম]

এ সম্পর্কে আরো অনেক হাদীস রয়েছে। সুতরাং বুঝা গেল জীবিত ব্যক্তি মৃতের জন্য দোয়া ও দান-খয়রাত করলে তার অনেক উপকার হয়।

মু'তাযিলাদের মতামত : মু'তাযিলা সম্প্রদায় বলে যে, জীবিতরা মৃতদের জন্য দোয়া ও দান-খয়রাত করলে তাদের কোনো উপকারে আসে না। তারা দুনিয়ায় যা করে গেছে সেখানে তাই পাবে।

তাদের জবাব : তাদের জবাবে বলা যায় যে, রাসূল ﷺ যে হাদীস বলেছেন এবং আল্লাহর বাণীতে যা রয়েছে এর বিপরীত কোনো উক্তিই ইসলামে ধর্তব্য নয়।

আল্লাহ তা'আলার কয়েকটি গুণাবলি

وَاللّٰهُ تَعَالٰى يَسْتَجِيْبُ الدَّعَوَاتِ وَيَقْضِى الْحَاجَاتِ وَيَمْلِكُ كُلَّ شَيْءٍ وَلَا يَمْلِكُهُ شَيْءٌ وَلَا غِنٰى عَنِ اللّٰهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ وَمَنِ اسْتَغْنٰى عَنِ اللّٰهِ طَرْفَةً فَقَدْ كَفَرَ وَكَانَ مِنْ اَهْلِ الْحَيْنِ.

অনুবাদ : আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের দোয়াসমূহ কবুল করেন। তিনি সকল হাজত বা প্রয়োজন পূরণ করেন। তিনি সকল জিনিসের মালিক। কেউ তাঁর মালিক নয়। কেউ আল্লাহ তা'আলা থেকে এক মুহূর্তের জন্য উদাসীন থাকতে পারে না। যে ব্যক্তি এক মুহূর্তের জন্য আল্লাহ তা'আলা হতে উদাসীন থাকবে সে কাফের হয়ে যাবে এবং ধ্বংস হয়ে যাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قوله وَاللّٰهُ يَسْتَجِيْبُ .... الخ : অর্থাৎ বান্দা যখনই আল্লাহ তা'আলাকে আপদে বিপদে ডাকে এবং গুনাহ মাফের জন্য দোয়া করে তখনই আল্লাহ তা'আলা তার দোয়া কবুল করেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন– اُدْعُوْنِىْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ অর্থাৎ হে আমার বান্দারা! তোমরা আমাকে ডাকো আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব। –[সূরা মু'মিন]

* অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِىْ عَنِّىْ فَاِنِّىْ قَرِيْبٌ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ অর্থাৎ আর বান্দা যখন আমার সম্পর্কে তোমার নিকট প্রশ্ন করে তখন নিশ্চয় আমি নিকটে। আমি প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা কবুল করি। যখন সে আমার নিকট প্রার্থনা করে। –[সূরা বাকারা]

উপরিউক্ত আয়াতদ্বয় দ্বারা বুঝা যায়, বান্দা যখনই প্রভুকে ডাকে তখনই তিনি সাড়া দেন।

* একটি হাদীসে রাসূল ﷺ বলেন– مَنْ لَمْ يَسْئَلِ اللّٰهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার নিকট চায় না তার উপর আল্লাহ তা'আলা রাগান্বিত হন। –[ইবনে মাজাহ]

قوله وَيَقْضِى الْحَاجَاتِ : বান্দা যখন আল্লাহ তা'আলার নিকট নিজের হাজত, বিপদ থেকে উদ্ধারের দোয়া করে তখন আল্লাহ তা'আলা তার হাজত পূরণ করেন এবং তাকে বিপদ হতে উদ্ধার করেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন– اَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ অর্থাৎ বলত কে অসহায়ের ডাকে সাড়া দেন, যখন সে আল্লাহকে ডাকে এবং তিনি আপদ দূরীভূত করেন। –[সূরা নামল]

উপরিউক্ত আয়াতে প্রমাণ দিচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলাই আপদ দূর করেন এবং তিনি হাজত পূরণ করেন।

قوله ويملك كل شيء .... الخ : আল্লাহ তা'আলা সব কিছুর মালিক। কিন্তু তার মালিক কেউ নয়। যেমন কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- لله ملك السموات والارض وما فيهن অর্থাৎ আসমান ও জমিন এবং এতদুভয়ের মাঝে যা কিছু রয়েছে সবকিছুর আধিপত্য আল্লাহ তা'আলার।

অন্য আয়াতে রাসূল ﷺ -কে সম্বোধন করে মহান আল্লাহ ইরশাদ হচ্ছে- قل لمن ما فى السموات والارض قل لله অর্থাৎ বলুন, আসমান ও জমিনে যা কিছু রয়েছে তার আধিপত্য কার? আপনি বলুন আল্লাহ তা'আলার।

উপরিউক্ত আয়তদ্বয় প্রমাণ করে যে, আল্লাহ্ই সব কিছুর মালিক। কিন্তু তাঁর মালিক কেউ নয়।

قوله ولا غنى عن الله : অর্থাৎ পৃথিবীতে যত মানুষ রয়েছে সকলে মহান আল্লাহ তা'আলার প্রতি মুখাপেক্ষী। কেউ তাঁর থেকে অমুখাপেক্ষী কিংবা আত্মনির্ভরশীল হতে পারবে না। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন- يايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغنى الحميد অর্থাৎ হে লোক সকল! তোমরা সকলেই আল্লাহ তা'আলার প্রতি মুখাপেক্ষী। আর আল্লাহ তা'আলা অমুখাপেক্ষী প্রশংসিত। -[সূরা ফাতির]

এই আয়াত দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, আল্লাহ তা'আলার প্রতি সকল মানুষই মুখাপেক্ষী। কিন্তু তিনি কারো প্রতি মুখাপেক্ষী নন। এ সত্ত্বেও যদি কেউ মুহূর্তের জন্য আল্লাহ তা'আলা হতে অমুখাপেক্ষী বা আত্মনির্ভরশীল হতে চায় তবেই সে কাফের হয়ে যাবে। শুধু তাই নয় এমনকি তার ধ্বংস পর্যন্ত অনিবার্য হয়ে যায়।

আল্লাহ তা'আলা ক্রোধান্বিত ও সন্তুষ্ট হন

وَاللّٰهُ يَغْضَبُ وَيَرْضٰى لَا كَاَحَدٍ مِنَ الْوَرٰى.

অনুবাদ : আল্লাহ তা'আলা ক্রুদ্ধ হন এবং সন্তুষ্টও হন। তবে বিশ্ব জগতের কারো মতো নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قوله وَاللّٰهُ يَغْضَبُ : আল্লাহ তা'আলা দুশ্চরিত্র ও নাফরমান বান্দার উপর ক্রুদ্ধ ও অসন্তুষ্ট হন। তবে তাঁর ক্রুদ্ধ হওয়ার ধরন দুনিয়ার মানুষের অসন্তুষ্টির মতো নয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা কুরআনে পাকে ইরশাদ করেন– قُلْ هَلْ اُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذٰلِكَ مَثُوْبَةً عِنْدَ اللّٰهِ مَنْ لَعَنَهُ اللّٰهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيْرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوْتَ অর্থাৎ আমি কি তোমাদেরকে তাদের সম্পর্কে বলে দিব? তাদের মধ্যে কারা আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রতিদান পাওয়া অনুসারে মন্দ? যাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার অভিশাপ দিয়েছেন এবং যাদের প্রতি তিনি ক্রুদ্ধ হয়েছেন এবং যাদের কতককে (তাদের কৃত অপরাধের কারণে শাস্তি স্বরূপ) বানর এবং শুকর বানিয়েছেন এবং যারা শয়তানদের পূজা করছে তাদেরকেও। –[সূরা মায়েদা]

এই আয়াত স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তা'আলা নাফরমান বান্দাদের প্রতি ক্ষুদ্ধ হন।

قوله وَيَرْضٰى : আল্লাহ তা'আলা যেরূপ ক্রুদ্ধ হন, তেমনি তিনি সৎ ও নেক বান্দাদের প্রতি সন্তুষ্টও হন নবী করীম ﷺ-এর সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর উপর রাজি বা সন্তুষ্ট হওয়ার কথা আল্লাহ তা'আলা কুরআনে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। যেমন সাহাবায়ে কেরাম (রা.) হযরত নবী করীম ﷺ -এর হাতে হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় যখন শপথ গ্রহণ করেন, সে সময় আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর সন্তুষ্ট হয়ে গেলেন। আর আল্লাহ তা'আলা সাহাবাদের এই কর্মের প্রতি সন্তুষ্ট হওয়ার কথা দুনিয়াবাসীকে জানানোর জন্য নিম্নোক্ত আয়াতে ইরশাদ করেন– لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন। যখন তারা বৃক্ষের নিচে আপনার হাতে শপথ গ্রহণ করল। –[সূরা ফাতাহ]

অন্য আয়াতে তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হওয়ার কথা ঘোষণা করে বলেন– رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট। তারাও আল্লাহ তা'আলার প্রতি সন্তুষ্ট।

উপরিউক্ত আয়াতদ্বয় দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্ট হন এবং অসন্তুষ্টও হন। তবে তাঁর সন্তুষ্ট হওয়া ও ক্ষুব্ধ হওয়া বান্দার মতো নয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা দেখেন, শুনেন এবং মাখলুকও দেখে এবং শুনে; কিন্তু তাঁর দেখা ও শুনা মাখলুকের মতো নয়। অনুরূপ আল্লাহ তা'আলা ক্রুদ্ধ হন ও সন্তুষ্ট হন তবে তাঁর ক্রুদ্ধ হওয়া ও সন্তুষ্ট হওয়া মাখলুকের মতো নয়; বরং তিনি তাঁর শান, মান, মর্যাদা ও অবস্থান অনুপাতে স্বীয় ক্ষুদ্ধ ও সন্তুষ্টির গুণ প্রকাশ করে থাকেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন– لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ তাঁর মতো কোনো কিছুই নেই। সুতরাং তাঁর কোনো গুণাবলির সাথে মাখলুকের তুলনা চলে না।

চতুর্দশ পাঠ

সাহাবায়ে কেরাম (রা.) সম্পর্কে আলোচনা

وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَلَا نُفْرِطُ فِيْ حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنُبْغِضُ مَنْ يُبْغِضُهُمْ وَبِغَيْرِ الْحَقِّ يَذْكُرُهُمْ وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِالْخَيْرِ.

অনুবাদ : আমরা আল্লাহ তা'আলার রাসূল মুহাম্মদ ﷺ -এর সাহাবীদেরকে ভালোবাসি। ভালোবাসার ক্ষেত্রে তাদের কাউকে নিয়ে কোনো বাড়াবাড়ি করি না। আবার কারো ব্যাপারে অসন্তুষ্টিও প্রকাশ করি না। যারা তাদেরকে কটাক্ষ করে আমরা তার প্রতি বিদ্বেষ রাখি এবং যারা তাদেরকে অসৎভাবে স্মরণ করে আমরা তাদেরকে ঘৃণা করি। আমরা তদের সু আলোচনা করবো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قوله وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ .... الخ : অর্থাৎ আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত রাসূল ﷺ-এর সাহাবীদেরকে ভালোবাসেন। কারণ আল্লাহ তা'আলা তদেরকে ভালোবাসেন এবং তারাও আল্লাহকে ভালোবাসে। নিম্নে সাহাবাগণের আলোচনা তুলে ধরা হলো–

সাহাবায়ে কেরামের পরিচিতি :

আভিধানিক বিশ্লেষণ : صَحَابَةٌ শব্দটি একবচন, বহুবচন أَصْحَابٌ ; শব্দটির অর্থ হলো, সাথি, সঙ্গি, সহচর, অনুসারী, বন্ধু।

পারিভাষিক সংজ্ঞা : ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় সাহাবা বলা হয় তাদেরকে যাঁরা হযরত মুহাম্মদ ﷺ -কে পেয়েছেন তার রেসালাতের উপর ঈমান এনেছেন তাঁকে ভালোবেসেছেন এবং ঈমানের উপর মৃত্যুবরণ করেছেন।

* গ্রন্থকার (র.) সাহাবীদের সম্পর্কে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আকিদা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন– وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ وَحُبُّهُمْ دِيْنٌ وَإِيْمَانٌ وَإِحْسَانٌ وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ.
* ইমাম বুখারী (র.) বলেন– مَنْ صَحِبَ النَّبِيَّ أَوْ رَآهُ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَهُوَ مِنْ أَصْحَابِهِ অর্থাৎ যারা রাসূলে কারীম ﷺ কে নিজ চোখে দেখেছেন অথবা মুসলমান হিসেবে তাঁর সাথে ছিলেন তারাই হলেন সাহাবী।

সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা :

সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর সম্মান ও মর্যাদার বিষয়টি অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। উম্মতের ঐক্যের পথনির্দেশ ও আজকের জটিল সমস্যা সমাধানে সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা ও তাদের জীবনী অনুসরণের বিকল্প নেই। যেমন আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে বলেন- ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِى التَّوْرٰاةِ وَمَثَلُهُمْ فِى الْاِنْجِيْلِ অর্থাৎ তাদের এই বৈশিষ্ট্য আলোচিত হয়েছে তাওরাত ও ইঞ্জিল গ্রন্থে। -[সূরা ফাতহ]

তারা আকাশের ধ্রুব তারকা সদৃশ :

সাহাবায়ে কেরাম হলেন আকাশের উজ্জ্বল ধ্রুব তারার ন্যায়। তাদের যে কারো পথ অনুসরণ করে মানুষ পাবে জান্নাতের পথ। এ সম্পর্কে রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন- اَصْحَابِىْ كَالنُّجُوْمِ بِاَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ অর্থাৎ আমার সাহাবাগণ হলেন উজ্জ্বল ধ্রুব তারার ন্যায়, তোমরা তাদের যে কাউকে অনুসরণ করবে তোমরা তোমরা হেদায়েত প্রাপ্ত হবে।

সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর বুজুর্গী ও মর্যাদা এতই গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাশালী যে তাদের উপর আল্লাহ তা'আলা নিজের সন্তুষ্টির কথা আল কুরআনে অকপটে স্বীকার করেছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- اَلسَّابِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوْا عَنْهُ অর্থাৎ যেসব সাহাবী আনসার ও মুহাজির প্রথম ঈমান গ্রহণ করেছেন, আর যারা তাদেরকে সততার সাথে অনুসরণ করেছেন। তাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্ট হয়েছেন তারাও আল্লাহকে প্রভু হিসেবে পেয়ে আত্মতৃপ্ত হয়েছেন। -[সূরা তাওবা]

তাঁরা সকলে আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতে ধন্য। তারা নবীদের মতো মাসূম নন। তারা হয়তো কখনো মানবীয় দুর্বলতার কারণে ছোট খাট ভুল করে ফেলেছেন। কিন্তু তারা ঐ কাজ হতে বিরত হয়ে তাৎক্ষণিক এর জন্য তাওবা করেছেন।

আর রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَّا ذَنْبَ لَهٗ অতএব আল্লাহ তা'আলা তাদের তওবার কারণে তাদের সকল অপরাধ ক্ষমা করে দিয়ে তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গেছেন।

তাঁরা উম্মতের জন্য আমানত :

হযরত রাসূল ﷺ সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর নিকট দীনকে আমানত রেখে গেছেন। আর তাদেরকে রেখে গেছেন সকল উম্মতের উপর আমানত স্বরূপ। যেমন রাসূল ﷺ বলেন- اَصْحَابِىْ اَمَانَةٌ لِاُمَّتِىْ অর্থাৎ আমার সাহাবাগণ আমার উম্মতের জন্য আমানত। অতএব তাদের মান ও মর্যাদার প্রতি কোনো রকম খেয়ানত করা উম্মতের জন্য কোনো ক্রমেই বৈধ হবে না।

তাঁরা রাসূল ﷺ-এর অতি প্রিয় :

সাহাবায়ে কেরামের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা ঈমানের বহিঃপ্রকাশ। তাঁদের বিষয়ে অসুন্দর ও অশালীন কথা বলা থেকে জিহ্বা ও কলমকে নিয়ন্ত্রণে রাখা অপরিহার্য কর্তব্য। যে হৃদয়ে রাসূল ﷺ-এর মহব্বত ও ভালোবাসা রয়েছে সে হৃদয়ে কখনো সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর

প্রতি বিদ্বেষ থাকতে পারে না। তাদের বিরুদ্ধে যদি কেউ আক্রমণের তীর নিক্ষেপ করে তা হলে এই তীর হযরত রাসূল ﷺ-এর কলিজায় বিদ্ধ হয়। কারণ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন— اَللّٰهَ اَللّٰهَ فِىْ اَصْحَابِىْ لَا تَتَّخِذُوْهُمْ غَرَضًا مِّنْ بَعْدِىْ فَمَنْ اَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّىْ اَحَبَّهُمْ وَمَنْ اَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِىْ اَبْغَضَهُمْ وَمَنْ اٰذَاهُمْ فَقَدْ اٰذَانِىْ وَمَنْ اٰذَانِىْ فَقَدْ اٰذَا اللّٰهَ অর্থাৎ সাবধান! তোমরা আমার সাহাবীদের ব্যাপারে আমার পরে তাদের পিছনে পড়ো না। সুতরাং যে তাদের প্রতি মহব্বত করবে সে আমার ভালোবাসার কারণেই তাদেরকে মহব্বত করবে। আর যে তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে সে আমার সাথে বিদ্বেষ রাখার কারণেই তাদের সাথে বিদ্বেষ রাখবে। আর যে তাদেরকে কষ্ট দেবে সে আমাকেই কষ্ট দিল আর যে আমাকে কষ্ট দিবে আল্লাহ তাকে কষ্ট দিবেন। –[তিরমিযী]

তারা বিশেষভাবে নির্বাচিত :

হযরত নবী করীম ﷺ-এর সাহাবী হওয়ার জন্য ও তাঁর দীনের সাহায্য করার জন্য আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বিশেষভাবে নির্বাচিত করেছেন। এ সম্পর্কে হযরত ইবনে মাসঊদ (রা.) বলেন– فَاخْتَارَهُمُ اللّٰهُ لِصُحْبَةِ نَبِيِّهٖ وَنُصْرَةِ دِيْنِهٖ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে রাসূল ﷺ-এর সাহাবী হওয়া ও তাঁর দীনের সাহায্য করার জন্য মনোনীত করেছেন। –[আবূ দাউদ]

এছাড়াও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবাদের ব্যাপারে কঠোর হুশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেছেন– اِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِيْنَ يَسُبُّوْنَ اَصْحَابِىْ فَقُوْلُوْا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلٰى شَرِّكُمْ.

তারা বেহেশতের সুসংবাদ প্রাপ্ত :

রাসূল ﷺ-এর সকল সাহাবীই জান্নাতবাসী। কিন্তু মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁর মাধ্যমে প্রায় অনেককেই জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। এদের মধ্যে দশজন বেহেশতের সুসংবাদ প্রাপ্ত সাহাবী খুবই প্রসিদ্ধ। তাদেরকে عَشَرَةٌ مُبَشَّرَةٌ বলা হয়। যেমন আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন– اَبُوْبَكْرٍ فِى الْجَنَّةِ وَعُمَرُ فِى الْجَنَّةِ وَعُثْمَانُ فِى الْجَنَّةِ وَعَلِىٌّ فِى الْجَنَّةِ وَطَلْحَةُ فِى الْجَنَّةِ وَالزُّبَيْرُ فِى الْجَنَّةِ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنَ عَوْفٍ فِى الْجَنَّةِ وَسَعْدُ ابْنُ اَبِىْ وَقَّاصٍ فِى الْجَنَّةِ وَسَعِيْدُ بْنُ زَيْدٍ فِى الْجَنَّةِ وَاَبُوْ عُبَيْدَةَ فِى الْجَنَّةِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

তাদের ঈমানের দৃঢ়তা :

পর্বতমালা যেভাবে ভূপৃষ্ঠে অটল, অনুরূপ সাহাবায়ে কেরাম (রা.) ঈমানের উপর অটল ও অবিচল ছিলেন; বরং এর চেয়েও কঠিনভাবে ঈমান তাদের অন্তরে প্রথিত হয়েছিল। হযরত কাতাদা (রা.) ইবনে ওমর (রা.)-কে ঈমানের পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে বলেন– اَلْاِيْمَانُ فِىْ قُلُوْبِهِمْ اَعْظَمُ مِنَ الْجَبَلِ অর্থাৎ ঈমান তাদের হৃদয়ে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল যেমন পাহাড় জমিনে প্রতিষ্ঠিত।

তারা একে অপরের প্রতি অনুগ্রহশীল :

তারা নিজেদের মাঝে অত্যন্ত কোমল ও নরম আচরণ করতেন। তারা অন্য সাথির প্রতি দৃষ্টান্তমূলক আন্তরিকতা ও অগ্রাধিকার প্রদর্শন করতেন। তারা অপর ভাইয়ের প্রতি সর্বদা উদার ও অনুগ্রহশীল ছিলেন। তাদের প্রশংসায় আল্লাহ তা'আলা বলেন– رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ অর্থাৎ তারা পরস্পর ছিলেন অত্যন্ত অনুগ্রহশীল। এছাড়াও অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রে যে অপূর্ব দৃষ্টান্ত দিয়েছেন যা ভুলার নয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রসংশায় বলেন– وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ অর্থাৎ তারা নিজেদের উপর অন্যকে প্রাধান্য দেন। যদিও তাদের সাথে কষ্ট দুর্দশা লেগেই থাকত।

তারা কুফরির মোকাবিলায় আপসহীন :

সাহাবায়ে কেরাম (রা.) কাফেরদের বেলায় ছিলেন বজ্র কঠোর। তারা কখনো কাফেরদের সাথে আপস করতেন না। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রশংসা করে বলেন– مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ অর্থাৎ মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর সাথে রয়েছে এমন একদল মানুষ যারা কুফরির সাথে আপসহীন তথা কাফেরদের উপর অত্যন্ত কঠোর। –[সূরা ফাতাহ]

মোটকথা কুফরির যে কোনো চ্যালেঞ্জকে তারা সবসময় সাহসিকতার সাথে মোকাবিলা করেছেন।

তারা ছিলেন তাহাজ্জুদ গুজার :

মুহাম্মদ ﷺ -এর সাহাবীগণ ছিলেন তাহাজ্জুদ গুজার। তারা রুকূ' ও সেজদা অবস্থায় রাত কাটিয়ে দিতেন। তাদের প্রশংসা করে আল্লাহ তা'আলা বলেন– تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا অর্থাৎ তুমি তাদেরকে দেখবে রুকূ'ও সেজদারত অবস্থায়। –[সূরা ফাতাহ]

সকল সাহাবী নামাজে বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ছিলেন। রাসূল ﷺ -এর লক্ষাধিক সাহাবীর মধ্য থেকে একজনও খুঁজে পাওয়া যাবে না যিনি তাহাজ্জুদ গুজার ছিলেন না। তারা সালাত আদায়ের মাধ্যমে রাত কাটাতেন। যেমন কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে– تَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَنِعْمَةً অর্থাৎ তাঁরা আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ ও নিয়ামত তালাশ করেন।

একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি কামনা :

সকল সাহাবায়ে কেরাম (রা.) একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি কামনার্থে ইবাদত করতেন। কোনো মানুষের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করতেন না। যেমন আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে বলেন– يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَ رِضْوَانًا অর্থাৎ তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করেন।

তাদের চেহারায় ইবাদতের চিহ্ন পরিলক্ষিত হয় :

আল্লাহর নবী মুহাম্মদ ﷺ -এর সাহাবায়ে কেরাম একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতেন। অধিক পরিমাণ রুকূ' ও সেজদা করার কারণে তাদের চেহারায় আমলের চিহ্ন ফুটে উঠেছে। তাদের এমন কাজের প্রশংসা করে আল্লাহ তা'আলা বলেন– سِيْمَاهُمْ فِىْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ

এছাড়া একান্ত আন্তরিকতা ও একাগ্রতার সাথে আমল করার কারণে তাদের মুখমণ্ডলে আমলের লক্ষণ ফুটে উঠেছিল।

তারা রাসূল ﷺ-এর পূর্ণ অনুসরণকারী :

সাহাবায়ে কেরাম (রা.) হযরত রাসূল ﷺ -এর পূর্ণ অনুসারী ছিলেন। তারা কোনো অবস্থাতেই রাসূল ﷺ -এর আদেশের বিরোধিতা করতেন না। তারা যে কোনো নির্দেশ শোনামাত্রই তার উপর ঈমান এনে আমল শুরু করতেন। তাদের জন্য আল্লাহ তা'আলা বলেন- وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ

তাছাড়া বদরের যুদ্ধের শুরুতে হযরত সা'দ ইবনে উবাদা (রা.) বলেন- يَا رَسُوْلَ اللهِ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَوْ اَمَرْتَنَا اَنْ نُخِيْضَ الْبَحْرَ لَاَخَضْنَاهَا অর্থাৎ ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ঐ সত্তার শপথ করছি যার হাতে আমার প্রাণ! যদি আপনি মহাসাগরে ঝাঁপ দিতে আদেশ করেন, তাহলে আমরা বিনা প্রতিবাদে মরণ সমুদ্রে ঝাঁপ দিব। -[মুসলিম]

তারা হাদীসের আমানতদার :

সকল সাহাবী সবসময় সর্ববিষয়ে পরিপূর্ণ আমানতদার ছিলেন। তারা সর্বোচ্চ সতর্কতার সাথে হাদীস বর্ণনা করেছেন। কারণ রাসূল ﷺ-এর সত্যতার স্বীকৃতি দিতে গিয়ে বলেন-

مَنْ قَالَ فِى الْقُرْاٰنِ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهٗ مِنَ النَّارِ (ترمذى)

مَنْ يَقُلْ مَالَمْ اَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهٗ مِنَ النَّارِ

مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهٗ فِى النَّارِ

তাই সাহাবাগণ হাদীস বর্ণনায় খুবই সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। এ কারণে সকল ওলামাগণ ঐকমত্য হয়েছেন যে, اَلصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ عُدُوْلٌ অর্থাৎ সকল সাহাবা ছিলেন ন্যায়পরায়ণ এবং এই ব্যাপারে ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

اَصْحَابِىْ كَالنُّجُوْمِ بِاَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ -এর ব্যাখ্যা :

কিছু সংখ্যক আলেম বলেন এ হাদীসটি সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ। অতএব এই হাদীসের অনুসরণে প্রত্যেক সাহাবী নক্ষত্রের মতো। আকাশের নক্ষত্র যেমন পথ হারা নাবিককে পথের সন্ধান দেয়। ঠিক তেমনিভাবে সাহাবায়ে কেরামের যে কাউকে যে কেউ অনুসরণ করবে সে সঠিক পথের সন্ধান পাবে।

তবে কোনো সাহাবীর ঘটে যাওয়া কোনো ভুলের অনুসরণ করা যাবে না। কারণ রাসূল ﷺ বলেছেন لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِىْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার অবাধ্য কাজে কোনো মাখলুকের আনুগত্য করা যাবে না। সুতরাং প্রমাণ হলো যে, সাহাবায়ে কেরামের যে কাউকে অনুসরণ করবে সঠিক পথ পেয়ে যাবে।

তাদের প্রতি ভালোবাসা :

আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত সব সাহাবীকে ভালোবাসেন। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗ اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ -[সূরা মায়েদা] অতএব তাদের প্রতি ভালোবাসা রাখা একান্তই প্রয়োজন।

قوله ولَا نُفَرِّطُ فِىْ حُبِّ .... الخ : আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত সাহাবায়ে কেরামকে ভালোবাসেন কিন্তু এতে বাড়াবাড়ি করেন না এবং কোনো সাহাবীকে হেয় ও অপর সাহাবীকে প্রাধান্য দেন না। কারণ সাহাবাদেরকে ভালোবাসা দীনের বিশেষ অংশ। আর দীন নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে আল্লাহ তা'আলা নিষেধ করেছেন। যেমন– لَا تَغْلُوْا فِىْ دِيْنِكُمْ অর্থাৎ তোমরা দীন নিয়ে বাড়াবাড়ি করো না। –[সূরা মায়েদা]

قوله وَنُبْغِضُ مَنْ يُّبْغِضُهُمْ : যারা হযরত সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর সাথে বিদ্বেষ পোষণ করে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত তাদেরকে ঘৃণা করেন। কারণ আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন– اَللّٰهَ اَللّٰهَ فِىْ اَصْحَابِىْ لَا تَتَّخِذُوْهُمْ غَرَضًا مِنْ بَعْدِىْ ... الخ এই হাদীসে বলা হয়েছে যারা সাহাবাগণকে ভালোবাসবে তারা রাসূলকে ভালোবাসবে এবং যারা বিদ্বেষ রাখবে তারা রাসূল ﷺ -এর সাথে বিদ্বেষ রাখবে। অতএব এর দ্বারা বুঝা যায় যে, রাসূল ﷺ-এর সাথে বিদ্বেষ পোষণকারীদের সাথে সম্পর্ক রাখা রাসূল ﷺ-এর সাথে বিদ্বেষ রাখার শামিল। তাই আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত রাসূল ﷺ -এর বিদ্বেষীদের ঘৃণা করেন। আর তাদেরকে ঘৃণা করা ঈমানের দাবি।

قوله وَلَا نَذْكُرُهُمْ اِلَّا بِالْخَيْرِ : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা হযরত সাহাবা (রা.)-এর অন্তর তাকওয়া হিসেবে পরীক্ষা করেছেন। তারা তাকওয়ার সর্বোচ্চ চূড়ায় পৌঁছে গেছেন। যার কারণে তাদের সমালোচনা ভ্রষ্টতা ছাড়া কিছু নয়। তাই আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত তাদের গুণাগুণ ব্যতীত অন্য কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন না। কারণ তাদের গুণাগুণ করা উম্মতের জন্য সফলতা কিন্তু তাদের সমালোচনা ক্ষতির কারণ।

* তাদের তাকওয়া সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন– اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ امْتَحَنَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ لِلتَّقْوٰى অর্থাৎ এরা ঐ সব লোক যাদের হৃদয়গুলোকে আল্লাহ তা'আলা তাকওয়ার জন্য মনোনীত করে নিয়েছেন। –[সূরা হুজুরাত]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন– وَاَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوٰى وَكَانُوْا اَحَقَّ بِهَا وَاَهْلَهَا অর্থাৎ তাদের জন্য তাকওয়ার বাক্য আল্লাহ তা'আলা অপরিহার্য করে দিয়েছেন। আর তারাই এর সর্বাধিক উপযুক্ত ছিলেন। –[সূরা ফাতাহ]

* একটি হাদীসে হযরত নবী করীম ﷺ বলেছেন– اَكْرِمُوْا اَصْحَابِىْ فَاِنَّهُمْ خِيَارُكُمْ অর্থাৎ তোমরা আমার সাহাবাদেরকে সম্মান কর। কেননা তারা তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মানুষ। –[নাসায়ী]

আর একথা স্বীকৃত যে, কোনো মানুষকে সম্মান প্রদর্শন করা হয় তার গুণ ও প্রশংসা প্রকাশের মাধ্যমেই। তার দোষ চর্চা করার মাধ্যমে নয়। তাই আমরা সাহাবাদেরকে সম্মান করব এবং তাদেরকে মহব্বত করব।

সাহাবা (রা.)-এর প্রতি মহব্বত ঈমানের বহিঃপ্রকাশ

وَحُبُّهُمْ دِيْنٌ وَإِيْمَانٌ وَإِحْسَانٌ وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ.

অনুবাদ : সাহাবা (রা.)-এর প্রতি ভালোবাসা দীন, ঈমান ও ইহসান এর বহিঃপ্রকাশ এবং তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা কুফরি, কপটতা ও অবাধ্যতার নামান্তর।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قوله وَحُبُّهُمْ دِيْنٌ الخ : সমগ্র সৃষ্টি কুলের স্রষ্টা হযরত রাসূলে কারীম ﷺ-এর প্রতি ওহী নাজিল করেছেন। দীনের বিধি-বিধান অবতরণ করেছেন। উক্ত ওহী ও বিধি-বিধান নবী করীম ﷺ সর্বপ্রথম নিয়ে এসেছেন তাঁর প্রিয় সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর নিকট। তাঁরা কেউ উক্ত ওহীর বিধি বিধানের প্রতি অনিহা প্রকাশ না করে সব মেনে নিয়েছেন এবং তাঁর আনীত ওহী বা প্রত্যাদেশ অনুপাতে জীবন পরিচালনা করেছেন তথা আমল করেছেন। আর সাহাবায়ে কেরাম উক্ত ওহী ও বিধি-বিধান কিভাবে সকল মানুষের নিকট পৌঁছতে পারে সে চিন্তায় লেগে গেলেন। যার ফলে কেউ কেউ ওহী মুখস্থ করতে লাগলেন। আবার কেউ উক্ত বিষয়ের উপর নিজে আমল করে অপরকে আহ্বান ও উদ্বুদ্ধ করতে লাগলেন। কেউ হাদীস মুখস্থ ও লিখে পাণ্ডুলিপি জমা করতে লাগলেন। আবার কেউ কেউ ওহী লিখতে ও সংরক্ষণ করতে লাগলেন। যেমন হাদীসশাস্ত্রে হযরত আবূ হুরায়রা, হযরত আয়েশা, হযরত ইবনে ওমর, হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) প্রমুখগণও আসহাবে সুফফার অধিবাসীগণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁরা সর্বদা হাদীস সংরক্ষণের কাজেই বেশি সময় কাটাতেন। অনুরূপ ওহী সংরক্ষণের ক্ষেত্রে হযরত মু'আবিয়া (রা.) সহ অনেক সাহাবী উল্লেখযোগ্য।

মোটকথা ইসলামি শরিয়া সংরক্ষিত হয়েছে সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর মাধ্যমে। সুতরাং যেহেতু তাদের মাধ্যমে ইসলামি শরিয়া সংরক্ষিত হয়েছে তাই তাদের প্রতি মহব্বত ও ভালোবাসা রাখতে হবে। বিদ্বেষ রাখা যাবে না। কারণ তাদের প্রতি ভালোবাসা রাখার অর্থ হলো তারা খুবই বিশ্বস্ত লোক। আর বিশ্বস্ত লোকের মাধ্যমে আমানতের খেয়ানত হয় না। (কেননা রাসূল ﷺ বলেছেন সাহাবাদের নিকট দীন আমানত) আর সাহাবাদেরকে আমানতদার মেনে নেওয়াই হলো পূর্ণ ইসলামকে সত্য মেনে নেওয়া। ফলাফল দাড়াল সাহাবাদের প্রতি ভালোবাসা রাখা দীন, ইসলাম ও ঈমান। পক্ষান্তরে সাহাবাদের প্রতি বিদ্বেষ রাখা যাবে না। কারণ তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ রাখার অর্থ হলো সাহাবায়ে কেরাম (রা.) তার নিকট অবিশ্বস্ত। আর অবিশ্বস্ত ব্যক্তির দ্বারা আমানতের খেয়ানত হয়ে থাকে। (কেননা দীন তাদের নিকট আমানত) আর কোনো ব্যক্তি সাহাবীদেরকে খেয়ানতকারী মনে করলে সে কখনো ইসলামকে সত্য বা খাঁটি ইসলাম হিসেবে মেনে নিতে পারে না। আর যে ইসলামকে সত্য বা খাঁটি ইসলাম হিসেবে মেনে নিতে পারবে না সে হলো কাফের। আর যারা ইসলামকে খাঁটি মনে করে কিন্তু সাহাবাদের সাথে পূর্ণ বিদ্বেষ রাখে তাহলে বুঝতে হবে এটি তার মারাত্মক অজ্ঞতা ও নিফাকী। আর সে হলো মুনাফিক। (আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে হেফাজত করুন)

সুতরাং বর্তমান সমাজে আমাদের চিহ্নিত করে নিতে হবে যে, কারা সাহাবায়ে কেরামকে বাদ দিয়ে ইসলামকে বুঝতে চায়? এবং তাদেরকে সমাজ হতে বয়কট করতে হবে।

قوله كُفْرٌ وَ نِفَاقٌ : শব্দ দুটির বিশ্লেষণ উক্ত বিষয় সংক্রান্ত আলোচনা ভূমিকা হতে দেখে নেওয়া যেতে পারে।

প্রথম খলিফা হযরত আবূ বকর (রা.)

وَنُثْبِتُ الْخِلَافَةَ بَعْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَوَّلًا لِأَبِىْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ تَفْضِيْلًا لَهُ وَتَقْدِيْمًا عَلٰى جَمِيْعِ الْأُمَّةِ.

অনুবাদ : আমরা রাসূল ﷺ -এর পরে সর্বপ্রথম হযরত আবূ বকর (রা.)-এর খেলাফতকে স্বীকার করি। তিনি সকল উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ ও শীর্ষস্থানীয় হওয়া হিসেবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قوله وَنُثْبِتُ الْخِلَافَةَ الخ : এখন থেকে গ্রন্থকার (র.) খোলাফায়ে রাশেদা সম্পর্কিত আকিদার আলোচনা শুরু করেছেন। কারণ সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ হলো রাসূল ﷺ-এর যুগ। অতঃপর খোলাফায়ে রাশেদার যুগ। এরপর তার পরের যুগ। কারণ রাসূল ﷺ বলেছেন- خَيْرُ الْقُرُوْنِ قَرْنِىْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ

আবার খোলাফায়ে রাশেদীনের মধ্যে হযরত আবূ বকর (রা.) অতঃপর হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) অতঃপর হযরত উসমান ইবনে আফফান (রা.) অতঃপর হযরত আলী ইবনে আবী তালেব (রা.) পর্যায়ক্রমে মর্যাদাশীল।

নবী রাসূলগণ ব্যতীত সকল মানুষের শ্রেষ্ঠ হলেন হযরত আবূ বকর (রা.)। নিম্নে তার খেলাফত সম্পর্কে যৎকিঞ্চিত আলোকপাত করা হলো।

হযরত আবূ বকর (রা.) :

তাঁর নাম আব্দুল্লাহ। উপনাম আবূ বকর, এ নামেই তিনি সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। উপাধি সিদ্দীক। মক্কার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

ইসলাম গ্রহণ :

আল্লাহর নবী মুহাম্মদ ﷺ ঐশী বাণী প্রাপ্ত হওয়ার পর পুরুষদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি ইসলাম গ্রহণের পর নিজের সমস্ত ধন দৌলত সবকিছু আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য উৎসর্গ করেছেন। তাবূকের যুদ্ধে সকল সাহাবীদের থেকে সাহায্য চাওয়া হলে তিনি নিজের কাছে থাকা সকল সম্পদ দিয়ে দিলেন।

রাসূল ﷺ -এর বন্ধুত্ব :

তাঁর সাথে রাসূল ﷺ-এর সম্পর্ক পূর্ব থেকেই খুব ভালো ছিল। হিজরতের সময় একমাত্র তিনি রাসূল ﷺ-এর পার্থিব বন্ধু ছিলেন। তিনি মিরাজের কথা মক্কার কাফেরদের মুখ থেকে শোনার সাথে সাথেই তা সত্য বলে আখ্যা দিয়েছিলেন।

ত্যাগ স্বীকার :

তিনি ইসলাম গ্রহণ করার পর নিজে সকল ধন সম্পদ ইসলামের জন্য উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। তিনি রাসূল ﷺ-এর সাথে মদিনায় হিজরত করেন। নিজের বাপদাদার বাসভূমির দয়ামায়া প্রত্যাখান করলেন। মদিনায় হিজরতের সময় তিনি 'গারে ছওরে' রাসূল ﷺ -এর সঙ্গে অবস্থান করেছিলেন।

তাঁর মর্যাদা :

তিনি সকল নবী রাসূলগণের পর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। তিনি রাসূল ﷺ -এর প্রাথমিক জীবনের বন্ধু ও জীবনের শেষ পর্বে শ্বশুর ছিলেন। মদিনায় হিজরতের সময় তিনি রাসূল ﷺ -এর সঙ্গি ছিলেন এবং তিনি বদরী সাহাবী ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে রাসূল ﷺ বলেছেন أَنْتَ صَاحِبِىْ فِى الْغَارِ وَصَاحِبِىْ عَلَى الْحَوْضِ অর্থাৎ তুমি গারে ছওরে আমার সঙ্গি ছিলে। হাউজে কাওছারেও আমার সঙ্গি থাকবে। –[তিরমিযী]

* অন্য হাদীসে রাসূল ﷺ বলেন– لَا يَنْبَغِىْ لِقَوْمٍ فِيْهِمْ اَبُوْبَكْرٍ اَنْ يَّؤُمَّهُمْ غَيْرُهٗ অর্থাৎ কোনো সম্প্রদায়ের জন্য উচিত নয় যে, তাদের মধ্যে আবূ বকর (রা.) উপস্থিত থাকাবস্থায় অন্য কেউ ইমামতি করবে। –[তিরমিযী]
* অন্য হাদীসে রাসূল ﷺ আরো বলেন– لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيْلاً غَيْرَ رَبِّىْ لَاتَّخَذْتُ اَبَابَكْرٍ خَلِيْلاً অর্থাৎ আমি যদি আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কাউকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করতাম। তাহলে হযরত আবূ বকর (রা.)-কে বন্ধু হিসেবে করতাম।
* অন্য আরেক হাদীসে রাসূল ﷺ বলেন– اَفْضَلُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا اَبُوْبَكْرٍ অর্থাৎ এই উম্মতের মধ্যে নবীদের পর আবূ বকরই সর্বশ্রেষ্ঠ।
* অন্য এক হাদীসে রাসূল ﷺ হযরত আবূ বকর (রা.)-কে সম্বোধন করে বলেন– اَمَا اَنَّكَ يَا اَبَا بَكْرٍ اَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ اُمَّتِىْ অর্থাৎ হে আবূ বকর! জেনে রাখ, আমার উম্মতের মধ্যে তুমিই সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে। –[আবূ দাউদ]

উপরিউক্ত হাদীস দ্বারা সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে, হযরত আবূ বকর (রা.) উম্মতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ ছিলেন।

খেলাফত পরিচিতি :

আভিধানিক অর্থ : خِلَافَةٌ শব্দটি فِعَالَةٌ -এর ওযনে এসেছে। এর মূল বর্ণ হলো– خ - ل - ف যার অর্থ হলো– প্রতিনিধিত্ব করা, উত্তরাধিকার বা স্থলাভিষিক্ত হওয়া।

খেলাফতের প্রকারভেদ :

খেলাফত সাধারণত দুই প্রকার :

১. বান্দাদের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার খেলাফত। এই খেলাফত আল্লাহর নবী ও রাসূলগণের মধ্যে সীমাবদ্ধ। আল্লাহ তা'আলার সর্বপ্রথম খলিফা হলেন নবী রাসূলগণ। যেমন– আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ.)-এর খেলাফত সম্পর্কে বলেন– اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً অর্থাৎ নিশ্চয় আমি পৃথিবীতে খলিফা নিযুক্ত করব। –[সূরা বাকারা]

* হযরত দাউদ (আ.)-এর খেলাফত সম্পর্কে বলেন– يَا دَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ অর্থাৎ হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীর খলিফা নিযুক্ত করেছি। –[সূরা ছোয়াদ]
* হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর খেলাফত সম্পর্কে বলেন– اِنِّىْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا অর্থাৎ নিশ্চয় আমি তোমাকে মানুষের ইমাম নিযুক্ত করব। –[সূরা বাকারা]
* হযরত মুহাম্মদ ﷺ -কে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত পর্যন্ত অনাগত সকল মানুষের জন্য খলিফা হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। কারণ তাঁর অনুসরণ করার মানে হলো আল্লাহ

তা'আলার অনুসরণ করা এবং তাঁর নাফরমানি করার অর্থই হলো আল্লাহ তা'আলার নাফরমানি করা। যেমন– এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন– مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّٰهَ। অর্থাৎ যে রাসূলের অনুসরণ করবে সে আল্লাহর অনুসরণ করবে। –[সূরা নিসা]

* অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন– إِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ أَيْدِيْهِمْ অর্থাৎ নিশ্চয় যারা আপনার নিকট বায়াত গ্রহণ করবে তারা আল্লাহর নিকট বায়াত গ্রহণ করবে। আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর রয়েছে। –[সূরা ফাতাহ]

পবিত্র কুরআনে এই খেলাফত সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন– وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ঈমানদার ও পুণ্যবান লোকদেরকে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তাদেরকে তিনি প্রতিনিধিত্ব দান করবেন। যেমনটি তিনি দান করেছেন তাদের পূর্ববর্তী লোকদেরকে। –[সূরা নূর]

উপরে উল্লিখিত আয়াতে দুটি জিনিস প্রমাণিত হয়। যথা– ১. পুণ্যবান লোকদেরকে খোফত দান করা। ২. পূর্ববর্তী সকল নবীর পুণ্যবান উম্মতদেরকে আল্লাহ তা'আলা খেলাফত দান করেছেন। যেমন– হযরত নূহ (আ.)-এর উত্তরাধিকারী পুণ্যবান উম্মতদেরকে সম্বোধন করে আল্লাহ তা'আলা বলেন– وَجَعَلْنَا كُمْ خَلَائِفَ فِى الْأَرْضِ অর্থাৎ তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি।

* হযরত সালেহ (আ.)-এর উম্মতদেরকে বলেন– وَاذْكُرُوْآ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَّبَوَّاَكُمْ فِى الْأَرْضِ অর্থাৎ স্মরণ কর! যখন তিনি তোমাদেরকে আ'দ -এর পর খলিফা বানিয়েছেন এবং তোমাদেরকে ভূপৃষ্ঠে নিবাসী করেছেন।

* হযরত ইবরাহীম (আ.) তাঁর আওলাদদের জন্য দোয়া করে বলেন–
قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى الظّٰلِمِيْنَ.

* হযরত হূদ (আ.)-এর উম্মতদের সম্পর্কে বলেন– وَاذْكُرُوْآ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْ بَعْدِ نُوْحٍ অর্থাৎ স্মরণ কর! যখন তোমাদেরকে হযরত নূহ (আ.)-এর পর খলিফা বানালাম।

হযরত আবূ বকর (রা.)–এর খেলাফত গ্রহণ :

উপরিউক্ত বিষয়ে বিশদ আলোচনা দ্বারা বুঝা গেল যে, নবীগণের পর তাদের পুণ্যবান উম্মতদের নিকটই খেলাফত অর্পিত হয়েছে। অপুণ্যবান উম্মতদের মধ্যে তা অর্পিত হয়নি। যেমন হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দোয়ার জবাবে আল্লাহ তা'আলা বলেন– لَا يَنَالُ عَهْدِى الظّٰالِمِيْنَ। অর্থাৎ জালেমদের পর্যন্ত আমার অঙ্গীকার [তথা খেলাফত দেওয়ার অঙ্গীকার] পৌঁছবে না; বরং পুণ্যবানদের নিকটই তা অর্পিত হবে।

সুতরাং হযরত মুহাম্মদ ﷺ যখন আল্লাহ তা'আলার প্রতিনিধিত্ব করলেন এবং তা সমাপন হলো। তখন রাসূল ﷺ -এর রেখে যাওয়া প্রতিনিধিত্ব -এর দায়িত্ব তাঁর পুণ্যবান উম্মতদের উপর অর্পিত হলো। আর তাঁর পুণ্যবান উম্মত হলো সাহাবায়ে কেরাম (রা.)। আর সাহাবাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মানুষ হলেন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) (যার শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনা ইতঃপূর্বে বর্ণিত হয়েছে।) যেহেতু হযরত আবূ বকর (রা.) শ্রেষ্ঠ মানুষ তাই সকল সাহাবায়ে কেরাম দলমত নির্বিশেষে তার হাতে (রাসূল ﷺ -এর তিরোধানের চতুর্থদিনে) বায়াত গ্রহণ করেন এবং তিনি হলেন ইসলামি রাষ্ট্রের ও খেলাফতের প্রথম আমীর। তাঁর সংবিধান মহাগ্রন্থ আল কুরআন ও সুন্নাহ।

খেলাফতের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ খলিফা

ثُمَّ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ثُمَّ لِعُثْمَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ثُمَّ لِعَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَهُمُ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُوْنَ وَالْاَئِمَّةُ الْمَهْدِيُّوْنَ.

অনুবাদ : অতঃপর ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.)-এর জন্য, এরপর হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রা.)-এর জন্য। অতঃপর হযরত আলী ইবনে আবী তালিব (রা.)-এর জন্য খেলাফতকে স্বীকার করি। তাঁরা সকলেই খোলাফায়ে রাশেদীন ও হেদায়েত প্রাপ্ত ঈমানদার।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قوله ثُمَّ لِعُمَرَ الخ : অর্থাৎ আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত হযরত ওমর (রা.)-কে খেলাফতে রাশেদার দ্বিতীয় খলিফা হিসেবে মান্য করেন। কারণ তিনি হযরত আবূ বকর (রা.)-এর পর উম্মতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। নিম্নে এর সংক্ষিপ্ত আলোচনা তুলে ধরা হলো।

দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রা.) :

তার নাম ওমর। উপনাম, আবূ হাফস, উপাধি আল ফারূক। তাঁর পিতার নাম খাত্তাব। তিনি মক্কানগরীর এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন।

ইসলাম গ্রহণ :

ইসলামের বিরুদ্ধে যখন মক্কার মুশরিকরা উঠে পড়ে লেগে গেল এবং ইসলামও দুর্বল ছিল। সে সময় তিনি মহানবী ﷺ-কে হত্যা করতে গিয়ে নিজেই মুহাম্মদ ﷺ -এর নিকট ইসলাম গ্রহণ করে চির ধন্য হয়ে গেলেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণের ফলেই ইসলামের মেরুদণ্ড শক্ত ও সবল হয়ে গেল। তাঁর হিজরতের কারণে ইসলাম আরো শক্তিশালী হয়েছে।

তাঁর মর্যাদা :

তিনি হযরত আবূ বকর (রা.)-এর পর সকল উম্মতদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাঁর মতানুসারে কুরআনে কয়েকটি আয়াত নাজিল হয়েছে। তিনি সর্বপ্রথম রাসূল ﷺ-এর দরবারে নারী ও পুরুষের মাঝে পর্দা করার কথা ব্যক্ত করেন। তিনি রাসূল ﷺ-এর আন্যতম সাহাবী ছিলেন। তিনি বদরী সাহাবী ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে রাসূল ﷺ বলেছেন- لَوْكَانَ بَعْدِىْ نَبِيٌّ لَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ অর্থাৎ আমার পর যদি কোনো নবী আসতো তাহলে হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব-ই নবী হতো। -[তিরমিযী]

হযরত ওমর (রা.)-এর মর্যাদা হযরত আবূ বকর (রা.)-এর পর হওয়ার প্রমাণ হিসেবে উপরিউক্ত হাদীসটিই যথেষ্ট।

খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ :

যেহেতু হযরত ওমর (রা.) হযরত আবূ বকর (রা.)-এর পর উম্মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মানুষ ছিলেন এবং সকল সাহাবী তাকে মান্য করতেন। তাই হযরত আবূ বকর (রা.) মৃত্যুর পূর্বে তাকে

খেলাফতের দয়িত্ব গ্রহণ এবং সকল মুসলমানকে তাঁর বায়'আত গ্রহণ করার জন্য আহ্বান করেন। অতঃপর তিনি হযরত আবূ বকর (রা.)-এর মৃত্যুর পরপরই খেলাফতের দায়িত্ব নেন এবং মুসলমানগণ তাঁর হাতে বায়াত গ্রহণ করেন।

قوله ثُمَّ لِعُثْمَانَ الخ : অর্থাৎ আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত হযরত ওমর (রা.)-এর পর হযরত ওসমান (রা.)-কে খেলাফতে রাশেদার তৃতীয় খলিফা হিসেবে স্বীকার করেন এবং তাঁকে হযরত ওমর (রা.)-এর পর সকল উম্মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মানুষ হিসেবে মান্য করেন। নিম্নে এর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো-

তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান (রা.) :

তাঁর নাম ওসমান, উপাধি যুন নূরাইন। পিতার নাম আফফান, তিনি মক্কা নগরীর সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি খুবই লজ্জাশীল ছিলেন।

ইসলাম গ্রহণ :

তিনি রাসূল ﷺ -এর পক্ষ থেকে ইসলামের দাওয়াত পেয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। অতঃপর নিজের বাসভূমি ত্যাগ করে সুদূর সিরিয়ায় হিজরত করেন। অতঃপর হযরত রাসূল ﷺ মদিনায় হিজরত করার পর তিনিও মদিনায় হিজরত করেন। অবশ্য তিনি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি।

তাঁর মর্যাদা :

তিনি হযরত নবী করীম ﷺ-এর জামাতা ছিলেন। তাবূকের যুদ্ধে যখন তিনি সর্বাধিক সম্পদ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দান করলেন তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর সম্পর্কে নিম্নোক্ত আয়াত নাজিল করলেন-

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُوْنَ مَآ اَنْفَقُوْا مَنًّا وَّلَآ اَذًى لَّهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ.

হযরত ওসমান (রা.) সম্পর্কে রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন- لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيْقٌ فِى الْجَنَّةِ وَرَفِيْقِىْ فِيْهَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ (رضـ) অর্থাৎ প্রত্যেক নবীর জন্য জান্নাতে একজন সাথি থাকবে। আর জান্নাতে আমার সাথি থাকবে হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রা.)। -[তিরমিযী]

হযরত ওসমান (রা.)-এর নিকট হযরত নবী করীম ﷺ-এর দুজন মেয়ে বিবাহ দিলেন। যখন দ্বিতীয় মেয়ে মৃত্যুবরণ করেন তখন রাসূল ﷺ বলেন, যদি আমার আরো মেয়ে থাকতো তবে ওসমানের নিকট আমি আরো মেয়ে বিবাহ দিতাম।

হযরত ওসমান (রা.)-এর মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করেই সকল সাহাবায়ে কেরাম (রা.) তাঁকে খেলাফতে রাশেদার তৃতীয় খলিফা নির্ধারণ করতে ঐকমত্য পোষণ করেন। তাই হযরত ওমর (রা.)-এর পরলোক গমনের পর তাঁকে রাসূল ﷺ-এর তৃতীয় খলিফা হিসেবে নিযুক্ত করেন।

وقوله ثُمَّ لِعَلِيٍّ (رضـ) : হযরত আলী (রা.)-কে রাসূল ﷺ -এর চতুর্থ খলিফা হিসেবে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত মান্য করেন। কেননা তিনিই ছিলেন তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান (রা.)-এরপর সকল উম্মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মানুষ। এ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিম্নে পেশ করা হলো-

চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রা.) :

তাঁর নাম আলী, উপনাম আবূ তুরাব। উপাধি হায়দার আলী ও আসাদুল্লাহ। তাঁর পিতার নাম আবূ তালিব। তিনি মহানবী ﷺ-এর চাচাতো ভাই ছিলেন। মক্কার বিখ্যাত কুরাইশ বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

ইসলাম গ্রহণ :

হযরত আলী (রা.) যুবকদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত রাসূল ﷺ মদিনায় হিজরত করার সময় তাঁকে নিজের স্থানে রেখে যান। অতঃপর তিনিও কিছুদিন পর মদিনায় হিজরত করেন।

তাঁর মর্যাদা :

তিনি হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর আদুরে কন্যা হযরত ফাতেমা (রা.)-কে বিবাহ করেন। বদরের যুদ্ধে তিনি অংশ গ্রহণ করেন। হযরত রাসূল ﷺ তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, أَنَا مَدِيْنَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا অর্থাৎ আমি ইলমের শহর আর আলী তার দরজা সদৃশ্য।

অন্য আরেক হাদীসে রাসূল ﷺ বলেন– أَنْتَ مِنِّيْ بِمَنْزِلَةِ هٰرُوْنَ مِنْ مُوْسٰى إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِيْ অর্থাৎ তুমি আমার নিকট ঐ মর্যাদার অধিকারী হযরত মূসা (আ.)-এর নিকট হযরত হারূন (আ.) যে মর্যাদার অধিকারী, তবে আমার পরে কোনো নবী নেই। –[বুখারী ও মুসলিম]

* অন্য এক হাদীসে রাসূল ﷺ আরো বলেন– لَا يُحِبُّ عَلِيًّا مُنَافِقٌ وَلَا يُبْغِضُ مُؤْمِنٌ অর্থাৎ আলী (রা.)-এর প্রতি মুনাফিক ভালোবাসা দেখাবে না এবং মু'মিন তাঁর সাথে শত্রুতা রাখবে না। –[আহমদ ও তিরমিযী]

খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ :

হযরত সাহাবায়ে কেরাম (রা.) হযরত আলী (রা.)-এর মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য করেই তাকে ওসমান (রা.)-এর খেলাফত সমাপ্ত হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চতুর্থ খলিফা হিসেবে নিযুক্ত করার জন্য ঐক্যে পৌঁছলেন। যার ফলে তিনি হযরত ওসমান (রা.)-এর পরলোক গমনের পরপরই খেলাফতে রাশেদার চতুর্থ খলিফার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

খেলাফতে রাশেদা সম্পর্কে ভ্রান্ত মতবাদ :

বর্তমানে কিছু সংখ্যক শিয়া সম্প্রদায় খেলাফতে রাশেদার প্রথম ও দ্বিতীয় খলিফার খেলাফতকে মানতে নারাজ। তারা বলে আমরা আবূ বকর ও ওমর (রা.)-এর খেলাফতকে বর্জন করলাম। তারা গায়ের জোরেই খেলাফতের দায়িত্ব নিয়েছেন। মূলত প্রধান খলিফা হওয়ার কথা ছিল হযরত আলী (রা.)-এর।

দলিল : তারা নিজেদের মতামতের স্বপক্ষে দলিল হিসেবে বলেন যে, রাসূল ﷺ-এর বাণী– أَنْتَ مِنِّيْ بِمَنْزِلَةِ هٰرُوْنَ مِنْ مُوْسٰى إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِيْ অর্থাৎ এ হাদীস দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, হযরত মূসা (আ.) তূর পাহাড়ে যাওয়ার সময় হযরত হারূন (আ.)-কে খলিফা নিযুক্ত করে যান। অতএব আমিও জিহাদে যাওয়ার সময় তোমাকে মদিনার খলিফা রেখে যাচ্ছি।

তাদের জবাব :

১. রাসূল ﷺ জিহাদে যাওয়ার সময় হযরত আলী (রা.)-কে পূর্ণ খলিফা বানাননি; বরং উপস্থিত সময়ের জন্য সাধারণ খলিফা হিসেবে দায়িত্ব দিয়েছিলেন। কারণ সে সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রা.)-কে ইমাম হিসেবে রেখে গিয়েছিলেন। সুতরাং তাঁকে পরিপূর্ণ খলিফা বানাননি।

২. হযরত আলী (রা.)-এর খেলাফতকে অগ্রাধিকার দিতে গিয়ে হযরত আবূ বকর ও হযরত ওমর (রা.)-এর খেলাফতকে অস্বীকার করা যাবে না। কারণ রাসূল ﷺ-এর জীবদ্দশায়ই হযরত আবূ বকর (রা.) ইমামতি করেছেন। অতএব তাঁর খেলাফতকে অস্বীকারের সুযোগ কোথায়।

قوله وَثُمَّ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُوْنَ الخ : খোলাফায়ে রাশেদীন চার খালিফা তথা হযরত আবূ বকর (রা.), হযরত ওমর (রা.), হযরত ওসমান (রা.) ও হযরত আলী (রা.)-এর খেলাফত কালকে বলা হয়। অনেক মুহাদ্দিসীন হযরত হাসান বিন আলী (রা.)-কেও তাদের অন্তর্ভুক্ত মনে করেন। তাঁদেরকে খোলাফায়ে রাশেদীন বলা হয় এজন্য যে, তারা পরিপূর্ণভাবে কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী শাসনকার্য সম্পাদন করেছেন। এ কারণেই হযরত নবী করীম ﷺ তাদের অনুসরণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

ইরশাদ হচ্ছে- عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِىْ وَسُنَّةُ خُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ অর্থাৎ তোমাদের উপর জরুরি হলো আমার সুন্নত ও খোলাফায়ে রাশেদীন ওয়াল মাহদিয়্যীন এর সুন্নতের অনুসরণ করা। এখন দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে গেল যে, খোলাফায়ে রাশেদীন সঠিক পথ প্রাপ্ত ছিলেন। তাদের সাথে বিদ্বেষ রাখা গোমরাহী। (আল্লাহ তা'আলা আমাদের হেফাজত করুন)।

জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্তগণ

وَاِنَّ الْعَشَرَةَ الَّذِيْنَ سَمَّاهُمْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَنَشْهَدُ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ عَلٰى مَا شَهِدَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ وَهُمْ اَبُوْ بَكْرٍ (رض) وَعُمَرُ (رض) وَعُثْمَانُ (رض) وَعَلِيٌّ (رض) وَطَلْحَةُ (رض) وَالزُّبَيْرُ (رض) وَسَعْدٌ (رض) وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ (رض) وَاَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ (رض) وَهُمْ اُمَنَاءُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمْ اَجْمَعِيْنَ.

অনুবাদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ যে দশজন সাহাবীর নাম উল্লেখ করে তাদের জান্নাতী হওয়ার সুসংবাদ দিয়েছেন। আমরা তাদের জন্য জান্নাতের সাক্ষ্য প্রদান করি। আর এটা এ জন্য করি যে, তাদের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। কেননা তাঁর বাণী সত্য। তাঁরা হলেন যথাক্রমে হযরত আবূ বকর (রা.), হযরত ওমর (রা.), হযরত ওসমান (রা.), হযরত আলী (রা.), হযরত তালহা (রা.), হযরত যুবায়ের (রা.), হযরত সা'দ (রা.), হযরত সাঈদ (রা.), হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রা.) এবং হযরত আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা.) এরা সবাই এই উম্মতের বিশ্বস্ত লোক। আল্লাহ তা'আলা তাদের সবাইকে বেহেশতের উচ্চ মাকাম দান করুন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قوله وَاِنَّ الْعَشَرَةَ الَّذِيْنَ الخ : গ্রন্থকার (র.) এখানে এমন কতক বিশেষ বিশেষ সাহাবীর নাম উল্লেখ করেছেন যাদেরকে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে আল্লাহর রাসূল ﷺ নাম ধরে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। তাদের এক বাক্যে আরবিতে বলা হয় اَلْعَشَرَةُ الْمُبَشَّرَةُ অর্থাৎ "দশ সুসংবাদ প্রাপ্ত"। তাদের সম্পর্কে মু'মিনের জন্য এই আকিদা পোষণ করা কর্তব্য যে, তারা নিঃসন্দেহে জান্নাতী। তারা সকলে ন্যায়পরায়ণ। তারা সকলে এই উম্মতের জন্য বিশ্বস্ত মানুষ।

* কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়ে বলেছেন–

اَبُوْ بَكْرٍ فِى الْجَنَّةِ وَعُمَرُ فِى الْجَنَّةِ وَعُثْمَانُ فِى الْجَنَّةِ وَعَلِيٌّ فِى الْجَنَّةِ وَطَلْحَةُ فِى الْجَنَّةِ وَالزُّبَيْرُ فِى الْجَنَّةِ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ فِى الْجَنَّةِ وَسَعْدُ بْنُ اَبِىْ وَقَّاصٍ فِى الْجَنَّةِ وَسَعِيْدُ بْنُ زَيْدٍ فِى الْجَنَّةِ وَاَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ فِى الْجَنَّةِ.

অর্থাৎ আবূ বকর জান্নাতে, ওমর জান্নাতে, ওসমান জান্নাতে, আলী জান্নাতে, তালহা জান্নাতে, জুবায়ের জান্নাতে, আব্দুর রহমান ইবনে আউফ জান্নাতে, সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস জান্নাতে, সাঈদ ইবনে যায়েদ জান্নাতে এবং আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ জান্নাতে। –[তিরমিযী]

সুতরাং কেউ এর বিপরীত আকিদা পোষণ করলে সে প্রকৃত মু'মিনদের অন্তর্ভুক্ত হবে না; বরং পথ ভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে।

সকল সাহাবীই জান্নাতী :

এখানে একটি কথা অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে বুঝে নিতে হবে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ উপরে যাদের নাম জান্নাতী বলে ঘোষণা করেছেন তাঁরা ব্যতীত অন্য সকল সাহাবী জান্নাতী। এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। চাই উক্ত সাহাবী যতই নিম্ন স্তরের হোক না কেন।

দলিল : আল্লাহ তা'আলা সকল সাহাবীদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে বলেছেন وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সকল সাহাবীর জন্য জান্নাতের (হুসনা) ওয়াদা করেছেন। –[সূরা নিসা] আর একথা চির সত্য যে, আল্লাহ তা'আলা কখনো ওয়াদা ভঙ্গ করেন না।

* অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন– رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তাঁরাও আল্লাহ তা'আলার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন। –[সূরা তাওবা]

আর এটা সর্বজন স্বীকৃত যে, আল্লাহ তা'আলা যাদের উপর রাজি হয়েছেন তাদেরকে অবশ্যই জান্নাত দান করবেন।

তাছাড়া দেখা যায় যে, রাসূল ﷺ বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বদরী সাহাবীদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। যদি আশারায়ে মুবাশশারাই শুধু জান্নাতী হতেন তাহলে বদরী সাহাবীদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দিতেন না।

উল্লেখ্য যে, রাসূল ﷺ 'আশারায়ে মুবাশশারা' -এর মর্যাদা সকল সাহাবীর নিকট প্রকাশের জন্য নাম ধরে ধরে জান্নাতী ঘোষণা করেছেন এবং তাও ছিল বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য তাদের মধ্যে থাকার কারণে এবং এই সংবাদটি একই মজলিসে প্রকাশ করেছেন। তাই এর প্রচার বেশি হয়ে গেছে। তাই বলে এটা নয় যে, আশারায়ে মুবাশশারাই শুধু জান্নাতী অন্য সাহাবীগণ নন।

মহানবী ﷺ ও সাহাবা সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য অবৈধ

وَمَنْ اَحْسَنَ الْقَوْلَ فِي اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَاَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّاتِهٖ فَقَدْ بَرِئَ مِنَ النِّفَاقِ . وَعُلَمَاءُ السَّلَفِ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ السَّابِقِيْنَ وَالتَّابِعِيْنَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ اَهْلِ الْخَيْرِ وَالْاَثَرِ وَاَهْلِ الْفِقْهِ وَالنَّظَرِ لَا يُذْكَرُوْنَ اِلَّا بِالْجَمِيْلِ وَمَنْ ذَكَرَهُمْ بِسُوْءٍ فَهُوَ عَلٰى غَيْرِ السَّبِيْلِ.

অনুবাদ : যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাহাবী, পূত পবিত্রা স্ত্রীগণ এবং তাঁর সন্তান সন্ততি সম্পর্কে সু-আলোচনা করবে তারা নিফাক তথা কপটতা হতে মুক্ত থাকবে। পূর্ববর্তী ওলামাদের মধ্যে যারা সালফে সালেহীন ও তাদের সঠিক অনুসারী (তাবেঈন) এবং যারা তাদের পরে এসেছেন কুরআন, হাদীস ও ফিকহে পারদর্শী এবং গবেষক তাদেরকে সম্মানের সাথে স্মরণ করতে হবে। আর যারা অসম্মানের সাথে তাদেরকে স্মরণ করবে তারা বিপথগামী।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قوله وَمَنْ اَحْسَنَ الْقَوْلَ فِيْ اَصْحَابِ الخ : হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর সাহাবাদের সম্পর্কে কোনো ধরনের বিরূপ মন্তব্য করা কিংবা ঠাট্টা করা কোনো মুসলমানের জন্য বৈধ নয়। তারা সকলে সমালোচনার উর্ধ্বে। এটাই আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আকিদা। যে ব্যক্তি তাদের সমালোচনা করবে সে নিফাক থেকে মুক্ত নয়; বরং সে নিফাকের সাথে জড়িত। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবাদের সমালোচকদের প্রতি হুশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেছেন- اَللّٰهَ اَللّٰهَ فِيْ اَصْحَابِيْ لَا تَتَّخِذُوْهُمْ غَرَضًا مِّنْ بَعْدِيْ فَمَنْ اَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّيْ اَحَبَّهُمْ وَمَنْ اَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِيْ اَبْغَضَهُمْ অর্থাৎ ভয় কর! ভয় কর! আমার সাহাবীদের ব্যাপারে তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আর সাবধান! আমার ইহধাম ত্যাগের পর তোমরা তাদেরকে সমালোচনার লক্ষ্যবস্তু বানাবে না। -[তিরমিযী]

قوله وَاَزْوَاجِهٖ الخ : যারা রাসূল ﷺ -এর পূত পবিত্র সহধর্মিণী ও তাঁর সন্তান সন্ততির প্রতি সুধারণা রাখবে এবং গাল মন্দ, সমালোচনা ও কটুক্তি থেকে বিরত থাকবে তারা নিফাক থেকে মুক্ত থাকবে।

কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন- اَحِبُّوْا اَهْلَ بَيْتِيْ لِحُبِّيْ অর্থাৎ তোমরা আমার পরিবারকে ভালোবাস। কেননা তাদের সাথে আমার মহব্বত রয়েছে। -[তিরমিযী]

উপরিউক্ত হাদীসে পরিবার বলতে হযরত রাসূল ﷺ -এর স্ত্রীগণ ও হযরত ফাতেমা, আলী, হাসান ও হুসাইন এবং ওসমান ও অন্যান্য পরিবারের সদস্যদের বুঝানো হয়েছে। অন্য এক হাদীসে রাসূল ﷺ বলেন- اِرْقَبُوْا مُحَمَّدًا فِيْ اَهْلِ بَيْتِهٖ -[বুখারী]

সুতরাং কেউ যদি রাসূল ﷺ -এর পরিবারস্থদের প্রতি বিদ্বেষ বা হিংসা রাখে তাহলে সে নিফাকের সাথে জড়িত হবে। যার পরিণাম ফল হবে অত্যন্ত ভয়াবহ।

قوله وَعُلَمَاءُ السَّلَفِ مِنَ الصَّالِحِيْنَ الخ : আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত সাহাবায়ে কেরাম, সালফে সালেহীন, তাবেঈন, তাবে তাবেঈন, আইম্মায়ে মুজতাহিদীন, কুরআন হাদীস বিশারদগণকে যথাযোগ্য সম্মান করেন এবং তাদেরকে সম্মান ও ভালোবাসার সাথে স্মরণ করেন।

সাহাবায়ে কেরামকে সম্মান করার কারণ হলো-

১. রাসূল ﷺ বলেছেন- اَكْرِمُوْا اَصْحَابِىْ فَاِنَّهُمْ خِيَارُكُمْ -[মিশকাত]

২. اَلنُّجُوْمُ اَمَنَةٌ لِلسَّمَاءِ فَاِذَا ذَهَبَتِ النُّجُوْمُ اَتَى السَّمَاءُ مَا تُوْعَدُ وَاَنَا اَمَنَةٌ لِاَصْحَابِىْ فَاِذَا ذَهَبْتُ اَنَا اَتَى اَصْحَابِىْ مَا يُوْعَدُوْنَ وَاَصْحَابِىْ اَمَنَةٌ لِاُمَّتِىْ فَاِذَا ذَهَبَ اَصْحَابِىْ اَتَى اُمَّتِىْ مَا يُوْعَدُوْنَ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

অর্থাৎ তারকারাজি হলো আসমানের জন্য নিরাপত্তাস্বরূপ। সুতরাং যখন তারকারাজি থাকবে না তখন বিধিমতো আসমান (সামনে) চলে আসবে। আর আমি হলাম আমার সাথীবর্গের জন্য নিরাপত্তাস্বরূপ। অতএব আমি যখন থাকব না তখন আমার সাথীবর্গ প্রতিশ্রুতিমতো চলে আসবে। আর আমার সাথীবর্গ হলো আমার উম্মতের জন্য নিরাপত্তাস্বরূপ। সুতরাং আমার সাথীবর্গ যখন থকবে না তখন কথা মতো আমার উম্মত চলে আসবে।

* তাবেঈন, তাবে তাবেঈন, আইম্মায়ে মুজতাহিদীন ও কুরআন এবং হাদীস বিশারদ গবেষকদেরকে সম্মান করা এজন্য কর্তব্য।

১. কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- خَيْرُ اُمَّتِىْ قَرْنِىْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ অর্থাৎ আমার উম্মতদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলো আমার যুগের উম্মত। অতঃপর যারা এদের সাথে সম্পৃক্ত। অতঃপর যারা এদের সাথে সম্পৃক্ত হয়। -[বুখারী ও মুসলিম]

উপরিউক্ত হাদীসে তিনটি যুগের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। ১. সাহাবাদের, ২. তাবেঈনদের, ৩. তাবে তাবেঈন এর যুগকে।

এই তিন যুগের সাথে সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন ও তাবে তাবেঈনসহ আইম্মায়ে মুজতাহিদীন, মুহাদ্দিসীন, মুফাসসিরীন, ফিকহবিদগণও শামিল রয়েছেন। এ হিসেবে এদেরকেও সমালোচনার উদ্দেশ্যে স্মরণ করা যাবে না। অশুভ সমালোচনা করা যাবে না এবং সর্বযুগের আলেমও কুরআন হাদীস গবেষকের সমালোচনা করা যাবে না। কারণ রাসূল ﷺ বলেছেন- اِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْاَنْبِيَاءِ অর্থাৎ ওলামাগণ নবীদের ওয়ারিশ। -[আবূ দাঊদ]

* অন্যত্র রাসূল ﷺ বলেছেন- فَقِيْهٌ وَاحِدٌ اَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ اَلْفِ عَابِدٍ অর্থাৎ একজন ফিকহবিদ আলেমকে পরাস্ত করা শয়তানের পক্ষে এক হাজার দরবেশের চেয়েও কঠিন।

সুতরাং সর্বযুগের ওলামা মাশায়েখ ও মুফাসসিরীনগণকে সম্মান করা একান্তই জরুরি।

قوله وَمَنْ ذَكَرَهُمْ بِسُوْءٍ الخ : যে ব্যক্তি আলেম ওলামা, ফিকহবিদ ও তাফসীরবিদদের সমালোচনা করবে সে বিপথগামী হবে এবং আহলে সুন্নত থেকে বের হয়ে যাবে। অতএব এ থেকে বিরত থাকাই ভালো।

নবীগণ ওলীর চেয়ে উত্তম

وَلَا نُفَضِّلُ اَحَدًا مِنَ الْاَوْلِيَاءِ عَلَى الْاَنْبِيَاءِ وَنَقُوْلُ نَبِيٌّ وَاحِدٌ اَفْضَلُ مِنْ جَمِيْعِ الْاَوْلِيَاءِ وَنُؤْمِنُ بِمَا جَاءَ مِنْ كَرَامَاتِهِمْ وَصَحَّ عَنِ الثِّقَاتِ مِنْ رِوَايَاتِهِمْ.

অনুবাদ : আমরা কোনো ওলীকে নবীগণের উপর প্রাধান্য দিব না এবং আমরা বলি একজন নবী সকল ওলী থেকে উত্তম। আমরা ঐ সব অলৌকিক ঘটনাকে বিশ্বাস করি যা ওলীদের থেকে কারামত হিসেবে প্রকাশ হয় এবং নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قوله وَلَا نُفَضِّلُ اَحَدًا مِنَ الْاَوْلِيَاءِ الخ : অর্থাৎ কোনো ওলী নবীর উপর প্রাধান্য লাভ করতে পারে না। প্রাধান্য দেওয়াও মারাত্মক অপরাধ; বরং একজন নবী সমস্ত ওলীদের চেয়ে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। এটাই আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আকিদা। কারণ রাসূল ﷺ বলেছেন- اَنَا اَكْرَمُ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ অর্থাৎ আমি শুরু ও শেষ সকল থেকে উত্তম। -[তিরমিযী] আর নবী করীম ﷺ-এর আগেও ওলী ছিল এবং পরেও ছিল, আছে এবং থাকবে। সুতরাং তিনি সকল ওলীদের থেকে উত্তম; বরং সকল নবীদের থেকেও তিনি উত্তম। কেননা নবী ও ওলীর মাঝে পার্থক্য রয়েছে। নিম্নে নবী ও ওলীদের মাঝে পার্থক্য তুলে ধরা হলো।

নবী ও ওলীদের মাঝে পার্থক্য :

আভিধানিক পার্থক্য : اَلنَّبِيُّ শব্দটি ن - ب - ى -এর সমন্বয়ে ঘটিত। বহুবচন اَلْاَنْبِيَاءُ - এর অর্থ হলো- খবর, সংবাদ ইত্যাদি।

আর وَلِيٌّ শব্দটি و - ل - ى -এর সমন্বয়ে ঘটিত। বহুবচন اَوْلِيَاءُ -এর অর্থ হলো- বন্ধু, অভিভাবক, মালিক ইত্যাদি।

পারিভাষিক পার্থক্য : اَلنَّبِيُّ বলা হয় যিনি আল্লাহ তা'আলার বিধানসমূহ প্রচার করেন কিংবা আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর বান্দাদের মাঝে দূত হিসেবে কাজ করেন।

اَلْوَلِيُّ বলা হয় রাসূল ﷺ -এর আনীত শরিয়তের সঠিক অনুসারী হয়ে আল্লাহর ইচ্ছায় আত্মনিয়োগকারী ব্যক্তিকে।

অন্যান্য পার্থক্য :

নবীগণ	ওলীগণ
১. নবীগণ নবুয়ত প্রাপ্তের পূর্বে ও পরে নিষ্পাপ থাকেন। তাদের থেকে কোনো ধরনের গুনাহ সংঘটিত হয় না।	১. ওলীগণ ওয়ালায়াতের পূর্বে ও পরে নিষ্পাপ থাকেন না; বরং গুনাহগার লোক কোনো সময় ওলী হতে পারে। আবার ওলী থেকেও গুনাহ সংঘটিত হতে পারে।

২. নবুয়ত রেসালাত কোনো মানুষ তার চেষ্টা ও সাধনার মাধ্যমে অর্জন করতে পারে না; বরং আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা তাকে এর জন্য মনোনীত করেন।	২. ওয়ালায়াত বা ওলী মানুষ নিজ চেষ্টা সাধনার মাধ্যমে অর্জন করতে পারেন।
৩. নবীগণের অনুসরণ করা সকল উম্মতের জন্য ফরজ। তাদের অনুসরণ ব্যতীত কেউ জান্নাতে যেতে পারবে না।	৩. ওলীদের অনুসরণ করা কোনো ব্যক্তির উপর ফরজ নয়; বরং তাদের অনুসরণ করা না করার চেয়ে উত্তম এবং তাদের অনুসরণ করা ব্যতীত জান্নাতে যেতে পারবে।
৪. নবীদের সাথে ফেরেশতারা সরাসরি সাক্ষাৎ করেন এবং তারা নিজেদের পরিচয় দেন।	৪. ওলীদের সাথে ফেরেশতারা সাক্ষাৎ করেন না। যদি করে তাহলেও পরিচয় দেয় না।
৫. নবীরা আল্লাহর সাথে কথা বলতে পারেন দুনিয়ায় থেকে।	৫. ওলীগণ আল্লাহর সাথে কথা বলতে পারেন না।

এছাড়াও নবী ও ওলীগণের মাঝে আরো অনেক পার্থক্য রয়েছে। যা এই সংক্ষিপ্ত গ্রন্থে উল্লেখ করা সম্ভব নয়।

قوله وَنُؤْمِنُ بِمَا جَاءَ الخ : অর্থাৎ আমরা ওলীগণ থেকে প্রকাশিত অলৌকিক ঘটনাবলির প্রতি বিশ্বাস রাখি। একথা স্মরণে রাখার বিষয় যে, ওলীদের থেকে যে অলৌকিক ঘটনাবলি প্রকাশিত হয় তাকে আরবিতে كَرَامَةٌ বলা হয় এবং নবী রাসূলগণ থেকে যা প্রকাশিত হয় তাকে مُعْجِزَةٌ বলা হয়। কাফের কিংবা মুশরিক বা নাফরমান ব্যক্তি থেকে যা প্রকাশিত হয় তাকে إِسْتِدْرَاجٌ বলা হয়। নিম্নে এগুলোর সংজ্ঞা ও পার্থক্য তুলে ধরা হলো।

كَرَامَةٌ -এর পরিচিতি :

كَرَامَةٌ -এর আভিধানিক অর্থ : এটি বাব نَصَرَ থেকে كَرُمَ মূল ধাতু হতে উদগত। এর অর্থ হচ্ছে বদান্যতা, মহাত্মা, দান করা ইত্যাদি।

পারিভাষিক সংজ্ঞা :

১. ইলমুল কালামের পরিভাষায় বলা হয়, هُوَ أَمْرٌ خَارِقٌ لِلْعَادَةِ يَظْهَرُ مِنَ الْوَلِيِّ غَيْرِ مُقَارِنٍ لَا دَعْوَى النُّبُوَّةِ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার প্রিয় বান্দাদের থেকে যে আলৌকিক ঘটনাবলি প্রকাশিত হয় তাই কারামত। তবে শর্ত হলো ঐ ব্যক্তি নুবয়তের দাবিদার না হওয়া।

২. যাদুত তুল্লাব গ্রন্থ প্রণেতা বলেন- هُوَ أَمْرٌ خَارِقٌ لِلْعَادَةِ يَأْتِي بِهِ شَخْصٌ অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি হতে অলৌকিক ঘটনাবলি প্রকাশিত হওয়াকেই কারামত বলে।

কারামত-এর উদাহরণ : পবিত্র কুরআনে উল্লেখ রয়েছে যে, হযরত সুলায়মান (আ.)-এর এক সাহাবী আসিফ ইবনে বারখিয়া চক্ষুর পলকের মধ্যেই একমাসের দূরত্ব থেকে বিলকিস রাণীর সিংহাসন তার নিকট পৌছে দিলেন।

مُعْجِزَةٌ পরিচিতি :

مُعْجِزَةٌ -এর আভিধানিক অর্থ :

مُعْجِزَةٌ শব্দটি বাব إِفْعَالٌ থেকে إِسْمُ فَاعِلٍ -এর وَاحِدْ مُؤَنَّثْ -এর সীগাহ, যা عَجْزٌ মূল ধাতু হতে উৎকলিত-

অর্থ হলো, অক্ষমকারী।

মু'জামুল ওয়াসীত গ্রন্থ প্রণেতা বলেন– مَا يُعْجِزُ الْبَشَرَ اَنْ يَّاْتِىَ بِمِثْلِهِ যে বস্তু সমকক্ষ বস্তু আনতে মানুষকে অব্যর্থ করে দেয়।

مُعْجِزَةٌ -এর পারিভাষিক সংজ্ঞা :

১. ইলমুল কালামের পরিভাষায় : هُوَ اَمْرٌ خَارِقٌ لِلْعَادَةِ يَظْهَرُ مِنَ النَّبِيِّ بَعْدَ النُّبُوَّةِ অর্থাৎ মু'জিযা বলা হয়, আলৌকিক ঐ ঘটনাকে যা কোনো নবী থেকে নবুয়ত প্রাপ্তির পর প্রকাশিত হয়।

২. মু'জমুল ওয়াসীত আভিধান প্রণেতা বলেন, هُوَ اَمْرٌ خَارِقٌ لِلْعَادَةِ يُظْهِرُهُ اللّٰهُ عَلٰى يَدِ النَّبِيِّ تَائِيْدًا لِلنُّبُوَّةِ অর্থাৎ মু'জিযা বলা হয়, আলৌকিক ঐ ঘটনাবলিকে যা আল্লাহ তা'আলা নবীদের হাতে প্রকাশ করেন নবুয়ত দৃঢ় করার জন্য।

৩. কতক আলেম বলেন– هُوَ اَمْرٌ خَارِقٌ لِلْعَادَةِ يُعْجِزُ الْاِنْسَانَ اَنْ يَّأْتِىَ بِمِثْلِهِ

মু'জিযার উদাহরণ : কুরআনে উল্লেখ রয়েছে হযরত রাসূল ﷺ চাঁদকে দ্বিখণ্ডিত করেছেন।

اِسْتِدْرَاجٌ পরিচিতি

اِسْتِدْرَاجٌ শব্দটি বাবে اِسْتِفْعَالٌ -এর মাসদার যা د - ر - ج মূলধাতু হতে উৎকলিত। অর্থ হলো– প্রতারণা মূলক অস্বাভাবিক কাজ করা।

اِسْتِدْرَاجٌ -এর পারিভাষিক সংজ্ঞা :

১. পরিভাষায় اِسْتِدْرَاجٌ বলা হয়, هُوَ اَمْرٌ خَارِقٌ لِلْعَادَةِ يَخْرُجُ مِنَ الْكَافِرِ اَوِ الْمُشْرِكِ حَسْبَ دَعْوَتِهِ অর্থাৎ ইস্তেদরাজ বলা হয় ঐ আলৌকিক ঘটনাবলিকে যা কাফের, মুশরিক থেকে তাদের দাবি অনুযায়ী প্রকাশিত হয়।

২. কেউ কেউ বলেন, ইস্তেদরাজ বলা হয় যে আলৌকিক ঘটনাবলি ঈমান ও আমলের সাথে সম্পৃক্ত নয়।

ইস্তেদরাজ-এর উদাহরণ : ফেরাউন তার আদেশে নীল নদে জোয়ার ও ভাটা দেখা ইত্যাদি।

উপরোল্লিখিত সব কটির মাঝে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান। নিম্নে তা দেওয়া হলো–

মু'জিযা, কারামত ও ইস্তেদরাজ-এর মধ্যকার পার্থক্য :

আভিধানিক পার্থক্য :

مُعْجِزَةٌ শব্দটি বাব اِفْعَالٌ হতে اِسْمُ فَاعِلٍ -এর وَاحِدْ مُؤَنَّثْ -এর যা ع - ج - ز মূলধাতু হতে উৎকলিত। অর্থ হলো– অক্ষমকারী ব্যহতকারী।

كَرَامَةٌ শব্দটি বাব كَرُمَ থেকে ك - ر - م মূলধাতু হতে উৎকলিত। অর্থ হলো– সম্মান, বদান্যতা।

اِسْتِدْرَاجٌ শব্দটি বাব اِسْتِفْعَالٌ থেকে د - ر - ج মূলধাতু হতে উৎকলিত। অর্থ হলো– প্রতারণামূলক কোনো কাজ সংঘটন করা, ধোকা দেওয়া।

পারিভাষিক পার্থক্য : مُعْجِزَةٌ : আল্লামা তাফতাজানী (র.) বলেন– মু'জিযা ঐ অলৌকিক ঘটনাবলি যা নবীদের থেকে নুবয়ত দাবি করার পর প্রকাশিত হয়।

كَرَامَةٌ : আল্লামা তাফতাজানী (র.) বলেন– কারামত ঐ অলৌকিক ঘটনাবলি যা নবুয়তের দাবি ব্যতীত ওলীদের থেকে প্রকাশিত হয়।

اِسْتِدْرَاجٌ : আল্লামা তাফতাজানী (র.) বলেন– ইস্তেদরাজ অস্বাভাবিক ঐ ঘটনাবলি যা কোনো ঈমান ও পুণ্যকর্মের সাথে সম্পৃক্ত নয়; বরং কাফের ও নাফরমান থেকে প্রকাশ হয়।

অন্যান্য পার্থক্য :

* মু'জিযা নবীগণ থেকে প্রকাশ হয়। আর কারামত ওলীদের থেকে প্রকাশ হয়। আর ইস্তেদরাজ কাফের ও ফাসেক হতে প্রকাশ হয়।
* মু'জিযা কাউকে শিখানো যায় না। আর কারামত কেউ শিখতে পারে না। আর ইস্তেদরাজ শিখানো যায়।
* মু'জিযা সত্যকে প্রমাণের জন্য। আর কারামত ওলীকে সান্ত্বনার জন্য। আর ইস্তেদরাজ পার্থিব স্বার্থ অর্জনের জন্য।
* মু'জিযা প্রকাশকারী নবী বলে দাবি করেন। আর কারামত প্রকাশকারী নিজেকে ওলী বলে দাবি করতে পারে না। আর ইস্তেদরাজ প্রকাশকারী ব্যক্তি শয়তানি বলে অস্বাভাবিক ঘটনা প্রকাশের দাবি করে থাকে।
* মু'জিযা বর্তমানে প্রকাশের কল্পনাই করা যায় না। যে মু'জিযা প্রকাশের দাবি করবে সে কাফের। আর কারামত বর্তমানেও প্রকাশের সম্ভাবনা রয়েছে এবং প্রকাশ পাওয়া কারামতের দাবিদার কাফের নয়। আর ইস্তেদরাজ জাদুর বেশে এখনো প্রকাশ পায়।

উল্লেখ্য যে কারামত এর বাস্তবতা ও সত্যতা নিয়ে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের ও মু'তাজিলা সম্প্রদায়ের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে।

আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত-এর মতামত :

আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের মতে কারামত সত্য। এ বিষয়ে কুরআন ও হাদীসের মধ্যে অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে।

দলিল :

* হযরত সুলায়মান (আ.)-এর সাহাবী আসফ বিন বারখিয়া তিনি বিলকিস রাণীর সিংহাসনকে চোখের পলকের মধ্যেই এক মাসের দূরত্ব থেকে তাঁর নিকট পৌঁছে দিলেন। তাঁর সম্পর্কে কুরআনে স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– وَقَالَ الَّذِيْنَ عِنْدَهٗ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ يَّرْتَدَّ اِلَيْكَ طَرْفُكَ –[সূরা নামল]
* হযরত নবী করীম ﷺ চাঁদ দু'খণ্ড করেছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ
* হযরত মারইয়াম (আ.) একজন আল্লাহর ওলী ছিলেন, তাঁর নিকট সর্বদা বেমৌসুমী ফল এসে যেত। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ
* মহানবী ﷺ বলেছেন– اِتَّقُوْا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَاِنَّهٗ يَنْظُرُ بِنُوْرِ اللّٰهِ

* হযরত ওমর (রা.) মদিনায় মসজিদের মিম্বরে দাঁড়িয়ে নাহাওয়ান্দ এলাকা দর্শন করেন এবং সেখানকার সেনাপতিকে সতর্ক হওয়ার নির্দেশ দান করেন।
* খলিফা হযরত ওমর (রা.) চিঠি দিয়েছিলেন নীলনদের কাছে, ফলে নীলনদ পুনরায় পানি প্রবাহিত করল।
* অনেক ওলীগণই পানির উপর দিয়ে চলা ফেরা করেছেন।
* সর্বময় কথা হলো এরকম অলিখিত অলৌকিক ঘটনা অসংখ্য অগণিত যা ওলীদের থেকে প্রকাশ হয়েছে।

মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের মতামত :

মু'তাযিলা সম্প্রদায় ওলীগণের কারামতকে অস্বীকার করে। তাঁরা বলে কারামত বা অলৌকিক ঘটনা নবী রাসূলদের থেকেই প্রকাশ পায়। ওলী আউলিয়াদের থেকে তা কখনো প্রকাশ পায় না।

দলিল : তারা নিজেদের স্বপক্ষে দলিল দিতে গিয়ে বলে, ওলীদের কারামত সত্য বলে স্বীকার করলে ওলীদের কারামত ও নবীদের মু'জিযা এক হয়ে যায় এবং নবীদের স্বতন্ত্র কোনো বৈশিষ্ট্য বর্তমান থাকে না।

তাদের জবাব : তাদের এই উদভ্রান্ত যুক্তি একেবারেই ঠিক নয়, কারণ ওলীর কারামত তখনই প্রকাশ পাবে যখন ওলী নবীদের আনীত শরিয়তের উপর পূর্ণভাবে অনুসরণ করবে। ফলে ওলীর কারামত ও নবীর মু'জিযা মিলে যাওয়ার কোনো ভয় নেই। প্রকৃত পক্ষে ওলীর কারামত নবীর মু'জিযারই অংশ বিশেষ। আর মু'জিযার জন্য নবুয়তের দাবি শর্ত। কিন্তু কারামতের জন্য নবুয়তের দাবি শর্ত নয়। এমন কি কারামতের জন্য নবুয়তের দাবি তো দূরের কথা। ওয়ালায়াতের দাবিও আবশ্যক নয়।

কিয়ামতের নিদর্শনাবলি

وَنُؤْمِنُ بِأَشْرَاطِ السَّاعَةِ مِنْ خُرُوْجِ الدَّجَّالِ وَنُزُوْلِ عِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ مِنَ السَّمَاءِ وَخُرُوْجِ يَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ وَنُؤْمِنُ بِطُلُوْعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَخُرُوْجِ دَابَّةِ الْاَرْضِ مِنْ مَوْضِعِهَا.

অনুবাদ : আমরা কিয়ামতের শর্তসমূহের প্রতি বিশ্বাস রাখি। ক. দাজ্জালের আবির্ভাব হওয়া। খ. আসমান হতে মারইয়াম তনয় হযরত ঈসা (আ.)-এর অবতরণ করা। গ. ইয়াজূজ ও মা'জূজের আবির্ভাব হওয়া এবং ঘ. দিগন্তের পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হওয়ার প্রতি আমরা ঈমান রাখি। দাব্বাতুল আরদ নামক বিশেষ জন্তু তার স্থান হতে আবির্ভাব হওয়ার প্রতিও ঈমান রাখি।

কিয়ামতের পূর্বাভাসসমূহ :

কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে সে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন, কিয়ামত ও পুনরুত্থান অবশ্যই সত্য। এতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে পুনরুত্থান ও কিয়ামত কবে হবে এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন। কুরআনে এ সম্পর্কে বারংবার আলোচনা হয়েছে। যেমন– আল্লাহ তা'আলা বলেন–

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسٰهَا قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّيْ لَا يُجَلِّيْهَا لِوَقْتِهَاۤ اِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَا تَاْتِيْكُمْ اِلَّا بَغْتَةً يَسْئَلُوْنَكَ كَاَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا ـ قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ.

অর্থাৎ তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে? বলুন এসব ব্যাপারে জ্ঞান শুধুমাত্র আমার প্রতিপালকেরই আছে। শুধু তিনি যথা সময়ে তা প্রকাশ করবেন। আর তা আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীতে একটি ভয়ংকর ঘটনা হবে। আকস্মিকভাবেই তা তোমাদের উপর ঘটবে। তুমি এ বিষয়ে সবিশেষ আবহিত মনে করে তারা তোমাকে প্রশ্ন করো বলুন এ বিষয়ে জ্ঞান শুধু আল্লাহরই আছে। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না। –[সূরা আ'রাফ : ১৮৭]

* অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ وَمَا يَشْعُرُوْنَ اَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ অর্থাৎ বল! আল্লাহ ছাড়া আকাশ ও পৃথিবীতে কেউই অদৃশ্যের খবর জানেনা। আর তারা জানেনা কখন তারা পুনরুত্থিত হবে। –[সূরা নামল : ৬৫]
* অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন– يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسٰهَا فِيْمَ اَنْتَ مِنْ ذِكْرٰهَا اِلٰى رَبِّكَ مُنْتَهٰهَا.

* **কিয়ামতের পূর্বাভাস :** কিয়ামত সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবীর মানুষকে কিছু জানাননি। তবে এর নিদর্শন স্বরূপ কিছু আলামত জানিয়ে দিয়েছেন। যেমন কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন- فَهَلْ يَنْظُرُوْنَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنّٰى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ. অর্থাৎ তারা কি কেবল এ জন্য অপেক্ষা করছে যে, তাদের নিকট কিয়ামত এসে পড়ুক আকস্মিকভাবে। আর কিয়ামতের শর্তসমূহ তো এসেই পড়েছে। আর যখন কিয়ামত এসেই পড়বে তখন তারা কিভাবে উপদেশ গ্রহণ করবে? -[সূরা মুহাম্মদ : ১৮]

কুরআন ও হাদীসে কিয়ামত সম্পর্কে বিভিন্ন পূর্বাভাস সবিস্তারে বর্ণিত রয়েছে। কুরআন ও হাদীসের আলোকে ওলামা মাশায়েখগণ এগুলোর কিছু বিষয়কে عَلَامَتْ صُغْرٰى অর্থাৎ সাধারণ আলামত এবং কিছু বিষয়কে عَلَامَتْ كُبْرٰى অর্থাৎ বিশেষ আলামত নামে চিহ্নিত করেছেন। নিম্নে এর সংক্ষিপ্ত আলোচনা উপস্থাপিত হলো।

আলামতে সুগরা :

উপরে বর্ণিত আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, কিয়ামতের পূর্বাভাস প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে সর্বশেষ আভাস হলো নবী করীম ﷺ -এর আগমন। যেমন সাহল ইবনে ছায়দ আস সাঈদী (রা.) হতে বর্ণিত- بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهٰذِهٖ مِنْ هٰذِهٖ أَوْ كَهَاتَيْنِ وَقَرَنَ بَيْنَ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطٰى অর্থাৎ রাসূল ﷺ তাঁর হাতের তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুল একত্রিত করে বলেন, আমি প্রেরিত হয়েছি কিয়ামতের সাথে এভাবে পাশাপাশি। আমরা দেখেছি নবুয়তের ধারার পরিসমাপ্তি কিয়ামতের অন্যতম পূর্বাভাস। -[বুখারী ও মুসলিম]

এ সকল হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে, কিয়ামতের পূর্বে মানুষের আগণিত উন্নতি হবে। জীবন যাত্রা যাত্রার মান হবে কল্পনাতীত রকমের উন্মত। অল্প সময়ে মানুষ অনেক কাজ করতে সক্ষম হবে। অর্থনৈতিক উন্নতি ব্যাপক হবে। অধিকাংশ মানুষ স্বচ্ছল ও স্বাবলম্বী হবে। তবে ধার্মিকতা কমে যাবে। নৈতিক মূল্যবোধের ব্যাপক অবক্ষয় ঘটবে। পাপ অনাচার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাবে। মিথ্যা ও ভণ্ড নবীদের আর্বিভাব ঘটবে। হত্যা, সন্ত্রাস বৃদ্ধি পাবে ও বৃহৎ যুদ্ধ হতে থাকবে। এসব আলামত প্রকাশের এক পর্যায়ে বিশেষ আলামত প্রকাশ হবে।

قوله نُؤْمِنُ بِأَشْرَاطِ السَّاعَةِ الخ : অর্থাৎ আমরা আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত কিয়ামতের সকল নিদর্শনাবলির প্রতি ঈমান রাখি। কেননা এগুলো সব কুরআন সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত। এগুলোর প্রতি ঈমান না রাখলে প্রকৃত মু'মিন হওয়া যাবে না। গ্রন্থকার (র.) কিয়ামতের বড় আলামতগুলোর উল্লেখ করেছেন। নিম্নে এর বিস্তারিত আলোচনা করা হলো-

আলামতে কুবরা :

গ্রন্থকার (র.) যে সকল আলামত উল্লেখ করেছেন সেগুলোর প্রমাণ হিসেবে হযরত নবী করীম ﷺ -এর একটি হাদীস নিম্নে তুলে ধরা হলো।

* হযরত হুজায়ফা বিন আসীদ (রা.) বলেন- হযরত নবী করীম ﷺ বিদায় হজের সময় আরাফার ময়দানে অবস্থান করতে ছিলেন। আমরা তাঁর থেকে নিচু স্থানে অবস্থান করছিলাম।

তিনি আমাদের দিকে দৃষ্টি দিয়ে বললেন, তোমরা কোন বিষয়ে আলোচনা করছ? আমরা বললাম, কিয়ামত সম্পর্কে। তখন তিনি বললেন−

لَنْ تَقُوْمَ السَّاعَةُ حَتّٰى تَرَوْا عَشَرَ اٰيَاتٍ الدُّخَانَ - اَلدَّجَّالَ - وَالدَّابَّةَ - وَطُلُوْعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَنُزُوْلَ عِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ وَخُرُوْجَ يَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ وَثَلٰثَةَ خُسُوْفٍ خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ خَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ وَخَسْفٌ بِجَزِيْرَةِ الْعَرَبِ وَاٰخِرُ ذٰلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ يَطْرُدُ النَّاسَ اِلٰى مَحْشَرِهِمْ.

অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত দশটি নিদর্শন প্রকাশ না পাবে ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না। যথা− ১. ধুম্র নির্গত হওয়া, ২. দাজ্জাল, ৩. ভূমির প্রাণী বের হওয়া, ৪. পশ্চিম দিগন্তে সূর্যোদয় হওয়া, ৫. মারইয়াম তনয় ঈসা (আ.) অবতরণ করা, ৬. ইয়াজূজ মা'জূজ আবির্ভাব হওয়া। তিনটি ভূমি ধ্বংস হওয়া, ৭. পশ্চিমে, ৮. পূর্বে, ৯. আরব উপদ্বীপে, ১০. এমন একটি অগ্নিকুণ্ড ইয়ামেন থেকে বের হওয়া যা সকল মানুষকে হাশরের দিকে তাড়াবে। −[মুসলিম]

এ সকল আলামত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা বিভিন্ন আয়াত ও হাদীসে দেওয়া হয়েছে। নিম্নে প্রত্যেকটি সম্পর্কে আলোচনা হলো।

* **দাজ্জাল :** হযরত রাসূল ﷺ বলেছেন− وَاللّٰهِ لَا يَخْفٰى عَلَيْكُمْ اَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِاَعْوَرَ وَاِنَّ الْمَسِيْحَ الدَّجَّالَ اَعْوَرُ عَيْنِهِ الْيُمْنٰى كَاَنَّ عَيْنَهُ طَافِيَةٌ অর্থাৎ আল্লাহর শপথ! তোমাদের নিকট গোপন নয় যে, আল্লাহ তা'আলা অন্ধ নন। নিশ্চয় মাসীহ দাজ্জাল তার ডান চোখ অন্ধ। তার চক্ষুটি ফুলা অঙ্গারের মতো। −[মুসলিম]
* **ঈসা ইবনে মারইয়াম :** তাঁর অবতরণ সম্পর্কে রাসূল ﷺ বলেছেন− وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ لَيُوْشِكَنَّ اَنْ يَنْزِلَ فِيْكُمْ عِيْسَى بْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلًا অর্থাৎ ঐ সত্তার শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ, অতি সত্তর তোমাদের মাঝে মারইয়ামের পুত্র ঈসা ন্যায়পরায়ণ বিচারক হিসেবে অবতরণ করবেন। এর দিকেই ইঙ্গিত করে আল্লাহ তা'আলা বলেন−

وَقَوْلِهِمْ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيْحَ عِيْسَى بْنَ مَرْيَمَ رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ وَلٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِيْهِ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مَالَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ اِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوْهُ يَقِيْنًا - بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ - وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا.

* **ইয়াজূজ মা'জূজ :** ইয়াজূজ মা'জূজ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন− حَتّٰى اِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوْجُ وَمَأْجُوْجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَّنْسِلُوْنَ .... الخ অর্থাৎ এমনকি যখন ইয়াজূজ ও মা'জূজকে মুক্তি দেওয়া হবে এবং তারা প্রতিটি উচ্চভূমি হতে ছুটে আসবে। −[সূরা আম্বিয়া]
* **পশ্চিম দিগন্তে সূর্যোদয় :** এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন− يَوْمَ يَأْتِيْ بَعْضُ اٰيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا اِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ اَوْ كَسَبَتْ فِيْ اِيْمَانِهَا خَيْرًا অর্থাৎ যেদিন আপনার পালনকর্তার কোনো নিদর্শন এসে যাবে তখন এমন কোনো ব্যক্তির ঈমান ফলপ্রসূ হবে না। যে পূর্ব থেকে ঈমান আনেনি। অথবা নিজ ঈমান অনুযায়ী সৎকর্ম করেনি। −[সূরা আন'আম]

এ আয়াত দ্বারা বুঝা যায় কিয়ামতের একটি নিদর্শন প্রকাশ হলে তওবা কবুল হবে না। আল্লাহ তা'আলা এখানে সে নিদর্শন সম্পর্কে কিছুই বলেননি। রাসূল ﷺ এ সম্পর্কে বলেন– ثَلٰثٌ اِذَا خَرَجْنَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا اِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ اَوْ كَسَبَتْ فِىْ اِيْمَانِهَا خَيْرًا طُلُوْعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَالدَّجَّالُ وَدَابَّةُ الْاَرْضِ অর্থাৎ (কিয়ামতের) তিনটি নিদর্শন যখন প্রকাশ হবে তখন ঐ ব্যক্তির ঈমান ফলপ্রসূ হবে না যে এর পূর্বে ঈমান আনেনি; কিংবা ঈমান অনুযায়ী আমল করেনি। যথা– ১. পশ্চিম দিগন্তে সূর্যোদয় হওয়া, ২. দাজ্জাল বের হওয়া ও ৩. ভূমির জীব বের হওয়া। –[মুসলিম]

* **ভূমির প্রাণী বের হওয়া :** এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন– وَاِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ اَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْاَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ اَنَّ النَّاسَ كَانُوْا بِاٰيَاتِنَا لَا يُوْقِنُوْنَ অর্থাৎ যখন ঘোষিত শাস্তি তাদের নিকট আসবে তখন আমি মৃত্তিকা গর্ভ থেকে বের করব এক জীব যা তাদের সাথে কথা বলবে। এজন্য যে মানুষ আমার নির্দশনে অবিশ্বাসী। –[সূরা নামল : ৮২]

* ইমামে আজম হযরত আবূ হানীফা (র.) বলেন–

خُرُوْجُ الدَّجَّالِ وَيَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ وَطُلُوْعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَنُزُوْلُ عِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ السَّمَاءِ وَسَائِرُ عَلَامَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ عَلٰى مَاوَرَدَتْ بِهِ الْاَخْبَارُ الصَّحِيْحَةُ حَقٌّ كَائِنٌ وَاللّٰهُ تَعَالٰى يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ.

অর্থাৎ দাজ্জালের বহির্গমন, ইয়াজূজ মা'জূজ -এর বহির্গমন, অস্তগমনের স্থান থেকে সূর্যোদয়, আকাশ হতে হযরত ঈসা (আ.)-এর অবতরণ এবং কিয়ামতের অন্যান্য সকল পূর্বাভাস যা সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, সবই চির সত্য এবং ঘটবেই। মহান আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন। সুতরাং এসবই কিয়ামতের পূর্বাভাস এগুলোর উপর আমরা পূর্ণ বিশ্বাসী। আর যে এগুলো বিশ্বাস করবে না সে বিপথগামী।

জ্যোতিষী ও শরিয়ত বিরোধীকে বিশ্বাস করা অবৈধ

وَلَا نُصَدِّقُ كَاهِنًا وَلَا عَرَّافًا وَلَا مَنْ يَدَّعِي شَيْئًا يُخَالِفُ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ وَإِجْمَاعَ الْأُمَّةِ.

অনুবাদ : আমরা কোনো জ্যোতিষী, কোনো গণক এবং এমন কোনো ব্যক্তি যে কুরআন সুন্নাহ ও উম্মতের ঐক্যের বিরুদ্ধে কথা বলে, তাদেরকে বিশ্বাস করি না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قوله وَلَا نُصَدِّقُ ..... الخ : যারা জ্যোতিষী, গণক এবং এমন ব্যক্তি যে সর্বদা ইসলাম তথা কুরআন সুন্নাহ ও ইজমায়ে উম্মতের বিরুদ্ধে কথা বলে, তাদেরকে বিশ্বাস করা ও তাদের কথা মেনে নেওয়া বৈধ নয়। এটাই হলো আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আকিদা। কেননা এ সকল লোক আবান্তর অদৃশ্যে সংবাদ প্রদান করে; যার মূলত কোনো ভিত্তি নেই।

এদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা দিয়েছেন- قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ' অর্থাৎ আপনি বলে দিন, ভূ-মণ্ডলে ও নভোমণ্ডলের অদৃশ্যের সংবাদ কেউ জানে না আল্লাহ তা'আলা ছাড়া। -[সূরা নামল]

উপরিউক্ত আয়াত দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ মিলে যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কেউ অদৃশ্যের সংবাদ জানে না। এমনকি হযরত নবী করীম ﷺ ও জানতেন না। শুধু অদৃশ্যের যে সংবাদ তাকে দেওয়া হতো তাই তিনি জানতেন। এর বেশি কিছু নয়। তাহলে গণক ও জ্যোতিষী কিভাবে অদৃশ্যের খবর জানবে?

যারা জ্যোতিষী ও গণকের কথা বিশ্বাস করে তাদেরকে কঠোর হুশিয়ারি দিয়ে রাসূল ﷺ বলেছেন- مَنْ اَتٰى عَرَّافًا فَسَئَلَهٗ عَنْ شَئٍ لَمْ تُقْبَلْ صَلٰوتُهٗ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোনো গণকের কাছে আসবে অতঃপর তাকে কোনো বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে তবে তার চল্লিশ দিনের নামাজ কবুল করা হবে না। -[মুসলিম]

অন্য এক হাদীসে রাসূল ﷺ বলেন- مَنْ اَتٰى كَاهِنًا فَصَدَّقَهٗ بِمَا يَقُوْلُ اَوْ اَتٰى اِمْرَاَتَهٗ حَائِضًا فِىْ دُبُرِهَا فَقَدْ بَرِئَ بِمَا اُنْزِلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ ﷺ অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোনো গণকের কাছে আসবে অতঃপর তার কথাকে সত্য বলে বিশ্বাস করবে অথবা ঋতুবর্তী অবস্থায় তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করবে কিংবা গুহ্যদ্বার দিয়ে সঙ্গম করবে নিঃসন্দেহে সে মুহাম্মদ ﷺ -এর উপর অবতারিত দীন থেকে মুক্ত হয়ে গেল।

সুতরাং বুঝা গেল, জ্যোতিষী বা গণকের কাছে যাওয়া এবং তার নিকট থেকে কিছু জিজ্ঞাসা করা ঈমানের জন্য মারাত্মক হুমকি। তাই এ থেকে বিরত থাকাই বাঞ্ছনীয়।

তাছাড়া আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ নিশ্চয় মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য নির্ধারক শরসমূহ এসব শয়তানের অপবিত্র কার্য ভিন্ন অন্য কিছু নয়। অতএব এ থেকে বিরত থাক। -[সূরা মায়েদা : ৯০]

এ আয়াতে ভাগ্য নির্ধারক শরকেও শয়তানের কাজ বলা হয়েছে। কারণ ভাগ্য নির্ধারণ একটি অদৃশ্য বস্তু নির্ধারণের শামিল। অনুরূপ গণক ও জ্যোতিষীও অদৃশ্য বস্তু নির্ধারণ করে তাই এটিও শয়তানের কাজের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর কোনো মু'মিন শয়তানের কাজে লিপ্ত হতে পারে না।

قوله ولا من يدعى شيئا : অর্থাৎ আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত ঐ ব্যক্তিকে বিশ্বাস করেন না যে ব্যক্তি কুরআন ও সুন্নাহ তথা ইজমায়ে উম্মতের বিরোধী কথাবার্তা বলে। যেমন কোনো ব্যক্তি দাবি করল যে সে নিঃস্ব ব্যক্তিকে ধনী বানিয়ে দিতে পারে। নিঃসন্তান ব্যক্তিকে সন্তান দান করতে পারবে এবং ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদির মোকাবিলা করতে পারবে। অনাবৃষ্টিতে সে জাতিকে বৃষ্টি দান করতে পারবে। তাহলে এ ব্যক্তিকে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত বিশ্বাস করে না। কারণ তার এসব কথাবার্তা শরিয়ত বিরোধী এবং কুফরি। এ ধরনের লোককে বিশ্বাস করাও কুফরি। (আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে হেফাজত করুন।)

মুসলমান ঐক্যবদ্ধ থাকা কর্তব্য

وَنَرَى الْجَمَاعَةَ حَقًّا وَصَوَابًا وَالْفُرْقَةَ زَيْغًا وَعَذَابًا .

অনুবাদ : আমরা (মুসলমানদের) একতাবদ্ধ থাকাকে সত্য ও সঠিক মনে করি এবং একতাবদ্ধতা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা ভ্রষ্টতা ও আজাব মনে করি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قوله وَنَرَى الْجَمَاعَةَ : আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত একতাবদ্ধতাকে সঠিক ও সত্য মনে করে। আর উক্ত একতা হতে হবে কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী এবং কুরআন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। কারণ আল্লাহ তা'আলাই সকল মুসলমানকে ঐক্যবদ্ধ থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। একতাবদ্ধতার ব্যাপারে কালাম পাকে ইরশাদ হচ্ছে وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে সম্মিলিতভাবে আকড়ে ধর। আর বিচ্ছিন্ন হয়ে না।

–[সূরা আলে ইমরান]

* অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন– وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَاخْتَلَفُوْا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ অর্থাৎ যারা স্পষ্ট দলিল আসার পরও বিচ্ছিন্ন হয়েছে এবং মতভেদ সৃষ্টি করেছে তোমরা তাদের মতো হয়ো না। –[সূরা আলে ইমরান]
* তাছাড়া রাসূল ﷺ একতাবদ্ধতার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করতে গিয়ে বলেছেন– لَا إِسْلَامَ إِلَّا جَمَاعَةً অর্থাৎ একতা ছাড়া ইসলাম হয় না।
* অন্য এক হাদীসে রাসূল ﷺ আরো বলেছেন– يَدُ اللّٰهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ অর্থাৎ একতাবদ্ধতা মুসলমানের উপর আল্লাহর রহমত।

অতএব সকল মুসলমান একতাবদ্ধ হওয়া উচিত।

قوله وَالْفُرْقَةَ زَيْغًا وَعَذَابًا الخ : অর্থাৎ আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত বিচ্ছিন্নতাকে আজাব ও বক্রতা হিসেবে আখ্যা দেন। কারণ যে জাতির মধ্যে সহমর্মিতা, সহিঞ্চুতা, সমবেদনা ও সহানুভূতি রয়েছে সে জাতি সবচেয়ে শান্তিতে রয়েছে। তাদের মধ্যে শান্তি শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা রয়েছে এবং এরই ফলে তাদের মধ্যে ঐক্য ও একতা রয়েছে এবং তাদের মধ্যে কোনো দলাদলি, বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতা নেই। কিন্তু যে জাতির মধ্যে সহমর্মিতা, সহিঞ্চুতা, সমবেদনা, ও সহানুভূতি নেই যেখানেই দেখা দিয়েছে দলাদলি, বিচ্ছিন্নতা ও বিভেদ।

আর এদের ব্যাপারে হুঁশিয়ার উচ্চারণ করে আল্লাহ তা'আলা বলেন– إِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِيْ شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللّٰهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ- অর্থাৎ নিশ্চয় যারা নিজ ধর্মকে খণ্ড বিখণ্ড করেছে এবং অনেক দলে বিভক্ত হয়েছে। তাদের সাথে আপনার কোনো সম্পর্ক নেই। নিশ্চয় তাদের বিষয় আল্লাহর নিকট সমর্পিত। অতঃপর তিনি তাদেরকে অবহিত করবেন, যা তারা করে সে সম্পর্কে।

–[সূরা আন'আম]

একটি প্রশ্ন ও তার জবাব :

প্রশ্ন : উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা বুঝা গেল যে, শরিয়তে মতভেদ সৃষ্টি করা একেবারেই অপছন্দ। কিন্তু আইম্মায়ে মুজতাহীদিন এর মধ্যে অনেক মতবিরোধ রয়েছে। এতে কি তারা উপরিউক্ত গর্হিত কাজের অন্তর্ভুক্ত হননি? এবং নিন্দনীয় ও বিচ্ছিন্নতার আওতায় পড়েন নি?

জবাব :

১. উপরিউক্ত আয়াতে যে বিচ্ছিন্নতা ও মতবিরোধের কথা বলা হয়েছে তাহলো সে সব মতবিরোধ যা শরিয়তের মূলনীতিতে করা হয়। কিংবা নিজের স্বার্থ অর্জনের জন্য শরিয়তের শাখা প্রশাখায় করা হয়। আয়াতে বর্ণিত সুস্পষ্ট উজ্জ্বল প্রমাণ আসার পর" বাক্যটি দ্বারা একথা বুঝা যায়। কারণ শরিয়তের প্রমাণ উজ্জ্বল সুস্পষ্ট হয়ে থাকে। কিন্তু শাখা প্রশাখা রয়েছে যা এমন স্পষ্ট হয়ে থাকে যে, তাতে স্বার্থপরতা না থাকলে মতেবিরোধের কোনো প্রশ্নই থাকে উঠে না। কিন্তু যে শাখা প্রশাখা অস্পষ্ট তা সম্পর্কে কোনো আয়াত বা হাদীস না থাকার কারণে ইমামদের মাঝে যে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে, তা উপরিউক্ত বর্ণিত মতবিরোধের আওতায় পড়ে না। কারণ তারা উক্ত মাসআলাটিকে সমাধান দেওয়ার জন্যই মতবিরোধ করেছেন; বরং তাদের এতে ছওয়াব হবে।

২. প্রত্যেক মতভেদই নিন্দনীয় নয়; বরং ঐ মতবিরোধই নিন্দনীয় যা কু-প্রবৃত্তির তাড়নার বশীভূত হয়ে কুরআন সুন্নাহর বাহির থেকে হয়ে থাকে। কিন্তু যদি কুরআনের গণ্ডির ভিতরে থেকে রাসূল ﷺ, সাহাবা, তাবেঈন (রা.) গণের ব্যাখ্যার অনুসরণ করে নিজের মেধা ও যোগ্যতার আলোকে শরিয়তের শাখা-প্রশাখার মতবিরোধ করে তাহলে তা নিন্দনীয় নয়; বরং প্রশংসনীয়। ইসলাম একে সমর্থন করে। আর আইম্মায়ে মুজতাহিদগণের মতবিরোধ ছিল এই প্রকারেরই। আর তাদের এই মতবিরোধকে রহমত হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

৩. আয়াতে বর্ণিত মতবিরোধের কারণে ভবিষ্যত প্রজন্ম হয়ে যায় বিভ্রান্ত এবং জাতি হয় ধ্বংস। কিন্তু আইম্মায়ে মুজতাহিদগণের মতবিরোধের কারণে ইসলামের বিধানগুলো হয়েছে জাতির জন্য সহজ-সরল ও সুস্পষ্ট। যার কারণে ভবিষ্যত প্রজন্ম হচ্ছে সঠিক পথ প্রাপ্ত এবং জাতি পাচ্ছে পরলৌকিক জীবনে মুক্তির সঠিক দিশা।

ইসলাম আল্লাহ তা'আলার মনোনীত ধর্ম

دِيْنُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ وَاحِدٌ وَهُوَ دِيْنُ الْاِسْلَامِ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ وَقَالَ تَعَالٰى وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا وَهُوَ بَيْنَ الْغُلُوِّ وَالتَّقْصِيْرِ وَالتَّشْبِيْهِ وَالتَّعْطِيْلِ وَبَيْنَ الْجَبْرِ وَالْقَدْرِ وَبَيْنَ الْاَمْنِ وَالْيَاْسِ.

অনুবাদ : আসমান ও জমিন সর্বত্রই আল্লাহ্ তা'আলার দীন এক। আর তা হলো ইসলাম। আল্লাহ্ পাক বলেন, "নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলার নিকট মনোনীত দীন ইসলাম।" এবং আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন– "আমি তোমাদের জন্য ইসলামকে দীন হিসেবে মনোনীত করলাম। এই দীন ইসলাম অতিরঞ্জন ও সংকোচন, তাশবীহ ও তা'তীল, জবর ও ক্বদর এবং নিশ্চিন্ততা ও নৈরাশ্যের মধ্যবর্তী এক ধর্ম।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قوله فِي السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ الخ : আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত এই আকিদা রাখে যে, আসমান ও জমিনে আল্লাহ্ তা'আলার দীন এক। তাঁর দীন ব্যতীত অন্য দীনের গ্রহণযোগ্যতা নেই। কারণ আসমান ও জমিনের স্রষ্টা, মালিক, বিচারক একমাত্র আল্লাহ্। এতে অন্য কেউ শরিক নেই। যেহেতু তাঁর মালিকানায় কেউ শরিক নেই। তাহলে কিভাবে তার দীনে অন্য কেউ শরিক থাকবে? সুতরাং তার দীন আসমান ও জমিনে এক।

قوله هُوَ دِيْنُ الْاِسْلَامِ الخ : অর্থাৎ আসমান ও জমিনে দীন এক, আর উক্ত দীন হলো ইসলাম। নিম্নে دِيْن দীন সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

دِيْن –এর পরিচিতি :

* دِيْن -শব্দের আভিধানিক অর্থ :

دِيْن শব্দটি একবচন, বহুবচন اَدْيَانٌ অর্থ হলো– ধর্ম, ধর্ম বিশ্বাস, ধার্মিকতা, প্রথা ও প্রতিদান। যেমন– আল্লাহ্ তা'আলা বলেন– مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ

* **পারভাষিক সংজ্ঞা :** শরিয়তের পরিভাষায় دِيْن বলা হয়। হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে শেষনবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ পর্যন্ত সকল নবী-রাসূলগণের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার যে বিধি-বিধান সমভাবে বিদ্যমান ছিল। যেমন– আল্লাহ্ তা'আলা বলেন–

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا.

ইসলাম পরিচিতি :

* اِسْلَامٌ -এর আভিধানিক অর্থ :

اِسْلَامٌ শব্দটি بَابُ اِفْعَالٌ থেকে س - ل - م মূলধাতু থেকে উৎকলিত। এর অর্থ–

১. اَلْاِنْقِيَادُ অর্থাৎ আনুগত্য করা। ২. اَلْاِسْتِسْلَامُ অর্থাৎ আত্মসমর্পন করা। ৩. مُذْعِنٌ অর্থাৎ আত্মসমর্পণকারী। ৪. قَبُوْلُ অর্থাৎ গ্রহণ করা। ৫. اَلْاِطَاعَةُ অর্থাৎ আনুগত্য করা। ৬. اَلْخُضُوْعُ অর্থাৎ বিনয় প্রকাশ করা। ৭. مُطِيْعٌ অর্থাৎ অনুগত। ৮. اِخْلَاصٌ অর্থাৎ নিষ্ঠার সাথে কাজ করা। ৯. اَلدُّخُوْلُ فِى السِّلْمِ অর্থাৎ শান্তির ধর্মে প্রবেশ করা। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন- يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَافَّةً

* اِسْلَامٌ -এর পারিভাষিক সংজ্ঞা :

১. আল্লামা আবুল বারাকাত আন-নাসাফী (র.) -এর মতে-

اَلْاِسْلَامُ هُوَ التَّصْدِيْقُ وَالْاِقْرَارُ بِاللّٰهِ تَعَالٰى كَمَا هُوَ وَاقِعٌ بِاَسْمَائِهٖ وَصِفَاتِهٖ وَشَرَائِعِهٖ.

অর্থাৎ ইসলাম বলা হয় আল্লাহ তা'আলাকে তাঁর নাম ও গুণাবলি অনুযায়ী মৌখিক স্বীকৃতি দেওয়া, অন্তরে বিশ্বাস করা এবং শরিয়তের আদেশ ও নিষেধসমূহ মেনে আপন জীবন পরিচালনা করা।

২. ইমাম আবূ হানীফা (র.) -এর মতে-

اَلْاِسْلَامُ هُوَ التَّسْلِيْمُ وَالْاِنْقِيَادُ لِاَوَامِرِ اللّٰهِ وَبِرَسُوْلِهٖ.

অর্থাৎ ইসলাম বলা হয় আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর আদেশসমূহ মেনে নেওয়া ও তার অনুসরণ করাকে।

৩. মু'জামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার (র.) বলেন- هُوَ اِظْهَارُ الْخُضُوْعِ وَالْقَبُوْلِ لِمَا اَتٰى بِهٖ مُحَمَّدٌ

৪. আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র.) বলেন-

هُوَ الْاِنْقِيَادُ لِلّٰهِ تَعَالٰى بِقَبُوْلِ مَا جَاءَ بِهٖ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَالتَّلَفُّظُ بِكَلِمَتَىِ الشَّهَادَةِ وَالْاِتْيَانُ بِالْوَاجِبَاتِ وَالْاِمْتِنَاعُ عَنِ الْمُنْكَرَاتِ.

৫. দুররুল মুখতার গ্রন্থকার (র.) বলেন- اَلْاِسْلَامُ هُوَ تَصْدِيْقُ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ﷺ فِىْ جَمِيْعِ مَا جَاءَ بِهٖ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ تَعَالٰى.

৬. কামূসুল ফিকহী গ্রন্থকার (র.) বলেন- اَلْاِسْلَامُ هُوَ الْاِنْقِيَادُ لِمَا اَخْبَرَ بِهٖ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

৭. ফয়জুল গ্রন্থকার (র.) বলেন-

هُوَ الْاِنْقِيَادُ الظَّاهِرِىْ وَالتَّلَفُّظُ بِالشَّهَادَتَيْنِ وَالْاِقْرَارُ بِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِمَا

* اِيْمَانٌ ও اِسْلَامٌ সমার্থক না বিপরীতার্থক :

১. আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত বলেন- اِيْمَانٌ শব্দটি اِسْلَامٌ -এর সাথে উহ্য মুতলাক। কেননা এতদুভয়ের শরিয়তে জাহির এর সাথে বাতিলের সম্পর্কের মতো। যা পরস্পর পৃথক করা যায় না।

২. জমহুর মুহাদ্দিসীন বলেন- اِيْمَانٌ ও اِسْلَامٌ শব্দদ্বয় এক ও অভিন্ন।

দলিল : আল্লাহ তা'আলা বলেন- فَاَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيْهَا مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَمَا وَجَدْنَا فِيْهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ

৩. মুহাক্কিক ওলামায়ে কেরাম বলেন– إِسْلَامْ ও إِيْمَانْ উভয়টি বিপরীতার্থক। কারণ إِيْمَانْ হলো অন্তরে বিশ্বাসের নাম। আর إِسْلَامْ হলো প্রকাশ্যে আনুগত্যের নাম। যেমন– قَالَتِ الْاَعْرَابُ اٰمَنَّا قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا وَلٰكِنْ قُوْلُوْآ اَسْلَمْنَا

৪. ওলামায়ে আহনাফ বলেন- إِسْلَامْ ও إِيْمَانْ -এর মাঝে عَامْ خَاصْ مُطْلَقْ -এর সম্পর্ক। অর্থাৎ একজন মু'মিন পূর্ণাঙ্গ মুসলিম বলা যায় কিন্তু একজন মুসলিমকে পূর্ণাঙ্গ মু'মিন বলা যায় না।

৫. হাফেজ ইবনে হাজার আসকালীন (র.) বলেন– إِسْلَامْ ও إِيْمَانْ শব্দদ্বয় একত্রে ব্যবহৃত হলে ভিন্নার্থে এবং ভিন্ন ভিন্ন থাকলে একার্থে ব্যবহার হয়।

৬. মোল্লা আলী কারী (র.) বলেন- إِسْلَامْ ও إِيْمَانْ -এর মাঝে পারস্পারিক সম্পর্ক হলো শরীর ও আত্মার সম্পর্ক।

৭. কতিপয় আলেম বলেন– إِسْلَامْ ও إِيْمَانْ -এর মাঝে عَامْ خَاصْ مِنْ وَجْهٍ -এর সম্পর্ক। অর্থাৎ একজন মু'মিন ক্ষেত্র বিশেষ মুসলিমও হতে পার। আবার একজন মুসলিম ক্ষেত্র বিশেষও মু'মিন হতে পারে।

إِسْلَامْ ও إِيْمَانْ -এর মধ্যকার পার্থক্য :

* إِسْلَامْ ও إِيْمَانْ প্রায় একই জিনিস। এতে মৌলিক কোনো পার্থক্য না থাকা বলা চলে। উভয়টি শব্দগতভাবে ভিন্ন হলেও ভাব ও উদ্দেশ্যগত দিক থেকে এক ও অভিন্ন । যার ফলে উভয়টি مُرَكَّبْ না بَسِيْطْ এ নিয়ে মতবিরোধ দেখা যায়।

১. **জাহমিয়াদের অভিমত :** জাহমিয়াগণ বলেন إِيْمَانْ হলো بَسِيْطْ তথা শুধু تَصْدِيْقٌ بِالْجِنَانِ। আর যদি কেউ মৌলিকভাবে অস্বীকার করে তাহলে এমতাবস্থায় তাকে কাফের বলা যাবে।

২. **খারেজী ও মু'তাযিলাদের অভিমত :** খারেজী ও মু'তাযিলাদের মতে ঈমান مُرَكَّبْ অর্থাৎ تَصْدِيْقٌ بِالْجِنَانِ -এর সাথে সাথে اِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ ও عَمَلٌ بِالْاَرْكَانِ রয়েছে। এগুলোর সমষ্টিই مُرَكَّبْ অর্থাৎ تَصْدِيْقٌ بِالْقَلْبِ এবং اِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ ও عَمَلٌ بِالْاَرْكَانِ -এর মাধ্যমে ঈমান/ ইসলাম পরিপূর্ণভাবে সংগঠিত হয়। এদের মতে প্রথমটি না থাকলে মুনাফিক হবে। দ্বিতীয়টি না থাকলে কাফের হবে এবং তৃতীয়টি না থাকলে ফাসেক হবে।

মোটকথা এ তিনটির প্রথম দু'টিকে ঈমান এবং তৃতীয়টিকে ইসলাম বলে। অতএব এই তিনটির সমন্বয়কেই إِسْلَام ও إِيْمَانْ বলে।

إِسْلَامْ ও إِيْمَانْ -এর তুলনামূলক আলোচনা :

১. ইমাম বুখারী (র.) বলেন– إِسْلَامْ ও إِيْمَانْ একও অভিন্ন। কেননা প্রত্যেক মু'মিন মুসলিম এবং প্রত্যেক মুসলিম-ই মু'মিন।

দলিল : فَاَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيْهَا مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَمَا وَجَدْنَا فِيْهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ এ আয়াতে মু'মিনকে মুসলিম বলা হয়েছে।

আল্লাহ অন্যত্র বলেন, يٰقَوْمِ اِنْ كُنْتُمْ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوْآ اِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِيْنَ অত্র আয়াতে মুসলিমকে মুমিন বলা হয়েছে।

২. ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন– إِسْلَامٌ ও إِيْمَانٌ শব্দদ্বয় مِسْكِيْنٌ ও فَقِيْرٌ শব্দদ্বয়ের মতো। উভয়টি একত্রে আসলে ভিন্ন অর্থ ও ভিন্ন ভিন্ন আসলে এক অর্থ প্রদান করে।

৩. আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (র.) বলেন– إِيْمَانٌ হচ্ছে خَاصٌ এবং إِسْلَامٌ হচ্ছে عَامٌ অতএব প্রত্যেক মুসলিম মু'মিন নয়। কিন্তু প্রত্যেক মু'মিন মুসলিম।

৪. কিছু সংখ্যক আলেম এ ব্যাপারে বলেন, ঈমান হলো অন্তরের সাথে সম্পৃক্ত এবং ইসলাম হলো বাহ্যিক কিছু কাজ কর্মের সাথে সম্পৃক্ত।

৫. আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত বলেন– إِيْمَانٌ ও إِسْلَامٌ -এর মাঝে আত্মা ও শরীরের ন্যায় সম্পর্ক।

উল্লেখ্য যে উপরিউক্ত আলোচনায় ঈমান ও ইসলামের সবিস্তার আলোচনা করা হয়েছে। এতে তালিবে ইলমদের নিকট বিষয়টা পরিষ্কার হয়েছে বলে আশা করি।

قوله إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ الخ : অর্থাৎ আসমান ও জমিনে আদিকাল থেকে কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার মনোনীত একমাত্র ধর্ম হলো ইসলাম। যেমন– আল্লাহ তা'আলা বলেন- إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহর নিকট মনোনীত ধর্ম হলো ইসলাম। –[সূরা বাকারা]

* অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন– اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا. অর্থাৎ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম এবং আমার নিয়ামত তোমাদের উপর সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের জন্য ইসলামকে দীন হিসেবে মনোনীত করলাম। –[সূরা মায়েদা]

যেহেতু আল্লাহ তা'আলা একমাত্র ইসলামকেই ধর্ম হিসেবে মনোনয়ন করলেন, তাই কেউ অন্য ধর্ম অনুসরণ করলে তাঁর ধর্ম গ্রহণ করা হবে না। যেমন– আল্লাহ তা'আলা বলেন– وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ. অর্থাৎ যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্মকে নিজের জন্য মনোনয়ন করে কখনো তা গ্রহণ করা হবে না। আখেরাতে সে ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত হবে। –[সূরা আলে ইমরান]

قوله وَهُوَ بَيْنَ الْغُلُوِّ الخ : অর্থাৎ মুহাম্মদী ধর্ম মধ্যমপন্থি ধর্ম। এতে হযরত মূসা (আ.) -এর ধর্মের ন্যায় কঠোরতা ও নেই এবং হযরত ঈসা (আ.) ধর্মের ন্যায় নম্রতাও নেই।

কারণ মূসা (আ.)-এর ধর্মে–

১. কেউ পাপ করলে তওবা করতে হতো আত্মহত্যার মাধ্যমে। তাদের ধর্মে তওবা করার মানে ছিল আত্মহত্যা করা। যেমন আল্লাহ তা'আলা তাঁর উম্মতের তওবা সম্পর্কে বলেন– فَتُوْبُوْآ اِلٰى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوْآ اَنْفُسَكُمْ

২. কোনো কাপড়ে কখনো নাপাকী লাগলে সেই কাপড় কাটা ব্যতীত তা পবিত্র হতো না। আরো অন্যান্য বিষয়ে অনেক কঠোরতা ছিল। পক্ষান্তরে হযরত ঈসা (আ.) -এর ধর্মে একেবারেই নম্রতা ছিল। যেমন–

১. পাপ করলে তওবার প্রয়োজন ছিল না।

২. কাপড়ে নাপাকী লাগলে ধৌত করতে হতো না।

৩. স্ত্রী সহবাসের পর গোসল করতে হতো না ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিন্তু আমাদের নবী হযরত ﷺ-এর ধর্ম এতদুভয়ের মাঝে অবস্থিত। যেমন–

১. পাপ করলে উক্ত পাপের জন্য কায়মনো বাকে তওবা করলেই যথেষ্ট।

২. নাপাকী লাগলে সে অঙ্গ বা কাপড় ধৌত করলেই যথেষ্ট।

৩. স্ত্রী সহবাসের পর গোসল করলেই যথেষ্ট ইত্যাদি।

قوله بَيْنَ التَّشْبِيْهِ الخ : মুহাম্মদ ﷺ -এর ধর্ম মুশাব্বিহ ও মুয়াত্তিল ইত্যাদি সম্প্রদায়ের ধর্মের মধ্যবর্তী তাদের ধর্মের ন্যায় অতি কঠিনও নয় অতি সহজও নয়। কেননা–

১. তাশবীহ্ পন্থিরা সৃষ্টির সাথে আল্লাহ্ তা'আলার উপমা পেশ করে। আল্লাহ্র জন্য দেহ সাব্যস্ত করে। তাদের চরম পন্থিরা বলে আল্লাহ্ তা'আলার দেহ রয়েছে যেমন সৃষ্ট জীবের দেহ থাকে। তাদের একদল বলে আল্লাহ্র দেহ আছে ঠিক তবে মাখলুকের দেহের মতো নয়। আর রক্ত মাংসও রয়েছে তবে মাখলুকের মতো নয়।

২. আর তা'তীল সম্প্রদায় বলে আল্লাহ্ তা'আলা নিষ্ক্রিয়। যেমন– একদল বুদ্ধিজীবীরা বলে আল্লাহ্ তা'আলা থেকে একে একে দশটি عَقْل প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে নয়টি عَقْل নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে। কিন্তু দশম عَقْل টিই শুধু সক্রিয় রয়েছে। সমগ্র বিশ্ব ভ্রহ্মাণ্ডের শৃঙ্খলা গ্রন্থি দশম عَقْل -ই ধারণ করে আছে।

৩. জাবরিয়া সম্প্রদায়ের মতে মানুষ জমাট পাথরের ন্যায়। তাদের না আছে সৃষ্টি ক্ষমতা এবং না আছে অর্জনের ক্ষমতা। সুতরাং সমস্ত কাজই আল্লাহ্ তা'আলা করে থাকেন। মানুষের এতে কোনো হাত নেই। তাই গুনাহের কারণে মানুষ শাস্তি ভোগ করতে হবে না।

৪. কাদরিয়া সম্প্রদায়ের মতে বান্দার সৃষ্টির ক্ষমতা রয়েছে। এক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলার কোনো হাত নেই। সুতরাং বান্দা যা কিছু করে সবই নিজের বল প্রয়োগ করে থাকে।

কিন্তু মুহাম্মদ ﷺ -এর ধর্ম মতে, আল্লাহ্ তা'আলা দিক ও দেহ থেকে পূত ঃ পবিত্র। তিনি সম্পূর্ণ সক্রিয়। সমগ্র সৃষ্টি জগতের শৃঙ্খলা তাঁরই হাতে ন্যস্ত। তিনি যা ইচ্ছে করেন তাই করেন। তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কারো কোনো কিছু করার ক্ষমতা নেই।

শুধু তাই নয়। আল্লাহ্ তা'আলাই একমাত্র সকল কাজ সৃষ্টি করেন। বান্দার এতে কোনো হাত নেই। তবে বান্দা কাজ অর্জনকারী। ইতিপূর্বে এর বিস্তারিত বিবরণ প্রমাণসহ আলোচনা অতিক্রান্ত হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, বর্ণিত ভ্রান্ত দলগুলোর অস্তিত্ব বর্তমানে খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই এদের বিস্তারিত আলোচনা করা হয়নি। প্রয়োজনবোধে বড় বড় কিতাব থেকে দেখা যেতে পারে।

আমাদের বিশ্বাস

فَهٰذَا دِيْنُنَا وَاعْتِقَادُنَا ظَاهِرًا وَبَاطِنًا وَنَحْنُ بَرَاءٌ اِلَى اللّٰهِ مِنْ كُلِّ خَالِفٍ الَّذِىْ ذَكَرْنَاهُ وَبَيَّنَّاهُ.

অনুবাদ : এটাই হলো আমাদের ধর্ম ও আমাদের আকিদা। যা আমরা প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে পোষণ করি। আর আমরা ঐসব লোকের সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা করছি যারা উপরিউক্ত বিষয়গুলোতে বিপরীত মত পোষণ করে। যা আমরা উল্লেখ করেছি এবং বর্ণনা করেছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قوله فَهٰذَا دِيْنُنَا الخ : অর্থাৎ অত্র কিতাবের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কুরআন সুন্নাহ দ্বারা যেসব আকায়েদ তথা বিশ্বাস্য-বিষয়সমূহ সাব্যস্ত হয়েছে এ সবগুলোই হলো আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আকিদা। অতএব এসবগুলোর সাথে আমাদের এবং সকল মুসলমানদের ঐকমত্য পোষণ করা জরুরি। কেননা এর বিপরীত মত পোষণ করা কুফরি ভিন্ন অন্য কিছুই নয়। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের সাথে ঐকমত্য পোষণ করার তাওফীক দান করুন।

قوله وَنَحْنُ بَرَاءٌ اِلَى اللّٰهِ الخ : অর্থাৎ গ্রন্থকার (র.) বলেন, উক্ত গ্রন্থের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের যে আকিদা বর্ণনা করা হয়েছে এসব আমরা মানি এবং যারা এসব আকিদার বিরোধী, আমরা তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ তা'আলার নিকট অভিযোগ করেছি এবং তাদের সাথে আমরা কখনই একমত নই। কেননা তারা ভ্রান্ত ও গোমরা। আর এদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করার জন্য আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং আদেশ করেছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন– وَلَا تَرْكَنُوْا اِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ অর্থাৎ তোমরা জালেমদের সাথে মিশনা। যদি মিশ তাহলে তোমাদেরকে অগ্নি স্পর্শ করবে।

আর আল্লাহ তা'আলা সত্যবাদী মানুষের সাথে থাকার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন– يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক। অতএব দেখা গেল উপরের আয়াত দু'টি একথাই প্রমাণ করে যে, সত্যিকারে মানুষের সাথে থাকা ও জালিমদের সঙ্গে ত্যাগ করা অত্যন্ত জরুরি।

শেষ কথা

وَنَسْأَلُ اللّٰهَ تَعَالٰى اَنْ يُّثَبِّتَنَا عَلَى الْاِيْمَانِ وَيَخْتِمَ لَنَا بِهٖ وَيَعْصِمَنَا مِنَ الْاَهْوَاءِ الْمُخْتَلِفَةِ وَالْاٰرَاءِ الْمُتَفَرِّقَةِ وَالْمَذَاهِبِ الرَّدِيَّةِ مِثْلَ الْمُشَبِّهَةِ وَالْمُعْتَزِلَةِ (الْمُعَطِّلَةِ) وَالْجَهْمِيَّةِ وَالْجَبْرِيَّةِ وَالْقَدْرِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الَّذِيْنَ خَالَفُوا السُّنَّةَ وَالْجَمَاعَةَ وَحَالَفُوا الضَّلَالَةَ وَنَحْنُ بُرَاءٌ مِنْهُمْ وَهُمْ عِنْدَنَا ضَلَالٌ اَرْدِيَاءٌ وَبِاللّٰهِ الْعِصْمَةُ وَالتَّوْفِيْقُ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَسَلَّمَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

অনুবাদ : আর আমরা আল্লাহ তা'আলার দরবারে এ প্রার্থনা করছি যে, তিনি যেন আমাদেরকে ঈমানের উপর অটল রাখেন এবং আমাদেরকে ঈমানের সাথে, মৃত্যু দান করেন এবং আমাদেরকে বিভিন্ন মনোবৃত্তি বিভিন্ন চিন্তাধারা এবং বাজে মতাদর্শ থেকে নিরাপদ রাখেন। যেমন- মুশাব্বিহা, মু'তাযিলা, জাহমিয়া, জাবরিয়া ও কাদরিয়া ইত্যাদি দল। আর ঐ সকল উপদল বা জামাত যারা আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের বিরোধী এবং গোমরাহীর সাথী অবস্থান করতেছে। আমরা এদের থেকে মুক্ত। এরা আমাদের নিকট গোমরাহী ও নিকৃষ্ট হিসেবে পরিচিত।

আর আমরা আল্লাহর নিকট নিরাপত্তা ও তাওফীক চাচ্ছি। আল্লাহ তা'আলা আমাদের মহান নেতা মুহাম্মদ ﷺ -এর উপর রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন এবং তাঁর সাহাবায়ে কেরাম ও পরিবারবর্গের উপর শান্তি বর্ষণ করুন। সাথে সাথে তাঁর সাহাবায়ে কেরাম ও পরিবারবর্গের শান্তিও রহমত বর্ষিত হউক আর সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য যিনি সমগ্র জাহানের প্রতিপালক।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قوله وَنَسْئَلُ اللّٰهَ الخ : গ্রন্থকার (র.) তার শেষ বাণীতে আল্লাহ তা'আলার দরবারে নিজের জন্য ও সকল উম্মতের জন্য দোয়া করে বলেন, হে আল্লাহ! আমাদেরকে ঈমানের উপর মৃত্যু পর্যন্ত রাখেন এবং মৃত্যুর সময় ও ঈমানের উপর অটল ও অবিচল রাখেন। কেননা মৃত্যুর সময় ঈমান হতে বিচ্যুতি হলে তার জীবনটাই বরবাদ। মৃত্যুর সময় ঈমান না থাকলে সকল আশাই নিঃশেষ হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাকে ঈমানের উপর অটল থাকার দোয়া শিখিয়ে দিয়েছেন। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন- رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ. অর্থাৎ হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদের সহজ সরল পথ প্রদর্শনের পর আমাদের অন্তরকে সত্য লজ্ঘনে প্রবৃত্ত করে না এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদেরকে অনুগ্রহ দান কর। নিশ্চয় তুমিই সব কিছুর দাতা। -[সূরা আলে ইমরান]

এতদ সম্পর্কিত একটি হাদীসে হযরত রাসূল ﷺ বলেন, এমন কোনো অন্তর নেই যা আল্লাহ তা'আলার দুই আঙ্গুলির মধ্যখানে নয়। তিনি যতক্ষণ ইচ্ছা করেন হেদায়েতের পথে রাখেন এবং যখন ইচ্ছা করেন বান্দাকে বিপথগামী করেন। তিনি যা ইচ্ছা তাই করেন। তিনি সর্বসময় ক্ষমতার অধিকারী। এ কারণেই রাসূল ﷺ তাঁর স্বীয় উম্মতকে নিম্নোক্ত দোয়াটি বেশি বেশি পড়ার জন্য শিখিয়েছেন। يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلٰى دِيْنِكَ অর্থাৎ হে অন্তরের আবর্তনকারী মহান আল্লাহ। তুমি আমার অন্তরকে তোমার মনোনীত দীনের উপর সুদৃঢ় রাখ।

قوله وَيَعْصِمُنَا مِنَ الْاَهْوَاءِ الخ : গ্রন্থকার ইমাম ত্বহাবী (র.) আল্লাহ তা'আলার নিকট ঈমানের উপর অটল রাখার দোয়া করার সাথে তিনি এই দোয়াও করেছেন হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে বিভিন্ন ভ্রান্তদল, বাজে মতাদর্শ ও বিভেদ সৃষ্টিকারী ভ্রান্তদের মতবাদ থেকে রক্ষা কর। কারণ এসব দল সঠিক ইসলাম আর সত্য আকিদাকে ধামাচাপা দেওয়ার জন্য নিজেদের তৈরিকৃত মনগড়া যুক্তি প্রদর্শন ও তর্কে লিপ্ত হয়। যা এদের মধ্যে মুশাব্বিহা, মু'তাযিলা, জাহমিয়া, জাবরিয়া ও কাদরিয়া সম্প্রদায় উল্লেখযোগ্য। নিম্নে ঐ সকল বাদর দ্রষ্টাদের কিছু ভ্রান্ত মতবাদের চিত্র তুলে ধরা হলো।

১. **মুশাব্বিহা :** মুশাব্বিহা সম্প্রদায় স্রষ্টাকে সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য তুল্য মনে করে। তারা ইহুদি সম্প্রদায়ের মতো আল্লাহ তা'আলাকে মাখলুকের গুণে গুণান্বিত করে। যেমন মাখলুক নড়া-চাড়া করে। এবং আন্তরিক আরাম আয়েশ অনুভব করে অনুরূপ আল্লাহ তা'আলাও নাড়া-চড়া, আশা-নিরাশা, আনন্দ উল্লাস রাগ- হাতাশ ইত্যাদি অনুভব করে থাকে।

   শুধু তাই নয়; বরং তারা আরো বলে যে, আল্লাহ তা'আলার চক্ষু অসুস্থ হয়েছে [নাউযুবিল্লাহ] যার ফলে ফেরেশতারা তাঁর সেবা করার জন্য তাঁর নিকট হাজির হয়েছে ইত্যাদি। আল্লাহ তুমি আমাদেরকে ঐ সমস্ত ধারণা পোষণ করা থেকে হেফাজত কর।

২. **মু'তাযিলা সম্প্রদায় :** এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আমর ইবনে উবায়েদ ও ওয়াসেল ইবনে আতা এবং তার সাথিবর্গ তারা হযরত হাসান বসরী (র.) -এর দরবারে অংশ গ্রহণ করতেন। তাঁর (হাসান বসরী) মৃত্যুর পর তার শিষ্যদের থেকে পৃথক হয়ে উঠা বসা করতে লাগল। এক পর্যায়ে তারা হাসান বসরী (রা.) -এর শিষ্যদের থেকে পৃথকই হয়ে গেল। তাই হযরত কাতাদা (র.) ও অন্যরা তাদেরকে লক্ষ্য করে বলতো أُولٰئِكَ الْمُعْتَزِلَةُ

   বলা হয় যে, ওয়াসেল ইবনে আতাই মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের নীতিমালা রচনা করেন। আমর ইবনে উবায়েদ যে হাসান বসরী (র.) -এর শিষ্য ছিল সে তার অনুসরণ করল। অতঃপর বাদশা হরুন বশিদের রাজত্বকালে আবূ হুজাইল নামে এক ব্যক্তি এই মাজহাবের উপর দুটি গ্রন্থ রচনা করেন। ভ্রান্ত বাদর দ্রষ্ট মু'তাযিলা সম্প্রদায় সৃষ্টিকে স্রষ্টার সাথে তুলনা করে। যে সকল বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি একমাত্র মহান আল্লাহ তা'আলার জন্য প্রযোজ্য তা মাখলুকের জন্য তারা সাব্যস্ত করে। যার ফলে তারা বলে সৃষ্টির সকল কাজকর্ম সৃষ্টি নিজেই সৃজন করে। যেমনিভাবে নাসারাগণ বলে থাকে অভিশপ্ত যে ঈসা নিজেই প্রভু। কেননা তিনি অদৃশ্য সম্পর্কে খবর রাখতেন।

৩. **জাহমিয়া সম্প্রদায় :** এই ফিরকাকে জাহাম ইবনে সফওয়ান সমরকন্দীর দিকে সম্বন্ধ করা হয়। তিনি সিফাতকে স্বীকার করে এবং তা'তীল তথা স্রষ্টা কর্মশূন্য হওয়ার প্রবক্তা। এরা আল্লাহ তা'আলার গুণাবলিকে অস্বীকার করে এবং তারা মনে করে যে, আল্লাহ তা'আলা সকল কাজকর্ম কার্যকর করা থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন।

৪. **জাবরিয়া সম্প্রদায় :** এই উপদল জাহমিয়াদের একটি প্রশাখা। তারা বলে যে, বান্দা সর্বদা জড়বস্তুর ন্যায়। এদের কোনো জ্ঞান নেই। যদি কোনো বান্দা কোনো কাজকর্ম করে তবে এসব হবে তার ইচ্ছার বাইরে। এতে তার কোনো হস্তক্ষেপ নেই। এরা হচ্ছে কাদরিয়া সম্প্রদায়ের সম্পূর্ণ বিপরীত।

আবার কতেক রয়েছে যারা বান্দাকে স্রষ্টার মতো গুণাবলির অধিকারী মনে করে।

সুতরাং আমরাও সর্বদা দোয়া করবো আল্লাহ তা'আলা যেন আমাদেরকে এ সকল গোমরাহ ও বাতিল দল থেকে হেফাজত করে সঠিক সরল পথ প্রদর্শন করেন। কারণ তিনি নিজেই বান্দাকে সরল পথ প্রদর্শনের জন্য দোয়া শিখিয়েছেন। যেমন তিনি বলেন- اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ـ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ

قوله وَنَحْنُ بُرَاءٌ مِّنْهُمْ : পূর্বের আলোচিত উপদলগুলো আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের বিরোধিতা করে। তাই গ্রন্থকার ইমাম ত্বহাবী (র.) বলেন, ঐ সমস্ত ভ্রান্তমতবাদ অবলম্বনকারীদের সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। এদের সাথে যারাই সম্পর্ক রাখবে তারাই বিভ্রান্তে পড়বে। গ্রন্থকার (র.) -এর এভাবে বলাটা আম্বিয়া (আ.) -এর সুন্নত অনুযায়ী হয়েছে।

কারণ যখন তাঁরা ভ্রান্তদের হেদায়েত থেকে নিরাশ হয়ে যান তখন দীনের পথে আহ্বান করার সাথে সাথে নিজেদেরকে গোমরাহীদের থেকে পবিত্র বলে ঘোষণা দেন। যেমন রাসূল ﷺ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন- فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ. অর্থাৎ তারা যদি পিছু হটে তাহলে তোমরা বল, তোমরা সাক্ষী থাক নিশ্চয়ই আমরা মুসলমান। -[সূরা আলে-ইমরান]

* হযরত নূহ (আ.) সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন- فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَاَلْتُكُمْ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ وَاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ. অর্থাৎ তোমরা যদি পিছু হটো তবে মনে রেখো! তোমাদের নিকট আমি কোনো প্রতিদান চাই না। আমরা প্রতিদান একমাত্র আল্লাহ তা'আলার নিকট। আর আমি মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আদিষ্ট হয়েছি। -[সূরা ইউনুস]
* হযরত ইবরাহীম (আ.) সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন- وَاِذْ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖ اِنَّنِىْ بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُوْنَ اِلَّا الَّذِىْ فَطَرَنِىْ فَاِنَّهٗ سَيَهْدِيْنِ. অর্থাৎ যখন ইবরাহীম (আ.) তাঁর পিতাকে বলল, নিশ্চয় আমি ঐ বস্তু থেকে মুক্ত যার ইবাদত বা উপাসনা আপনারা করেন। তবে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন তিনি অচিরেই আমাকে সরল পথ প্রদর্শন করবেন। -[সূরা যুখরুফ]

সুতরাং সকল মু'মিনদের জন্য উচিত হলো, তাঁরা নিজেদেরকে সকল গোমরাহী দল থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট সরল পথ পাওয়ার দোয়া করা।

قوله صَلَّى اللّٰهُ عَلَى الخ : গ্রন্থকার ইমাম ত্বহাবী (র.) তাঁর বিশ্বাস্য বিষয়ক নাতিদীর্ঘ কিতাবটি সমাপ্ত করেছেন হযরত রাসূল ﷺ -এর দরূদ পেশ ও আল্লাহ তা'আলা প্রশংসা করার মাধ্যমে। কারণ মুফাসসিরগণ বলেন, মু'মিনের জন্য কর্তব্য হলো রাসূল ﷺ -এর উপর দরূদ ও আল্লাহ তা'আলার প্রশংসার মাধ্যমে যে কোনো বৈঠক, বৃক্ততা, লেখনী এবং যে কোনো কর্ম সম্পাদন করা। কেননা এতে বরকত ও রহমত নিহিত রয়েছে। আর দুনিয়ার নেককার, পরহেজগার এবং বুজর্গ ব্যক্তিদের কর্ম সম্পাদন এমন হয়। এতে কারো দ্বিমত নেই।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

مَبَانِى الْخِلَافَةِ وَالسِّيَاسَةِ الدِّيْنِيَّةِ وَغَايَاتُهَا مِنَ الْمُحَشِّى مُدَّظِلُّهُ.

হাশিয়া লেখক (র.) কর্তৃক লিখিত

"খেলাফত ও ধর্মীয় রাজনীতি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য"

وَمِنْ اِقْتِضَاءِ الْخِلَافَةِ الْاِسْتِخْلَافُ وَهُوَ نَصْبُ الْاِمَامِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ حَسْبَ الْاِسْتِطَاعَةِ لِئَلَّا يَبْقَى الْقَوْمُ فَوْضٰى.

অনুবাদ : খেলাফতের দাবি হলো 'ইসতেখলাফ'। আর ইসতেখলাফ বলা হয় সর্বাবস্থায় যথাসাধ্য জাতির পরিচালনার জন্য একজন আমীর বা ইমাম নিযুক্তকরেন। যাতে জাতি অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলার মুখোমুখি না হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ لِئَلَّا يَبْقَى الْقَوْمُ فَوْضٰى : ইমাম নিযুক্ত করণের দাবি প্রমাণিত হয় বনী ইসলাঈলের এক জামাত সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'আলার বাণী থেকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

اَلَمْ تَرَ اِلَى الْمَلَاِ مِنْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ مِنْ بَعْدِ مُوْسٰى اِذْ قَالُوْا لِنَبِىٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ (سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ : ٢٤٣)

অর্থাৎ আপনি কি বনী ইসরাঈলের ঐ জামাতকে দেখেননি? যারা মূসা (আ.) -এর মৃত্যুর পরে তাদের এক নবীকে বলেছিল, আমাদের জন্য একজন আমীর বা বাদশা পাঠান আমরা (তাঁর সাহায্যে) আল্লাহর পথে লড়াই করব। –[সূরা বাকারা : ৩২৪]

আয়াতে مَلِكٌ শব্দটি প্রবল ক্ষমতার অধিকারী ও ক্ষমতাধরের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। নেতৃত্ব কামনা, জোর জবরদস্তির অর্থে ব্যবহৃত হয় নি। কেননা নেতৃত্ব বাপ দাদার সূত্রে কিংবা গোত্র সম্প্রদায়ের সূত্রে পাওয়া কোনো মিরাশ নয়; বরং দীন দিয়ানত, ইলম ও জ্ঞান-এর মাপকাঠিতে যে ব্যক্তি নেতৃত্বের যোগ্য বলে বিবেচিত হবে সেই এর যোগ্য। এর দলিল–

১. মহান আল্লাহর বাণী– اِصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাকে তোমাদের জন্য নির্বাচন করেছেন।

২. রাসূল ﷺ-এর বাণী– مَنْ لَمْ يَعْرِفْ اِمَامَ زَمَانِهٖ فَقَدْ مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজ জমানার ইমামকে চিনলনা, সে যেন জাহেলী যুগের মৃত্যুর মতো মৃত্যুবরণ করল।

৩. সাহাবায়ে কেরাম (রা.) রাসূল ﷺ কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার পরে আমরা কাকে আমীর বানাবো?

وَانْتِخَابُ الْاَصْلَحِ بِمِعْيَارِ الْعِلْمِ وَالْحِفْظِ وَتَفْوِيْضُ الْاَمْرِ اِلٰى مَنْ لَا يَبْتَغِيْهِ اِلَّا مَنْ يَطْلُبُهُ لِابْتِغَاءِ مَرْضَاةِ اللّٰهِ وَالنَّاسُ يَعْرِفُوْنَ بِصِدْقِهِ وَاِخْلَاصِهِ وَيَلْزَمُهُ الشُّوْرٰى لِدَفْعِ الْاِسْتِبْدَادِ وَعَلَيْهِ الْعَزِيْمَةُ وَالتَّرْجِيْحُ لِدَفْعِ الْاِنْتِشَارِ وَالْفَوْضُوِيَّةِ وَالْقَانُوْنُ الْقَطْعِيُّ لِلتَّمَسُّكِ وَالْحُكْمُ بِالْعَدْلِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ.

অনুবাদ : কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে যা (জনসাধারণের) জন্য অধিকযোগ্য আমীর নিযুক্তকরণ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে যে ব্যক্তি নেতৃত্ব কামনা করে কেবল তাকেই নেতৃত্ব প্রদান করা এবং জনগণ যার সততা ও একনিষ্ঠতা সম্পর্কে সম্যক অবগত। স্বেচ্ছাচারিতা প্রতিহত করার লক্ষ্যে আমীরের দায়িত্ব হলো প্রতি কাজে পরামর্শ করা। এবং পরামর্শকৃত বিষয়ের উপরে পূর্ণাঙ্গ অটল থাকবে হবে। (মনোনীত) একাধিক বিষয়ের মাঝে প্রাধান্য প্রদানে মূলনীতি অবলম্বন করতে হবে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা প্রতিরোধ করার জন্য। খেলাফতের আরেকটি দাবি হলো বাস্তবায়ন যোগ্য অকাট্য সংবিধান থাকা এবং ন্যায়বিচার বাস্তবায়ন যদিও নিজেদের বিরুদ্ধে হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَانْتِخَابُ الْاَصْلَحِ الخ : সুতরাং এ থেকে বুঝা যায় খেলাফতের একটি গুরুত্বপূর্ণ দাবি হলো– ইন্তেখাব বা কল্যাণকর বস্তুকে নির্বাচন করা। যা মিরাশ সূত্রে পাওয়ার বস্তু নয়।

এর দু'টি প্রমাণ– আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– وَاللّٰهُ يُؤْتِيْ مُلْكَهُ مَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ (سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ : ٢٣٤) অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা রাজত্ব দান করেন। আল্লাহ তা'আলা হলেন সর্বজ্ঞ সর্বময়।

উল্লিখিত আয়াতে কারীমায় مَنْ শব্দটি عَامّ ; যা কোনো বংশ, সম্পদ, পাত্র কিংবা জনগোষ্ঠীর মাধ্যমে বিমোহিত নয়।

রাসূলে কারীম ﷺ-এর বাণী– اِسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوْا وَلَوْ اُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبْشِيٌّ অর্থাৎ তোমরা কথা/নির্দেশ শোন ও তার অনুগত হও যদি তোমাদের আমীর একজন হাবশী গোলামকেও নির্বাচন করা হয়।

সুতরাং হাদীসের আলোকেও ইন্তেখাব বিষয়টির প্রমাণিত হয়। আর ইন্তেখাব যা নির্বাচনের মাপকাঠি হলো যোগ্য হওয়া। গোত্র বা বংশ নয়।

قَوْلُهُ بِمِعْيَارِ الْعِلْمِ : রাজনীতিতে যোগ্যতার মাপকাঠি হলো দিয়ানতদারীর সাথে রাজনৈতিক জ্ঞানে জ্ঞানী হওয়া। দেশ ও রাজত্ব টিকিয়ে রাখার শক্তি থাকা এবং শত্রুকে প্রতিহত করার শক্তি থাকা।

আল্লাহ তা'আলা তালূত (আ.) সম্পর্কে হযরত দাউদ (আ.)-এর জবানে বলেন, إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِى الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ (سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ : ٣٢) অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাকে তোমাদের জন্য নির্বাচন করেছেন এবং তাকে ইলম ও শারীরিক গঠনে মজবুতি দান করেছেন।

এখানে بَسْطَةً فِى الْعِلْمِ দ্বারা عِلْمُ السِّيَاسَةِ তথা রাজনৈতিক জ্ঞান ও بَسْطَةً فِى الْجِسْمِ দ্বারা শারীরিক শক্তি বুঝানো হয়েছে।

قَوْلُهُ تَفْوِيْضُ الْاَمْرِ اِلٰى مَنْ لَا يَبْتَغِيْهِ : নেতৃত্ব লোভী নয় এমন ব্যক্তিকে নেতৃত্ব প্রদানের কারণ স্বরূপ রাসূল ﷺ বলেন- اَنَا وَاللّٰهِ لَا نُوَلِّ عَلٰى هٰذَا الْعَمَلِ (اَىْ الْاِمَارَةِ) اَحَدًا سَأَلَهُ وَلَا اَحَدًا حَرَصَ عَلَيْهِ (مِشْكٰوة) অর্থাৎ ক্ষমতা প্রার্থী কিংবা ক্ষমতার লোভী ব্যক্তিকে আমি ক্ষমতা প্রদান করি না। -[মিশকাত]

قَوْلُهُ اِلَّا مَنْ يَطْلُبُهُ الخ : যেমন হযরত ইউসুফ (আ.) রাজনীতি সম্পর্কে নিজস্ব জ্ঞান ও রাজত্ব হেফাজতের শক্তি থাকায় নেতৃত্ব কামনা করেছিলেন। কুরআনে এসেছে اِجْعَلْنِىْ عَلٰى خَزَائِنِ الْاَرْضِ، اِنِّىْ حَفِيْظٌ عَلِيْمٌ (سُوْرَةُ يُوْسُفَ : ٧٤) অর্থাৎ (ইউসুফ (আ.) বলেন) হে আল্লাহ! আপনি আমাকে জমিনের ধনরাজির আমীর নিযুক্ত করুন। কারণ আমি একজন (এ বিষয়ে) জ্ঞানী ও হেফাজতকারী।

আর মানুষেরা হযরত ইউসুফ (আ.)-এর সততা ও একনিষ্ঠতার পূর্ণাঙ্গতা সম্পর্কে অবগত ছিল। তিনি হলেন- اَلنَّبِىُّ الْكَرِيْمُ ابْنُ الْكَرِيْمِ ابْنِ الْكَرِيْمِ

قَوْلُهُ وَيَلْزَمُهُ الشُّوْرٰى : দেশ পরিচালনার জন্য পরামর্শ একটি অতি জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ (سُوْرَةُ اٰلِ عِمْرَانْ : ١٧)

قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ الْعَزِيْمَةُ : পরামর্শকৃত বিষয়ের উপর পূর্ণ অটল থাকার বিষয়টি মহান আল্লাহ তা'আলার বাণী- فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ (اٰل عِمْرَانْ : ١٧) থেকে বুঝে আসে।

قَوْلُهُ اَلْقَانُوْنُ الْقَطْعِىُّ لِلتَّمَسُّكِ : আর সংবিধান বা আইন হলো কুরআন হাদীস অতঃপর تفقه فى الدين -এর আলোকে গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং ইজতেহাদ (তবে তা পূর্ণ শর্ত মোতাবেক হতে হবে) এর দলিল-

হযরত মু'আয (রা.)-এর প্রসিদ্ধ হাদীস এর দলিল। ইয়ামানে তাকে বিচারকরূপে পাঠানোর সময় রাসূল ﷺ তাকে বলেছিলেন, بِمَا تَقْضِىْ (তুমি কিসের ভিত্তিতে বিচারকার্য পরিচালনা করবে?) তিনি বলেন, بِكِتَابِ اللّٰهِ (কিতাবুল্লাহর মাধ্যমে) রাসূল ﷺ আরো বললেন, فَاِنْ لَمْ تَجِدْ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ؟ (যদি তুমি কিতাবুল্লাহর মধ্যে সমাধান না পাও?

তাহলে কি করবে) তিনি বললেন, فَسُنَّةُ رَسُوْلِ اللهِ (হাদীসের মাধ্যমে) রাসূল ﷺ বললেন, যদি হাদীসেও না পাও? উত্তরে হযরত মু'আয (রা.) বলেন– আমি নিজস্ব জ্ঞানের আলোকে ইজতেহাদ করবো। এ কথা শুনে রাসূল ﷺ খুশি হয়ে বলেন, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ وَفَّقَ رَسُوْلَ رَسُوْلِ اللهِ بِمَا يَرْضٰى بِهٖ رَسُوْلُ اللهِ (مشكوة)

আল্লাহ তা'আলা বলেন, يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ (سُوْرَةُ النِّسَاءِ :٨)

সুতরাং اِطَاعَةُ اللهِ অর্থ হলো اِطَاعَةُ كِتَابِ اللهِ (আল্লাহর কিতাবের অনুগত হওয়া) আর اِطَاعَةُ السُّنَّةِ আর اِطَاعَةُ اُوْلِى الْاَمْرِ অর্থ হলো কুরআন ও হাদীসের আলোকে গৃহীত সিদ্ধান্তের অনুসরণ।

আর এগুলোই হলো قَانُوْنِ قَطْعِىْ বা অকাট্য সংবিধান। এতদভিন্ন সংগৃহীত সংবিধান শয়তানের ওয়াসওয়াসা ছাড়া কিছুই নয়।

قَوْلُهُ اَلْحُكْمُ بِالْعَدْلِ : কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেন, يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاۤءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ (سُوْرَةُ النِّسَاءِ : ٢٠) অর্থাৎ হে মুমিনগণ! নিজেদের বা পিতামাতা কিংবা নিকটজনদের বিরুদ্ধে হলেও তোমরা ন্যায়বিচারে প্রতিষ্ঠিত থাকবে আল্লাহর সাক্ষী স্বরূপ।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, وَاَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ (سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ : ٢٦) অর্থাৎ বিরোধপূর্ণ বিষয়ে ফয়সালার জন্য আল্লাহ তা'আলা আম্বিয়া (আ.)-এর সাথে কিতাব পাঠিয়েছেন।

وَعَلَى الْقَوْمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى مُنْشَطٍ وَمُكْرَهٍ إِذَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةِ الْخَالِقِ، وَيَلْزَمُهُ الْإِعْدَادُ الْمُسْتَطَاعُ لِلْحِفْظِ وَسَدِّ الثُّغُوْرِ.

অনুবাদ : জনসাধারণের দায়িত্ব হলো ইচ্ছা অনিচ্ছায় (সদা) আমীরের কথা মান্য করা ও তাঁর অনুসরণ করা। যতক্ষণ পর্যন্ত না তাদেরকে সৃষ্টিকর্তার অবাধ্যতার নির্দেশ দেওয়া হয় এবং আমীরের উচিত যথাসাধ্য দেশ ও সীমান্ত রক্ষার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ عَلَى الْقَوْمِ السَّمْعُ : আল্লাহ তা'আলা সাহাবায়ে কেরামের গুণাবলি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ (سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ : ٤٠) অর্থাৎ তারা বলে আমরা শুনলাম ও মানলাম। হে আমাদের রব! আপনি আমাদের ক্ষমা করুন। আপনার দিকেই আমাদের প্রত্যাবর্তন অনিবার্য।

রাসূল ﷺ বলেন, أُوْصِيْكُمْ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِيْ سَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيْرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ مِنْ بَعْدِيْ، تَمَسَّكُوْا بِهَا وَعَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ (اَلْحَدِيْثُ) অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে আনুগত্যের নির্দেশ দিচ্ছি। কেননা তোমাদের মধ্য হতে যারা আমার পরবর্তীতে বেচে থাকবে তারা অনেক মতবিরোধ দেখতে পারে। সুতরাং তোমাদের কর্তব্য হলো। আমার ও আমার পরবর্তী হেদায়েতপ্রাপ্ত খলীফাদের আদর্শ অবলম্বন করা। তোমরা তা শক্ত করে মাড়ির দাঁত দিয়ে আকড়ে ধর।

এ সমস্ত আয়াত ও হাদীস দ্বারা إِطَاعَةٌ -এর অপরিহার্যতা প্রমাণিত হয়।

قَوْلُهُ عَلَى مُنْشَطٍ : সর্বাবস্থায় اطاعة -এর অপরিহার্যতার দলিল−

১. রাসূল ﷺ বলেন, عَلَى الْمَرْأِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيْمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَالَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةِ الْخَالِقِ

২. হযরত উবাদা ইবনে সামেত (রা.) বলেন, بَايَعْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْيُسْرِ وَالْعُسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ.

قَوْلُهُ إِذَا لَمْ يُؤْمَرْ : আল্লাহর অবাধ্যতায় সৃষ্টিজীবের অনুসরণ অবৈধ হওয়া দলিল−

১. রাসূল ﷺ-এর হাদীস لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِيْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ (مِشْكٰوةٌ)

২. আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا (سُوْرَةُ لُقْمَانَ : ٢٤) অর্থাৎ পিতামাতা যদি তোমাকে আমার সাথে এমন বিষয়ে শিরক করার জন্য বাধ্য করে যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই, এমতাবস্থায় তুমি তাদের অনুসরণ করো না।

قَوْلُهُ يَلْزَمُهُ الْإِعْدَادُ : শত্রু মোকাবিলায় প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ স্বরূপ সূরা আনফালে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন− وَأَعِدُّوْا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ الخ অর্থাৎ তোমরা শত্রু মোকাবিলার জন্য যথাসাধ্য শক্তি অর্জন কর।

وَالْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ لِدَفْعِ الْفِتْنَةِ وَاِعْلَاءِ كَلِمَةِ اللهِ وَالتَّيْسِيْرُ لِلْهِجْرَةِ لِمَنْ يُهَاجِرُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ مَكَانِيَّةً كَانَتْ اَوْ مَعْنَوِيَّةً وَالْاِحْتِسَابُ لِلْاِيْقَاظِ وَالْمُؤَاخَذَةِ وَغَايَتُهَا اِقَامَةُ الدِّيْنِ وَحِفْظُ الْحُدُوْدِ فِي الْعِبَادَاتِ وَالْمُعَامَلَاتِ وَالْمُعَاشَرَاتِ وَنَظْمُ الْاَمْرِ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاِقَامَةُ الْحُدُوْدِ وَالْقِصَاصِ وَالتَّعْزِيْرَاتِ لِاِزَالَةِ الْمُنْكَرَاتِ.

অনুবাদ : ফেতনা নিরসন ও আল্লাহর كَلِمَةٌ (لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ) -এর বুলন্দির জন্য জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ করা। যারা হিজরত করতে চায় তাদের জন্য হিজরতের পথ সহজ করে দেওয়া। হিজরত চাই দেশ ত্যাগের মাধ্যমে কিংবা অন্য কোনোভাবে হোক। আখেরাতের হিসাব নিকাশের জন্য সবাইকে সতর্ক করা। আর ধর্মীয় রাজনীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো দীনে ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করা, ইবাদত, মুআমালা ও মুআশারার ক্ষেত্রে ইসলামি সীমারেখা সংরক্ষণ করা। এবং সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে বাধা দেওয়ার বিষয়টি সুশৃঙ্খল রূপ দেওয়া। এবং অন্যায় ও অপকর্ম দূরীকরণের জন্য হদ কিসাস ও শাস্তির বিধান বাস্তবায়ন করা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اَلْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ : জিহাদের আবশ্যকতার দলিল আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَجَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَاْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ (سُوْرَةُ التَّوْبَةِ : ١٠)

অর্থাৎ তোমরা কাফের ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর এবং তাদের উপর কঠোরতা আরোপ কর। তাদের ঠিকানা জাহান্নাম। কতইনা নিকৃষ্ট তাদের প্রত্যাবর্তন স্থল।

قوله لِدَفْعِ الْفِتْنَةِ : আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ الخ (سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ : ٢٤)

অর্থাৎ ফেতনা নিরসন ও দীন একমাত্র আল্লাহর হওয়ার আগ পর্যন্ত তোমরা যুদ্ধ কর।

قوله وَالتَّيْسِيْرُ لِلْهِجْرَةِ : আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَنْ يُّهَاجِرْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يَجِدْ فِي الْاَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيْرًا وَّسَعَةً (سُوْرَةُ النِّسَاءِ : ٤)

অর্থাৎ যারা আল্লাহর পথে হিজরত করবে তারা পাবে বহু আশ্রয়স্থল ও প্রশস্ততা।

قوله مَكَانِيَةً كَانَتْ اَوْ مَعْنَوِيَةً : হিজরতে মাকানী যেমন– রাসূল ﷺ সাহাবায়ে কেরামদের নিয়ে মদিনায় হিজরত করেন। আর هِجْرَةٌ مَعْنَوِيْ হলো, অন্যায় ও পাপ কাজ হতে বিরত থাকা। যেমন রাসূল ﷺ বলেন,

اَلْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللّٰهُ عَنْهُ (الحديث)

قوله غَايَاتُهَا الخ : ইবাদত, মু'আমালা ও মুআশারার ক্ষেত্রে ইসলামি সীমারেখা সংরক্ষণ করার মানে হলো, এসব ক্ষেত্রে ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত ও আজাবের প্রতি যত্নবান হওয়া। যেমন বিবাহ সম্পর্কে ইসলামি সীমা সংরক্ষণ করার বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَاتَعْتَدُوْهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰئِكَ هُمُ الظّٰالِمُوْنَ - (سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ)

অর্থ : এটা আল্লাহর দেওয়া সীমারেখা, সুতরাং তোমরা তা লঙ্ঘন করো না। আর যারা আল্লাহর দেওয়া সীমারেখা লঙ্ঘন করে তারা প্রকৃত জালেম। –[সূরা বাকারা : ২২৯]

রোজার বিধানের ক্ষেত্রে ইরশাদ করেন, تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَا অর্থ : উহা আল্লাহর সীমারেখা, সুতরাং তোমরা এর নিকটবর্তীও হবে না। –[সূরা বাকারা]

উত্তরাধিকার সম্পদের বিধানের ক্ষেত্রে বলেন,

تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ - وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهٗ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا وَلَهٗ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ (سُوْرَةُ النِّسَاءِ)

অর্থ : এটা আল্লাহর সীমানা। আর যে আল্লাহর ও তার রাসূল ﷺ -এর অনুসরণ করবে আল্লাহ তা'আলা তাকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার পাদদেশ দিয়ে নহর প্রবাহিত হবে, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আর সেটাই মহা সফলতা। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর অবাধ্যতা করবে এবং আল্লাহর সীমানা লঙ্ঘন করবে তাকে তিনি জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন সেখানে সে চিরকাল থাকবে আর তার জন্য থাকবে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি। –[সূরা নিসা]

قوله الْاَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ : যেমন পিছনে আল্লাহর বাণী অতিবাহিত হয়েছে যে, وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ অর্থাৎ তোমরা সৎ কাজের আদেশ দাও এবং অসৎ কাজ থেকে বাধা প্রদান কর।

قوله اِقَامَةُ الْحُدُوْدِ : হদ কায়েম করা যেমন, চুরির শাস্তি হিসাবে হদ, মদপান করার কারণে হদ, ব্যভিচারের কারণে হদ, হত্যার কারণে হদ, সতীসাধ্বী নারীকে অপবাদ দেওয়া সহ অন্যান্য কারণে হদ কায়েম করা। কেননা রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন,

اَقِيْمُوْا حُدُوْدَ اللّٰهِ فِي الْقَرِيْبِ وَالْبَعِيْدِ وَلَاتَاخُذْكُمْ فِي اللّٰهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ .

অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নির্ধারিত হদ কায়েম কর। নিকটতম ও দূরবর্তী আত্মীয়ের বেলায়ও। আল্লাহর বিধান পালনের ক্ষেত্রে যেন কোনো তিরস্কারকারীর তিরস্কার তোমাদের বাধা প্রদান না করে।

অপর হাদীসে রাসূল ﷺ বলেন, اِقَامَةُ حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللّٰهِ خَيْرٌ مِنْ مَّطَرِ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً فِيْ بِلَادِ اللّٰهِ অর্থ : আল্লাহর দেওয়া হদসমূহের মধ্য থেকে কোনো একটি বাস্তবায়ন করা আল্লাহর জমিনে চল্লিশ রাত বারি বর্ষণের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

وَالرِّفْقُ وَالتَّطْيِيبُ لِتَرْوِيجِ الْمَعْرُوفَاتِ وَالتَّعْمِيمُ لِلتَّعْلِيمِ وَالْإِكْرَاهُ فِي ضَرُورِيَّاتِ الدِّينِ وَالتَّوْسِيعُ فِي التَّبْلِيغِ عَلَى التَّدْرِيجِ حَسَبَ دَرَجَاتِهِ.

অনুবাদ : নেক ও সৎকাজের বিস্তর ঘটানোর জন্য নম্র ও শান্ত আচরণ করা। দীনি ইলম শিক্ষাকে ব্যাপক করা। দীনের অত্যাবশ্যকীয় বিষয়গুলোকে বাধ্যতামূলক করা এবং পর্যায়ক্রমে তাবলীগের স্তর অনুযায়ী দীনের প্রচার প্রসারে ব্যাপকতা ঘটানো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قوله وَالرِّفْقُ الخ : নেক কাজে বিস্তার ঘটানোর জন্য নম্র হওয়া। কেননা আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.) ও হারুন (আ.) কে ফেরাউনের কাছে ঈমানের দাওয়াত নিয়ে যাওয়ার সময় বলেছেন- فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى (سُورَةُ طٰهٰ : ٤٤)

অর্থাৎ তোমরা উভয়ে তার সাথে নম্রভাবে কথা বল, আশা করা যায় সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা আল্লাহকে ভয় পাবে।

অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা রাসূল ﷺ কে বলেন,

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ (سُوْرَةُ الْأَعْرَافِ : ١٩٩)

অর্থাৎ আপনি ক্ষমা করে দিন, নেক কাজের আদেশ দিন এবং মূর্খলোকদেরকে উপেক্ষা করুন।

অপর আয়াতে বলেন,

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. (سُوْرَةُ اٰلِ عِمْرَانَ : ١٥٩)

অর্থাৎ আপনি আল্লাহ তা'আলার রহমতে নম্র হয়েছেন। যদি আপনি রূঢ় ও কঠোর হৃদয়ের হতেন তাহলে তারা আপনার কাছ থেকে দূরে সরে যেত। সুতরাং আপনি তাদেরকে ক্ষমা করেদিন ও তাদের জন্য মাগফেরাত প্রার্থনা করুন এবং যাবতীয় বিষয়ে তাদের নিয়ে মশওয়ারা করুন।

নম্র ও কঠোর আচরণে পূর্ণাঙ্গ সমন্বয় করা রাসূল ﷺ -এর দ্বারা সম্ভব। কেননা তিনি বলেছেন : بُعِثْتُ مَرْحَمَةً وَمَلْحَمَةً অর্থাৎ আমি দয়ার্দ্র ও কঠোর স্বভাব নিয়ে প্রেরিত হয়েছি।

قوله اَلتَّعْمِيْمُ لِلتَّعْلِيْمِ : দীনি শিক্ষাকে ব্যাপক করা। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِي الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوْا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ (سُوْرَةُ التَّوْبَةِ : ١٢٢)

অর্থাৎ তাদের প্রত্যেক গোত্র থেকে কেন একটি উপদল বের হয় না যেন তারা দীনের তাফাক্কুহ অর্জন করে। এবং যখন তারা ফিরে আসবে তখন নিজ সম্প্রদায়কে ভীতি প্রদর্শন করবে যেন তারা সতর্ক হয়ে যায়।

قوله ضَرُوْرِيَّاتُ الدِّيْنِ : দীনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বাধ্যবাধকতা করবে। কেননা রাসূল ﷺ বলেছেন, طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ (প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর উপর দীনি ইলম শিক্ষা করা ফরজ।)

এখানে ফরজ শব্দটি বলে রাসূল ﷺ দীনের গুরুত্ব পূর্ণ ইলম শিক্ষা করাকে আবশ্যকীয় করে দিয়েছেন। তা ফরযে আইন। আর মাসআলা মাসায়েল, এসবের দলিল ও হাকীকত তত্ত্ব সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ইলম অর্জন করা ফরযে কেফায়া। অপর হাদীসে তিনি বলেন :

مُرُوْا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ اِذَا بَلَغُوْا سَبْعًا وَاضْرِبُوْهُمْ اِذَا بَلَغُوْا عَشْرًا.

তোমাদের সন্তানদের যখন সাত বছর হবে তখন তাকে নামাজের আদেশ দিবে আর যখন দশ বছরে উপনীত হবে তখন (নামাজ না পড়লে) তাদেরকে প্রহার কর।

قوله وَالتَّوْسِيْعُ الخ : দীনের প্রচার-প্রসার ঘটানো। কেননা আল্লাহ তা'আলা সমস্ত নবীর ব্যাপারে বলেছেন–

اَلَّذِيْنَ يُبَلِّغُوْنَ رِسَالَاتِ اللّٰهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ اَحَدًا اِلَّا اللّٰهَ وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا (سُوْرَةُ الْاَحْزَابِ : ٥٤)

অর্থাৎ যারা আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত বিধান অন্যদের পৌঁছিয়ে দেন এবং তারা আল্লাহকেই ভয় করে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় করে না। আর আল্লাহই তাদের জন্য যথেষ্ট।

قوله عَلَى التَّدْرِيْجِ الخ : পর্যায়ক্রমে দীনের প্রচার করবে অর্থাৎ প্রথমে নিজ থেকে শুরু করবে। অতঃপর নিজ পরিবার পরিজনকে। কেননা আল্লাহ বলেছেন– قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا অর্থাৎ তোমরা নিজেকে ও নিজের পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো। অতঃপর নিজের আত্মীয় স্বজনকে। যেমন আল্লাহ বলেছেন, وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ অর্থাৎ আপনি আপনার নিকটাত্মীয় স্বজনকে সতর্ক করুন।

অতঃপর নিজের দেশের মানুষকে যেমন ইরশাদ হয়েছে, لِتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرٰى অর্থাৎ যেন আপনি মক্কাবাসীকে সতর্ক করেন।

অতঃপর পাশের রাষ্ট্রের মানুষদেরকে তারপর পুরো পৃথিবীর সকল সৃষ্টিজীবকে। ইরশাদ হয়েছে– لِيَكُوْنَ لِلْعَالَمِيْنَ نَذِيْرًا অর্থাৎ যাতে আপনি পুরো পৃথিবীর জন্য সতর্ককারী হোন। পর্যায়ক্রমে দীন প্রচার এভাবে করা হয় যার উপর রাসূল ﷺ আমল করেছেন।

وَالتَّنْظِيْمُ بِالْاِعْتِصَامِ بِحَبْلِ اللهِ لِدَفْعِ الْفِرْقَةِ وَتَوْحِيْدِ الْاُمَّةِ وَتَرْبِيَةِ خَلْقِ اللهِ عَلٰى اَخْلَاقِ اللهِ

অনুবাদ : উম্মতকে ঐক্যবদ্ধ করা ও বিভক্তিকে দূর করার জন্য আল্লাহর রজ্জুকে আকড়ে ধরার এক সুবিন্যস্তরূপ দান করা। এবং আল্লাহর সৃষ্টিকে আল্লাহর চরিত্রে চরিত্রবান করা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قوله وَالتَّنْظِيْمُ بِالْاِعْتِصَامِ الخ : আল্লাহর রজ্জুকে আকড়ে ধরা। কেননা আল্লাহ বলেছেন–

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا (سُوْرَةُ اٰلِ عِمْرَانَ : ١٤١)

অর্থাৎ তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে আকড়ে ধরা এবং বিভক্ত হয়ো না।

সুতরাং মতানৈক্য ও বিভক্তিকে দূর করার উপায় হলো, আল্লাহর রজ্জুকে আকড়ে ধরা, আনুষ্ঠানিক সংগঠন-এর মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ করা সম্ভব নয়। যেমন আল্লাহ ইরশাদ করেছেন,

إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا (سُوْرَةُ مَرْيَمَ : ٢٤)

অর্থাৎ নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করে অচিরেই আল্লাহ তাদের পরস্পরে ভালোবাসার সম্পর্ক দান করবেন। সুতরাং কাঙ্ক্ষিত ঐক্যবদ্ধতা কর্মের মাধ্যমেই অর্জিত হবে।

قوله تَرْبِيَةِ خَلْقِ اللّٰهِ الخ : আল্লাহর সৃষ্টিকে তরবিয়াত দেওয়া ও চরিত্রবান করা। কেননা রাসূল ﷺ বলেছেন– بُعِثْتُ لِاُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْاَخْلَاقِ অর্থাৎ আমি উত্তম আখলাককে পূর্ণতা দান করার জন্য প্রেরিত হয়েছি।

অপর হাদীসে রাসূল ﷺ বলেন – تَخَلَّقُوْا بِاَخْلَاقِ اللّٰهِ অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর চরিত্রে চরিত্রবান হও।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : وَذَرُوْا ظَاهِرَ الْاِثْمِ وَبَاطِنَهٗ (سُوْرَةُ الْاَنْعَامِ : ١٤٤)

অর্থাৎ তোমরা বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ গুনাহকে পরিহার করো। অভ্যন্তরীণ গুনাহ হলো মন্দ ও খারাপ আখলাক। আর এই মন্দ আখলাক দূর হবে তরবিয়ত ও তাযকিয়া তথা আত্মশুদ্ধি করার মাধ্যমে। এটা ইহসান বা তাসাউফের আলোচ্য বিষয়। আর ইসলামি খেলাফতের দায়িত্ব এটার সুবিস্তন্যরূপ দেওয়া। কেননা এটা খেলাফতের লক্ষ্য এবং নবুয়তেরও লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

وَلَخَّصَهَا النَّبِيُّ فِيْ خَمْسٍ وَهِيَ مَبَانِيْ أُصُوْلِ السِّيَاسَةِ الدِّيْنِيَّةِ الْجَمَاعَةُ وَالسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ وَالْهِجْرَةُ وَالْجِهَادُ.

অনুবাদ : খেলাফতের ভিত্তিকে রাসূল ﷺ ৫টি বিষয়ের মাঝে সীমাবদ্ধ করেছেন। আর সেগুলোই হলো ধর্মীয় রাজনীতির মৌলিক নীতিমালা। ১. জামাত তথা ঐক্যবদ্ধ থাকা ২. আমীরের নির্দেশ শ্রবণ ৩. আমীরে আনুগত্য প্রদর্শন ৪. হিজরত ৫. জিহাদ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

হারেস আশ'আরী (রা.) হতে এক হাদীসে এই বিষয়টি সুস্পষ্ট ভাবে বর্ণিত হয়েছে। হাদীসটি বেশ দীর্ঘ হওয়ায় প্রয়োজন অনুপাতে নিম্নে তার সার সংক্ষেপ উল্লেখ করা হলো- রাসূল ﷺ বলেন,

إِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ أَمَرَ يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا عَلَيْهِ السَّلَامُ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ يَّعْمَلَ بِهِنَّ وَأَنْ يَّأْمُرَ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ أَنْ يَّعْمَلُوْا بِهِنَّ ١. بِعِبَادَةِ اللّٰهِ وَحْدَهُ لَايُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا ٢. وَبِالصَّلَاةِ ٣. وَبِالصِّيَامِ ٤. وَبِالصَّدَقَةِ ٥. وَبِذِكْرِ اللّٰهِ كَثِيْرًا (وَهٰذِهِ أُصُوْلُ الدِّيَانَةِ) وَأَنَا أُمُرُكُمْ بِخَمْسٍ اللّٰهُ أَمَرَنِيْ بِهِنَّ ١ اَلْجَمَاعَةُ ٢ وَالسَّمْعُ ٣ وَالطَّاعَةُ ٤ اَلْهِجْرَةُ ٥. وَالْجِهَادُ (هٰذِهِ أُصُوْلُ السِّيَاسَةِ)

অর্থ : আল্লাহ তা'আলা ৫টি বিষয়ে হযরত ইয়াহইয়া (আ.) কে নির্দেশ দিয়েছেন যেন তিনি এ বিষয়গুলোর উপর নিজে আমল করেন এবং বনী ইসরাঈলকেও এ বিষয়গুলোর উপর আমলের নির্দেশ দেন।

১. এক আল্লাহর ইবাদত করা। তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরিক না করা ২. নামাজ ৩. রোজা ৪. সদকা ৫. বেশি বেশি আল্লাহর জিকির করা।

আর আমি তোমাদেরকে ৫টি বিষয়ের নির্দেশ দিচ্ছি। যেগুলোর উপর আমল করার নির্দেশ আল্লাহ আমাকে দিয়েছেন-

১. দলবদ্ধ থাকা ২. আমীরের নির্দেশ শ্রবণ ৩. তাঁর কথা মানা ৪. হিজরত করা ৫. জিহাদ করা।

এই হাদীসটিকে ইবনে কাছীর (র.) তাঁর প্রসিদ্ধ তাফসীর গ্রন্থ تَفْسِيْرُ بْنِ كَثِيْرٍ এ
يَاأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ (الْآيَةَ)
আয়াতের অধীনে উল্লেখ করেছেন। কেননা দলবদ্ধতা বা জামাত ছাড়া ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয় না। আর জামাত ইমাম ছাড়া সম্ভব নয়।

আর ইমামের আনুগত্য ছাড়া ইমামের নেতৃত্ব টিকে থাকে না। আর আল্লাহর পক্ষ হতে সংবিধান না থাকলে ইমামের আনুগত্য কেউ করব না। আর আইন কানুন বিধি বিধান থাকলেই ফেৎনা, গোলযোগ প্রতিরোধ সম্ভব। নিরাপত্তা বাস্তবায়ন সম্ভব। অন্যথায় হয় হিজরত নতুবা জিহাদের বিকল্প অন্য কোনো উপায় নেই।

সমাপ্ত